

नदी-काहिनी ।

ਸਰਜੀ ਬਾਬੂ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ।

নন্দীশা-কাহিনী ।

মদীয়ার রাজনীতি, সমাজনীতি, প্রাচীন-ইতিহাস, বিজ্ঞানচর্চা,
ধর্মালোচনা, বংশ-পরম্পরাগত-কাহিনী, বিশিষ্ট-জীবনী,
এবং সাহিত্য, শিল্প, লোকাচার সম্বন্ধীয় বিবিধ
জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক চিত্র ।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় কর্তৃক লিখিত
মুখবন্ধ সংবলিত ।

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত ।

প্রথম সংস্করণ ।

রাণাঘাট

সন ১৩১৭ বঙ্গাব্দ ।

প্রকাশক
গ্রন্থকার
সাহিত্য-সভা ।
১০৬১, প্রে-স্ট্রীট—কলিকাতা ।

মুদ্রিত
ডলিম্পিয়ারান প্রেস
৫৬, বেচু চার্টার্ড স্ট্রীট, কলিকাতা ।
আর, আর, সিংহ দ্বারা মুদ্রিত ।

মূল্য ২৫০ আনা ।

উৎসর্গ।



কর্মমাত্রেই ফলপ্রসূ

অতএব

এই ক্ষুদ্র কর্মের

যদি

কিছু ফল থাকে

তবে

সেই ফল

শ্রীশ্রীভগবানের পাদপদ্মে

ভক্তিপূর্বক

অর্পণ করিয়া

ক্ষুদ্র

গ্রন্থকার

ধন্য

এবং

কৃতার্থ হইল।

আবার প্রিয় হৃদয় অশেষ শুভাম্বুজ কল-সাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত রাজা
 বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ বাহাদুরের আন্তরিক বন্ধু সাহিত্য-সভা আজ ভারতের সর্বত্র
 সুপরিচিত। আবার নদীরা-কাহিনী সাহিত্য-সভার নামে প্রকাশিত হওয়ার
 জাতি নিম্নে পৌরবাহিত মনে করিতেছি। আমি শ্রীযুক্ত রায় রামেন্দ্র চন্দ্র
 শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ মহোদয় প্রমুখ সাহিত্য সভার স্থায়ী সভ্যগণের নিকট
 এজন্ত কৃতজ্ঞ রহিলাম।

এহকার।

যজ্ঞলাচরণ

- ১। কেচিদ্ধিযুঃ যমাহ দ্বিভুবন শরণং পূর্ণতাং যন্তমহা
কেচিচ্চাঃ শাবতারং বিবিধগুননিধিং নিত্যমাহঃ প্রপল্লভাঃ ।
কেচিৎভক্তং বদন্তি প্রতিহতমতয়োভাব গাষ্ট্রীয়া পূর্ণং
সত্ৰীকং তং নদীয়াজনচিতিতমসাং জ্ঞানদীপ স্বরূপং ॥
- ২। নদীয়াভূষণং বন্দে বিষ্ণুং গৌরাক্ষ রূপিণং ।
পিত্রোচ্চরণধন্বং সর্বকামপ্রদং দ্বিজান্ ॥



নিবেদন।

হই বৎসর পূর্বে বংশবাজীর কৃতবিদ্য বিজ্ঞোৎসাহী কুমারগণের বশে পরিচালিত পুণিমা নারী মাসিক পত্রিকার বন্দীর সাহিত্য-সম্ভারখী প্রথিত-নামা বংশবীণেশ্বর শ্রীযুক্ত অক্ষরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে “নবীরা কাহিনী” নামে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমার লিখিত সেই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেকে নবীরাসম্বন্ধে আরও অধিক কথা জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি নবীরার সমাজ, বিজ্ঞা, ধর্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় ইতিহাস সংগ্রহে বহুবান হই ও বহু পরিশ্রমে এতদিনে বাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই সম্ভ্রতি পুস্তকাকারে “নবীরা-কাহিনী” নামে প্রকাশ করিলাম।

নবীরা-কাহিনীকে নবীরার ইতিহাস বলা যায় না। তবে যে সকল উপন্যাসে ইতিহাস বিবর্তিত হয়, তাহার অধিকাংশ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমাদের দেশে অশ্রান্ত বিষয়ের বতই কেন উন্নতি হউক না, ইতিহাসের চর্চা যে কখনও বহল পরিমাণে হইয়াছে, বলিয়া অনুমিত হয় না। বাহা কিছু ইতিহাস বলিয়া সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, তাহা এতই অল্পুত ও অলৌকিক কাহিনীতে সমাজের যে, তাহার মধ্য হইতে খাঁটি সত্যটুকু বাছিয়া লওয়া সুকঠিন। আর তাহা বাছিয়া লইতে গেলেও ইতিহাসের সঙ্গে অনেক কত হইয়া পড়ে; তাই এই পুস্তক রচনার বহু কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর অবতারণা করিতে হইয়াছে, আর সেই অন্তর্ভুক্ত ইহার নাম নবীরার ইতিহাস না দিয়া “নবীরা-কাহিনী” দিয়াছি। নবীরা-কাহিনী কেবলমাত্র নবদ্বীপের কাহিনীতে পূর্ণ নহে, ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক সমগ্র নবীরা জেলার জাতব্য বাবতীর বিষয় সংশ্লীষিত হইয়াছে।

সাধারণতঃ ইতিহাস বলিলে মনে যে একটা স্থান-বিশেষের রাজনীতি, সমাজনীতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদির চিত্র মনে আসে, নদীয়ার ঠিক সেরূপ বিবিধ ঘটনা-রাগ-রঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত করিবার উপায় নাই। কারণ, শেষ বঙ্গেশ্বর লক্ষণ সেনের পর, মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কাল পর্য্যন্ত প্রায় তিন শত বৎসরের ব্যবধান। এই সুদীর্ঘকাল নদীয়া হইতে রাজধানী অপসারিত হওয়ার, নদীয়ার পারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। এইরূপ আরও অনেক সময়ের তথ্য গ্রহণ করিবার উপায় নাই। সুতরাং নদীয়ার ইতিহাস বর্ণন করিতে যাইয়া যামাকে অনেক সময় বঙ্গের সাধারণ ইতিহাস বর্ণন করিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্গের ইতিহাসে নদীয়ার সংশ্লিষ্ট কতটুকু এবং বাঙ্গালার সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র-বিপ্লবে নদীয়ার প্রভাব কতখানি, এইগুলি পরিষ্কৃত করিবার জন্য প্রথম কয়েক অধ্যায়ে বঙ্গের ইতিহাসের সহিত নদীয়ার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া গিয়াছি। পরে, পরবর্তী কয়েক অধ্যায়ে ষাঁটি নদীয়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এমন কি পুরাতন ও আধুনিক বিখ্যাত গ্রাম মাঝেরই স্থানীয় ইতিহাস পৃথকভাবে বিশদভাবে লিপিতে প্রকাশ পাইয়াছে। একদিকে যেমন নদীয়া-রাজবংশের ইতিহাস বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি, তেমনি আবার বহুতর প্রাচীন বংশের ইতিহাস স্থানীয় বিবরণীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

মুখ্যতঃ বিজ্ঞাচর্চা লইয়াই নদীয়ার বশঃ পৃথিবী-ব্যাপ্ত! তাই, জ্ঞানদর্শন, শ্রুতি, জ্যোতিষ, তন্ত্র, বঙ্গভাষা ও পারস্য ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার চর্চা, নদীয়ার কোন্ সময় হইতে আরম্ভ ও উহাদের ক্রম-বিকাশ কিরূপে হইয়াছে, তাহার পারাবাহিক ইতিহাস পৃথক পৃথক ভাবে লিখিয়াছি। এ সকল বিষয়ে লিখিবার এতই সামগ্রী আছে যে, উহাদের প্রত্যেকের নিমিত্ত এক একখানি সূত্রগ্রন্থ গ্রন্থ লিখিলে তবে উহাদের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু প্রত্যেকের সম্বন্ধে অল্প পরিচ্ছেদ লিখিত হইলেও, উহাদের কেবল দুই ঘটনা-গুলি মাত্র এবং বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর কয়েকজননের জীবনী মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

ধর্মচর্চাই নদীয়ার বশঃ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়াছে ; আর নববীণচন্দ্র মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবই নদীয়ার প্রচলিত ধর্ম সকলের প্রাণ-স্বরূপ ; তাই, তাঁহার পুতচরিত নদীয়ার ধর্মচর্চা অধ্যায়ে পৃথকরূপে পরিবিষ্ট করিয়াছি এবং মহাজন-বিরচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের লিখিত বিবরণ হইতেই তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির বিবরণ যতদূর প্রকাশ করিলে সাম্প্রদায়িক আগন্তির কারণ না হইতে পারে, ততদূরই প্রকাশ করিয়াছি। মুসলমান ও খৃষ্টীয় ধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার নিজের জ্ঞান অতি সামান্য সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আমি লিখিয়াছি তাহাতে ভুল প্রমাদ থাকি সম্ভব। যদি কোনও সহৃদয় পাঠক রূপা করিয়া ঐ সকল ভ্রম, বা অন্য কোন ভ্রম বা ত্রুটি প্রদর্শন করাইয়া দেন তাহা হইলে আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব ও ভবিষ্যৎ সংস্করণে ঐ সকল ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইব। সাম্প্রদায়িক মেলাগুলির বিবরণ স্বচক্ষে দেখিয়া বা স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

সমগ্র বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস বাহা, নদীয়ার সামাজিক ইতিহাসও তাহাই। তবে, বিশেষভাবে নদীয়ার সামাজিক পরিবর্তন কিরূপে সাধিত হইয়াছে তাহাই দেখাইবার জন্য নদীয়ার গ্রন্থকারগণের পুস্তক হইতেই তত্তৎ সময়ের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

নদীয়ার যে সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক স্থান সমূহের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ স্থানীয় জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ও প্রাচীন দলী-লাদি দৃষ্টে লিখিত। তবে এ সম্বন্ধে সাধারণের নিকট হইতে যতদূর সহায়ভূতির আশা করিয়াছিলাম, তাহা প্রাপ্ত না হওয়ায়, নদীয়ার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন সমস্ত স্থানগুলির ইতিহাস দিতে পারি নাই। ভবিষ্যতে সাধারণের সহায়ভূতি পাইলে, সমস্ত স্থানের সম্পূর্ণ ইতিহাস দিবার ইচ্ছা থাকিল। নদীয়া সম্বন্ধে “বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়” বলিয়া যে অধ্যায়টি লিখিয়াছি, তাহাতে বর্তমান নদীয়া সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয়ের statistical account বর্ণনাক্রমে দেখান

হইরাছে, যথা—বেলায় ক্রমবিকৃতি ও তাহার ভাগ, নদীর নদী, রাজবন্দী, আদমশুমারী, নদীর কবী ও বাণিজ্য ইত্যাদি।

পুস্তকের মূলতানে যে সকল বিষয় স্থান পায় নাই, তাহাই পরিশিষ্টে পরিবিষ্ট হইরাছে। নদীরা-কাহিনী মুদ্রাঙ্কণ করিবার পূর্বে ভাবিয়াছিলাম যে, নদীরা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল কথাই একত্রণ সংগৃহীত হইরাছে; কিন্তু মুদ্রাঙ্কণ সমাপ্ত হইলে দেখিলাম যে, অনেক কথাই লেখা হয় নাই। ভগবান দিন দিলে, সে সকল কথাই পুনরায় লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

এ পুস্তকে যে সমস্ত ছবি দিয়াছি, তাহার অধিকাংশই আমি নদীর বিভিন্ন স্থানে Photographer পাঠাইয়া সংগ্রহ করিয়াছি, আর কতকগুলি আমি মাননীয় বিচারপতি সাহিত্য-মুদ্রা শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এবং আমার প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইরাছি। তাঁহাদের সকলেরই নিকট আমি চিরকণী রহিলাম।

এই পুস্তক রচনার আমি আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব অনেকের নিকটেই নানারূপে উৎসাহ লাভ করিয়াছি, সেজন্য তাঁহাদের সকলের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। তবে যাঁহাদের সহায়ত্ব ও উৎসাহ না পাইলে আমি এই ত্বরহ কার্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম না, তাঁহাদের মধ্যে প্রবীণ সাহিত্যগুরু পরমারাম্য শ্রীযুক্ত অক্ষরচন্দ্র সরকার মহাশয়, যিনি আমাকে পুস্তক লেখক হইতে এবং এই পুস্তকের সুবন্ধ লিখিয়া নিরাকরণ নদীরা-কাহিনীকে লালকার্য করিয়া সাধারণের সম্মুখে প্রকাশযোগ্য করিয়া দিয়াছেন এবং পুস্তকের পণ্ডিত্যপ্রণয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্তকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্তনাথ সার্কভৌম, কবিত্বগণ শ্রীযুক্তনাথ ভারদ্বাজ, শ্রীযুক্তকৃষ্ণ তর্করত্ন, শ্রীযুক্তকৃষ্ণ কাব্যার্থ প্রমুখ নবীন পণ্ডিতমণ্ডলী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আচার্য বিভাজন, পদ্মচাৰ্য্য-

চরিত, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-রচয়িতা পণ্ডিত শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীরামস্বর বেদান্ত-রত্ন, উড়িষ্যার চিত্র প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীবতীন্দ্রমোহন সিংহ, নবদ্বীপাধিপতি স্বর্ন-গত মহারাজা কিতীশচন্দ্র রায়, শোভাবাজারের সাহিত্যাত্মরাসী রাজা শ্রীবিনয়চন্দ্র দেব বাহাদুর, স্বকবি শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে চৌধুরী এবং আমার সোদর-কল্প বংশবাটীর স্বনামধন্য উদার-চরিত সাহিত্যসেবী সুখী রাজকুমারগণ প্রমুখ অনেকের নিকট আমি তাঁহাদের কৃত উপকারের জন্য চিরঞ্চী রহিলাম।

আমার অক্ষমতা বশতঃ এই গ্রন্থে নানা ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলেও, ইহাতে আমার বস্তুর ত্রুটি হয় নাই, তবে বিষয়টী বেরূপ দূর হইবে এবং দেশের লোকের এমন কি অনেক শিক্ষিত লোকেরও এবিষয়ে যেরূপ ঔদাসীন্য, তাহাতে গ্রন্থ সকলনে ও তথ্যগ্রন্থে সাধারণের নিকট আশামুরূপ সহানুভূতি না পাওয়ার ইহাতে বহু ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। বিশেষ এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া অবধি আমি দারুণ বাতরোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ার এবং বহুদিন রোগভোগ করায়, সেই পীড়িত অবস্থার প্রেক্ষ সংশোধনে বঞ্চিত মনোযোগী হইতে না পারায়, সূত্রাক্রমে বহু ভ্রমপ্রমাণ ও বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে ; ভবিষ্যতে সে ত্রুটি সংশোধনে বঞ্চিত বন্ধ করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তক রচনার আমি কোনও বিষয়ের মৌলিকত্বের দাবী করিতেছি না বা সে স্পর্ধাও রাখি না। আমি নদীয়া সঙ্ক্ষে বেখানে যেটুকু বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই বর্ণনাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি মাত্র। পরন্তু কোনও বিষয়ে মতান্তর প্রাপ্ত হইলেও সে সঙ্ক্ষে নিজের কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া তাহার সকলগুলিই পুস্তকে স্থান দিয়াছি। কলকাতা বিশাল সাহিত্যক্ষেত্রে নদীয়ার ভায় কমনীর কলকুলে অসংখ্য কাননের বেখানে যে ভাল কুলটী পাইয়াছি, তাহাই চয়ন করিয়া নদীয়া-কাহিনী রূপ মালা গাথিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এই মালা যদি কাহারও মনোরঞ্জে অপারক হয়, তবে সে দোষ পুস্তকের নয়—সে দোষ মালাকরের। এই কীণ-শক্তি মালাকরের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং ষোগ্যতা কিছুই নাই, তবে স্মৃতি কুলের

প্রাণোন্মাদী গন্ধে মুগ্ধ হইয়া তাহা নিজে উপভোগ করিত। আর দশজন বৃদ্ধ বাক্রবকে আনন্দ দিতে তাহার এই বিফল প্রয়াস। যদি কোন দক্ষতর শিল্পী এমন স্মৃতিকুসুমের অযোগ্য হস্তে একণু লাঞ্ছনা দেখিত, দয়াপরবশ হইয়া স্বয়ং এই সকল পুণ্যে স্মৃতিমালা প্রেছন করেন, তবেই এই পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইবে। সেদিন কি হইবেনা?

রাণাঘাট, নদীয়া ।
১৪ই ভাদ্র মন ১৩১৭। }

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক ।

মুখবন্ধ ।

আপনাদের কথা, আপনাদের ঘরের কথা, আর একটু অধিকতররূপে
তাবিতে যদি আমরা অভ্যাস করি, তাহা হইলে, আমাদের অধিকতর মঙ্গল
হয়। এমনই একটা ধারণা হইয়াছে যে, যে বস্তু আপনার ঘরের কথা না
জানে, তাহার তত ‘কুপমণ্ডুকত্ব’ অপবাদ ঘুচিয়া গেল। এই ধারণার বশে
যুবকগণ আপনার দেশের, আপনার জাতির কিছুই না জানিয়া, না বুঝিয়া
বিলাতে, বা অন্য কোন বিদেশে আপনার জ্ঞান বিস্তার করিতে বান;স্থানকার
সমাজ-শৈবালের শোভা মাথার পুরিয়া ঘরে কিরিয়া আসেন—একটি কিস্ত-
কিমাকার জীব। দেশে আসিয়া হন—সমাজ-সংস্কারক। এই বিবমবিভ্বনা
হইতে শীঘ্র বঙ্গীয় যুবকগণকে রক্ষা করিতে না পারিলে, আমরা তথা কথিত
কুপমণ্ডুকমণ্ডলীর পরিবর্তে পাইব—কেবল কতকগুলি উড়ন্ত ঘুঘু—সেই
ঘুঘুগুলি আমাদের কোটা-তিটার প্রবেশলাভ করিয়া, আমাদের সর্বনাশ সাধন
করিবে।

বঙ্গালী যুবককে বঙ্গালার কথা ঔবধ-গিলান মত করিয়া শিখাইতে
হইবে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাথ রায়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যো-
পাধ্যায় প্রভৃতি সুধিগণ বঙ্গালিকে বঙ্গালার কথা শিখাইতে অগ্রসর হইয়া
আপনারা ধন্য হইয়াছেন ও আমাদেরকে ধন্য করিয়াছেন। খ্যাতনামা
কার্ত্তিকেরচন্দ্র রায় মহাশয় কৃষ্ণনগরের রাজবংশের এবং রাজাদিগের কৃতিত্বের
বিস্তারিত পরিচয় প্রদান করিয়া, যে পথ উৎকর্ষ করিয়াছিলেন, সেই পথে
আমাদের নবীন যুবক গ্রন্থকার রাণাঘাটের শ্রীমান্ কুমুদনাথ বল্লিক অগ্রসর
হইয়া, এই যে নদীয়া-কাহিনী প্রচারিত করিলেন, ইহাতে সাধারণতঃ বঙ্গবাসীর,
বিশেষতঃ নদীয়া জেলার অধিবাসীদের বিশেষ উপকার হইবে।

প্রাচীন হুনানী মন্ডলে যেমন আখিনী নগরী, ভারতে যেমন বারাণসী,

নকে তেমনই নবদীপ, ভারতীয় রাজধানী—কিতির প্রদীপ। নবদীপ, সরস্বতীর সিংহাসন—এইখানে দীপ জলে, চারিদিকে আলো হয়। স্মৃতি, তত্ত্ব, জ্ঞান, জ্যোতিষ—এইখানেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কলি-পাবন পতিত-তারণ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই খানেই অবতীর্ণ হইয়া, অপূর্ণ হরিনাম প্রচারে কলি-কলুষিত জীবের সদপতিসাধন করিয়াছেন। এই নদীয়ার এবং সমগ্র নদীয়া জেলার বিবরণ, ধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস আমাদের লিখিবার সামগ্রী। আবার নদীয়া জেলার পলাশী-ক্ষেত্রে আমাদের ভাগ্যপরিবর্তন ঘটয়াছে, সুতরাং নদীয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসও আমাদের অমুশীলনের উপযোগী।

নদীয়া-কাহিনীতে এসকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ আছে, আরও অনেক প্রয়োজনীয় কথাও বিস্তার আছে। কলকথা, নদীয়া-কাহিনীতে ভবিষ্যৎ বঙ্গতিহাসের একটি প্রধান অংশ সঙ্কলিত হইল।

আমার ধাত্মীয়তা বৃদ্ধা এবং এক চক্ষুহীন ছিলেন—সেই বিড়ম্বনার আমার মাথার উপরিতাগ দণ্ড হয়, এখনও কেনহীন। আমি নদীয়া-কাহিনীর স্মৃতিকা হইতে পরিচর্যা করিয়াছি, আমিও এখন কয়োবৈশিষ্ট্যে শক্তিহীন, দৃষ্টিশীল হইয়া পড়িয়াছি—সুতরাং নদীয়া-কাহিনীর যে অল্প-বৈলক্ষণ্য থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই—তবে ধাইগিরীতে যে নবপর্তিনী প্রকাশিত হইলেন, নবীন যুবক যে এরূপ সুবৃহৎ পুস্তক প্রকাশে সমর্থ হইলেন, তাহাতেই আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

নবপ্রসূতকে স্মৃতিকার সকলেই সোণারচাঁদ দেখে—আমাদের এই সোণার চাঁদকে, তোমাদের কোলে দিলাম, তোমরা বুকে করিয়া, আশীর্বাদ করিয়া ঘরে তোলা—ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। ছেলে তাল মন্ড—তোমরা যেমন লালনপালন করিবে, তেমনই হইবে। আমরা তার কি জানি ?

কদমতলা, চুঁচুড়া
এই আবার, ১৩১৭। }

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।



সূচিপত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ॥
মজলাচরণ	১৮০
নিবেদন	১/০
মুখবন্ধ	৫০/০
নদীয়ার নামোৎপত্তি	১—৫
নদীয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস	৬—১০৪
(ক) নদীয়ার হিন্দুরাজত্ব	৬
(খ) নদীয়ার বখানাধিকার	১৩
(গ) নদীয়ার ইংরাজাধিকার	৬১
নদীয়ার বিভাগচর্চা	১০৫—১৯২
(ক) ন্যায়দর্শন	১০৫
(খ) স্থিতি	১২৬
(গ) জ্যোতিষ	১৩৫
(ঘ) ভূত্ব	১৫৮
(ঙ) বঙ্গভাষা ও লিঙ্গা	১৬৬
নদীয়ার ধর্মচর্চা	১৯৩—২৬০
(ক) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১৯৭
(খ) বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়	২২১
(গ) বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মেলা	২৪৭
নদীয়ার সামাজিক বিবরণ	২৬১—২৮৫

নদীর কতিপয় প্রাচীন ও আধুনিক স্থান	...	২৮৭—৩৭৮
(ক) কৃকনগর ও কৃকনগর রাজবংশ	...	২৮৮
(খ) হরধার	...	৩১৭
(গ) শান্তিপুর	...	৩১২
(ঘ) হরিনদী, বাগবাঁচড়া, ব্রহ্মশাসন	...	৩২০
(ঙ) উলা (বীরনগর)	...	৩২২
(চ) রাণাঘাট	...	৩৩৩
(ছ) চাকদহ	...	৩৪৫
(জ) কাঁচড়াপাড়া	...	৩৪৯
(ঝ) বাগের গ্রাম	...	৩৫১
(ঞ) স্থলনাগর	...	৩৫৪
(ট) চুয়াডাঙ্গা	...	৩৫৬
(ঠ) মেহেরপুর	...	৩৬৩
(ড) নবদ্বীপ	...	৩৬৮
(ঢ) মারাপুর, মহেশগঞ্জ, স্বরূপগঞ্জ, বিশ্বপুত্রিশী, ভাঙ্গনঘাট	...	৩৭৪
(ণ) কুষ্টিয়া	...	৩৭৫
(ত) কুমারখালি, আমলাসদরপুর, ছেঁউড়িয়া	...	৩৭৭
নদীরা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিবিধ বিষয়	...	৩৭৯—৩৯৬
(ক) পরিমাণ কল ও ভৌগোলিক সংস্থান	...	৩৭৯
(খ) নদীয়ার নদী	...	৩৮০
(গ) নদীয়ার রাজপথ	...	৩৮৫
(ঘ) আদমসুয়ারী	...	৩৮৭
(ঙ) নদীয়ার কৃষি	...	৩৯৩
(চ) নদীয়ার বাবসা বাণিজ্য	...	৩৯৫
পরিশিষ্ট	...	৩৯৭—৪০০
(ক) নয়হরিন্দাসের নবদ্বীপ পরিক্রমা	...	৩৯৭
(খ) নদীয়াগত বিখ্যাত সাহেবগণ	...	৩৯৭
(গ) নদীয়ার জমিদার	...	৩৯৯
(ঘ) পরিসংখ্যান	...	৪০০

চিত্রাবলী ।

নদীয়ার মানচিত্র ।

নবাব মুরশীদকুলী খাঁ ।

নবাব আলিবর্দী খাঁ ।

নবাব সিরাজ-উ-দৌলা ।

নবাব মীরজাফর ও মীরণ ।

ইংরাজের বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রাপ্তি ।

লর্ড ক্লাইব ।

ওয়ারেন হেস্টিংস্ ।

বঙ্গেশ্বর পিটার গ্রাণ্ট ।

ডব্লিউ, এন্স, সিট্‌নকর ।

রেভাঃ জেমস্ লঙ্ ।

দীনবন্ধু মিত্র ।

রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ।

সার উইলিয়ম জোন্স্ ।

লর্ড কর্ণওয়ালিস ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ।

নবদ্বীপস্থ বর্তমান পণ্ডিতমণ্ডলী ।

সপরিষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের ভাগবত শ্রবণ ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ।

লক্ষণসেনদেবের তান্ত্রশাসন ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অশ্রুমতাসুসারে

নদীয়ার ঢালাই কামান ।

নবদ্বীপাধিপতি ৬কিতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর ।

নবীন নবদ্বীপাধিপতি ক্রোড়ীষ চন্দ্র রায় বাহাদুর ।

শিবনিবাসের শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির ।

শিবনিবাসের ১ম শিবমন্দির ।

শিবনিবাসের ২য় শিবমন্দির ।

কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন চক্ ।

কবি কুন্তিবাসের ফুলিয়ার দোঙ্গমঞ্চের ধ্বংসাবশেষ ।

রাণাঘাটের জমিদার ৬ শ্রীগোপাল পাল চৌধুরী ।

রাণাঘাটের জমিদার ৬রামলাল দে চৌধুরী ।

শান্তিপুর শ্রামটাদেব শ্রীমন্দির ।

রাণী কৃষ্ণচন্দ্র স্থাপিত উলার দীর্ঘিকা ।

বাগের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ।

মহামহিমায়িত রাজরাজেশ্বর শপ্তম এডোয়ার্ড ।

মহামহিমায়িত রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ ।



উৎসর্গ।



কর্মমাত্রেই ফলপ্রসূ

অতএব

এই ক্ষুদ্র কর্মের

যদি

কিছু ফল থাকে

তবে

সেই ফল

শ্রীশ্রীভগবানের পাদপদ্মে

ভক্তিপূর্বক

অর্পণ করিয়া

ক্ষুদ্র

গ্রন্থকার

ধন্য

এবং

কৃতার্থ হইল।



আবার প্রিয় হৃদয় অশেষ শুভাম্বুজ কল-সাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত রাজা
 বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ বাহাদুরের আন্তরিক বন্ধু সাহিত্য-সভা আজ ভারতের সর্বত্র
 সুপরিচিত। আবার নদীরা-কাহিনী সাহিত্য-সভার নামে প্রকাশিত হওয়ার
 জাতি নিম্নে পৌরবাহিত মনে করিতেছি। আমি শ্রীযুক্ত রায় রামেন্দ্র চন্দ্র
 শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ মহোদয় প্রমুখ সাহিত্য সভার স্থায়ী সভ্যগণের নিকট
 এজন্ত কৃতজ্ঞ রহিলাম।

এহকার।

যজ্ঞলাচরণ

- ১। কেচিদ্ধিযুঃ যমাহ দ্বিভুবন শরণং পূর্ণতাং যন্তমহা
কেচিচ্চাঃ শাবতারং বিবিধশুননিধিং নিত্যমাহঃ প্রপল্লভাঃ ।
কেচিৎভক্তং বদন্তি প্রতিহতমতয়োভাব গাষ্ট্রীয়া পূর্ণং
সত্ৰীকং তং নদীয়াজনচিতিতমসাং জ্ঞানদীপ স্বরূপং ॥
- ২। নদীয়াভূষণং বন্দে বিষ্ণুং গৌরাক্ষ রূপিণং ।
পিত্রোচ্চরণধন্বং সর্বকামপ্রদং দ্বিজান্ ॥



নিবেদন।

হই বৎসর পূর্বে বংশবাজীর কৃতবিদ্য বিজ্ঞোৎসাহী কুমারগণের বশে পরিচালিত পুণিমা নারী মাসিক পত্রিকার বন্দীর সাহিত্য-সমারমণী প্রথিত-নামা বংশবীণেশ্বর শ্রীযুক্ত অক্ষরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে “নবীরা কাহিনী” নামে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমার লিখিত সেই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেকে নবীরাসম্বন্ধে আরও অধিক কথা জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি নবীরার সমাজ, বিজ্ঞা, ধর্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় ইতিহাস সংগ্রহে বহুবান হই ও বহু পরিশ্রমে এতদিনে বাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই সম্ভ্রান্তি পুস্তকাকারে “নবীরা-কাহিনী” নামে প্রকাশ করিলাম।

নবীরা-কাহিনীকে নবীরার ইতিহাস বলা যায় না। তবে যে সকল উপাদানে ইতিহাস বিহচিত হয়, তাহার অধিকাংশ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমাদের দেশে অশ্রান্ত বিষয়ের বতই কেন উন্নতি হউক না, ইতিহাসের চর্চা যে কখনও বহুল পরিমাণে হইয়াছে, বলিয়া অনুমিত হয় না। বাহা কিছু ইতিহাস বলিয়া সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, তাহা এতই অল্পত ও অলৌকিক কাহিনীতে সমাচ্ছন্ন যে, তাহার মধ্য হইতে খাঁটি সত্যটুকু বাছিয়া লওয়া সুকঠিন। আর তাহা বাছিয়া লইতে গেলেও ইতিহাসের সঙ্গে অনেক কত হইয়া পড়ে; তাই এই পুস্তক রচনার বহু কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর অবতারণা করিতে হইয়াছে, আর সেই অন্তর্ভুক্ত ইহার নাম নবীরার ইতিহাস না দিয়া “নবীরা-কাহিনী” দিয়াছি। নবীরা-কাহিনী কেবলমাত্র নবদ্বীপের কাহিনীতে পূর্ণ নহে, ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক সমগ্র নবীরা জেলার জাতব্য বাবতীর বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে।

সাধারণতঃ ইতিহাস বলিলে মনে যে একটা স্থান-বিশেষের রাজনীতি, সমাজনীতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদির চিত্র মনে আসে, নদীয়ার ঠিক সেরূপ বিবিধ ঘটনা-রাগ-রঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত করিবার উপায় নাই। কারণ, শেষ বঙ্গেশ্বর লক্ষণ সেনের পর, মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কাল পর্য্যন্ত প্রায় তিন শত বৎসরের ব্যবধান। এই সুদীর্ঘকাল নদীয়া হইতে রাজধানী অপসারিত হওয়ার, নদীয়ার পারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। এইরূপ আরও অনেক সময়ের তথ্য গ্রহণ করিবার উপায় নাই। সুতরাং নদীয়ার ইতিহাস বর্ণন করিতে যাইয়া আমরা অনেক সময় বঙ্গের সাধারণ ইতিহাস বর্ণন করিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্গের ইতিহাসে নদীয়ার সংশ্লিষ্ট কতটুকু এবং বাঙ্গালার সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র-বিপ্লবে নদীয়ার প্রভাব কতখানি, এইগুলি পরিষ্কৃত করিবার জন্য প্রথম কয়েক অধ্যায়ে বঙ্গের ইতিহাসের সহিত নদীয়ার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া গিয়াছি। পরে, পরবর্তী কয়েক অধ্যায়ে ঐতিহাসিক নদীয়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এমন কি পুরাতন ও আধুনিক বিখ্যাত গ্রাম মাঝেরই স্থানীয় ইতিহাস পৃথকভাবে বিশদভাবে লিপিতে প্রকাশ পাইয়াছে। একদিকে যেমন নদীয়া-রাজবংশের ইতিহাস বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি, তেমনি আবার বহুতর প্রাচীন বংশের ইতিহাস স্থানীয় বিবরণীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

মুখ্যতঃ বিজ্ঞাচর্চা লইয়াই নদীয়ার বংশ: পৃথিবী-ব্যাপ্ত! তাই, জ্ঞানদর্শন, শ্রুতি, জ্যোতিষ, তন্ত্র, বঙ্গভাষা ও পারস্য ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার চর্চা, নদীয়ার কোন সময় হইতে আরম্ভ ও উহাদের ক্রম-বিকাশ কিরূপে হইয়াছে, তাহার পারাবাহিক ইতিহাস পৃথক পৃথক ভাবে লিখিয়াছি। এ সকল বিষয়ে লিখিবার এতই সামগ্রী আছে যে, উহাদের প্রত্যেকের নিমিত্ত এক একখানি সূত্রগ্রন্থ গ্রন্থ লিখিলে তবে উহাদের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু প্রত্যেকের সম্বন্ধে অল্প পরিচ্ছেদ লিখিত হইলেও, উহাদের কেবল দুই ঘটনা-গুলি মাত্র এবং বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর কয়েকজনের জীবনী মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

ধর্মচর্চাই নদীয়ার বশঃ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়াছে ; আর নববীণচন্দ্র মহাপ্রভু ত্রীচৈতন্তদেবই নদীয়ার প্রচলিত ধর্ম সকলের প্রাণ-স্বরূপ ; তাই, তাঁহার পুতচরিত নদীয়ার ধর্মচর্চা অধ্যায়ে পৃথকরূপে পরিবিষ্ট করিয়াছি এবং মহাজন-বিরচিত ত্রীচৈতন্ত চরিতামৃত, ত্রীচৈতন্ত ভাগবত, ত্রীচৈতন্ত মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের লিখিত বিবরণ হইতেই তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির বিবরণ যতদূর প্রকাশ করিলে সাম্প্রদায়িক আগন্তির কারণ না হইতে পারে, ততদূরই প্রকাশ করিয়াছি। মুসলমান ও খৃষ্টীয় ধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার নিজের জ্ঞান অতি সামান্য সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আমি লিখিয়াছি তাহাতে ভুল প্রমাদ থাকি সম্ভব। যদি কোনও সহৃদয় পাঠক কৃপা করিয়া ঐ সকল ভ্রম, বা অন্য কোন ভ্রম বা ত্রুটি প্রদর্শন করাইয়া দেন তাহা হইলে আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব ও ভবিষ্যৎ সংস্করণে ঐ সকল ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইব। সাম্প্রদায়িক মেলাগুলির বিবরণ স্বচক্ষে দেখিয়া বা স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

সমগ্র বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস বাহা, নদীয়ার সামাজিক ইতিহাসও তাহাই। তবে, বিশেষভাবে নদীয়ার সামাজিক পরিবর্তন কিরূপে সাধিত হইয়াছে তাহাই দেখাইবার জন্ত নদীয়ার গ্রন্থকারগণের পুস্তক হইতেই তত্তৎ সময়ের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

নদীয়ার যে সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক স্থান সমূহের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ স্থানীয় জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ও প্রাচীন দলী-লাদি দৃষ্টে লিখিত। তবে এ সম্বন্ধে সাধারণের নিকট হইতে যতদূর সহায়ভূতির আশা করিয়াছিলাম, তাহা প্রাপ্ত না হওয়ায়, নদীয়ার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন সমস্ত স্থানগুলির ইতিহাস দিতে পারি নাই। ভবিষ্যতে সাধারণের সহায়ভূতি পাইলে, সমস্ত স্থানের সম্পূর্ণ ইতিহাস দিবার ইচ্ছা থাকিল। নদীয়া সম্বন্ধে “বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়” বলিয়া যে অধ্যায়টি লিখিয়াছি, তাহাতে বর্তমান নদীয়া সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয়ের statistical account বর্ণনাক্রমে দেখান

হইরাছে, যথা—বেলায় ক্রমবিকৃতি ও তাহার ভাগ, নদীর নদী, রাজবন্দী, আদমশুমারী, নদীর কবী ও বাণিজ্য ইত্যাদি।

পুস্তকের মূলভাগে যে সকল বিষয় স্থান পায় নাই, তাহাই পরিশিষ্টে পরিবিষ্ট হইরাছে। নদীরা-কাহিনী মুদ্রাঙ্কণ করিবার পূর্বে ভাবিয়াছিলাম যে, নদীরা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল কথাই একত্রণ সংগৃহীত হইরাছে; কিন্তু মুদ্রাঙ্কণ সমাপ্ত হইলে দেখিলাম যে, অনেক কথাই লেখা হয় নাই। ভগবান দিন দিলে, সে সকল কথাই পুনরায় লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

এ পুস্তকে যে সমস্ত ছবি দিয়াছি, তাহার অধিকাংশই আমি নদীর বিভিন্ন স্থানে Photographer পাঠাইয়া সংগ্রহ করিয়াছি, আর কতকগুলি আমি মাননীয় বিচারপতি সাহিত্য-মুদ্রাঙ্কণ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এবং আমার প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইরাছি। তাঁহাদের সকলেরই নিকট আমি চিরকণী রহিলাম।

এই পুস্তক রচনার আমি আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব অনেকের নিকটেই নানারূপে উৎসাহ লাভ করিয়াছি, সেজন্য তাঁহাদের সকলের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। তবে যাঁহাদের সহায়ত্ব ও উৎসাহ না পাইলে আমি এই ত্বরহ কার্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম না, তাঁহাদের মধ্যে প্রবীণ সাহিত্যগুরু পরমারাম্য শ্রীযুক্ত অক্ষরচন্দ্র সরকার মহাশয়, যিনি আমাকে পুস্তক লেখক হইতে এবং এই পুস্তকের সুবন্ধ লিখিয়া নিরাকরণ নদীরা-কাহিনীকে লালকার্য করিয়া সাধারণের সম্মুখে প্রকাশযোগ্য করিয়া দিয়াছেন এবং পুস্তকের পণ্ডিত্যপ্রণয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্তকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্তনাথ সার্কভৌম, কবিত্বগণ শ্রীযুক্তনাথ ভারদ্বাজ, শ্রীযুক্তকৃষ্ণ তর্করত্ন, শ্রীযুক্তকৃষ্ণ কাব্যার্থ প্রমুখ নবীন পণ্ডিতমণ্ডলী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্তকৃষ্ণ আচার্য্য বিভাভূষণ, শ্রীযুক্তকৃষ্ণ-

চরিত, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-রচয়িতা পণ্ডিত শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীরামরত্ন বেদান্ত-রত্ন, উড়িষ্যার চিত্র প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীবতীন্দ্রমোহন সিংহ, নবদ্বীপাধিপতি স্বর্ন-গত মহারাজা কিতীশচন্দ্র রায়, শোভাবাজারের সাহিত্যাত্মরাসী রাজা শ্রীবিনয়চন্দ্র দেব বাহাদুর, স্বকবি শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে চৌধুরী এবং আমার সোদর-কল্প বংশবাটীর স্বনামধন্য উদার-চরিত সাহিত্যসেবী সুখী রাজকুমারগণ প্রমুখ অনেকের নিকট আমি তাঁহাদের কৃত উপকারের জন্য চিরঞ্চী রহিলাম।

আমার অক্ষমতা বশতঃ এই গ্রন্থে নানা ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলেও, ইহাতে আমার বস্তুর ত্রুটি হয় নাই, তবে বিষয়টী বেরূপ দূর হইবে এবং দেশের লোকের এমন কি অনেক শিক্ষিত লোকেরও এবিষয়ে যেরূপ ঔদাসীন্য, তাহাতে গ্রন্থ সকলনে ও তথ্যগ্রন্থে সাধারণের নিকট আশামুরূপ সহানুভূতি না পাওয়ার ইহাতে বহু ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। বিশেষ এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া অবধি আমি দারুণ বাতরোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ার এবং বহুদিন রোগভোগ করায়, সেই পীড়িত অবস্থার প্রেক্ষ সংশোধনে বঞ্চিত মনোযোগী হইতে না পারায়, সূত্রাক্রমে বহু ভ্রমপ্রমাণ ও বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে ; ভবিষ্যতে সে ত্রুটি সংশোধনে বঞ্চিত বন্ধ করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তক রচনার আমি কোনও বিষয়ের মৌলিকত্বের দাবী করিতেছি না বা সে স্পর্ধাও রাখি না। আমি নদীয়া সঙ্ক্ষে বেখানে যেটুকু বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই বর্ণনাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি মাত্র। পরন্তু কোনও বিষয়ে মতান্তর প্রাপ্ত হইলেও সে সঙ্ক্ষে নিজের কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া তাহার সকলগুলিই পুস্তকে স্থান দিয়াছি। কলকাতা বিশাল সাহিত্যক্ষেত্রে নদীয়ার ভায় কমনীর কলকুলে অসংখ্য কাননের বেখানে যে ভাল কুলটী পাইয়াছি, তাহাই চয়ন করিয়া নদীয়া-কাহিনী রূপ মালা গাথিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এই মালা যদি কাহারও মনোরঞ্জে অপারক হয়, তবে সে দোষ পুস্তকের নয়—সে দোষ মালাকরের। এই কীণ-শক্তি মালাকরের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং ষোগ্যতা কিছুই নাই, তবে স্মৃতি স্মৃতির

প্রাণোন্মাদী গন্ধে মুগ্ধ হইয়া তাহা নিজে উপভোগ করিরা আর দশজন বন্ধু
বান্ধবকে আনন্দ দিতে তাহার এই বিফল প্রয়াস। যদি কোন দক্ষতর শিল্পী
এমন সুপ্রতিকূস্মের অযোগ্য হস্তে একণ লাজনা দেখিরা, দয়াপরবশ হইয়া স্বয়ং
এই সকল পুশ্পে সুন্দরমালা প্রেছন করেন, তবেই এই পরিশ্রম ও
অর্থব্যয় সার্থক হইবে। সেদিন কি হইবেনা?

রাণাঘাট, নদীয়া।
১৪ই ভাদ্র মন ১৩১৭। }

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক।

মুখবন্ধ ।

আপনাদের কথা, আপনাদের ঘরের কথা, আর একটু অধিকতররূপে ভাবিতে যদি আমরা অভ্যাস করি, তাহা হইলে, আমাদের অধিকতর মঙ্গল হয় । এমনই একটা ধারণা হইরাছে যে, যে বস্তু আপনার ঘরের কথা না জানে, তাহার তত ‘কুপমণ্ডুকত্ব’ অপবাদ ঘুচিয়া গেল । এই ধারণার বশে যুবকগণ আপনার দেশের, আপনার জাতির কিছুই না জানিয়া, না বুঝিয়া বিলাতে, বা অন্য কোন বিদেশে আপনার জ্ঞান বিস্তার করিতে বান;সেখানকার সমাজ-শৈবালের শোভা মাথার পুরিয়া ঘরে কিরিয়া আসেন—একটি কিস্ত-কিমাকার জীব । দেশে আসিয়া হন—সমাজ-সংস্কারক । এই বিবমবিভ্রমনা হইতে শীঘ্র বঙ্গীয় যুবকগণকে রক্ষা করিতে না পারিলে, আমরা তথা কথিত কুপমণ্ডুকমণ্ডলীর পরিবর্তে পাইব—কেবল কতকগুলি উড়ন্ত ঘুঘু—সেই ঘুঘুগুলি আমাদের কোটা-তিটার প্রবেশলাভ করিয়া, আমাদের সর্বনাশ সাধন করিবে ।

বঙ্গালী যুবককে বঙ্গালার কথা ঔবধ-গিলান মত করিয়া শিখাইতে হইবে । শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাথ রায়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সুধিগণ বঙ্গালিকে বঙ্গালার কথা শিখাইতে অগ্রসর হইয়া আপনারা ধন্য হইয়াছেন ও আমাদেরকে ধন্য করিয়াছেন । খ্যাতনামা কার্তিকেরচন্দ্র রায় মহাশয় কৃষ্ণনগরের রাজবংশের এবং রাজাদিগের কৃতিত্বের বিস্তারিত পরিচয় প্রদান করিয়া, যে পথ উৎকর্ষ করিয়াছিলেন, সেই পথে আমাদের নবীন যুবক গ্রন্থকার রাণাঘাটের শ্রীমান্ কুমুদনাথ বল্লিক অগ্রসর হইয়া, এই যে নদীয়া-কাহিনী প্রচারিত করিলেন, ইহাতে সাধারণতঃ বঙ্গবাসীর, বিশেষতঃ নদীয়া জেলার অধিবাসীদের বিশেষ উপকার হইবে ।

প্রাচীন হুনানী মন্ডলে যেমন আখিনী নগরী, ভারতে যেমন বারাণসী,

নকে তেমনই নবদীপ, ভারতীয় রাজধানী—কিতির প্রদীপ। নবদীপ, সরস্বতীর সিংহাসন—এইখানে দীপ জলে, চারিদিকে আলো হয়। স্মৃতি, তত্ত্ব, জ্ঞান, জ্যোতিষ—এইখানেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কলি-পাবন পতিত-তারণ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই খানেই অবতীর্ণ হইয়া, অপূর্ণ হরিনাম প্রচারে কলি-কলুষিত জীবের সদপতিসাধন করিয়াছেন। এই নদীয়ার এবং সমগ্র নদীয়া জেলার বিবরণ, ধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস আমাদের লিখিবার সামগ্রী। আবার নদীয়া জেলার পলাশী-ক্ষেত্রে আমাদের ভাগ্যপরিবর্তন ঘটয়াছে, সুতরাং নদীয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসও আমাদের অমুশীলনের উপযোগী।

নদীয়া-কাহিনীতে এসকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ আছে, আরও অনেক প্রয়োজনীয় কথাও বিস্তার আছে। কলকথা, নদীয়া-কাহিনীতে ভবিষ্যৎ বঙ্গতিহাসের একটি প্রধান অংশ সঙ্কলিত হইল।

আমার ধাত্মীয়তা বৃদ্ধা এবং এক চক্ষুহীন ছিলেন—সেই বিড়ম্বনার আমার মাথার উপরিতাগ দণ্ড হয়, এখনও কেনহীন। আমি নদীয়া-কাহিনীর স্মৃতিকা হইতে পরিচর্যা করিয়াছি, আমিও এখন কয়েবৈশিষ্ট্যে শক্তিহীন, দৃষ্টিশীল হইয়া পড়িয়াছি—সুতরাং নদীয়া-কাহিনীর যে অন-বৈলক্ষ্য থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই—তবে ধাইগিরীতে যে নবপর্তিনী প্রণয়না হইলেন, নবীন যুবক যে এরূপ সুবৃহৎ পুস্তক প্রকাশে সমর্থ হইলেন, তাহাতেই আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

নবপ্রসূতকে স্মৃতিকার সকলেই সোণারচাঁদ দেখে—আমাদের এই সোণার চাঁদকে, তোমাদের কোলে দিলাম, তোমরা বুকে করিয়া, আশীর্বাদ করিয়া ঘরে তোলা—ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। ছেলে তাল মন্ড—তোমরা যেমন লালনপালন করিবে, তেমনই হইবে। আমরা তার কি জানি ?

কদমতলা, চুঁচুড়া
এই আবার, ১৩১৭। }

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।



সূচিপত্র ।

বিষয় ।		পৃষ্ঠা ॥
মঙ্গলাচরণ	...	১৮০
নিবেদন	...	১/০
মুখবন্ধ	...	৫০/০
নদীয়া নামোৎপত্তি	...	১—৫
নদীয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস	...	৬—১০৪
(ক) নদীয়ার হিন্দুরাজত্ব	...	৬
(খ) নদীয়ার বখনাধিকার	...	১৩
(গ) নদীয়ার ইংরাজাধিকার	...	৬১
নদীয়ার বিভাগচর্চা	...	১০৫—১৯২
(ক) ন্যায়দর্শন	...	১০৫
(খ) শ্রুতি	...	১২৬
(গ) জ্যোতিষ	...	১৩৫
(ঘ) ভূত্ব	...	১৫৮
(ঙ) বঙ্গভাষা ও লিঙ্গা	...	১৬৬
নদীয়ার ধর্মচর্চা	...	১৯৩—২৬০
(ক) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	...	১৯৭
(খ) বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়	...	২২১
(গ) বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মেলা	—	২৪৭
নদীয়ার সামাজিক বিবরণ	...	২৬১—২৮৫

নদীর কতিপয় প্রাচীন ও আধুনিক স্থান	...	২৮৭—৩৭৮
(ক) কৃকনগর ও কৃকনগর রাজবংশ	...	২৮৮
(খ) হরধার	...	৩১৭
(গ) শান্তিপুর	...	৩১২
(ঘ) হরিনদী, বাগবাঁচড়া, ব্রহ্মশাসন	...	৩২০
(ঙ) উলা (বীরনগর)	...	৩২২
(চ) রাণাঘাট	...	৩৩৩
(ছ) চাকদহ	...	৩৪৫
(জ) কাঁচড়াপাড়া	...	৩৪৯
(ঝ) বাগের গ্রাম	...	৩৫১
(ঞ) স্থলনাগর	...	৩৫৪
(ট) চুয়াডাঙ্গা	...	৩৫৬
(ঠ) মেহেরপুর	...	৩৬৩
(ড) নবদ্বীপ	...	৩৬৮
(ঢ) মারাপুর, মহেশগঞ্জ, স্বরূপগঞ্জ, বিশ্বপুকুরিণী, ভাঙ্গনঘাট	...	৩৭৪
(ণ) কুষ্টিয়া	...	৩৭৫
(ত) কুমারখালি, আমলাসদরপুর, ছেঁউড়িয়া	...	৩৭৭
নদীর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিবিধ বিষয়	...	৩৭৯—৩৯৬
(ক) পরিমাণ কল ও ভৌগোলিক সংস্থান	...	৩৭৯
(খ) নদীর নদী	...	৩৮০
(গ) নদীর রাজপথ	...	৩৮৫
(ঘ) আদমসুয়ারী	...	৩৮৭
(ঙ) নদীর কৃষি	...	৩৯৩
(চ) নদীর বাবসা বাণিজ্য	...	৩৯৫
পরিশিষ্ট	...	৩৯৭—৪০০
(ক) নরহরিনাসের নবদ্বীপ পরিক্রমা	...	৩৯৭
(খ) নদীমাগত বিখ্যাত সাহেবগণ	...	৩৯৭
(গ) নদীর জমিদার	...	৩৯৯
(ঘ) পরিসংখ্যান	...	৪০০

চিত্রাবলী ।

নদীয়ার মানচিত্র ।

নবাব মুরশীদকুলী খাঁ ।

নবাব আলিবর্দী খাঁ ।

নবাব সিরাজ-উ-দৌলা ।

নবাব মীরজাফর ও মীরণ ।

ইংরাজের বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রাপ্তি ।

লর্ড ক্লাইব ।

ওয়ারেন হেস্টিংস্ ।

বঙ্গেশ্বর পিটার গ্রাণ্ট ।

ডব্লিউ, এন্স, সিট্‌নকর ।

রেভাঃ জেমস্ লঙ্ ।

দীনবন্ধু মিত্র ।

রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ।

সার উইলিয়ম জোন্স্ ।

লর্ড কর্ণওয়ালিস ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ।

নবদ্বীপস্থ বর্তমান পণ্ডিতমণ্ডলী ।

সপরিষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের ভাগবত শ্রবণ ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ।

লক্ষণসেনদেবের তান্ত্রশাসন ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অশ্রুমতাসুসারে

নদীয়ার ঢালাই কামান ।

নবদ্বীপাধিপতি ৬কিতীচন্দ্র রায় বাহাদুর ।

নবীন নবদ্বীপাধিপতি ক্রোনীষ চন্দ্র রায় বাহাদুর ।

শিবনিবাসের শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির ।

শিবনিবাসের ১ম শিবমন্দির ।

শিবনিবাসের ২য় শিবমন্দির ।

কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন চক্ ।

কবি কুন্তিবাসের ফুলিয়ার দোঙ্গমঞ্চের ধ্বংসাবশেষ ।

রাণাঘাটের জমিদার ৬ শ্রীগোপাল পাল চৌধুরী ।

রাণাঘাটের জমিদার ৬রামলাল দে চৌধুরী ।

শান্তিপুর শ্রামটাদেব শ্রীমন্দির ।

রাণী কৃষ্ণচন্দ্র স্থাপিত উলার দীর্ঘিকা ।

বাগের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ।

মহামহিমাবিত রাজরাজেশ্বর শপ্তম এডোয়ার্ড ।

মহামহিমাবিত রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ ।



নদীয়া-কাহিনী ।



এই পরিবর্তনশীল জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। আজ যে জনসঙ্ঘ বিপুলানগরী অগণিত পণ্য-বিপীকা, অসংখ্য সুরমা হস্তারাজি, শত শত অশ্ব গজাদিতে পরিপূর্ণ, কালে তাহাই বিজন অরণ্যে পরিণত। আজ যে স্থানে সমুদ্র গিরিশ্রেণী মগোরবে নিদারুণ ঝঙ্কাবাত অবহেলা করিতেছে, সময়ে হয়ত সেই স্থানেই বাত্যাধিকৃষ্ট উত্তাল তরঙ্গ সঙ্ঘল নীলাঘ্রাশির লহরীলীলা পবিত্র হইবে। যে উত্তর কোশল একদিন প্রাতঃস্মরণীয়, বরেন্দ্র, সূর্য্যবংশীয় রাজগণের সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য ছিল, যে স্থানে অল্প কথায় কি, পূর্ণরক্ত ঐরামচন্দ্র স্বয়ং রঘুপতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মানুমেদিত শাসন ও স্বীয় মহতী সুপরিজ্ঞ লীলায় দ্বারা মানবকে তাহার কর্তব্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, জগতের সেই শ্রেষ্ঠ পুরীর আজ কি দশা! যে ইন্দ্রপ্রস্ত একদিন মহারাজচক্রবর্তী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাহার মহা প্রতাপবান্ধব আদিশচরিত্র ভ্রাতৃগণের প্রিয় রাজধানী ছিল, যে স্থানে শত সন্তান নরপতি পাণ্ডবের শ্রেষ্ঠ মানিয়া তাহাদের সেবার নিরবধি রত রহিতেন, সুবর্ণধাম সৌন্দর্য্যভূষিত সেই বিশালপুরী আজ কোথায়! যে মহতী দ্বারকানগরী শ্রীশ্রীনারায়ণের মর্ত্তলীলার ঐশ্বর্য্যবিকাশ, সেই ভূবর্গ দ্বারাবর্তী আজ কোথায়! আবার সেদিন যে সুপ্রশস্ত দিল্লীনগরী দোর্দণ্ডপ্রতাপ মোগল বাদশাহগণের রাজধানীরূপে শোভা ও সমৃদ্ধির আধার ছিল, এবং যে বাদশাহগণ 'দিল্লীখেরো বা জগদীখেরো বা' বলিয়া খ্যাত হইতেন, আজ সেই দিল্লী এবং দিল্লীখরগণের কি দশা! কালে সকলই লয় হয়, আবার পুরাতনের স্থানে নূতনের উদ্ভব হয়।

যে নবদ্বীপ একদিন স্বাধীন বাঙ্গালী সম্রাটের রাজধানী ছিল, যে স্থানের জ্ঞানগরিমা সমগ্র পৃথিবী ব্যাপ্ত, যে পবিত্রধামে শ্রীমদ্ কৃষ্ণচৈতন্য—স্বয়ং

নবদ্বীপচক্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া সনাতন বৈষ্ণব ধর্মের সমুজ্জ্বল মহিমা আত্মচরিত্রে প্রদর্শন করিয়া লোক শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে স্থানের পণ্ডিত-মণ্ডলী সমগ্র দেশের বরণ্য, সেই মহিমাম্বিত নবদ্বীপ আজ গৌরবের স্মৃতি ও সমাধি মাঝে পর্যাবসিত। কালের গতি অতি কুটিল ও দুর্ভেদ্য। যে স্থান একদিন জ্ঞান ও ধর্মের আলোকে উদ্ভাসিত ছিল, আজ সে স্থান বোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। আশার কীর্ণ রশ্মি মাত্রেরও বিকাশ নাই।

নদীয়ার সমগ্র ইতিহাস ধীরভাবে পর্যালোচনা করিলে, স্মৃতি মনে হইবে যে নদীয়া যুদ্ধবিগ্রহের নিমিত্ত অথবা রাজনৈতিক সঙ্গীর্ণ ক্ষেত্রেব জড় উদ্ভূত হয় নাই। উহার প্রশস্ত ক্ষেত্র বিদ্যা ও জ্ঞান, এবং ধর্ম। জ্ঞানচর্চা ও ধর্মালোচনাট নদীয়ার বিশেষত্ব। জ্ঞান নদীয়ার রক্ত, মাংস, অস্তি ও গচ্ছা এবং ধর্মই নদীয়ার প্রাণ।

নদীয়ার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিলে সমস্তই অসুমান ও কল্পনার উপর নির্ভর করিতে হয়। পূর্বকালীন বৈদেশিক ভ্রমণকারী-গণের লিখিত বিবরণে কুত্ৰাপি নদীয়ার নাম দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন গ্রীক বা রোমিয়গণের বৃত্তান্তেও উহার কোন উল্লেখ নাই কিম্বা সুপ্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ান বর্ণিত তৎকালীন বঙ্গের ইতিহাসে নবদ্বীপের উল্লেখ নাই। আবার যখন খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে অভ্যন্তরীণ চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাং বঙ্গের অবস্থা বর্ণন করিয়াছিলেন, তখনও তিনি নবদ্বীপের নামোল্লেখ করেন নাই। অতএব এ সময়ে হয় নবদ্বীপের অস্তিত্ব ছিল না, অথবা উহা সামান্য নগর্য্য অবস্থায় থাকার কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ কবে নাই। তবে বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের সংগৃহীত গ্রন্থ সমুদায় অমূল্যকান করিলে দেখা যায় যে পৌরাণিক যুগেও নদীয়ার নাম পরিচিত ছিল। শ্রীমৎ পূর্ণব্রহ্ম, শ্রীধাম নবদ্বীপে, শ্রীপৌরাক্রমে অবতীর্ণ হইবেন, এট মতের পোষকে যে সকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করা হয়, সেই পৌরাণিক শ্লোক-বলীট এ বিষয়ের উত্তম প্রমাণ।

ভূতযবিৎ পণ্ডিতগণ বহু গবেষণার স্থির করিয়াছেন যে সমগ্র নদীয়া এবং বর্তমান বশোহরের উত্তরাংশ পুণ্যনগর্য্য ভাগীরথীর বহু পুরাতন জ্বিষ্ঠীর্ণ ও সমুদ্রত চরভূমি এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে অধাবিত।

কলকল নাদিনী স্বচ্ছ সলিলা ভাগীরথী, প্রাতঃস্মরণীয় ভাগীরথের ঐকান্তিক ভক্তি ও কাতর প্রার্থনায় যখন সগরবংশের উদ্ধার করে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াও সগর সন্তানগণের উদ্দেশ্য পান নাই, তখন কুপাময়ী জননী ভক্তের কারণে উদ্ভিন্ন হইয়াছিলেন এবং এক শরীর হইতে শত মুখী হইয়া সগর সন্তানান্যে দক্ষিণমুখে প্রবাহিতা হন। সেই শত মুখ মধ্যবর্তি জাহ্নবী বিধাত পূত বায়ু সম্পৃক্ত ভূখণ্ডই বঙ্গনামে অভিহিত। বাঙ্গলা যেন মায়ের কমনীয় কণ্ঠে মনোহর কণ্ঠভূষণ আর নবদ্বীপ—পূণ্যধাম নবদ্বীপ—যে স্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের বজ্রায় সমগ্র ভারত প্রাবল্য করিয়াছিলেন, সেই ভূধাম যেন সেই মনোরম ভূষণের দ্যুতীমান মধ্যমাণি। চৈতন্য ভাগবত-কার প্রণম্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় প্রকৃতই লিখিয়াছেন—

“নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।

যথা অবতীর্ণ হইলা চৈতন্য গোসাঞি।”

নবদ্বীপের অপর নাম নদীয়া। প্রথমে কোন্ নামটির দ্বারা ইহার নামকরণ সমাধা হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা বার না। এই দুইটি নামের আবার বহু লোকে বহুবিধ অর্থ করিয়া থাকেন। যাহারা নবদ্বীপকে “নয়টি দ্বীপের সমষ্টি” বলিয়া উল্লেখ করেন তাহাদের মধ্যে সুবিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থকার নরহরি একজন। ইহার প্রণীত “নবদ্বীপ-পরিক্রমাপদ্ধতি” * নামক গ্রন্থে নবদ্বীপকে নয়টি দ্বীপের সমষ্টি বলিয়া এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—

“নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়।

নবদ্বীপে, নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয় ॥”

“নয় দ্বীপে নবদ্বীপ নাম।

পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম ॥

যেছে রাজধানী কোন স্থান।

যদ্যপি অনেক ভাষা হয় এক নাম ॥”

* নরহরি দাস বিরচিত “নবদ্বীপ পরিক্রমাপদ্ধতি”—পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

তিনি উক্ত গ্রন্থে যে নরটি দ্বীপের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে পাঁচটি গঙ্গার পূর্ব পারে ও চারিটি পশ্চিম পারে অদ্যাপি বর্তমান আছে বলা :—

গঙ্গার পূর্ব পারে ৪টি দ্বীপ :—

(১) আন্তদ্বীপ—মায়াপুর বা মেয়াপুর, ভারুটেডাঙ্গা ইহার অন্তর্গত ।

এই স্থানে চৈতন্তদেবের ভ্রম্য ভর ।

(২) সীমন্তদ্বীপ—সরডাঙ্গা, সিমলাদি ইহার অন্তর্গত ।

(৩) গোক্রমদ্বীপ—গা'দগাছ', সূর্ণবিহার আদি ইহার অন্তর্ভুক্ত ।

(৪) মধ্যদ্বীপ—মাজীদা, ভালুকা আদি ইহার অন্তর্গত ।

গঙ্গার পশ্চিম পারে ৫টি দ্বীপ :—

(১) কোল দ্বীপ—কুলিয়া তেঘরির দক্ষিণ ও সমুদ্রগড় ইহার অন্তর্ভুক্ত ।

(২) ঋতু দ্বীপ—রাতপুৰ, রাততপুৰ ও বিদ্যানগর ইহার অন্তর্গত ।

(৩) মোদক্রম দ্বীপ—মাউগাছি, মামগাছি ও মহতপুৰ ইহার অন্তর্গত ।

(৪) অরু দ্বীপ—জাননগর বা জামুনগর ।

(৫) কুদ্র দ্বীপ—রাজপুৰ বা কুদ্রডাঙ্গা, সকাপুর ও পূৰ্ণশ্রী আদি ইহার অন্তর্ভুক্ত ।

যাঁচার নবদ্বীপের নূতন দ্বীপ অর্থ করেন, তাঁচা বা বলেন যে পূর্ণকালে এই স্থান গঙ্গামধ্যবর্তী চর ভূমি ছিল এবং উহার চতুর্দিক বেটন করিয়া গঙ্গা ও জালাঙ্গী প্রবাহিত ছিলেন; কালে নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়ার ঐ চরভূমি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়া উঠে । ক্রমশঃ জনসমাগমে কুদ্র পল্লী হইতে উঠা একদিন সমগ্র বঙ্গের রাজধানীতে পরিগণিত হয় । দ্বীপের উপর নূতন গ্রাম সংস্থাপিত হয় বলিয়া উঠা নব-দ্বীপ নামে খ্যাত হয় ।

নদীয়া নামের ইতিবৃত্ত সৰ্ব্বদা অনেকের মত এই যে পূর্ণকালে প্রাদেশকে “দীয়া” বলিত এবং ন অর্থাৎ নরটি দীয়া হইতে নবদ্বীপ বা নদীয়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে । এই মতের পোষকে তাঁহারি বলিয়া থাকেন যে, বখন গঙ্গামধ্যস্থিত সুবিস্তীর্ণ চরে প্রথম মনুষ্য সমাগম হইতে থাকে, তখন উক্ত চরে একজন সরাসী প্রাতি নিশার নরটি দ্বীপ জালিয়া

কোনও তাত্ত্বিক সাধনার রত রহিতেন । লোকে দূর হইতে ঐ নদী নদী দেখাইয়া উক্ত চরকে ন-দীয়ার চর বলিয়া অভিহিত করিত । ক্রমে যখন উক্ত চরে গ্রাম বসিল, তখন উহা নদীয়া নামে খ্যাত হয়; পরে কালের ক্রিয়ায় যখন এই ক্ষুদ্র চর বিশাল বঙ্গভূমির ঐশ্বর্যশালিনী রাজধানী বলিয়া পরিচিত হইল, তখন তদধীন সুপ্রশস্ত রাজ্য সাধারণত নদীয়া নামে অভিহিত হয় ।

নদীয়া রাজ্য বলিতে বল্লাল সেনের সময় সমগ্র বাঙ্গালা রাজ্য বুঝাইত । মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় উত্তরে পলাশী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ধুনিয়াপুর ও পশ্চিমে ভাগীরথী এই চতুঃসীমান্তগত সর্বত্র চৌরাসী পরগণা বুঝাইত এবং ইংরেজ আমলের প্রথম ভাগে বর্তমান প্রেসিডেন্সী বিভাগকে বুঝাইত । বর্তমানকালে উত্তরে রাজসাহী, পূর্বে পাবনা ও যশোহর, দক্ষিণে চব্বিশ পরগণা ও পশ্চিমে বীরভূম, বর্ধমান ও হুগলী এবং উত্তর-পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ এই চতুঃসীমান্তগত ভূখণ্ডই নদীয়া নামে খ্যাত । *

* Padma separating Nadia from Pabna and Rajshahi; Jalangi from Murshidabad, Bhagirathi forming the Western boundary, but for the change of its current Navadip now lies on the farther bank of the river. Kaliaduk forms the South-eastern boundary separating from Jessore.

W. W. Hunter's Imp. Gazetteer of India Vol.X.



নদীয়ায় হিন্দুরাজত্ব ।

বর্তমান যুগে নদীয়া বলিয়া যে নদী বহুল প্রশস্ত তুখত আখ্যাত, তাহা পুরাকালে গোড়েশ্বরগণের রাজ্যাস্থগত ছিল। এই গোড় রাজ্য খৃষ্ট জন্মের ৭৩০ বৎসর পূর্বেও লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ ছিল, এবং গোড়, সারস্বত, কান্তকূজ, মিথিলা ও উৎকল এই পঞ্চভাগে বিভক্ত ছিল। এই পঞ্চ পঞ্চ, পাঁচজন পৃথক নরপতির শাসনাধীন ছিল; এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি পঞ্চ গোড়েশ্বর নামে অভিহিত হইতেন। গোড়ের অপর নাম লক্ষণাবতী; সম্ভবতঃ টলেমি তাঁহার বর্ণনায় “গ্যানজিয়া রিজিয়া” বলিয়া যে ভূভাগের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই এই গোড় বা লক্ষণাবতী *। হিন্দু কুলচূড়ামণি মহারাজ আদিশূর ৯৯৯ শকে বা ১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধাধিকার হইতে বঙ্গভূমিকে উদ্ধার করণান্তর স্বয়ং গোড় রাজ্য অধিকার করিয়া হিন্দুধর্মের বিজয় বৈজয়ন্ত পুনরুদ্ভূতমান করেন†। কথিত আছে একদিন রাজা আদিশূর শ্রান্তি বিনোদনার্থ যখন প্রাসাদোপরি পাদচারণা করিতেছিলেন, সেই সময় একটি শকুনী অস্বাভাবিক শব্দ সহকারে তাঁহার প্রাসাদের শিখরদেশে সবেগে অবতরণ করে। শাস্ত্রজ্ঞানী রাজা, তান, কাল বিবেচনা করিয়া এই শকুনী অবতরণকে বিশেষ অশুভ জ্ঞাপক অবধারণ করেন এবং ঐ সময়ে স্বীয় সত্যস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মত জিজ্ঞাস্য

* Gour called also Luknowti the ancient Capital of Bengal and supposed to be the Gangia regia of Ptolemy, stood on the left bank of the Ganges about 25 miles below Rajmahal. It was the Capital of Bengal 730 years before Christ.

Major Rennells' map of Hindustan.

† বিজয়া বুদ্ধাংস্তকার স্বয়মপি নৃপতি গোড়পালায়রমতান।

শব্দকল্পকম।

হটলে, তাঁহার সভাস্থ একজন ব্রাহ্মণ বলেন যে সম্প্রতি দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হটরা তিন কান্তকূজাধিপতির প্রাসাদে অবস্থিত এবিধ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং উদ্দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী এক মহাযজ্ঞাস্থানের দ্বারা এতদ্বিষয়ের দোষশাস্তি করিয়াছেন। ধর্ম্মগত প্রাণ নরপতি ব্রাহ্মণের এবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কান্তকূজাধিপতির তায় নিজেও যজ্ঞ দ্বারা এত অন্তঃ-ঘটনার স্বস্ত্যয়ন করিতে বাসনা করেন। কিন্তু সে সময়ে বৌদ্ধ প্রভাবে তাঁহার রাজ্যমধ্যে তদ্রূপ ক্রিয়ানীল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব থাকায়, কান্তকূজ হইতে শ্রীচর্চ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও চান্দড নামধেয় আচার্য্যবান পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন এবং ভক্তি ও যত্নসহকারে ধন রত্ন ও গ্রামাদি দান করিয়া তাঁহাদের এতদ্রূপ স্থাপনা করেন * । ইহারাই বঙ্গদেশীয় বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ। মহারাজ আদিশূর এইরূপে বঙ্গদেশের বহু কল্যাণ সাধন করিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার বংশ কিছুদিন গোড়সিংহাসনে রাজত্ব করিবার পর তৎপুত্রগণের পরাক্রম খর্ব্ব করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয়েরা গোড় অধিকার করেন। পরে সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে সেন নরপতিগণ এদেশে রাজা হন এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে অনুমান করেন, বর্ত্তমান নবদ্বীপের ৪ মাইল পূর্বে সুবর্ণবিহার নামে যে ক্ষুদ্র পল্লী বর্ত্তমান, উহাই পাল রাজ্যগণের অন্ত্যতম বাসস্থান; এবং উক্ত পল্লীতে অদ্যাপি যে বহু প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, উহাই তাঁহার। পালরাজত্ববর্গের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দেশ করেন। পরন্তু বৌদ্ধগণের মঠের অপর নাম “বিহার”; এই গ্রামটির নামের সহিত বিহার শব্দ যোগ থাকায় ইহাদের মতের পোষকতা করিতেছে। ইহাদের মতে নবদ্বীপ উক্ত রাজ্যগণের রাজত্বকালে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে লব্ধ প্রতিষ্ঠ।

মতান্তরে সেনবংশীয় হিন্দু নরপতিগণের রাজত্বকালে সামন্ত সেন নামে ঐ বংশীয় এক বুদ্ধ নরপতি শেষ দশায় গঙ্গাতীরে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া গঙ্গা জালাঙ্গী সঙ্গমে এক উপনিবেশ স্থাপনা করেন। এই উপ-

মিবেশের অনতিদূরে বর্তমান নবদ্বীপ অবস্থিত। এই সামন্ত সেনের পৌত্র বিজয় সেন আপনীর বাহুবলে বহু দেশ জয় করিয়া প্রবল প্রতাপশালী হইলেন। সুবিখ্যাত বল্লাল সেন এত বিজয় সেনের পুত্র। ইনি পিতার জ্ঞার দুর্দ্বৈর বীর এবং শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। সুবিখ্যাত গ্রন্থ নানসাগর তৎকর্তৃক রচিত হয়। তিনি পিতৃসিংহাসনে অধিকতর হটরা সমগ্র বঙ্গদেশকে প্রধান প্রধান নদীর গতি অনুসারে পাঁচ প্রদেশে বিভক্ত করেন। যথা—বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী ও মিথিলা*। এবং উক্ত প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণগণকে তত্ত্বৎ নামে অভিহিত করেন, যথা—রাঢ়ীর, বারেন্দ্র, মৈথিলী ইত্যাদি। এই সময়ে বল্লাল সেন সমাকে কোলকুম্ভধানার স্মৃতি দ্বারা জ্ঞানী ও সচ্চরিত্র ব্যক্তির সম্মান বাড়াইয়া দান। তিনি গোড়-বাড়িরেই নবদ্বীপ ও সুবর্ণগ্রামে আর দুইটী রাজধানী স্থাপনা করেন, এবং জীবনের অধিকাংশ সময় পুণ্যসলিলা ভাগীরথী তীরে নবদ্বীপে অতিবাহিত করেন। এই সময়ে ভাগীরথী নবদ্বীপের পশ্চিম দিগে প্রবাহিত হইতেন, এক্ষণে পূর্বদিকে প্রবাহিত হইতেছেন†। বল্লালের সুবিকীর প্রাসাদের ভগ্নস্তম্ভ ও বল্লাল দীঘি ইত্যাদি এখনও নবদ্বীপে তাঁহার স্মৃতি জাগরুক রাখিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে তাঁহার প্রাসাদের এই ধ্বংসস্থলের মধ্য হইতে কতিপয় কাষ্ঠের বারকোশ ও একটা বন্দীকনষ্ট ভগ্নসিদ্ধক আবিষ্কৃত হয়। এত কাষ্ঠসিদ্ধকের মধ্য হইতে কয়েকখানি কৌটনষ্ট জীর্ণ শাল ও পলমী পোষাকের জীর্ণভিজীর্ণ ভিরাংশ ও কতিপয় রৌপ্য মূর্তা বহির্গত হয় ‡।

* বঙ্গ—গঙ্গাসঙ্গম স্থানের পূর্ব, প্রধানতঃ বর্তমান ঢাকা বিভাগ। রাঢ়—ভাগীরথীর পশ্চিমে এবং গঙ্গার দক্ষিণে, প্রধানতঃ বর্তমান বর্তমান বিভাগ। বরেন্দ্র—পদ্মার উত্তরে এবং বারভোরা ও কুই নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ, বর্তমান রাজসাহী। বাগড়ী—গঙ্গাসাগর সম্মুখ, বর্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগ। মিথিলা—মহানন্দের পশ্চিম প্রদেশে, বর্তমান বিহারের অন্তর্গত। প্রধানতঃ বাঘবঙ্গ, সতঃকরপুর ও পূর্ণিরা।

† কথিত আছে ১২০৬ সনে ভাগীরথী এইরূপ গতি পরিবর্তন করেন।

‡ On the other side of the river, there is a large mount still called after Ballal Sen. It was recently dug by one Mullah Shahib

বঙ্গাঙ্গের শেষ জীবনে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন * পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া নবদ্বীপের বিখ্যাতকিরীত নক্ষিণে এক প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্মাণ করেন ।

who discovered some *Barkoshes* or wooden trays and a box containing remnants of shawls and silken dresses and also some small silver coins.

Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. II. p. 142.

* মতান্তরে লক্ষ্মণ সেন দেব ১১০৬ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার প্রথম পুত্র মাধব এক বৎসরের নিমিত্ত, পরে তাঁহার মধ্যম কেশব ১১০৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তিনিও অল্প বয়সে ১১১৮ খৃষ্টাব্দে এক গর্ভবতী পত্নী রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । তাঁহার মৃত্যুর পর সতাস্ত্র পণ্ডিতমণ্ডলী ও জনসাধারণ এই গর্ভস্থ সন্তানকেই রাজ্যেশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন । দশম মাসে সতাস্ত্র জ্যোতির্বিদগণ গর্ভস্থ সন্তানের শুভাশুভ গণনা করিয়া আসন্নপ্রসব রাত্রিকে বলেন, “যদি গর্ভস্থ শিশু এখনই জন্ম গ্রহণ করেন তবে হুর্ভাগ্য ও অমঙ্গল হইবে, কিন্তু আর দশ চারি পরে ভূমিষ্ট হইলে শিশু ভাগ্যবান হইবে ।” স্নেহশীলা মাতা পুত্রের ভাবী কল্যাণ কামনার প্রসব বেদনা উপহিত হইবা মাত্র স্বীয় পরিচারিকাগণকে ও রাজবৈদ্যগণকে আহ্বান করিয়া কোন উপায় নির্ধারণপূর্বক প্রসবে বিলম্ব ঘটাইতে বলেন; কিন্তু ঔষধাদিতে স্বভাবের গতি রোধের উপায় না দেখিয়া রাত্রি স্বীয় পদদ্বয়ে রক্ত বন্ধন করিয়া উর্দ্ধ পদে অবস্থান করেন । এই অস্বাভাবিক উপায়ে স্বাভাবিক নিরমের যদিও একটু ব্যতিক্রম হইল এবং পুত্রও কিঞ্চিৎ বিলম্বে ভূমিষ্ট হইল কিন্তু স্নেহশীলা মাতা পুত্রমুখ দর্শনের পূর্বেই প্রাণত্যাগ করিলেন । ট্যালবর হুইলার সাহেব, ইলিরট সাহেব প্রভৃতির মতে এই পিতৃমাতৃহীন হুর্ভাগ্য সন্তানই পরে লক্ষ্মণের নামে অভিহিত হইলেন এবং ইহারই রাজত্বকালে ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বক্তৃতির বঙ্গদেশ জয় করেন । এ সম্বন্ধে হুইলার সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন:—

“The Raja of Nadia was named Rai Laksmaniya. His timidity may be in part ascribed to a belief in astrology. His mother is said

সর্লধ্বংসী কালের হতে ইহাও এখন সুবিভীর্ণ ধ্বংসরূপে পরিণত। বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপে নীর রাজধানী স্থাপন করেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার আগাঢ় বিশ্বাস ছিল। এই অন্ধ বিশ্বাসই তাঁহার এবং সমগ্র বাঙ্গালা দেশের লক্ষ্যনাশের মূল। তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্যের সমস্ত ভারই ব্রাহ্মণগণের উপর প্রাপ্ত ছিল। অর্থসিদ্ধি গ্রহকার হলামুখ ও তাঁহার ভ্রাতা পশুপতি মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; বটুদাস নামে একব্যক্তি সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু তিনি যে কখনও সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন এমনতরো বোধ হয় না। মুসলমান বিজয়ের পূর্বেই ত্রিপুরা, কামরূপ, পঞ্চকোট প্রভৃতি রাজ্যগুলি গোড় রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। গোড় রাজ্য যখন এইরূপে ক্রমে ক্রমে হীনবল হইতেছিল সেট সময়ে সুযোগ বুঝিয়া সুচতুর মুসলমান সেনাপতি মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার খিলজি বেহার জয় করিয়া ধীরে ধীরে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হইলেন *। বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেন এই সময়ে অশীতিপর বৃদ্ধ, মুসলমানগণ রাজধানী আক্রমণ করিতে আসিতেছে শুনিয়া তিনি কর্তব্যাবধারণের নিমিত্ত সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর মতামত জিজ্ঞাসা করেন। সভাস্থ অবধারণের নিমিত্ত দৈবজ্ঞগণের মত গ্রহণ করা হইল। দৈবজ্ঞগণ গণনা দ্বারা স্থির করিলেন যে রাজা লক্ষ্মণ সেন বৃদ্ধ বয়সে রাজ্যচ্যুত হইবেন ও তাঁহার রাজ্য স্বেচ্ছা জাতির হস্তগত হইবে। যে ব্যক্তি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবে তাহার আকার ধর্ম,

to have been put to horrible torment in order to delay his birth a couple of hours. The astrologers had assured him that he would be deprived of his kingdom by a man with long arms.

Wheeler's History of India. Vol. IV. Part I. p. 45.

• বেহার হইতে যে পথে বক্তিয়ার নবদ্বীপ জয় করিতে অগ্রসর হইলেন চেষ্টা করিলে তাহা বাহির হইতে পারে। নদীরা জেলার যে যে স্থান দিয়া তিনি গমন করিয়াছিলেন, তাহা এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার নাম বহন করিতেছে। শান্তিপুর ও বরনার মধ্যবর্তী স্থানে তিনি গঙ্গা পার হইয়াছিলেন এখনও ঐ স্থানটী বক্তারের ঘাট নামে খ্যাত। এইরূপ অনেক স্থানে তাঁহার নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

বাহুদয় দীর্ঘ ও মুখ মৰ্কটাকৃতি হইবে। কেহ কেহ অমুমান করেন দৈবজ্ঞগণ ও রাজ্যের কোনও কোনও কৃতত্ত্ব কর্মচারী মুগলমান সেনাপতি বক্তিত্যার কর্তৃক সবিশেষ প্রলুব্ধ হইয়া স্বীয় প্রভুকে প্রতারণা পূর্বক নিজ মাতৃভূমি বিজাতীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের কোনও উপায় নাই, তবে স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই সম্ভবপর বলিয়া প্রতীতি হয়। বক্তিত্যার নবদ্বীপের উপকণ্ঠস্থ বনাত্যস্তরে তাঁহার বিপুলবাহিনী লুকাণিত রাখিয়া, মাত্র সপ্তদশ, অথারোহী সৈনিক সমভিব্যাহারে অথ বিক্রমচ্ছলে দিবা দ্বিপ্রহরে রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করেন *। সে সময়ে প্রাসাদস্থ রক্ষাবৃন্দ মাধ্যাহ্নিক পাককার্যাদিতে রত ছিল। বক্তিত্যার পুরী প্রবেশ পূর্বক রক্ষাবৃন্দ ও কর্মচারীগণকে হত্যা করিতে লাগিলেন।

* বক্তিত্যারের বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে অধুনা নানারূপ তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু সে সময়ের প্রকৃত ইতিহাস বিদ্যমান না থাকায় অতীতের অন্ধকারময় গর্ভে শ্রেণ বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের কাহিনী কি ভাবে সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা তাঁহার পক্ষে বলকের কি গৌরবের সে বিষয়ে কিছু বলা যায় না। অনেকে অমুমান করেন যে সপ্তদশ অথারোহীর নবদ্বীপ অধিকার কাহিনী “তবকাৎ-ই-নাসেরী” লেখক মিনহাজউদ্দীনের কল্পনা প্রসূত মাত্র; তাহা তাঁহার স্বাভাবিক হিন্দু বিদ্বেষের পরিচায়ক ব্যতীত আর কিছুই নহে। মিনহাজউদ্দীন বঙ্গবিজয়ের কয়েককাল পরেই বক্তিত্যারের পার্শ্বচর জনৈক মুগলমানের নিকট শুনিয়াই সঙ্গপ্রথম এই কলঙ্ককাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং পরবর্তী গ্রন্থকারগণ তাহারই পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র। এবিধ বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা লক্ষ্মণ সেনের লগাট হইতে ভীকতা ও কাপুরুষতার কলঙ্ক চিহ্ন মুড়িয়া লইতে চাহেন, এবং তৎফলে “অম্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজদ্রাঘাধিপতি” “অরিরাজ মদন শঙ্কর গোড়েখর শ্রীমল্লঙ্গ সেন দেব” নামে তাঁহাকে মহিমাযিত করিতে চাহেন। শ্রদ্ধের অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এ মতের একজন পরিপোষক, তিনি নবগর্ভ্যার ৩৭ বর্ষের বঙ্গদর্শনে এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।

এই সময় দলে দলে মুসলমান সেনা বনপ্রান্ত হইতে বহির্গত হইয়া নগর আক্রমণ করিল * । রাজা লক্ষণ সেন পূর্ক হইতেই অবশ্রম্ভাবী পরাজয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন । এক্ষণে সহসা এইরূপে আক্রান্ত হওয়ার নবদ্বীপ ত্যাগ করত সপরিবারে বিক্রমপুরে প্রস্থান করেন এবং বঙ্গের ইতিহাসের অকলঙ্কিত পৃষ্ঠার চিরদিনের জন্য কলঙ্ককালিমা লেপন করেন ।

রাজপুরী হস্তগত করিয়া বক্তিরায় আপন সৈন্যদিগকে নদীয়া লুণ্ঠন করিতে আদেশ দেন । এইরূপে ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ জয় + করিলেও সমগ্র বঙ্গভূমি অধিকার করিতে মুসলমানগণের শতাধিক বৎসর লাগিয়াছিল । বক্তিরায় এইরূপে বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী নবদ্বীপ ধ্বংস করিয়া বঙ্গের পুয়াতন রাজধানী লক্ষণাবতীতে পুনরায় রাজধানী স্থাপন করেন । এই দিন নবদ্বীপের এবং সমগ্র বাঙ্গালার পক্ষে একটা অশুভ দিন ।

* Vide Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. II. p. 143.

+ ভবকান্ত-ই-নাসিরী নামক প্রাচীন মুসলমান ইতিহাসে বঙ্গবিজয়ের সময় ৫৯০ হিজরী বা ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে নির্দ্ধারিত আছে । Blochman's Contribution to the Geography and History of Bengal in J. A. S. B. 1873 Pt. I p. 211 মতে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে, Asiatic Researches, Vol. IV. p. 203তে উইলসন সাহেবের মতে ১২০৭ খৃষ্টাব্দে, এবং Thomas' Initial Coinage of Bengalএ ১২০৫ খৃষ্টাব্দে, উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয় বলিয়া উল্লিখিত আছে । সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক বেতারিঙ্গ সাহেব প্রাপ্তক সমস্ত পুস্তকগুলি বিশেষরূপে অনুশীলন করিয়া “১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বক্তিরায় কর্তৃক বঙ্গবিজয় হইয়াছিল” এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । মহা-মহৌপাধায়ক হুসেনাশ পাঞ্জী মহাশয়েরও এই মত ।



নদীয়ার যবনাদিকার ।



বক্তিয়ার খিলজি, অধিকৃত প্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত করেন, এবং গোড়ের জায় দিনাজপুরের সমিহিত দেবকোটে আর একটি রাজধানী স্থাপন করেন। এই দেবকোটেই বক্তিয়ার কালগ্রাসে পতিত হন। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ দিল্লীখয়ের অধীন হয়, বাদশাহ গারমুদ্দিন বলবন্ শাসন সৌকার্যার্থ বঙ্গদেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া গোড়নগরীকে উত্তর ভাগের, সুবর্ণগ্রামকে পূর্ব ভাগের এবং নবদ্বীপের পরিবর্তে সরস্বতী-তীরস্থ সপ্তগ্রামকে পশ্চিম ভাগের রাজধানী মনোনীত করেন*। সপ্তগ্রাম তখন বাণিজ্যাদির কেন্দ্রস্থলরূপে গণ্য হয় এবং বহুসংখ্যক ধনবান্ বণিক এখানে আসিয়া বাসস্থান নির্মাণ করেন। কালে এই সমৃদ্ধিশালী সপ্তগ্রাম বিজ্ঞান অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। ধনীর অভ্রভেদী প্রাসাদ ও দরিরের পর্ণকূটীর একই দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে দিন বিশাল-কারা বেগবতী পুণ্যসলিলা সরস্বতীর স্রোত মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল সেই দিন হইতে, সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধি হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়।

১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে সামসুদ্দিন ইলিয়স্ সমগ্র বঙ্গদেশের একছত্র রাজা হন এবং দিল্লীখয়ের অধীনতা অস্বীকার করেন। সামসুদ্দিন গোড় পরিভ্রমণ করিয়া পাণ্ডুরাজ রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র সুবিখ্যাত সেরসাহ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু তিনি

* In the early period of the Mahometan rule Satgaon was the seat of the Governors of Lower Bengal and a mint town. It was also a place of great commercial importance.

তাহার কৃত্ত্ব পুত্র গীয়াসুদ্দিন কর্তৃক নিহত হইলে, ভাতুড়িরার জমিদার রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণ বাইজিদসাহ নামে একজনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, পরে ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দশ বৎসর নিরীক্সাদে রাজ্য ভোগ করেন। গণেশের পুত্র জাঠমল বা বজ্জালানুদ্দিন নাম ধারণ পূর্বক মুসলমান ধর্মাবলম্বন করিয়া ১৪১৪ হইতে ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অনন্তর জালানুদ্দিনের পুত্র আহমদসাহ সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু তিনি অচিরে তাহার ভৃত্যবর্গ কর্তৃক নিহত হইলে নসিরুদ্দিন মহম্মদ সাহ সিংহাসন অধিকার করেন। ইহার পুত্র বারবাক সাহ নিজ সেনাদলে আট হাজার হাবসী কৃতদাসকে স্থান দান করেন। তাহার ক্রমশঃ প্রভূত শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং অন্তঃপুর রক্ষী খোজা ও পাইক সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া, ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাধিপতি ফতে সাহকে হত্যাপূর্বক বারীক নামক খোজাকে সুলতান সাজাদা নামে বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বাঙ্গালার সিংহাসনে এইরূপে এক নপুংসক সমাক্রান্ত হইল। কিন্তু তাহাকে অধিক দিন রাজ্যভোগ করিতে হর নাই। হাবসী সেনাপতি মালিকিদ্দিন ইহাকে নিহত করিয়া ফিরোজ সাহ নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর নসিরুদ্দিন মহম্মদসাহ রাজা হন। তিনিও আবার সিদ্দিকদর দেওয়ানে নামক এক ব্যক্তির দ্বারা নিহত হন। এই সিদ্দিকদর মজাফর সাহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তাহার ছাত্র নুংস ও যপেচ্চাচারী রাজা অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হর। তিনি নিরুপদ্রবে রাজ্য ভোগ করিবার মানসে প্রথমে তুর্কী জাতীয় ওমরাহগণের নিধন সাধন করেন, পশ্চাৎ হিন্দু সামন্ত রাজা ও জমিদারগণকে নিহত ও বিধ্বস্ত করেন। এই নির্দম নরপতির অত্যাচার হইতে কাহারও নিস্তার ছিল না। তিনি ভয়ঙ্কর হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। এই সময়ে কতকগুলি মুসলমান তাহার নিকট নবাবীপের ব্রাহ্মণদিগের নামে নানারূপ মিথ্যাংবাদ দিয়া নবাবীপ ধ্বংসের অমুমতি গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাতে নবাবীপের ব্রাহ্মণগণের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার হর। তাহাদের অত্যাচার নবাবীপের সন্নিহিত গিরিয়া গ্রামেই অতিশয় ভীষণ আকার ধারণ করে। তাহার গিরিয়াবাসী ব্রাহ্মণগণকে বলপূর্বক তাহাদের উচ্ছিন্ন

অভক্ষ্য দ্রব্যাদি ভক্ষণ করাইয়া জাতি ধর্ম নাশ করিয়াছিল। এইরূপে নষ্টধর্ম পিরল্যা বাসী ব্রাহ্মণগণ উত্তরকালে পিরালী নামে অভিহিত হন * ।

* “আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয় ।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয় ॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞস্থত্র কাঁধে ।
ঘর দ্বার লোটে তার নাগপাশে বাঁধে ॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী ।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপ বাসী ॥
গঙ্গান্নান বিরোধিল হাট বাট যত ।
অশ্বথ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত ॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতক যবন ।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে ।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে ॥
গোড়েশ্বর বিদ্যামানে দিল মিথ্যা বাদ ।
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিবে প্রমাদ ॥
গোড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে হেন আছে ।
নিশ্চিন্ত না থাকিও প্রমাদ হবে পাছে ॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হবে রাজা ।
গন্ধর্ব লিখন আছে ধর্ম্মের প্রজা ॥
এই মিথ্যাকথা রাজার মনেতে থাকিল ।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা অজ্ঞা দিল ” ॥

পূর্বোক্ত বিবরণটা শ্রীচৈতন্য দেবের শ্রিয় ভক্ত সুবুদ্ধি মিশ্রের ভাগ্যবান পুত্র শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাত্র জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যসঙ্গলে বিবৃত করিয়াছেন। জয়ানন্দ এই ঘটনার প্রায় সমসাময়িক ব্যক্তি, সুতরাং তিনি বাহ্য দেখিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একরূপ স্থলে তাঁহার কথার অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই। এই উৎপীড়িত পিরল্যাগ্রামবাসীগণের “পিরালী” নামকরণ সম্বন্ধে দুই মত দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন এই পিরল্যা বাসী নষ্টধর্ম্মী ব্যক্তিগণই পিরালী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যেমন রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে বিশেষ বিশেষ গ্রাম বা ব্যক্তির নাম হইতে সমাজ মধ্যে বিভিন্ন থাকের উৎপত্তি তেমনি পিরল্যা হইতে “পিরালী” থাকের উৎপত্তি হয়। আবার কেহ বলেন, বাগের হাটের পীর আলি সাহেব হইতে পিরালীর উৎপত্তি, এবং বাগের হাটে পীরআলি সাহেবের বে কবর

অনিচ্ছায় বল প্রয়োগে জাতিচ্যুত হইলে অনেকে যবনাচার গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন, আবার অনেকে করেন নাই * ।

পিরালীগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে । কথিত আছে
পাঁচ শত বৎসর পূর্বে † খাঁ জাহান আলি বা খাজেআলি নামে কোন
এক ধনশালী মুসলমান দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে সুনন্দরবন আবাদে সনন্দ
লইয়া যশোহরে আসিয়া উপস্থিত হন । এই সুফলা সুফলা উর্বরা ভূমিতে
বিস্তীর্ণভাবে আবাদ করিয়া খাজেআলি অল্পকালের মধ্যে বিপুল ধনের
অধিকারী হইয়া উঠেন এবং নবাব খাজেআলি নামে খ্যাত হন । নবাব
খাজেআলির সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর শাসনভার যশোহরের বেঙুটিয়া পরগণার
জমিদার কামদেব ও জয়দেব রায় চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর অর্পিত ছিল ।
এই দুই ভ্রাতা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন । তাঁহাদের যত্নে এবং নবাব খাজে
আলির অর্থে খুলনা বাগেরহাট প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকগুলি প্রশস্ত রাজবাড়ী
প্রস্তুত ও পুষ্করিণী খনন করা হয় ‡ ।

এই সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া মহম্মদ
তাহের নাম গ্রহণ পূর্বক নবাব খাজে আলির সহিত মিলিত হন । মহম্মদ
তাহের স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একজন গোঁড়া মুসলমান হইয়া উঠেন
এবং নবাব খাজে আলির সাহায্যে তৎপ্রদেশস্থ হিন্দুগণকে মুসলমান
করিতে প্রবৃত্ত হন ও তিন শত ঘাটী মসজিদ স্থাপন করেন, এ কারণে

অন্যাপি বর্তমান আছে উহাতে পীর-আলির মৃত্যু তারিখ ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দ বলিয়া
লিখিত আছে, অতএব পীরালীর সৃষ্টি জয়ানন্দ বর্ণিত ঘটনার কিছু দিন
পূর্বে, সম্ভবতঃ ঐ নষ্টধর্মী পিরালীগণের মধ্যে বহু লোক আসিয়া নবাবীপের
পল্লীবিশেষে বাস করার উহাই পীরল্যা গ্রাম নামে অভিহিত হয় এবং উক্ত
ব্যক্তিগণ কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া গোড়েশ্বর নবদ্বীপ ধ্বংসের অমুমতি প্রদান
করেন ।

* ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৪ আইনের ৭ ধারা দৃষ্টে জানা যায় স্বেচ্ছাচারী
পিরালীগণের শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না।
পরে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে নিষিদ্ধ জাতির ভালিকা হইতে পিরালী নাম তুলিয়া
দেওয়া হইয়াছে ।

† জয়ানন্দ বর্ণিত পিরালী বিপ্লবের প্রায় সমসাময়িক ।

‡ Vide Hunter's Statistical Account of Jessore.

তৎপ্রদেশস্থ মুসলমানগণ তাঁহাকে “পির আলি” নামে অভিহিত করিয়া সম্মানিত করেন। পিরআলি আপনার বুদ্ধিকৌশলে ক্রমে ক্রমে নবাব খাজে আলির অতিশয় প্রিয়পাত্র হন এবং পরিশেষে তাঁহার উজিরী পদ লাভ করেন। দরিদ্র তাহের উজিরী পদ প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল না, তিনি দেখিলেন তদঞ্চলে কামদেব ও জয়দেব রায়চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিপত্তি অসাধারণ; একে তাঁহার স্বয়ং বহু অর্থের অধীশ্বর তাহাতে আবার নবাব খাজে আলির সুনিষ্ঠাও জমিদারীর শাসনভার হস্তে থাকায়, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সে অঞ্চলের রাজা; সুতরাং উজিরী পাইলেও তাঁহাকে এই দুই ভ্রাতাকে মাগু করিয়া চলিতে হইবে; বিশেষতঃ তাঁহার নিষ্ঠাবান কুলীন ব্রাহ্মণ, আর তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও স্বধর্ম্মত্যাগী মুসলমান বলিয়া অনেকের চক্ষে অতি হীন। এই সকল কারণে পিরআলি, চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের পরম বিদ্বেষী হইয়া উঠেন এবং কিম্বা তাঁহাদের অনিষ্ট করিবেন তাহার সুযোগ অবশেষে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে কোন একটা ঘটনা উপলক্ষে পিরআলি তাঁহাদের সর্বনাশ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। নবাব খাজে আলি সকল সময়ে দরবারে উপস্থিত থাকিতেন না। এক্ষণে উজির হওয়ায় পিরআলিই অধিকাংশ সময় দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। কামদেব ও জয়দেব রায়চৌধুরীও কার্যোপলক্ষে সময়ে সময়ে দরবারে আসিতেন। এক দিন রোজার উপবাসকালের মধ্যে দরবার হইতেছে, এমন সময়ে জনৈক কর্মচারী একটা ঘৃতকলষা লেবু আনিয়া উজিরকে উপহার দিলেন। পিরআলি লেবুটীর আশ্রয় লইয়া সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সেই দরবার গৃহে নিষ্ঠাবান হিন্দু চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয় উপস্থিত ছিলেন, জ্যেষ্ঠ কামদেব রায়চৌধুরী উপবাসকাল মধ্যে উজির সাহেবকে লেবুর আশ্রয় লইতে দেখিয়া বলিলেন—“হজুর করিলেন কি, রোজার দিন লেবুর আশ্রয় লইলেন?” উজির জিজ্ঞাসা করিলেন—“দোষ কি?” তাহাতে কামদেব উত্তর করিলেন, “আমাদের শাস্ত্রে উক্ত আছে উপবাসের দিন কোন দ্রব্যের ভ্রাণ পর্য্যন্ত লইতে নাই, কারণ ভ্রাণে অর্জেক ভোজন হয়।” পিরআলি একথা শুনিয়া মনে করিলেন তিনি যে পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাই লক্ষ্য

করিয়া কামদেব তাঁহাকে এবিধ বিক্রপ করিতে সাহসী হইরাছেন । তিনি মনে মনে ইহার প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন ।

ঐতিহাস-পরায়ণ উজির এক দিন প্রজাসাধারণ ও কর্মচারী-বৃন্দের এক দরবার আহ্বান করিলেন এবং চৌধুরীবংশের সকলকে বিশেষ করিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন । নির্দিষ্ট দিবসে বথাসময়ে সকলে দরবারে উপস্থিত হইলে পূর্বনির্দেশানুসারে ঐ দরবার প্রাঙ্গণের সন্নিকটে এক সুপ্রশস্ত গৃহে মুসলমান বাবুর্জিগণ নানাবিধ সুগন্ধি মসলা পলাণ্ডু ও লণ্ডনাদি সংযোগে গোমাংস রন্ধন করিতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে সভাগৃহ গন্ধে ভরপুর হইয়া উঠিল । সভাস্থ হিন্দুগণ নাসিকার বস্ত্র দিয়া বসিলেন ; পিরআলি মনে মনে সবিশেষ আফ্লাদিত হইয়া মৌখিক মৌজ্ঞ সহকারে বলিলেন, “চৌধুরী মহাশয়গণ ওরূপ নাসিকা আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন কেন ? ব্যাপার কি ?” কামদেব উত্তর করিলেন “মাংসের গন্ধ” । তখন নষ্টবুদ্ধি পিরআলি বলিলেন “অগ্রে গোমাংসের গন্ধ পাইয়া পরে নাসিকা আচ্ছাদন করিয়াছেন, তাহা হটলে হিন্দুশাস্ত্র মতে আপনাদের সকলেরই ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আপনাদের সকলেরই জাতিচ্যুতি ঘটয়াছে, এক্ষণে আর নাসিকা-চ্ছাদনে ফল কি ?” পিরআলির এবিধ বাক্যে কামদেব প্রমাদ গণিলেন । ও দিকে উজিরের আদেশে কয়েকজন সিপাহী আসিয়া বল-পূর্বক কামদেব ও জয়দেবের মুখে গোমাংস প্রদান করিল । গ্রামস্থ হিন্দুগণ সকলে মিলিয়া রায়চৌধুরী বংশীয়গণকে ও অজ্ঞান দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে পতিত সিদ্ধান্ত করিলেন এবং তাঁহাদের সতিত আহার ব্যবহার রহিত করিলেন । এ দিকে কামদেব ও জয়দেবের মুখে প্রত্যক্ষ-ভাবে গোমাংস পতিত হওয়ার তাঁহাদের জাতিবর্গ ও নিকট কুটুম্বগণও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন সেই দুই হুঁতগা ব্রাহ্মণ সন্তান মুসল-মান হওয়া ব্যতীত গতাস্তর নাই দেখিয়া নবাব খাজেআলি খাঁর শরণাপন্ন হইলেন ও বথাক্রমে কামালউদ্দীন খাঁ চৌধুরী ও আমালুদ্দীন খাঁ চৌধুরী নাম লইয়া যশোহরের পাঁচ কোশ দূরে সিংহিয়া গ্রাম জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিলেন ; ইহাদের বংশাবলী বৃদ্ধি পাইয়া এখন

সাতক্ষীরা, হুসেনপুর, মাগুরা, বঙ্গলিয়া প্রভৃতি গ্রামে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

দীর্ঘজীবির দৌরাত্ম্যে এই সকল ব্যক্তির জাতিচ্যুতি ঘটায় তাঁহাদের পতিত বংশাবলী সাধারণতঃ পিরানী নামে খ্যাত হন। রায় চৌধুরী বংশীয়গণ এইরূপে শুদ্ধগ্রামী সাধা শ্রোত্রীয় হইতে পিরানী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে বিশেষ দামে পড়িতে লাগিলেন। তাঁহাদের ধনের অপ্রতুল ছিল না, সুতরাং ধনবলে কুলীন ও শ্রোত্রীয় পাত্র সংগ্রহ করিয়া বিবাহাদি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন, তখন সেই সকল কুটুম্বগণও পতিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে পিরানীগণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এতদ্ব্যতীত পিরানীগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও অনেক কিস্কদন্তী প্রচলিত আছে। এ সকল কিস্কদন্তীর মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তাহা নির্ধারণ করা সুকঠিন, সুতরাং জরানদের চৈতন্য-মঙ্গল, যাহা ঐতিহাসবহন গ্রামাণক গ্রহ বর্ণনা সাহিত্যে আদৃত তথা কথিত বিবরণী, এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

নবদ্বাপবাসীগণের উপর অত্যাচার অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। পিণ্ডাচ প্রকৃতি মজাফরের প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন সাহ মুসলমান ও হিন্দু জমিদারগণের সহিত মিলিত হইয়া ১৪৯৬ অব্দে মজাফরের কলুষময় জীবনের অবসান করত স্বয়ং বঙ্গ-সংহাসন অধিকার করেন। হুসেন সাহ নবদ্বীপের নষ্ট মন্দির ও ভগ্ন দেউল প্রভৃতির পুনঃসংস্কারের অনুমতি প্রদান করেন। এই হুসেন সাহ পুণে সুবুদ্ধি খাঁ নামক এক জন ধনাঢ্য কায়স্থের বাটীতে ভূত্যের কার্য্য করিতেন। কোন সময়ে সুবুদ্ধি খাঁ তাঁহাকে পুঙ্খবিলী খনন কার্য্যের পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। কিন্তু হুসেন তাঁহার প্রভুর নির্দিষ্ট কার্য্যে সর্বিশেষ মনোযোগী না হওয়ায়, সুবুদ্ধি বেত্রাঘাতে তাঁহাকে জর্জরিত করেন। হুসেন নীরবে বেত্রাঘাত সহ করেন এবং পূর্ব্বৎ প্রভুর কার্য্য করিতে থাকেন, এ কারণ সুবুদ্ধির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। সুবুদ্ধির চেষ্টায় হুসেন রাজসরকারে প্রথমে একটা সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন, উত্তরকালে স্বীয় সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত লাভ করেন।

হুসেন সাহের সময়ে কামরূপ বিজিত হয় এবং চট্টগ্রামে মগগণ পরাজিত হয়। ইনিই মেদিনীপুর অঞ্চলে হাবসীদিগকে নিকর ভূমি দান করিয়া উড়িষ্যার রাজাদিগের আক্রমণ হইতে বঙ্গদেশ রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার সময়ে প্রজাসাধারণের অবস্থা অতি সচ্ছল ছিল। ধনীগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন। নিমজ্জণ সভায় বিনি বস্ত্র স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন তিনি তত মর্যাদা প্রাপ্ত হইতেন।

তিনি একদিকে যেমন সুশাসক বলিয়া পরিচিত, তেমনি বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহদাতা বলিয়াও সুবিখ্যাত। ইহারই আদেশে সুপ্রসিদ্ধ কবীজ্ঞ পরমেশ্বর মহাভারত অনুবাদ করেন, ইহা পারগলী ভারত বলিয়াও খ্যাত। বঙ্গকবি গুণরাজ খাঁ, ছুটী খাঁ, গোপীনাথ বসু প্রভৃতি ইহার সভার উজ্জল রত্ন ছিলেন।

হুসেনের সময় অনেক হিন্দু উচ্চ রাজকর্ম প্রাপ্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ রূপ ও সনাতন ব্রাহ্মণ নদীর খাস ও সাকর মল্লিক নামে তাঁহার সভার প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন সপ্তগ্রামের রাজপ্রতিনিধি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দুই ভ্রাতা নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর অর্থ ও ভূমি দান করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন *। চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে ও বহু সমসাময়িক সাহিত্যে দেখা যায় যে সে সময়ে কয়েকজন কাজী বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া নদীয়া শাসন করিতেন। চাঁদ খাঁ নামক একজন কাজী নবদ্বীপের একাংশে বেলপুখুরিয়ার বাস করিতেন। আর একজন শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে থাকিতেন; তাঁহার নাম ছিল মুলুক; ইহার গোরাই নামে এক জন হিন্দুবিদ্বেষী পরম অত্যাচারী অমাত্য ছিল। কাজীগণ বিদ্বেষ বশতঃ সর্বদাই হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। শুভ-

* হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই সহোদর।

সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ॥

মহৈশ্বর্য যুক্ত দোহে বদান্ত ব্রাহ্মণ।

সদাচার সংকুল ধার্মিক অগ্রগণ্য ॥

নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।

অর্থ, ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥ চৈতন্যচরিতামৃত।

শিরোমণি যবন হরিদাস • ইসলাম ধর্মের পরিবর্তে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করার শাস্তিপুর নিবাসী কাজীর এরোচনার ও বাধসাহের বিচারে বেআযাতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। কথিত আছে হরিদাস ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর অপার কৃপার পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপস্থ চাঁদ কাজী মহাপ্রভুর বিক্কাচারী হইয়াও পরিশেষে তাঁহার কৃপালাভ করিতে সমর্থ হন।

হুসেন সাহের পরবর্তীকালে সের সাহ নামক একজন দুর্ভদ্র আফগান প্রথমে বঙ্গদেশ পরে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুনকে পরাস্ত কবির দিল্লী অধিকার করেন। সের সাহ রাজকার্য্যে স্নদক্ষ হইলেও অত্যন্ত হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। এমন কি তাহার জাতি ধর্ম হানিকর আইনাদি প্রচলন করিয়াছিলেন। এই সকল আইনের মধ্যে “হিন্দু প্রজা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর দিতে অশক্ত হইলে মুসলমান শাসনকর্তা ইচ্ছা করিলে তাহার মুখে নিজীবন নিক্ষেপ করিতে পারিবেন, এবং ইসলাম ধর্মের সমুজ্জ্বল মহিমা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত হিন্দু প্রজা ঘৃণা না করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য,” †

• ভক্ত শিরোমণি হরিদাস ঠাকুর বনগ্রাম মহকুমার অধীন বৃঢ়ণ গ্রামে মুসলমান কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, প্রথমে তিনি বনগ্রামের অন্তর্গত বেনা-পোলের বনভাস্তরে নিভৃত কুটীরে নাম বজ্র আরম্ভ করেন। কিন্তু ঐ স্থানের জমীদার রামচন্দ্র খানের পীড়নে তিনি উক্ত আশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রথমে শাস্তিপুরে, পরে সপ্তগ্রামের সরিকটহ চাঁদপুর গ্রামে আসিয়া কিছু দিন বাস করেন, পরে তথা হইতে আসিয়া শাস্তিপুরের সরিকটে ফুলিয়া গ্রামে গঙ্গাতীরে এক গুহা নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার প্রতি শাস্তিপুরের কাজীর বিদ্বেষ জন্মে। ফুলিয়া গ্রামে হরিদাসের গুহার কোনও চিহ্ন ছিল না। আর ৪০ বৎসর পূর্বে যশোহর জেলার চাঁচুড়ি পুড়ুরী গ্রামের অগদানন্দ গোবামী বহু কষ্টে ও অসুস্থতানে হরিদাসের আশ্রম ও ভজন গুহাটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন ও গুহাটীকে কৃপাকারে সংরক্ষণ করিয়াছেন। বর্তমানকালে আশ্রমের ভলে গঙ্গা না থাকিলেও গঙ্গার গভীর খাত বিদ্যমান আছে। ইহার উপর কবি কুন্তিবাসের বাস্তবিকতা।

† When the collector of the Dewan asks them (the Hindus) to pay the tax, they should pay it with all humility and submission. If the collector wishes to spit into their mouth, they should open

ইত্যাদি আইন প্রচলন দ্বারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র হিন্দুর ধর্মনাশ করিয়া মুসলমান করিয়া দান । ইহাই এতদঞ্চলে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান সংখ্যা-ধিক্যের প্রধান কারণ বলিয়া অঙ্গীকৃত হয় † ।

সের সাহের মৃত্যুর পর তৎকালীণ করক জন গোড়ে শাসনকর্তা হন । রাজনীতিবেত্তা মোগল-কুল-রবি অচ্যুতর আক্‌বর সাহ সমগ্র হিন্দুস্থান করতলগত করিয়া সেনাপতি মুনিম খাঁকে এবং তোডরমল্লকে বাঙ্গালায়, পাঠান শাসনের মূলোচ্ছেদ করিতে প্রেরণ করেন । এই সময়ে গোড়ে অত্যন্ত মারিতর উপস্থিত হয় ; লক্ষ লক্ষ লোক এই লোকক্ষরকর ব্যাধির দাক্ষণ্য কবলে কবলিত হওয়ার প্রাচীন গোড় একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়ে । আক্‌বরের সেনাপতি মুনিম খাঁও এখানে আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং আক্‌বর সাহ তাঁহার স্থানে হুসেনকুলী খাঁ নামক একজন দক্ষ সেনাপতিকে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তোডরমল্লের সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন । অচ্যুতর তোডরমল্ল দিল্লী হইতে সৈন্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সৈন্তসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিবার মানসে বঙ্গদেশস্থ জমিদারবর্গের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন । তাহার ফলে তদানীন্তন নদীয়ার অন্তর্গত চতুর্বেষ্টিত দুর্গ-স্বামী কারহকুলভূষণ রাজা কাশীনাথ রায় তোডরমল্লের সহিত মিলিত হন এবং মোগলের পক্ষ হইয়া পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে অতুল বীরত্ব প্রদর্শন করেন । এই চতুর্বেষ্টিত দুর্গ এক্ষণে নামমাত্রে পর্যাবসিত হইয়াছে, এবং সাধারণতঃ চৌবেড়িয়া নামে খ্যাত । ইহা বর্তমান বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেল-

their mouths without the slightest fear of contamination so that the collector may do so. The object of such humiliation and spitting into their mouths is to prove the obedience of the infidel subjects under protection and promote, if possible, the glory of the Islam—the true religion and to show contempt to false religions.

Von. Noha's Akbar.

এই বর্নরোচিত আইন মহামতি আক্‌বরের সময় রহিত হয় ।

† The existence of a large Musalman population in the district (Nadiya) is accounted for by wholesale forcible conversions at a period anterior to the Moghul Emperors during the Afghan supremacy.

Hunter's. S. Account Vol. II p. 51.

ওয়ের গোপালনগর ষ্টেশন হইতে ৭ সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । • চতুর্বেষ্টিত দুর্গ যখন প্রাসাদ, পরিখা ও অগণিত জনপূর্ণ ছিল, তখন সমিহিত বনগ্রাম ও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। পূর্বে চতুর্বেষ্টিত দুর্গ ও রাজপ্রাসাদের চতুর্দিক বেটন করিয়া পুণ্যসলিলা যমুনা প্রবল বেগে প্রবাহিতা ছিলেন ; সেই দুর্গপাদচারিণী বিশালকারা যমুনাও এক্ষণে ক্ষীণ রজত রেখার ভাষা অতি মুহু গতিতে প্রবাহিতা । কোথাও আবার সেই স্নান প্রবাহেরও অভাব দাঁড়াইরাছে । শুণগ্রাহী বাদসাহ আক্বেবর সেনাপতি তোডরমন্দের নিকট বঙ্গবীর রাজা কালীনাথের অসাধারণ যুদ্ধকৌশল ও অপূর্ণ বীরত্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া এবং পাটনা অবরোধের সময় স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিয়া পাটনা অধিকারের পর প্রকাশ্য দরবারে রাজা কালীনাথকে সমর-সিংহ এই গৌরব জনক উপাধি ও বাদসাহী খাণ্ডা, নাগরা, পাড়ী ও অশ্ব গজাদি প্রদান পূর্বক নানাক্রমে সম্মানিত করেন । ইহার অব্যবহিত পরেই যখন কুলী খাঁ ও তোডরমন্দের সম্মিলিত বিপুল মোগলবাহিনী পলায়নগর শেষ পাঠান নরপতি দাযুদ খাঁর পশ্চাচ্ছাবন করিয়াছিল তখনও রাজা সমরসিংহ সানন্দচিত্তে সর্ব প্রথমে তোডরমন্দের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইরাছিলেন এবং নিজের স্বাতন্ত্র্যক বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন করিয়া বাক্সালা হইতে পাঠান রাজ্য উচ্ছেদের ও মোগল রাজত্ব সংস্থাপনের বিশেষ সহায়তা

• পণ্ডিতাগ্রগণ্য সুলেখক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস, মহোদয় যখন বনগ্রামের সব ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন, তখন বহু অমূল্যকালে এই চতুর্বেষ্টিত দুর্গস্থামীর বীরত্বকাহিনী সংগ্রহ করিয়া তাহাই অবলম্বন পূর্বক তাহার সুবিখ্যাত উপভাষা “বঙ্গবিজেতা” প্রণয়ন করিয়াছিলেন ।

বর্তমানকালে চৌবেড়িয়াতে পূর্ব সমৃদ্ধির কোনরূপ চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই । চতুর্বেষ্টিত স্থানটির মধ্যে এক্ষণে রাজার বাগান, কুল বাড়ী ও সেহালাপাড়া নামে তিনটা ম্যালেরিয়া পীড়িত ক্ষুদ্র পল্লী বিদ্যমান আছে । তাহার তাহাদের নামের সহিত যেন একটা পূর্বদৃষ্টির আভাসমাত্র বহন করিতেছে । এই চতুর্বেষ্টিত দুর্গ এখানে সাধারণতঃ রাজা সত্যেশ্বর দুর্গ বলিয়া খ্যাত । সত্যীশ ইছাপুরের জমিদার ও সমরসিংহের মন্ত্রী ছিলেন । তাহার বংশ অব্যাপি ইছাপুরে বিদ্যমান । ইছাপুর চৌবেড়িয়া হইতে ৫ মাইল দূরবর্তী । এই চৌবেড়িয়া সুপ্রসিদ্ধ নীলদর্পণ প্রণেতা ৮ দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুরের জন্মস্থান ।

করেন। মহাবীরাশালী রাজা সমরসিংহের শেষ জীবন অতি শোকাবহ। বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইলে কুলী খাঁর উপর কিরদিবলের নিমিত্ত বঙ্গের শাসন ভার অর্পণ করিয়া রাজা তোডরমল সম্রাট আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিল্লী গমন করেন। এই সুযোগে সমরসিংহের কতিপয় কৃত্য কর্মচারী সমরসিংহের সর্কনাশ সাধনের জন্য এক ভীষণ বড়যন্ত্র করে। রাজবিদ্রোহ-অগবাদে তদানীন্তন বঙ্গের সুবেদারের অদ্বুত বিচারে সমরসিংহের শিরচ্ছেদন হইয়াছিল। কিছুদিন পরে তোডরমল বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গালার প্রত্যাগমন করিলে সমরসিংহের মহিষী তাঁহার নিকট বিচারপ্রার্থিনী হন। রাজা তোডরমল, চতুর্বেষ্টিত দুর্গে বঙ্গবিজয়ের ঘোষণাস্বরূপ এক বিরাট দরবার আহ্বান করেন এবং সমরসিংহের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্রকারীগণের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। এই দরবারে সমস্ত বঙ্গদেশ মোগল সম্রাটের শাসনাধীন বলিয়া ঘোষিত হয়। এত দিনে বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান রাজত্ব শেষ হইয়া বাঙ্গালা প্রত্যক্ষভাবে মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। রাজা তোডরমলই বাঙ্গালার মোগল সম্রাটের প্রথম প্রতিনিধি। তিনি সমগ্র বঙ্গদেশ জরীপ জমাবন্দী করিয়া রাজস্বের সু-বন্দোবস্ত করেন ও আশ্চর্য্য জমাতুমায়ে বঙ্গদেশকে ১২টা সরকারে ও ৬৮৯টা মহলে বিভক্ত করেন। তোডরমলের আশ্চর্য্য জমায় ১০,৬২৩,০৬৭ আকবরসাহী টাকা রাজস্ব আদায় হইত। পূর্বে ১২টা সরকারের মধ্যে ১১টা গঙ্গার উত্তর ও পূর্বে ৮টা গঙ্গার পশ্চিম এবং ভাগীরথীর সঙ্গমস্থানের নিকট অবস্থিত, তন্মধ্যে সরকার সপ্তগ্রাম ১টা। জেলা নদীয়া তখন সরকার সপ্তগ্রামের অধীন ছিল। এই সপ্তগ্রাম সরকার তখন বহুদূর বিস্তৃত ছিল; ইহার উত্তর সীমা পলাশী, দক্ষিণ সীমা হাতিরাগড় এবং পূর্ব ও পশ্চিম কপাতক (কপোতাক্ষ নদী ?) হইতে ভাগীরথীর উত্তর তীর লইয়া বিস্তৃত ছিল। ইহার অধিকাংশ মহল বর্তমান নদীয়া ও ২৪ পরগণার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে এই সুবিভাগ সরকারের বার্ষিক রাজস্ব ছিল ৪১৮,১১৮ আকবরী টাকা, বন্দর ও হাটের আর ছিল ৩০,৩০০ টাকা, ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে আর ২২৭,৭৪১ টাকা বলিয়া উল্লিখিত আছে *।

* Grant's Analysis of the Bengal Finances.

পাঠানগণ বিজিত হইলেও তাহাদিগকে যোগলগণের করতলগত রাখা হুঃসাধ্য হইল। সুযোগ পাইলেই বাঙ্গালার ভূস্বামীগণ দিল্লীধরের অধীনতা অস্বীকার করিতেন। তাঁহারি নামে দিল্লীধরের অধীন হইলেও কার্য্যত তাঁহারাই দেশের প্রকৃত রাজা ছিলেন। এইরূপে স্বাধীন ভূস্বামীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে দ্বাদশ জন প্রধান ছিলেন, তাঁহারি সাধারণতঃ দ্বাদশ ভৌমিক নামে খ্যাত। এই সকল স্বাধীন ভূস্বামীগণের মধ্যে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যই সৰ্ব্বপ্রধান ছিলেন। যোগলগণ কতৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইলে পাঠান রাজের একজন বাঙ্গালী কর্মচারী বহু পাঠান সর্দারের ও বীর ধন রত্নাদি সহ সুলতানবনের মধ্যে লুক্কায়িত থাকেন; তাঁহার নাম বিক্রমাদিত্য। তিনি এই জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম প্রদেশে ক্রমে বল সঞ্চয় করিয়া তদানীন্তন ভূস্বামীগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেন। সুবিখ্যাত পদকর্ত্তা বলসু রায় ইহার খুল্লভাতপুত্র এবং বঙ্গের শেষ বীর—বীরচূড়ামণি প্রতাপাদিত্য ইহার পুত্র। এই প্রতাপাদিত্য আকবরের শেষ জীবনে তাঁহার অতি বুদ্ধি ও দুর্দমনীয় শত্রু হইয়া উঠেন। তিনি চট্টগ্রামের ও আরাকানের রডা-প্রমুখ পৰ্ব্বগুঞ্জদিগকে আপনার গোলন্দাজ সৈন্য মধ্যে নিযুক্ত করিয়া পুরী হইতে নোরাখালি পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ অধিকার করেন। নদীয়ার দক্ষিণ অংশ কাঞ্চননগর বর্ত্তমান কাঁচড়াপারা এবং জগদল প্রভৃতি স্থানও তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এখনও জগদলে তাঁহার গড় ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে ও রাজার পুকুর নামে পুকুরিণী তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এতদ্ব্যতীত তাত্-কালিক নদীয়ার অপর্যাপ্ত স্থানেও তাঁহার অধিকারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে প্রতাপের রাজ্যাভ্যন্তরে পূর্ব হইতেই কুশদেহের অন্তর্গত জলেশ্বর ও ইছাপুরে কালীনাথ রায় নামে একজন ধনশালী ব্যক্তি বাস করিতেন। নদীয়া প্রভৃতি কয়েকখানি পরগণা ইহার অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ইছাপুরের চৌধুরীগণের পূর্বপুরুষ ও খড়কহ মেলের সিদ্ধান্তী থাকের রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ সেই জমিদারীর অধিকাংশ ভোগ করিতেছিলেন। প্রতাপ তাঁহাদের নিকট কর প্রার্থনা করিলে সিদ্ধান্তবাগীশ দিতে অস্বীকার করায় প্রতাপ তাঁহাকে শাসন করিবার

মানসে সৈন্যে গোবরডাঙ্গার নিকট প্রতাপপুর নামক স্থানে আসিয়া শিবির সরিবেশ করেন। এক্ষণে সিদ্ধান্তবাণীশ সবিশেষ ভীত হইয়া প্রতাপের শরণাগত হন। দয়ালু প্রতাপ ব্রাহ্মণের কাতরোক্তিভে তাঁহার জমিদারী গ্রহণ করিলেন না। তবে যে স্থানে তাঁহার শিবির সরিবেশিত হইয়াছিল সেই স্থানটুকু গ্রহণ করিয়া আপনার নামে উহার প্রতাপপুর নাম রাখিলেন। এই স্থানটুকু গ্রহণের কারণ এই শুনা যায় যে প্রতাপ নিজ অধিকার ব্যতিত অস্ত্র আহার করিতেন না। এই গ্রামখানি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এখান হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি হালিসহর, কুমারচট্ট, জগদল প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন। প্রতাপকে দমন করিবার জন্য দিল্লীর আক্‌বর সাহেব পুনঃ পুনঃ তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালীর সুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এই সময় সম্রাট আক্‌বর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর দিল্লীর সম্রাট হন। জাহাঙ্গীরও প্রতাপের বিরুদ্ধে তাঁহার স্ত্রীযোগা সেনাপতি অঘররাজ মানসিংহকে বাঙ্গালার প্রেরণ করেন। মানসিংহ বহু সৈন্য সমতিবাহারে বাঙ্গালার আগমন করতঃ নদীয়া রাজ-বংশের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের সহায়তায় এবং প্রতাপের কতিপয় কুতর আত্মীয় ও কর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতার বহু কষ্টে প্রতাপকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া যান। দিল্লীর পথে পবিত্র কানীধামে বীর প্রতাপের জীবনীলার অবসান হয়।

এই সময়ে অস্ত্রাস্ত্র যে সমস্ত বঙ্গীর ভূস্বামী অত্যাচারী মুসলমান শাসন-কর্তার বিপক্ষে মন্তকোত্তলন করিয়াছিলেন, নদীয়ার অস্ত্রতম বিখ্যাত ভূস্বামী দেবগ্রামস্থ কুন্তকার বংশীর রাজা দেবপাল তদুপায়ে উদ্বেগযোগ্য। কালের কঠোর নিষ্পেষণে এই কুবেশ সদৃশ ধনশালী, শক্তিমান ভূস্বামীর বিজীর্ণ প্রাসাদ, বিপুল পুরী ও স্নগভীর পরিখাদি ধ্বংস হইয়া সাধারণতঃ “দে গাঁর ঢাবি” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা এক্ষণে বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলওয়ের মাঝেরগ্রাম নামক স্টেশন হইতে তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। দেবগ্রামস্থিত এই পর্বতাকৃতি ধ্বংসাবশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহস্র দর্শকমাত্রেয়ই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে। এখনও ইতস্ততঃ

বিক্ষিপ্ত এনামেলের ইট কারুকার্যময় প্রস্তরাদি ও প্রাসাদের পরিধা প্রান্তে অবস্থিত চারিটা উচ্চ মৃত্তিকাপুংপ (যাহার গঠন প্রণালী দেখিলে পূর্বে লক্ষ্য সৈন্তের গতিবিধি পর্যালোচনার নিমিত্ত স্থাপিত বলিয়া অনুমিত হয়) এবং অসংখ্য পুকুরিণী, বিশেষতঃ, শোকাবহ স্থিতি বিলড়িত রাজাস্তম্ভঃপূর সংলগ্ন সুবিস্তীর্ণ সরোবর স্বতই প্রাণের অন্তঃকালে একটা বিবাদের চিত্র অঙ্কিত করে * ।

রাজা দেবপাল সৰ্বক্কে নানাবিধ কিসদত্তী প্রচলিত আছে; তাহাদের মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তাহা অবধারণ করা সুকঠিন। বহু অমুসন্ধানেও আমরা এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। সুকবি ভারতচন্দ্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে মানসিংহের আখ্যায়িকার মধ্যে স্বর্গগমনোদ্যত ভবানন্দ মজুমদারের সহিত দেবী অন্নদার কথণোকথনচ্ছলে নবদ্বীপ রাজবংশের যে ভবিষ্যচিহ্ন অঙ্কিত

* "This is said to be the fort of a Mohjan Raja, who on going out to fight a battle, carried with him a pigeon giving his Ranis orders, that they should watch for the return of the pigeon. If he won the battle, he would return himself, if he lost he would loose the pigeon, whose return would intimate to the Ranis the loss of battle, and if they had any regard for the honor, they would destroy themselves. He won the battle but the pigeon got loose by accident and returned to the Raja's palace, whereupon the Ranis drowned themselves and their treasure in the "Khirki" tank behind the palace. The Raja hastened home but arrived too late to save the Ranis, whereupon in despair he drowned himself also in the tank. The tank has stone "ghats" all round and is covered on three sides with ruins of brick buildings, four high circular towers stood at the four corners of the oblong fort, which is of earth. Outside the fort are the ruins of several large temples which appear to be of great interest and of some antiquity, as evidenced by the size of the bricks. They are the only pre-Mahomedan ruins seen or heard of in the District."

"List of Ancient Monuments &c."

Published by the Government of India.

করিরাছেন অর্থাৎ রাজশেরী মহারাজ রাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে রাজসভায় বসিয়া ভারতচন্দ্র নদীয়া রাজবংশের যে অতীত কাহিনী দেবীর মুখে হইতে ভবিষ্যৎ বাণীরূপে লিপিবদ্ধ করিরাছেন তাহাতে দেব-গ্রামের রাজবংশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি পরিদৃষ্ট হয়। ঐ ছত্র কয়েকটি হইতে ইহাই প্রতীতি হয় যে দেবপালবংশ ধ্বংস হইলে তাঁহাদের বিশাল সম্পত্তি, কি স্ত্রী জ্ঞানি না, তবানন্দ মজুমদারের পৌত্র রাজা রাঘবের অধিকারভুক্ত হয়। বধা—

“গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর ।

রাঘব হইবে নাম রাঘব সোঁসর ॥

দেগাঁর আছিল রাজা দেপাল কুমার ।

পরশ পাইরাছিল বিখ্যাত সংসার ॥

আমার কপটে তার হয়েছে নিধন ।

রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্যধন ॥”

ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের চাকদহ ষ্টেশন হইতে তিন কোশ পূর্ব মুখে যাইলে কামালপুর নামে একখানি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রাম প্রাচীন নদীয়ার মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। বহু ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত এখানে বাস করিতেন; সেজন্য অনেকে এখনও ইহাকে ভট্টাচার্য্য কামালপুরও বলিয়া থাকেন। অগ্রসিক বনমালী বিদ্যাসাগর মহাশয় এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র গ্রামখানি পশ্চাতে রাখিয়া আরও কিয়দূর অগ্রসর হইলে স্বচ্ছসলিল খলসিয়ার বিল দৃষ্টিপথে পতিত হয়; এই বিলের নিকট সরাবপুর নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম বিদ্যমান আছে। এই গ্রামের মধ্যস্থিত ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরের অভ্যন্তরে যে মৃত্তিকা প্রেথিত হস্তপরিমিত লিঙ্গমূর্ত্তি দৃষ্ট হয় উহাই সাধারণতঃ পোড়া মহেশ্বর নামে খ্যাত। তদ্ব্যবশেষ মন্দিরের ভিত্তি ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত মৃত্তিকাতৃণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উহা যে পূর্বে ইষ্টকনির্মিত বহু গৃহ প্রাঙ্গণ ও চত্বর বেষ্টিত সমৃদ্ধিশালী দেবালয় ছিল তাহা স্পষ্টই লক্ষিত হয়। সেই স্তূপ সকল একগে জললাকীর্ণ ও খাপন সঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে।

কথিত আছে এ স্থানের অবস্থা হীন হইয়া পড়িলে এককাল এক লোভী

সন্ন্যাসী এই পাবানময় লিঙ্গমূর্তির মস্তকদেশে একখানি স্পর্শমণি লুক্কায়িত আছে জানিতে পারিয়া এই শিবমন্দিরে আসিয়া বাস করিতে থাকে । এক দিন ঐ কপটাচারী ভাবিল যদি চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ঐ লিঙ্গমূর্তি উত্তপ্ত করা যায়, তবে ঐ মণি মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে ; কিন্তু পাছে দগ্ধ করিলে লিঙ্গমূর্তি গ্রামবাসীগণকে মন্দির রক্ষার্থে আহ্বান করেন সেই আশঙ্কায় এক চাতুরী অবলম্বন করিল । সে বহু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া ঐ মন্দিরে সঞ্চার করিল এবং উপযুক্ত পাত্র কয়েক রাজি ভীষণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া স্বয়ং ঐ অগ্নিকুণ্ডমধ্যে উপবেশন পূর্বক “কে কোথায় আছ গ্রামবাসি ! দেখ পামর সন্ন্যাসী আমার দগ্ধ করিতেছে” ইত্যাদি আর্তনাদ করিতে থাকে । গ্রামবাসীগণ প্রথম প্রথম কয়েক রাজি ঐ ভয়ঙ্কর চিংকারে আকৃষ্ট হইয়া মন্দিরে আগমন করিয়াছিল ; কিন্তু প্রত্যহ সন্ন্যাসীকে এইরূপ চিংকার করিতে শুনিয়া শেষে তাহাকে উন্মাদগ্রস্ত হিঁস্র করিয়া আর কেহ সে বিষয়ে মনোযোগ করিত না । এক দিন ঐ সন্ন্যাসী লিঙ্গমূর্তির চতুর্দিকে শুপাকারে কাষ্ঠ সজ্জিত করিয়া অগ্নি প্রদান করিল । কিয়ৎকাল পরে যখন অগ্নি ভীষণাকার ধারণ করিল তখন লিঙ্গমূর্তি হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ বিনির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু গ্রামবাসীগণ উহা উন্মাদগ্রস্ত সন্ন্যাসীরই কার্য্য বিবেচনার সে কথা কেহ শুনিয়াও শুনিল না, সন্ন্যাসীর এই পৈশাচিক কার্য্যে বাধা দিতে কেহই অগ্রসর হইল না । দেখিতে দেখিতে সেই উজ্জ্বলমণি পাবান মূর্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে নিপতিত হইল । এতদিনে সন্ন্যাসীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল । সেই অমূল্য নিধি ঝুলির মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া রাজি থাকিতে থাকিতে সন্ন্যাসী তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দেবগ্রামে উপস্থিত হইল । তখন দেবগ্রামে বহু কুস্তকারের বাস ছিল । সন্ন্যাসী ঐ গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেবপাল নামক একজন কুস্তকারের গৃহে আতিথি হইল এবং ঝুলিটি ঐ কুস্তকারের কুটির প্রান্তে ঝুলাইয়া রাখিয়া স্বানার্থ গমন করিল । তখন বর্ষাকাল—হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার কুস্তকারের জীর্ণ চাল হইতে জল পড়িয়া ঐ ঝুলিটি সিক্ত হইতে লাগিল এবং স্পর্শমণি সংস্পর্শে ঐ জলধারা অপরূপ গুণ প্রাপ্ত হইয়া গৃহস্থিত যে কোন ধাতবপদার্থের সংস্পর্শে আসিতে লাগিল তাহাই স্ববর্ণ হইল । এই

অত্যন্ত ব্যাপার সম্বন্ধে করিয়া কুন্তকার বৎপরোনাক্তি বিস্তৃত হইল এবং সাগ্রহে সন্ন্যাসীর অসাক্ষাতেই তাহার কুলিটী অমুসন্ধান করায় সেই অমূল্য-নিধি প্রাপ্ত হইল এবং এক নিভৃত স্থানে উহা লুক্কায়িত রাখিয়া পুনরায় স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। সন্ন্যাসী স্নানান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিল যে তাহার এক কষ্টের এত সাধনার ধন অপহৃত হইয়াছে। তখন সে আকুলপ্রাণে দেবপালের শরণাপন্ন হইয়া মণি প্রত্যর্পণের নিমিত্ত সকাতিরে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিল কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া এক বৃহৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া এট বলিয়া পূর্ণাহুতি দিল, “যেন ঐ মহামণিই দেবপালের সর্জনশেষের মূল হয়—আর যেন অচিরাত্ সে নির্বংশ হয়—ও সেই গ্রামে যেন কখন কোন কুন্তকার আসিয়া বাস না করে—করিলে সেও যেন সবংশে নিবংশ হয়।” দেবপাল সেই স্পর্শমণির শুণে ক্রমে কুবের সদৃশ ধনশালী হইয়া উঠিলেন এবং নিজ বাসগ্রাম অধিকার করিয়া ইন্দ্রপুরী সদৃশ প্রাসাদ ও মন্দিরাদি নির্মাণ এবং সুবৃহৎ সরোবরাদি খনন করাইয়া স্বীয় নামে ঐ গ্রামের “দেবগ্রাম” নাম করণ করিলেন। ক্রমে ঐ ক্ষুদ্র গ্রাম নগরের আকার ধারণ করিল এবং দেবপাল একজন ক্ষমতালশী ভূম্যধিকারী হইয়া উঠিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। মুসলমানগণকে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়—বঙ্গদেশ তখন মুসলমান অধিকৃত, মুসলমানগণের প্রতাপ তখন অপ্রতিহত। বহুদিন শাস্তির ক্রোড়ে বিলাস স্রোতে ভাসমান থাকিয়া তাহার অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল, এমন কি জ্রীলোকগণের উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত না। রাজা দেবপাল এই সকল উচ্ছৃঙ্খলতা অমার্জনীয় মনে করিতেন, তাই তিনি কঠোর হস্তে তাঁহার নিজ অধিকারভুক্ত মুসলমানগণের এই সকল অত্যাচার দমন করিতে প্রবৃত্ত হওয়ার তদানীন্তন বঙ্গেশ্বরের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয় এবং কয়েকবার কয়েকটা ক্ষুদ্র সংঘর্ষে তিনি মুসলমান সৈন্তগণকে বিধ্বস্ত করেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ নবাব এই রূপে একজন ক্ষুদ্র ভূঁইয়ার নিকট পরাস্ত হওয়ার দারুণ হিংসানলে প্রজ্বলিত হইয়া দেবগ্রামের চতুর্দিকে বহু সৈন্ত সমাবেশ করিলেন। দিল্লীশ্বরের বিনাহুমতিতে এক জন ভূঁইয়ার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাহার রাজ্য

বিশ্বস্ত করিলে পাছে সম্রাটের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইতে হয়, সেই ভয়ে বজেশ্বর দেবগ্রাম অবরোধ পূর্বক রাজা দেবপালের বিরুদ্ধে বহু মানিকস্বয়ং কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া দিল্লীদরবারে দূত প্রেরণ করিলেন এবং দিল্লীশ্বরের আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । এদিকে রাজা দেবপালও বজেশ্বরের এই অসুখী অভিযানের প্রতিবিধান মানসে দিল্লীর খাগ দরবারে আরজ করিতে গমন করিলেন । গমনকালে তিনি জয় ও বিজয় নামে দুইটা বার্তাবাহকপোতকে সঙ্গে লইয়া বলিয়া যান যে “যদি এই স্বৈতকার জয় আমার আসিবার পূর্বে প্রত্যাগমন করে—তবে সকলে জানিও যে আমি দরবারে স্রলভ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছি, কিন্তু জয়ের পরিবর্তে যদি কৃষ্ণকার বিজয় প্রত্যাবর্তন করে তবে জানিও আমার নিধন হইয়াছে । তখন সকলে হৃদান্ত মুসলমান হস্তে আত্মরক্ষার উপায় করিও ।” নবাব প্রেরিত দূত ও দেবপাল উভয়ে একই সময়ে দিল্লীশ্বরের সমীপে উপস্থিত হন । দিল্লীশ্বর দেবপালের তেজগর্ভবাক্যক বপু, অসীম সাহস, নির্ভীক ভাব ও উপায় চরিত্র দেখিয়া তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হন ও তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বজেশ্বরকেই মুসলমানগণ কৃত অভিযানের প্রতিবিধান করিতে পরামর্শ দিয়া দেবপালকে এক ফরমান দ্বারা মহারাজ উপাধি ভূষিত করিয়া কেরকথানি পরগণার স্বামীত্ব প্রদানপূর্বক তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দেন । মহারাজা দেবপাল এইরূপে দিল্লীর দরবারে অপ্রত্যাশিতরূপে সাফল্য ও সম্মান লাভ করিয়া বঙ্গাভিমুখে রওনা হন এবং কপোতবাহী দাসকে স্বৈতকার জয়কে মুক্ত করিয়া দেবগ্রাম অভিমুখে প্রেরণ করিতে আদেশ করেন । ঐ কপোতবাহী দাস বজেশ্বরের দূতের নিকট বহু অর্থ উৎকোচ লইয়া জয়ের ফলে বিজয়কে মুক্তি প্রদান করে । দেখিতে দেখিতে শিক্ত কপোত শনৈঃ শনৈঃ দেবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয় । রাজা দেবপালের পৌরজন-বর্গ সেই অন্ততর্পন কৃষ্ণকার কপোতকে প্রত্যাক করিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং রাজা দেবপালের নিধন নিশ্চয় বুঝিয়া মহিলাগণ হৃদান্ত মুসলমান হস্ত হইতে আপনাদের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্ত সকলে অপূর্ণ বেশভূষা ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া প্রাসাদ প্রাঙ্গণস্থিত বজ্রসলিলা খড়কী

পুষ্করিণীতে ও সাগর দিখিতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন । তখন পুরুষগণ ক্রপাণ হস্তে গড়ের দ্বার মোচন করিয়া প্রচণ্ড বেগে সেই মুসলমান সৈন্য বাহের মধ্যে পতিত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে সেই মুষ্টিমেয় হিন্দু-সেনা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল । তখন মুসলমানগণ বিনা ক্রেশে সেই অরক্ষিত পুরী প্রবেশ করিয়া যেখানে বাহা পাইল অপহরণ ও ধ্বংস করিল । এ দিকে মহারাজা দেবশাল মহারাজাসে শূন্তে কত অট্টালিকা রচনা করিতে করিতে আগমন করিতেছিলেন, এক্ষণে দূর হইতে মুসলমানগণের বিজয় নিনাদ শুনিয়া ও স্বীয় পুরী তাহাদের অধিকৃত দেখিয়া বজ্রাহতবৎ সেই স্থানে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । মুচ্ছান্তে দ্রুত অর্থ চালনা করিয়া পুরী প্রবেশ করিলেন এবং আপনার শরীর রক্ষক সেনা করজন ও স্বয়ং কিয়ৎকাল অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া শত শত মুসলমান সেনা ধ্বংস পূর্বক আপনিও নিহত হইলেন । এইরূপে বহুদিবস আর একটা রক্ত আপনার পূর্ণজ্যোতি বিকীরণ না করিতেই অকালে কালের অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইলেন এবং এইরূপে সেই দুর্শ্মখ সন্ন্যাসীর দারুণ অভিসম্পাত কার্য্যে পরিণত হইল ।

এইরূপে বাঙ্গালার ভূঁইয়া রাজাগণ একে একে মোগল শাসনাধীনে আসিলেন বটে কিন্তু রাজ্যাশাসন সম্বন্ধে মুসলমানগণের প্রত্যেক কোন সম্পর্ক রহিল না । তদানীন্তন ভূস্বামীগণ রাজ্যের সর্ব্ব প্রকার শাসন কার্য্য স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন । মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ কেবল নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া সমুদ্রৈ ধাকিতেন ও সর্ব্বদা আমোদ আশ্বাদে কালাতিপাত করিতেন ।

এইরূপে নদীয়া সে সময়ে আদৌ মুসলমান শাসনাধীন থাকিলেও উহা প্রত্যক্ষত কখনগরাদিগণের শাসনাধীন হইল । মানসিংহকে বাঙ্গালা বিজয়ে সহায়তার পুরস্কারস্বরূপ ভবানন্দ মজুমদার সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে বহু সম্মান ও এক করমান দ্বারা ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে নদীয়া, মহৎপুর, মারুগদহ, লেপা, মুলতানপুর, কাশিমপুর, কয়েশা, মসুড়া প্রভৃতি চতুর্দশ পরগণার স্বামীক প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যাশাসনে মনোনিবেশ করিলেন । এই সময় হইতে নদীয়া, তৎকালীকালের দ্বারা স্বাধীনভাবে শাসিত হইতে থাকে । ভবানন্দ বাগোরান হইতে মাটিয়ারিতে রাজধানী স্থাপনা করেন ।

তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তে মধ্যম পুত্র গোপালকে তাঁহার বিষয়ের অধিকারী করিয়া বান। গোপাল, বাদসাহের নিকট হইতে শাস্তি-পুর, সাহাপুর, ভালুকা, রাজপুর প্রভৃতি পরগণার জমিদারী স্বত্ব প্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ নিজ বুদ্ধিবলে স্বতন্ত্রভাবে কুশদহ ও উখুড়া পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি অল্প বয়সে প্রাণত্যাগ করায় তাঁহার সমুদার সম্পত্তি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা গোপাল অধিকার করেন। গোপালের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাঘব মাটিরারি হইতে রেউই নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কথিত আছে এই রেউই ও তরিকটবর্তী প্রদেশসমূহ খড়িরা নদীর উপরে শ্রামল বৃক্ষাদি শোভিত মনোরম স্থান ছিল এবং সেই সময়ে এখানে দলে দলে মৃগ ও ময়ূর বিচরণ করিত। অদ্যাপি এই সকল মৃগের ছ চারিটা বংশধর কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী আড়বান্দি প্রভৃতি গ্রামের প্রান্তরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন এই স্থানে বহুসংখ্যক গোপ বাস করিত এবং তাহারা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিল। রাজা রাঘবের পুত্র কজ্জরার এই রেউইরের নাম পরিবর্তন করিয়া কৃষ্ণনগর নাম করণ করেন। তাঁহার সময়ে নদীয়া রাজ্য অতি বিস্তীর্ণ আকার ধারণ করে। তিনি এই সুবিস্তীর্ণ ভূমির রাজস্ব হিসাবে বিংশতি লক্ষ মুদ্রা মোগল সরকারে কর প্রেরণ করিতেন। কথিত আছে এই সময়ে তদানীন্তন বাদসাহ রেউইতে মৃগাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় শুনিয়া এখানে মৃগয়ার আসিতে মনস্থ করেন। কিন্তু রাজা সসৈন্ত বাদসাহের আগমনে দ্রিষ্ট প্রজাগণের উপর অত্যাচারের আশঙ্কা করিয়া বহু মুদ্রা অন্নিয়োগ পূর্বক বাদসাহকে নিরস্ত করেন *।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত টাবরনিয়ার সাহেব তারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে আগমন করিয়া উক্ত বৎসর ১২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে নদীয়ার উপস্থিত হন। তিনি তদানীন্তন নদীয়াকে জনসঙ্খ্যে বৃহৎ নগর বলিয়া

* Early in ye morning we passed by a village called Sreenagar and by 5 o'clock this afternoon (October, 1682) we got as far as Rewee—a small village belonging to Woodoy Roy, a Jamindar that owns all the country on that side of the water almost as far as over against Hugbly. It is reported by ye country people that he pays

উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার বর্ণনায় দেখা যায় গঙ্গার জোয়ার এ সময়ে নদীয়া পর্যন্ত আসিত। কিন্তু এখন উহা কালনা পর্যন্ত আসিরা থাকে *।

more than twenty lacks of Rupees per annum to ye king, rent for what he possesses and that about two years since he presented above a lack of rupees to ye Mogoul and his favourite, to divert his intention of hunting and hawking in his country, for fear of his tenants being ruined and plundered by the Emperor's lawless and unruly followers. This is a fine pleasant situation, full of great shady trees, most of them tamrins, well stored with peacocks and spotted deer like our fallow deer. We saw two of them near the river side on our first landing.

Hedge's Diary Vol. I, p. 39.

তৎকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর Agent and Governor of their affairs in Bay of Bengal and of the British Factories (November 25, 1681) Mr. Hedges এর দৈনিক রোজনামচা হইতে আমরা পূৰ্বোক্ত অংশটি গ্রহণ করিয়াছি। উক্ত বিবরণীতে আমরা তদানীন্তন নদীয়াধিপতির নাম পাইতেছি “উদয় রায়” কিন্তু আমরা “ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্” সংস্কৃত এবং Translation by W. Pertsch, Published at Berlin in 1852, W. W. Hunter's Statistical Account of Nadya, স্বর্গীয় কার্তিকের রায় প্রণীত ক্ষিতীশ গ্রন্থাবলী এবং কৃষ্ণনগরের বর্তমান মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র অনুগ্রহ পূর্বক আমাদেরকে তাঁহার পূর্ব পুরুষের ইংরাজীতে লিখিত যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রেরণ করিয়াছেন, তৎসমুদায় প্রামাণিক বিবরণে তদানীন্তন কৃষ্ণনগরাধিপতির নাম পাইয়াছি “কজ রায়”। এখন কোন্ নামটি বাস্তবিক ভাষা অবধারণ করা সুকঠিন। যতান্তরে এই রেউট গ্রাম এবং তৎসম্বন্ধিত প্রদেশ সমূহ তখন পাটুলীর তুখামী উদয় রায়ের জমিদারী-ভুক্ত ছিল। নদীয়ার রাজাগণ, কি স্থজে জানি না, ঐ গ্রাম খানি প্রাপ্ত হন এবং তথায় রাজধানী স্থাপনা করেন। বংশবাহির স্বনাম প্রসিদ্ধ রাজাগণই পূর্বে পাটুলীর রাজা নামে খ্যাত ছিলেন। পাটুলী অগ্রদ্বীপের সম্বন্ধিত একখানি গ্রাম এবং পূর্বে নদীয়ার এলেকাধীনই ছিল। নদীয়ার বহু গ্রামই তখন পাটুলীর রাজ্যভূগর্ভে ছিল। পরে তাঁহারা পাটুলী হইতে তাঁহাদের রাজধানী স্থানান্তরিত করিলে নদীয়াবাসীর স্মৃতি হইতে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে দূরে পড়িয়াছেন।

* On the 19th February 1666, I passed a large town called Nadiya, and it is the furthest point to which the tide reaches.

Tavernier's Travels in India, vol. I, p. 133.

এই সময়ে সুবিখ্যাত সারোত্তা খাঁ বাঙ্গালার নবাব পদে অধিষ্ঠিত। ইঁহার শাসনকালে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে অবচর্ণক নামক সাহেব সুভাষাটী নামক স্থানে হংয়েরজ কোম্পানী বাহাদুরের একটা কুঠী স্থাপন করেন; সুভাষাটী কলিকাতার একটি অংশ, সুতরাং এই সময় হইতে কলিকাতার প্রথম সূত্রপাত বলিতে হইবে। কথিত আছে এই সারোত্তা খাঁর শাসনকালেই টাকার আট মন চাউল বিক্রয় হইত।

সারোত্তা খাঁর পরে বঙ্গ মসনদে ইব্রাহিম খাঁ উপবিষ্ট হইলেন। ইঁহার সময়ে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে শোভা সিংহ নামে বর্জমানের এক জন জমিদার, বর্জমানাধিপতি রাজা কৃষ্ণরামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এবং রোহিম খাঁ নামক আকগান সর্দারের সহিত মিলিত হইয়া রাজা কৃষ্ণরামের প্রাণ সংহার পূর্বক তদীয় প্রাসাদ অগ্নিকার করে। * বর্জমান রাজকুমার জগৎ রায় পলায়ন পূর্বক নদীয়া রাজ রামকৃষ্ণের শরণ লইলেন। শোভা সিংহ ও রোহিম খাঁর সম্মিলিতশক্তি এই সময়ে হুগলি অধিকার করে, কিন্তু তাহার গুলনাজগৎ রায় বিতাড়িত হইয়া সপ্তগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এই স্থান হইতে শোভাসিংহ তাহার সৈন্তের অধিকাংশ রোহিম খাঁর অধীনে নদীয়া ও সুরশিদাবাদ অধিকার নিমিত্ত প্রেরণ করে†। এবং স্বয়ং বর্জমানাধিপতির কুমারী কস্তার রূপে আকৃষ্ট হইয়া বর্জমান বাজা করে এবং সুরাপানে মত্ত হইয়া রাজকুমারীর ধর্মনাশ করিতে উত্তত হইলে তেজস্বিনী বর্জমান রাজকুমারী ছুরিকাঘাতে কামোদ্ভূত পুত্র প্রাণ হনন করেন। তাহার নিধনের পর তাহার জাতা হিম্মত সিং তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত অধিকার

* অথ সতীশচন্দ্রবাহাদুরশীর্ষাভিঃ: সমাগত্য হনুদরিবারে চ. অরামরায় সিংহস্য বর্জমানসু-
প্রাধন্যমাস। যজ্ঞাধিপত্যেনাথ জন্যবাস্য বাসকুমারীমাটিয়ারি প্রদীপে লিখ্যতঃ স্যাদযা-
নাস। শীর্ষাভিঃ হনুদরে কুমারামদরিবারি যজ্ঞাধন্যে বর্জমানী স্যাদিযথ্য বিজ্ঞাবাহানাস।

দ্বিতীয় বংশাবলী—অবিতদ।

† Vide Memoirs of the Mogoul Empire by Bradut Khan
p. 330.

পূর্বক দেশে অরাজকতা আনয়ন করে। এই সময়ে ইংরেজগণ কলিকাতার মহামান্ত্র ইংলণ্ডের তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে “ফোর্ট উইলিয়ম” নামকরণ করিয়া তাঁতাদের দুর্গ দৃঢ়তর রূপে স্থাপনা করেন এবং ওলন্দাজেরা চুচুড়ার ও করাসীরা চন্দননগরে আশ্রয়কার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া লন। তদানীন্তন বাদশাহ ঔরঙ্গজেব বাঙ্গালার শান্তি স্থাপনার্থ তাঁহার প্রিয় পৌত্র সাজাদা আফিক ওসানকে বহু সৈন্য সমভিষা হারে এদেশে প্রেরণ করেন। ইনি আসিয়া দেখিলেন যে গোভাসিংহ নিহত হইয়াছে এবং নব নিযুক্ত বজেন্দর অবরুদ্ধ খাঁ বিদ্রোহ অনেক দমন করিয়াছেন সুতরাং নিজে বর্দ্ধমানে থাকিয়া দেশস্থ সমস্ত ভূম্যধিকারীর সহিত শ্রীতি বিনিময় ও আনন্দোৎসব করিতে থাকেন। এই সময় তদানীন্তন নদীয়াধিপতি রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য স্থাপিত হয়। বাদশাহজাদা যখন বর্দ্ধমানে থাকিয়া এইরূপে উৎসবাদিতে মগ্ন, সেই সময়ে বিদ্রোহীরা আবার শক্তি সঞ্চয় করিয়া নদীয়া লুণ্ঠন করে * ।

এই সময়ে নদীয়া রাজবংশ কি মুসলমান শাসনকর্ত্তা কি বুরোপীয় শাসনকর্ত্তা সকলের নিকটে বিশিষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাৎকালিক কলিকাতার ইংরেজ প্রতিনিধি সাহেবের সহিত নদীরাজ রামকৃষ্ণের বিশেষ প্রণয় স্থাপিত হয়, এমন কি তিনি নদীরাজের শাসন সৌকার্য্য স্বার্থে বিসহস্র অশ্বনিগুন সৈন্য কৃষ্ণনগরে থাকিতে অহুঙ্কার করেন † ।

* Thus while the prince was amusing himself at Burdwan, receiving the congratulation of the Zemindars and principal men of the province, the rebels again collected in greater force and had the audacity, not only to Plunder the districts of Nuddeah and Hooghly, but to encamp within a few miles of Burdwan.

Memoirs of Mogoul Empire, Eradut Khan.

p. 341.

† Ram Krishna lived happily at Krisnagar for a long time. and any matter of interest of which he gave notice to the grandson of

বাদসাহজাদা আজিম ওসান নদীয়ার রাজা রামকৃষ্ণকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, দেওয়ান জাফর খাঁর তাহা ভাল লাগিত না। রামকৃষ্ণের উপর তাঁহার বিজাতীয় বিদ্বেষ ভাব ছিল কিন্তু তখন তিনি দেওয়ান মাত্র, কাজেই রামকৃষ্ণের কোনও অনিষ্ট করিতে সাহসী হন নাই। জাফর খাঁ, মুরসিদ কুলী খাঁ নাম গ্রহণ করিয়া যখন দোদ্দিগু প্রতাণে বাঙ্গালার শাসন কার্য্য গ্রহণ করিলেন তখন রামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার পূর্ব বিদ্বেষ জাগরিত হইয়া উঠিল এবং রাজস্ব অনাদায় ব্যপদেশে কোশলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাজধানীস্থ ‘বৈকুণ্ঠে’ (কারাগারে) প্রেরণ করিলেন। বাশবেড়িয়ার রাজা রঘুদেব রায় মহাশয় এ কথা শুনিতে পাইয়া আপনি তাঁহার সমুদায় দেনা শোধ করিয়া তাঁহাকে নরক মুক্ত করিয়া দেন। রঘুদেবের এই বদান্ততায় মোহিত হইয়া নবাব রঘুদেবকে “শূদ্রমণি” উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু তাহাতেও রামকৃষ্ণের পাণগ্রহ কাটিল না। অল্প দিন পরে পুনরায় রাজস্ব বাকী পড়ায় নবাব তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া রাজস্ব পরিশোধের নিমিত্ত একটা সময় নির্দেশ করিয়া দেন। উক্ত নির্দিষ্ট দিনের ভিতর টাকা না আসিলে তাঁহার জাতি নাসের ভয় প্রদর্শন করেন। একদিন ছুইদিন করিয়া নির্দিষ্ট দিন আসিল কিন্তু এবারেও রামকৃষ্ণের টাকা আসিয়া পৌঁছিল না। শুদিকে অন্ততম কারারুদ্ধ সমুদ্রগড়ের রাজার টাকা আসিল। সমুদ্রগড়ের উদার হৃদয় রাজা, রঘুদেবের মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনার সমস্ত অর্থ রাজা রামকৃষ্ণের নামে জমা দিলেন। রঘুদেব যে কার্য্যের জন্য “শূদ্রমণি” উপাধিতে ভূষিত হইলেন সেই কার্য্যের জন্যই সমুদ্রগড়ের রাজার ভাগ্যে অন্তরূপ ব্যবস্থা হইল। তিনি স্বীয় রাজস্ব দিতে না পারায় নবাবের আদেশে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন *। যদিও সদাশয় সমুদ্রগড়াধিপতির

the Sultan of Delhi, who resided at Janhagira was executed without fail by the latter who scarcely having got notice of it gave his instructions in a letter of answer.—Kshitish Vansabali Charitam.

* ইহাদের বাটীতে অন্যাপি মহাসমারোহে হুর্গোৎসব ও মহরম ছুইই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে এবং কৃষ্ণনগরের রাজবংশীয়গণের সহিত ইহাদের বৈশ্ব বৈশ্ব্য বিদ্যমান আছে।

‘বৈকুণ্ঠের’ দাক্ষণ কটে তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া কারাগারে প্রাণত্যাগ করেন ।

মুরসিদকুলীর রাজত্বকালে আর একটা ঘটনার সহিত নদীয়ার সম্পর্ক দেখা যায় । এই সময়ে হিন্দুধর্মের মধ্যে মহাপ্রভু প্রদর্শিত বৈষ্ণবধর্মই দেশ বিশেষে চর্চিত ও বহুলরূপে আচরিত হইতেছিল । জয়পুর রাজের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য নামীয় একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আপনার অসাধারণ বিদ্যাবলে বলীয়ান হইয়া মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুবর্তী ভক্তগণের আচরিত পরকীয়া মতে দোষারোপ করিয়া স্বকীয়াভাবের শ্রেষ্ঠ প্রতীপাদনকল্পে জয়পুর ও বৃন্দাবনবাসী বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের সহিত বিচারার্থী হন । বিচারে পরাস্ত হইয়া পণ্ডিতগণ স্বকীয়ামতের আনুকূল্যে দিগ্বিজয়ীর জয়প্রভু স্বাক্ষরিত করেন কিন্তু তৎকালীন জয়পুরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া দিগ্বিজয়ীকে বন্দের পরকীয়া ভাবের শ্রেষ্ঠ অধিকারী বৈষ্ণব কুলের সহিত বিচার করিয়া স্বকীয়া বা পরকীয়াভাবের শ্রেষ্ঠ স্থাপনের নিমিত্ত বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন । পথিমধ্যে প্রয়াগ ও কাশীর বৈষ্ণবকুলও স্বকীয়ার দস্তখত করিতে বাধ্য হন এবং বন্দের বহুস্থানেও দিগ্বিজয়ীর জয় হয় ; কিন্তু পরিশেষে শ্রীধাম নবদ্বীপে এবং শ্রীখণ্ড ও জাজিগ্রাম প্রভৃতি বৈষ্ণবপ্রধান স্থানে আসিয়া ঐক্লপ দাবী করিলে উক্ত স্থানসমূহের, বিশেষতঃ নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব-পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত বিচার না করিয়া দিগ্বিজয়ীর প্রাধান্ত স্বীকার করিতে অসম্মত হওয়ায়, তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর নবাব জাকির খাঁর আনুকূল্যে এক বিরাট বিচার সভা আহুত হইয়া এ সম্বন্ধে বিচার হয় । এই সভার নদীয়াস্বর্গত চাকড়ী (চাখন্দী) গ্রাম নিবাসী শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের বংশধর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর রাধামোহন ঠাকুরের সহিত বিচারে দিগ্বিজয়ী পরাজিত হইয়া স্বকীয়া ভাবাপেক্ষা পরকীয়ার প্রাধান্ত স্বীকার ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । এ সম্বন্ধে সম্প্রতি বেঙ্গলিলের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্বাক্ষরকারী গোস্বামীগণের মধ্যে শান্তিপুর, নবদ্বীপ, খড়দহ, বর্দ্ধমান, কাটোরা, কানাইডাঙ্গা প্রভৃতির গোস্বামীগণের স্বাক্ষর দৃষ্ট হয় । তাঁহারা বলেন আমরা ‘শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতাবলম্বী ; অতএব বিচারে যে ধর্ম স্থায়ী হয়

তাহাই লইল। এই মত কড়ার হইল, বিচার মানিলাম—তাহাতে পাত-সাহী সুভা শ্রীযুক্ত নবাব জাফর খাঁ সাহেবের নিকট দরখাস্ত হইল—তিহো কহিলেন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনা তজ্জবিজ্ হয় না—অতএব বিচার কবুল করিলেন। সেই মত সভাসদ হইল—শ্রীপাট নবাবীর শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য ও তৈলঙ্গ দেশের শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, সোনারগ্রামের শ্রীরামরাম বিদ্যাবূষণ ও প্রিন্সপীকান্ত ভট্টাচার্য্য গয়রহ শ্রীশ্রীকান্তী শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারী ও নয়নানন্দ ভট্টাচার্য্য—সং মহলা ১।”

পূর্বেই উক্ত হটরাছে রাজা রামকৃষ্ণ মুসলমানের অকথা পীড়নে কাচা-গারে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্রাদি না থাকায় নদীয়া সিংহাসন কাহাকে বসিবে এই লইয়া সে সময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং রাজা রামকৃষ্ণের পরম সুন্দর সাজাদা আজিম ওসান তাঁহার শৌচনীয় মৃত্যু সংবাদে আন্তরিক ব্যথিত হইয়া জাফর খাঁর প্রতি এক পরোয়ানা জারি করেন এবং রামকৃষ্ণের ব্যবসায় সম্পত্তি ও নদীয়ার রাজ্য তাঁহার পুত্র বা পৌত্র অর্থাৎ দত্তক পুত্র বা তত্তৎ-সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিকে দান করিতে অনুজ্ঞা করেন। জাফর রামকৃষ্ণের প্রতি অসং ব্যবহার করিলেও এক্ষণে সাজাদা আজিম ওসানের আজ্ঞা উপেক্ষা করিতে সাহসী না হইয়া লিখিলেন যে রামকৃষ্ণের পুত্রাদি বা উত্তরাধিকারী কেহই বিদ্যমান নাই, তাহাতে সাজাদা নদীয়া রাজ্য, রামকৃষ্ণের স্ত্রী ও আশ্রয়গণের সুখ স্বচ্ছন্দে প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম এক্ষণে কোন বিদ্যস্ত রাজকর্ম্মচারীকে দান করিতে বলেন। এতদন্তরে জাফর খাঁ পুনরায় লিখিলেন যে রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন যিনি বহুদিন যাবৎ ঢাকায় বন্দী অবস্থায় আছেন—অনুমতি হইলে তাঁহাকে নদীয়া রাজ্য প্রদান করা যায়। সাজাদা আজিম ওসান জাফরের এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হন। এইরূপে রামজীবন তাঁহার মুক্তির নিমিত্ত জাফর খাঁকে বহু অর্থ অঙ্গীকার করিয়া নদীয়ার সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু যথাসময়ে তাঁহার মুক্তির মূল্য পরিশোধ করিতে না পারায় পুনরায় জাফর খাঁ কর্তৃক নবরাজধানী মুরসিদাবাদে কারাবদ্ধ হন।

* শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রকাশিত প্রতিগণি (সাহিত্যপরিষদ-পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩০৬)।

এই সময়ে আলি মহম্মদ ও কালু জমিদার নামক দুইজন মুসলমান সেনানীর সহায়তায় রাজসাহীর জমিদার উদয়নারায়ণ, বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গেশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করেন এবং বীরকাটি *, নারায়ণগড়, দেবীনগর প্রভৃতি স্থানে দুর্গাদি নির্মাণ করিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। মুরসিদকুলী খাঁ তাঁহার দমনের নিমিত্ত লহরীমল্ল প্রমুখ সেনাপতিগণকে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণনগরাধিপতি রামজীবনের পুত্র অসীম বলশাণী যুবরাজ রঘুরাম স্বইচ্ছায় লহরী মলের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন এবং তথায় স্বীয় বাহুবল ও বুদ্ধিবল প্রকাশ করিয়া যশস্বী হন। কথিত আছে তাঁহারই অমোঘ সন্ধানে আলি মহম্মদ নিহত হইলে পরিণাম চিন্তা করিয়া বিদ্রোহী রাজা উদয়নারায়ণ সপরিবারে দেবীনগরের নিকটবর্তী হুদে প্রাণ বিসর্জন করেন। এইরূপে বিদ্রোহ দমিত হইলে নবাব মুরসিদকুলী বিস্তীর্ণ রাজসাহী জমিদারী তাঁহার প্রিয়পাত্র রঘুনন্দনকে প্রদান করেন। রঘুনন্দন তদানীন্তন বঙ্গের সদর কাননগু দর্পনারায়ণের কর্মচারী ছিলেন †। এই রঘুনন্দনই নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মুরসিদ নদীয়া রাজকুমার রঘুরামের কৃতকার্যের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার পিতা রামজীবনের দারামোচন করেন। পরে পিতার মৃত্যু হইলে রঘুরাম ত্রয়োদশ বর্ষ রাজত্ব করিয়া ১৬৫০ শকে বা ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথী-তীরে প্রাণত্যাগ করেন এবং

* লুপ লাটনে মুরারট রেল ষ্টেশনের পশ্চিমে মহেশপুরের পূর্ব-দক্ষিণে বীরকাটি গ্রাম। ক্ষিতীশ বংশাবলীতে টেহাই বীরকাটি নামে অভিহিত। দেবীনগর অদ্যাপি বর্তমান—এই সকল স্থানে ভগ্নদুর্গের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়।

† কথিত আছে নবাব মুরসিদকুলী (তৎকালীন দেওয়ান জাফর খাঁ) এক সময়ে বাদশাহী দরবারে পেশ করিবার নিমিত্ত নিকাশী কাগজে প্রথমত সদর কাননগু দর্পনারায়ণের মোহর ছাপ করা হইতে চাহিলে দর্পনারায়ণ তাঁহার প্রাপ্য রসুম বাবদ তিন লক্ষ মুদ্রা দাবী করেন এবং উক্ত মুদ্রা না পাইলে কোন মতেই মোহর ছাপ করিবেন না প্রকাশ করেন; কিন্তু দেওয়ানের তখন অত মুদ্রা সংগ্রহ না হওয়ার দর্পনারায়ণের কর্মচারী উদয়নারায়ণকে প্রলোভনে বশীভূত করিয়া তাঁহার দ্বারা নিকাশী কাগজে কাননগুর মোহর ছাপ করিয়া লন। এই উপকারের প্রতাপকার স্বরূপ ভবিষ্যতে মুরসিদকুলী উদয়নারায়ণকে রাজসাহী জমিদারী প্রদান করেন।

তৎপুত্র ইতিহাস গ্রন্থিক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ার সিংহাসনে অধিরোধন করেন। এই রাজার অধিকারকালে নদীয়া সর্ববিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছিল। এই সময়ে নদীয়া রাজ্যের বিস্তৃতি উত্তরে মুরসিদাবাদ হইতে দক্ষিণে সুদূর বঙ্গোপসাগর এবং পূর্বে ধুলিয়াপুর হইতে পশ্চিমে ভাগীরথী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় *। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পরিচালনা করিতে ন্যূনতম দ্বাদশ দিবস অতিবাহিত হইত এবং ইহার আয় পঞ্চবিংশতি লক্ষ মুদ্রারও উপর ছিল †। সমগ্র অধিকার মোট ৮৪ পরগণার বিভক্ত ছিল; এই সকল পরগণা বিভিন্ন জমিদারগণের অধিকারভুক্ত ছিল এবং দেশের সর্ববিধ বিচার কার্য্যই এই সকল জমিদারগণ কর্তৃক সমাহিত হইত। মহারাজা স্বয়ং হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলমান কাজীর সাহায্যে জ্ঞানানুমানিত বিচার সাধন করিতেন। মহারাজের অধীনে বদৌলদীন নামক জনৈক কাজী ছিলেন। কথিত আছে এই কাজীর মাতৃবিয়োগ হইলে মাতার প্রেতকার্য্য সমাধানার্থ তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট কিয়দ্বিসের নিমিত্ত অবকাশ প্রার্থনা করিলে মহারাজ তাঁহাকে বিদায় দিয়া তাঁহার মাতৃকার্য্যে গোহত্যা করিতে নিষেধ করেন, এবং তাহার স্থলে ছাগ ও মহিষ বধে অনুজ্ঞা দেন। কাজী স্বীকৃত হইয়া বাটী প্রত্যাগমন করত মহিষবেষণে বহু লোক নিযুক্ত করেন, কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে মহিষ আসিয়া না পৌঁছানর তাঁহার আত্মার স্বপ্ননের প্ররোচনায় গোহত্যা করিতে বাধ্য হন। মহারাজ, স্বীয় অধিকার মধ্যে আপনায় ভৃত্য কর্তৃক এক্ষণে গোহত্যা কাহিনী শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ কাজীর মুখদর্শন

* রাজ্যের উত্তর সীমা মুরসিদাবাদ।

পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগিরথী খাদ ॥

দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।

পূর্বসীমা ধুল্যাপুর বড় গঙ্গাপার ॥ অন্নদামঙ্গল।

† Holwell, in his work, quoted under Jafar Khan I p. 202, says that he (Krisna Chandra) possessed a tract of country of about twelve days' journey and that he was taxed at 9 lacs per annum, though his revenue exceeded twenty-five lacs of rupees.—Kshitish Bangsabali Charitam—Translation by W. Pertsch p. 60. (Index).

করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন ও তাহার আবাস লুণ্ঠনে আদেশ দেন । রাজসভার রাজার জমাদার জাকর খাঁ—কাজীর বন্ধু ছিলেন । তিনি রাজার আদেশ শ্রবণমাত্র গোপনে কাজীকে সপরিবারে গ্রাম ত্যাগে পরামর্শ পাঠাইয়া সতর্ক করিয়া দেওয়ার, রাজভৃত্যগণ যখন কাজীর আবাস লুণ্ঠন করিতে আসিল, তখন সমস্ত গ্রাম অসুস্কানেও কাজীর সন্ধান না পাইয়া তাহার শূন্য আবাস দখল করিয়া তাহার রাজসম্মিধানে প্রত্যাবর্তন করিল । কাজী ইতিমধ্যে বসিরহাটে কুটুম্বগৃহে অজ্ঞাতবাস করিতে থাকেন এবং গোপনে জমাদার জাকর খাঁকে • রাজসম্মিধানে উপযুক্ত অবসরে তাহার গঞ্জে ওকালতি করিয়া রাজার ক্রোধোপনোদনে চেষ্টা করিতে অমুরোধ করেন । মহারাজা সর্বদা স্ত্রীর বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন । প্রধান কাজী বিহনে মুসলমানদের বিচারে সর্বদাই মহারাজের সন্দেশ হইতে লাগিল । এক দিন এবস্থিৎ সন্দেশাকুলিত চিত্তে যখন উপবিষ্ট ছিলেন তখন তাহার প্রিয় জমাদার সুযোগ বুঝিয়া কাজীর জন্ত ক্ষমা ভিক্ষা করেন । তাহাতে মহারাজ সে যাত্রা কাজীকে ক্ষমা করেন বটে কিন্তু তাহার মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া পূর্বে প্রতিজ্ঞা করায় কাজীর উপযুক্ত পুত্রকে ঐ কার্যে মনো-নীত করিয়া তাহাদের সন্ধান করিতে আজ্ঞা করেন । জমাদার পূর্ব হইতেই তাহাদের সন্ধান অবগত ছিলেন এক্ষণে সুযোগ পাইয়া অবিলম্বে তাহাদের এই শুভবার্তা জ্ঞাপন করিলেন ও তাহাদের দেশে ফিরিয়া আসিতে আদেশ পাঠাইলেন ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বঙ্গের রাজনৈতিক গগন ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হয় । ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুরসিদকুলী খাঁর মৃত্যু হইলে তাহার আমাতা সুজাউদ্দীন বাজালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারী প্রাপ্ত হন । ইহার সময়ে চারি জন বাক্তি রাজ্যমধ্যে প্রধানরূপে গণ্য হন ও তাহাদের পরামর্শানুসারে সমস্ত রাজকার্য্য নির্বাহ হইতে থাকে । প্রথম আলম চাঁদ—ইনি হিন্দু এবং

• এই জাকর খাঁ সম্বন্ধে নানারূপ অদ্বিতীয় কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে । তিনি নাকি একজন যথার্থ সাধক ছিলেন এবং কোনও সময়ে শিবনিবাসে থাকিয়াই যোগবলে শ্রীধাম পুরীর সান্নিধ্যের আশি নিব্বাণিত করিয়াছিলেন । শিবনিবাসে অদ্যাপি ইহার সমাধি বিদ্যমান আছে ।

নায়েব দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়া পরে "রাইরাইয়া" অর্থাৎ রাজাদের মধ্যে রাজা—এই পদবী ভূষিত হন। দ্বিতীয় ফতেচাঁদ—যিনি বাদশাহ কর্তৃক জগৎশেঠ উপাধি-মণ্ডিত হন *। তৃতীয় হাজি-আহম্মদ—সুজার প্রধান মন্ত্রী ও চতুর্থ হাজি আহম্মদের সহোদর ভ্রাতা আলিবর্দী যিনি আজিম-বাদের শাসনকর্ত্ত্বে নিযুক্ত ছিলেন। সুজা এই সকল উপযুক্ত সহকারী সাহায্যে সূচাক্রমে রাজ্যশাসন করিয়া ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে (১৩ই জেলহজ্জ ১১৫১ হিঃ) পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র সরফরাজ বঙ্গ মসনদে উপবিষ্ট হন। সরফরাজ বাল্যকাল হইতে উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন, এক্ষণে স্বয়ং সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ঘোর ইজ্জিরাগস্ত হইয়া উঠেন এবং পিতৃবন্ধু রাইরাইয়ান আলমচাঁদ, মন্ত্রী হাজি আহম্মদ ও জগৎশেঠ, ফতেচাঁদকে সর্বদা ভাঙ্ছিল্য করিতে থাকেন, এমন কি সময়ে সময়ে তাঁহাদের অপমানিত করিতে চেষ্টা পাইতেন। রাজ্যস্থ ক্ষমতাবান ব্যক্তি চতুঃয়ের সহিত সংঘর্ষ তাঁহার সন্ধানশের কারণ হইয়া উঠে এবং জগৎশেঠের প্রতি নিদারুণ পাশব ব্যবহার তাঁহার উচ্ছেদের কাল অগ্রবর্তী করিয়া দেয়। কথিত আছে সরফরাজ এই সময় এতই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন যে জগৎশেঠের ভ্রাতৃ একজন ক্ষমতাবান ধর্মীর অস্তঃপুরে দৃষ্টিপাত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই†। বুদ্ধ জগৎশেঠ তাঁহার পৌত্র মহাতাপ রায়ের সহিত একটা কিঞ্চিৎদূর একাদশ বর্ষীয়া অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার রূপলাবণ্যের প্রশংসা প্রবাদের ভ্রাতৃ তৎকালে প্রচারিত হয়। নরপশু সরফরাজ এই লাবণ্যময়ী, সকল সৌন্দর্য্যের ললাম-ভূতা কস্তুর রূপের কথা লোক-মুখে শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে একবার দর্শনের নিমিত্ত কামাকুল ছন্দে বুদ্ধ জগৎশেঠের শরণাপন্ন হন। এই নিদারুণ

* Riyaz-us-salatin—p. 274.

† He (Fattaiah Chand) had about this time married his youngest grandson named Set-Mortab Roy to a young creature of exquisite beauty, aged about 11 years. The fame of her beauty coming to the ears of the Soubah, he burned with curiosity and lust for the possession of her and sending for Jagut Set demanded a sight of her.—Holwell's Interesting Historical Events. Part I. Ch. II. p. 70.

বাক্যে বুদ্ধের মস্তকে আকাশ তাজিরা পড়ে এবং তাঁহার বংশমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায় উদ্ভাবন করিবার পূর্বেই পাপিষ্ঠ সরফরাজ জগৎ শেঠের বাটী অবরোধ পূর্বক সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই কন্ডাকে প্রাসাদে আনয়ন করেন এবং দর্শন-পিপাসা মিটাইয়া তাঁহাকে পুনঃ প্রেরণ করেন * ।

কেহ কেহ অনুমান করেন জগৎ শেঠের সহিত অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়াই সরফরাজের মনোস্থির হয় । যে কারণেই হউক রাজ্যপ্রাপ্তির ৫ বৎসরের মধ্যে সরফরাজ, আহম্মদ, জগৎ শেঠ প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্মচারীবৃন্দের কোপনয়নে পতিত হন । হাজি আহম্মদ রাজমহলের ফৌজদার পরে পাটনার নবাব স্বীয় ভ্রাতা আলিবর্দীকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজের প্রতি সরফরাজের তাজিল্য ভাবের প্রতিশোধ গ্রহণে সুযোগ অবেষণ করিতেছিলেন । এক্ষণে জগৎ শেঠের সাহায্য পাইয়া কোশলে দিল্লী হইতে আলিবর্দীর নামে বাঙ্গালার সুবেদারের সনন্দ বাহির করিয়া লন, এবং গোপনে আলিবর্দীকে সসৈন্তে মুরসিদাবাদ আক্রমণে উপদেশ প্রেরণ করেন । পথে গিরিয়া নামক স্থানে নবাব সৈন্তের সহিত আলিবর্দীর বল পরীক্ষা হয় এবং এই যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলে আলিবর্দী আপনাকে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার বলিয়া ঘোষণা করেন । রাজধানী অধিকৃত হইলেও সমগ্র দেশ তাঁহাকে প্রথমে সুবেদার বলিয়া স্বীকার করে নাই । এ কারণে তাঁহাকে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল । এই সকল যুদ্ধের পর দেশে শান্তি স্থাপিত হইতে না হইতেই নাগপুর হইতে মারহাট্টারা আসিয়া বার বার পশ্চিমবঙ্গ লুটপাট করিতে থাকে । এই ঘটনার নাম বগৌর হাঙ্গামা * । এই হাঙ্গামা দেশে দশ বৎসর ছিল । এই সময়ে বর্দ্ধমানের

* The young woman was sent to the Palace in the evening, and after staying there a short space, returned unviolated indeed, but dishonoured to her husband.—Orme Vol. II p. 30.

সম্ভবতঃ এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া বঙ্গ কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার “পলাশীর যুদ্ধ” সিরাজদৌল কর্তৃক জগৎ শেঠের নির্দল কুলে কালি দিয়াছেন । হতভাগ্য সিরাজ ! মুসলমান শাসনকর্তৃগণের যাবতীয় সত্য ও মিথ্যা দোষ ভাগ্যক্রমে তোমার স্বন্ধে আরোপিত—জানি না তোমার প্রেতাত্মা কিরূপে এই দুর্দৈব ভার বহন করিতেছে ।



মুর্শাদ কুলিখা



নবাব আলিবর্দী



নবাব মীরজাফর ও মীরণ



নবাব সিরাজদৌলা

নদীয়া কাহিনী ।

রাজা সপরিবারে পলায়ন করিয়া তদানীন্তন নদীয়াস্বর্গত মূলাজোড়ের সন্নিহিত কাউগাছি গ্রাম গড়খাই করিয়া তন্মধ্যে প্রাসাদাদি নির্মাণপূর্বক বাস করিতে থাকেন । কিন্তু নদীয়াও এ সময়ে ভাস্কর পণ্ডিতের অধীন মহারাষ্ট্রীগণের অত্যাচার * হইতে অব্যাহতি পায় নাই । নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদের দৌরাত্ম্য হইতে নির্ভয় হইবার মানসে শিব-নিবাসকে কঙ্কণাকারে নদী বেষ্টিত করিয়া সুদৃঢ় দুর্গ ও বাসস্থানাদি নির্মাণ করেন, এবং সন্নিহিত কৃষ্ণপুরে অসংখ্য লাঠি সড়কী ক্রীড়া পারদর্শী গোপ-গণের বাসস্থান নির্দেশ করেন † । বর্গীর বিভ্রাটে নদীয়ার ভাগীরথীকুল যেমন ধ্বংস হইয়াছিল তেমনি নবাবের রাজত্ব আনন্দের অথবা অভ্যাচারে সমগ্র নদীয়ার প্রজাকুল উদ্বাস্ত হইতে বসিয়াছিল । বর্গীর বিভ্রাটে পশ্চিম বঙ্গের জমিদারকুল, বর্গীর আক্রমণে অত্যধিক পীড়িত হওয়ায় পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের জমিদারগণের নিকট হইতে অসম্ভব রাজস্ব আদায় হইতেছিল এবং নদীয়া, রাজসাহী, দিনাজপুর প্রভৃতির রাজাগণের নিকট যুদ্ধের ও রাজ্য-রক্ষার ব্যয় নির্বাহার্থ অর্থ সংস্থানের নিমিত্ত সর্বিশেষ উৎপীড়ন চলিতেছিল । নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র পৈত্রিক অগ্নি নশ লক্ষ ও ছই লক্ষ মুদ্রা নিজ নজরানা না দিতে পারায় তৎকাল প্রচলিত নিয়মে ক্রিয়াকালের নিমিত্ত কারারুদ্ধ থাকিতে বাধ্য হন ‡ । এখান হইতে তিনি সে সময়ে রাজকাৰ্য্য নির্বাহ

* আজিও অশান্ত শিশুকে ঘুম পাড়াইতে হইলে, বঙ্গজননী

“ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এল দেশে ।

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে ॥”

বলিয়া তাহার চঞ্চল মনে ভীতির স্ফোর করিয়া ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করেন ।

† শিবনিবাস এক্ষণে লুপ্ত-শ্রী । কৃষ্ণপুরের গোয়ালাদের বংশাবলী অনুযায়ী আছে ও লাঠী ধরিতে আজিও মজবুত ।

‡ শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেবে । (১৬৬৪ শকে)

বর্গীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে ॥

আলিবর্দী কৃষ্ণচন্দ্রে ধরে লয়ে বাবে ।

নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে ॥

বদ্ধ করি রাখিবেক সুবসিদাবাদে ।

মোর স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে ॥ অন্নদামঙ্গল ।

করিতেন কিন্তু শীঘ্রই বীর দক্ষ দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের কর্তৃক পলাতন নন্দ্রানার টাকা পরিশোধ করিয়া মুক্ত হন। মারহাট্টা বিভ্রাট শেষ হইলে পুনরায় রাজস্ব বাকী দায়ে কারাবদ্ধ হন। এবার নবাব আলিবর্দী স্বচক্ষে তাঁহার অসিদ্ধারীর দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দেন। কথিত আছে চতুরচূড়ামণি কৃষ্ণচন্দ্র কোশলে জলবিহারী নবাবকে নদীয়ার জলময় ভূভাগ সকল বিশেষতঃ নবাবীপের বংশাচ্ছাদিত জলাভূমির ও কলিকাতা সমিহিত বাণীর জলময় স্থান সকলের দুরবস্থা দেখাইয়া সে-যাত্রা অব্যাহতি লাভ করেন। পূর্বোক্ত দেওয়ান রঘুনন্দন সম্বন্ধেও বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে কোন সময়ে নদীয়ারাধের দেওয়ান মুরসিদাবাদ দরবার গৃহে প্রবেশকালে সভাপ্রবেশের পথ অতি সঙ্কীর্ণ বিহার তাঁহার পরিচ্ছদের প্রান্তদেশে বর্দ্ধমানাধিপতির দেওয়ান মাণিকচাঁদের অনঙ্গস্পর্শ করার ক্রুদ্ধ হইয়া মানিকচাঁদ, রঘুনন্দনকে হিন্দী ভাষায় “দেখতে নেহি পাজী” বলার তৎক্ষণাৎ রঘুনন্দন “হাঁ, নওকর সব্‌হি পাজী হৈ—কোই ছোটী কোই বড়া”—এই সমুচিত উত্তর প্রদান করেন। সেই অবধি মাণিকচাঁদ রঘুনন্দনের ভয়ঙ্কর শত্রু হইয়া দাঁড়ান এবং পরে বুদ্ধিবলে বর্দ্ধমান রাজ-সংসার হইতে মুরসিদাবাদের নবাবের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইয়া রঘুনন্দনের সর্বনাশ করিবার পছা খুঁজিতে থাকেন। এই সময়ে হুগলী হইতে কয়েক লক্ষ সূতা রাজস্ব হিসাবে মুরসিদাবাদ সরকারে প্রেরিত হয়, কিন্তু পথে নদীয়ার্দ্ধগত পলাশীতে দস্যুগণ কর্তৃক উহা অশ্রুত হইলে বহু অমূল্যকালেও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কর্তৃত্বাঙ্গীর্ণ উহার উদ্ধার সাধন করিতে না পারায় রঘুনন্দনের দোষেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া মাণিকচন্দ্রের বড়বস্ত্রে রঘুনন্দনকে প্রথমে গর্জিত গুঠে পরিভ্রমণ করাইয়া পরে তোপসুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাসী দেওয়ানের এই বীভৎস পরিণামে সন্তোষিত হইয়া রঘুনন্দনের বংশাবলীকে পলাশী পরগণার চৌক শত বিঘা মহোদ্রাঘ অগ্নি প্রদান করেন। অদ্যাপি তাঁহারি উহা ভোগ করিতেছেন।

বর্গীদিগের দ্বারা ক্রমাগত দশ বৎসর কাল বাবৎ দেশ এইরূপ পুনঃ পুনঃ লুপ্ত হইতে থাকে, এবং অমিততেজা বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দী বার বার তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলেও আরণ্যঃ প্রতিবৎসর বর্ষাপমে লুপ্যোগ

পাইলে তাহার দর্শন দিতে থাক। ইদানীং তাহার আর সমবেত হইয়া সমুখ বুদ্ধ করিত না; সুতরাং তাহাদিগকে আন্ত দমন করার কোন আশা না দেখিয়া রাজনীতিজ বুদ্ধ নবাব ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপনা করেন। এই সন্ধির ফলে বর্গীয়া উড়িষ্যার সম্পূর্ণ স্বত্ব ও বাঙ্গলার চৌধ অর্থাৎ বার্ষিক রাজস্বের এক চতুর্থাংশ বাবদ দাদশ লক্ষ মুদ্রা লাভ করিয়া সমুদ্রতটে চিরদিনের জন্য বাঙ্গলা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই দীর্ঘ কালব্যাপী বর্গীর হাদ্যমার ফলে দেশে দুর্দশা দেখা দিয়াছিল—পতাদির অবস্থা শোচনীয় ঝাঁড়াইয়াছিল এবং বস্ত্র বরাদদি হস্ত শিল্পেরও সবিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল; তত্ত্বাবরণ যুদ্ধের অবকাশ কালে যে কিছু বস্ত্রাদি বরন করিত তাহাও আশঙ্কা ও ব্যগ্রতা প্রযুক্ত ভুত উৎকট হইত না *। এইরূপে এই সময় হইতেই শান্তিপুর প্রভৃতির বস্ত্রাদি বরন ব্যবসারে দ্রব্যবহার সূত্রপাত হয়।

ক্রমাগত গুরুতর পরিশ্রমে বুদ্ধ নবাবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি তখন তাঁহার আদরের ছুলাল, মেহের পুতুল দৌলত সিরাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দূরদর্শী বুদ্ধ নবাব ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে যত্নসূত্রে পতিত হইলে নবাব সিরাজ-উ-দ-দৌলা, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মনসদে উপবিষ্ট হইলেন। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, নবীন নবাব নানাকারণে তৎকালীন রাজ্যস্থ বহু প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের সহিত ও তাঁহার কতিপয় প্রধান প্রধান কর্মচারীর সহিত সন্তাব রাখিতে সক্ষম হইলেন নাই; সুতরাং তাঁহাদের সকলেরই তাঁহার প্রতি বিরাগ জন্মিয়াছিল, এবং কিসে তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ হয় সকলেই তাহার পক্ষা অভ্যুসন্ধান করিতেছিলেন। ইহাদের দুই চারিজন একত্র হইলেই এ বিষয়ের গোপন পরামর্শ চলিতেছিল; এক্ষণে দৈবক্রমে তাঁহাদের মনোভিলাষ সিদ্ধ হওয়ার এক সুযোগ উপস্থিত হইল। ঢাকার শাসনকর্তা রাজা রাজবল্লভের পরিবারবর্গকে আশ্রয় দেওয়া উপলক্ষে ও অস্ত্রান্ত নানাকারণে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত নবীন নবাবের বিবাদ বাধিয়া উঠিল। † এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীগণ ইংরাজগণের সহায়তায় নবাবকে পদচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে

* Holwells—Interesting Historical Events p. 151.

† Vide Life of Lord Clive (1836) vol. I, p. 147, and Orme's History of the Military Transactions of the British Nation, vol. II, p. 49.

সিংহাসন দেওয়াইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে জগৎশেঠের মুরশিদাবাদ ভবনে এই গোপন সভার অধিবেশন হয়। প্রবাদ এই সময়ে নদীয়াধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পরিজন ও ভৃত্যবর্গ হইরা শিবনিবাসে বাস করিতেছিলেন। নবাব সিরাজের পক্ষে বড়বত্রকারী মীরজাকর, জগৎশেঠ, রাজা মহেন্দ্র (হুলত রায়) রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণদাস প্রমুখ ব্যক্তিগণ বহু তর্ক বিতর্ক করিয়াও কোন দ্বির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া নদীয়াধিপতিকে তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়া সংপরামর্শ দিবার জন্য এক পত্রিকা প্রেরণ করিয়া মুরশিদাবাদে আহ্বান করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পত্রিকার্ক অবগত হইয়া এককালে হর্ষ ও বিবাদপ্রাপ্ত হইলেন। এই পত্রে নবাবকে পদচ্যুত করিবার কথা লেখা ছিল। রাজা সেইদিন নিশীথসময়ে এক নিভৃত স্থানে স্বীয় মন্ত্রী কালীপ্রসাদ সিংহ ও অজ্ঞাত বিখ্যাত অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিয়া পত্রপাঠ পূর্বক তাঁহাদের পরামর্শ চাহিলেন। পত্রার্থ এইরূপ ;—

“নবাবের অত্যাচারে মুরশিদাবাদের লোক সকল ব্র ব ব্রবার ভ্যাগ করিয়া পলাইতে উদ্ভত। নবাব কাহারও কোন কথা শুনে ন। এ বিবরে কি কর্তব্য আমরা বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছি ; আপনি শীঘ্র আসিবেন।” সূচত্বর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের আহ্বানে প্রথমে স্বয়ং না বাইয়া নিজ বিখ্যাত দেওয়ান কালীপ্রসাদকে তাঁহাদের উদ্দেশ্য অবগত হইবার জন্য মুরশিদাবাদে প্রেরণ করেন। পরে, তাঁহার বাচনিক সমস্ত জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং মুরশিদাবাদ বাজা করেন। পুনর্বার জগৎশেঠের বাটীতে মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হয়। এই সভার কেহ কেহ মূলমানের পরিবর্তে হিন্দু শাসকের প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাহাতে দূরদর্শী বিচক্ষণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উত্তর করেন, “আমার মতে সেনাপতিকে সহায় করিয়া নববল্লভ ইংরাজগণের সহিত যোগ দিয়া বর্তমান নবাবকে পদচ্যুত করা সহজসাধ্য হইবে। বিশেষতঃ ইংরাজগণের সহিত আমার বিশেষ সদ্ভাব আছে, সুতরাং এ বিবরে আমি বিশেষ চেষ্টা করিতে পারিব।” পরিশেষে কথঞ্চিৎ বাকবিত্ত্যের পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মতই সর্বদম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কোন কারণেই প্রকাশ না থাকিলেও ইল বাজার জনসাধারণের বিশ্বাস যে স্বয়ং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কালীঘাটে যাদের পূজা দিবার ছলে কলিকাতার গরমপূর্বক ইংরাজদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এ

বিষয়ের কর্তব্য নির্ধারণ করেন। এইরূপে নবাবের নৃপংস হস্ত হইতে অগহাঙ্গ প্রজাবর্ণের নিষ্কৃতি লাভ ও বাঙ্গালার ইংরাজাধিকার বিস্তার এই উত্তর ঘটনাই নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পরিণামদর্শীতার ফল বলিতে হইবে।

এইরূপে উত্তোগ পূর্ব শেষ হইলে ইংরাজগণ সেনাপতি মীরজাকরের আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া প্রায় ৩৯৬২ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পলাশীস্থ সিরাজের বিপুল বাহিনীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ২২শে জুন অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় সমগ্র বৃষ্টিবাহিনী পলাশী অভিমুখে অগ্রসর হইল, এবং গভীর নিশীথে ভাগীরথী তীরস্থ বিশাল আশ্রুক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া সে রাজ্যে অতিবাহিত করিল। * এই আশ্রুকানন তখন “লকাবাগ” নামে অভিহিত হইত, কথিত আছে এই বাগানে লক্ষ্য আশ্রুক থাকতেই উহার ঐক্লম নামকরণ হইয়াছিল—কেহ কেহ বলেন ঐ স্থানে বহু শত পলাশ বৃক্ষ থাকার ঐ স্থানের নাম পলাশী হইয়াছিল। নবাব চালিত নবাব সৈন্যগণ মুর্শিদাবাদ হইতে মানকরা ভূপরে দাদপুর পরিপথে পলাশী ক্ষেত্রে ইংরাজেরা আসিবার দ্বাদশ ঘণ্টা আগে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। নবাব পক্ষে ৩৫ হাজার পদাতিক পঞ্চদশ সহস্র অশ্বরোহী ও ৪০টি কামান ছিল। কিন্তু হইলে কি হয় এই, বিপুলবাহিনীর অধিকাংশই বড়বলকারী মীরজাকর ইয়ারলুৎক ও হুর্দাভরামের অধীনে চালিত হইতেছিল। ২৩শে জুন বৃহস্পতি বার প্রাতঃকালে এই অগণিত নবাব বাহিনী ইংরাজের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। বিপর্যয় চক্রবাহ বিশাল কার বিচিত্র গতি রণহতী, রণকুল স্তম্ভিত বিপুল অশ্বসেনা, ভীষকায় স্তম্ভ পদাতিক ও তাহাদের হস্তস্থিত বালার্ক কিরণ প্রতিভাত করাল করবাল, কঠিন গিরিশৈলী হুর্দার কামান ও প্রতিভাত সমীরে উড্ডীয়মান অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত ববনের অরণ্যতাকা ও রথধ্বজ সমূহ সূর্য্যের ইংরাজ দলের হৃদকম্প উপস্থিত করিল। অনিত্যভেদ্য অসমসাহসী দলপতি মনেও জ্বালেন সকার হইল। মনে হইল যদি মীরজাকর প্রমুখ নবাবের সেনাপতিবর্গ হুর্দাগ্যক্রমে প্রকৃতই বুড়ে অগ্রসর হয়—যদি তাহাদের আশ্রয়তাক্য ববনের

* পলাশী বুদ্ধ সম্বন্ধে বিতীর্ণ তথ্য জারিতে হইলে Bolt's consideration on Indian-affairs. Malleeson's Decisive Battles of India. Orme. Firminger অক্ষর বাবুর “সিরাজদৌলা” মিথিলবাবুর “মুর্শিদাবাদ-কাহিনী” কালীপ্রসন্ন বাবুর “বাঙ্গালার ইতিহাস” প্রভৃতি গ্রন্থ।

চক্রান্তমাত্রই হয়, তবেও একটা প্রাণীও সংবাদ দিতে কিরিতবে না। তাহাদের আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ইংরাজ এতদূর অগ্রসর হইরাছে ; এখন হয় বুদ্ধ নয় কাপুরুষের জ্ঞান পলায়ন ব্যতীত উপারান্তর না দেখিয়া ক্লাইব সৈন্তসমাবেশে মন দিলেন এবং আক্রমণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এই সময় ফরাসীগণই প্রথম কামান লাগিল। অতঃপর নবাবসৈন্তের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বর্ষাধার বারি বরিষণের ন্যায় অজস্র গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল, কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী সেদিন ইংরাজের প্রতি অল্পকূল, সুতরাং অধিকাংশ গোলাই হয় উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ইংরাজের পশ্চাতে পড়িতে লাগিল বা আত্মবৃক্ষে লাগিয়া বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। ক্রটিং ২১৪ জন মৃত্যুস্থখে পতিত হইতেছিল ; কিন্তু এই বহু মৃত্যু সংখ্যাই ইংরাজের সংখ্যা হিসাবে অতি ভয়ের কারণ হইরা দাঁড়াইল। এই সময়ে নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীর মদনের পদব্বর গোলা লাগিয়া উড়িয়া বাওরায় তাঁহাকে নবাব শিবিরে আনয়ন করা হইল ; তথায় প্রভুর সাক্ষাতে অন্যান্য সেনাপতির দুরভিসন্ধির কথা বলিতে না বলিতে তিনি স্বর্ণগত হইলেন। এতদিনে নবাবও তাঁহার সেনাপতিগণের দুরভিসন্ধি বেশ বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে উপারান্তর না দেখিয়া তাহাদের হস্তেই আত্মসমর্পণ করিলেন এবং মীরজাফরকে বীর পঠীবাসে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীরজাফর এতক্ষণ স্থিরভাবে সৈন্যে যুদ্ধকৌড়া পরিদর্শন করিতেছিলেন ; এক্ষণে মীরমদনের মৃত্যুর পর বাঙ্গালী বীর যোহনলালকে অমিত বিক্রমে শত্রুসৈন্যের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ইংরাজের প্রমাদ গণনা অস্থির হইয়া উঠিলেন। নবাবের আহ্বানে বীর প্রাণের আশঙ্কায় মীরজাফর, পুত্র মীরণ ও হোসেন খাঁ প্রভৃতি বিশ্বস্ত অমুচরবর্গ সমভিব্যাহারে সমস্ত নবাব শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কথিত আছে সিরাজ তখন আপনায় ও প্রিয় জনের প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া স্বর্ণগত নবাব আলীবর্দীর পুণ্য নাম স্মরণ করতঃ মীরজাফরের সম্মুখে রাজমুকুট রাখিয়া বীর সম্মান ও জীবন রক্ষার নিমিত্ত কাতর প্রার্থনা করিলেন ; কিন্তু মৃতের মন তখন রাজ্যলাভের মত্ত—সে বহির কর্ণে সিরাজের কাতরোক্তি নিবেদন আরো প্রবেশ লাভ করিল না। বরং এতাবৎ যে সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল তাহা সুসাধনের উপায় দেখিয়া, মীর জাফর নবাবকে সে দিনের মত বুদ্ধ হগিত রাখিতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার এই কণ্ঠ বিজ্ঞতার

সরল প্রকৃতি কিংকর্তব্যবিমূঢ় নবাব প্রতারিত হইলেন এবং মোহনলালকে ও করাসী গোলন্দাজগণকে সে দিনের অল্প যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অনুমতি পাঠাইলেন। মোহনলাল প্রতিযুগ্মেই বিজয়ের আশা করিতেছিলেন সুতরাং সে সময়ে প্রত্যাগমনের সময় নহে বলিয়া নবাবের নিকট যুদ্ধ চালাইবার অনুমতি চাহিয়া পাঠান কিন্তু মীর জাকরের চক্রান্তে পুনরায় যুদ্ধ করিতে নিবেদাজা পাইয়া অগত্যা অনিচ্ছান্বয়ে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। সেনাপতির প্রত্যাগমনে সৈন্যগণ ভয়ানক হইল। ওদিকে চক্রান্তকারীগণের সৈন্যদের পলায়নপর দেখিয়া তাহারা আরও নিকংসাহ হইয়া রণে ভঙ্গ দিল।

নবাব সৈন্তগণকে এইরূপ পলায়নপর দেখিয়া তাহাদের পশ্চাৎদাবন করিবার মানসে ইংরাজদের মেজর কীলপ্যাট্রিক আত্মকুল হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছা

অষ্টাদশ শতাব্দীর পলাশীক্ষেত্রের একদে বহু পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। পলাশী যুদ্ধে ইংরাজসৈন্তের আশ্রয়কেন্দ্রে সেই আত্মকুল এবং এই কুঞ্জের উত্তর দিকে স্থাপিত নবাবের সেই শিকার মঞ্চ, যেখানে ভাগীরথী অত্যন্ত বক্রতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই বেগবতী প্রোতধ্বতী ভাগিরথী, সেই ভাগিরথী তীরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামাদি সকলেরই পরিবর্তন অথবা ধ্বংস সাধিত হইয়াছে। সেই বিশাল আত্ম কুঞ্জের সমস্ত বৃক্ষ ধ্বংস হইলেও একটা বহুদিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল এবং অল্পে গোলার চিহ্ন ধারণ করিয়া বহুদিন একাকী পলাশী যুদ্ধের শেষ স্বাক্ষররূপ দণ্ডারমান ছিল। ১৮৭২ অব্দে উহা শুষ্কাবস্থায় পরিণত হওয়ার তাহার মূলদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া পলাশী বিজয়ের স্মৃতিস্বরূপ ইংলেণ্ডে প্রেরিত হয়। পলাশী প্রবাহিত ভাগীরথীও ঐতিহাসিক চকলতা হেতু বহুল পরিমাণে পতি পরিবর্তন করিয়াছেন। এবং ১৮০১ সালে উহা পলাশী উদরস্থ করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়ার বহু আশাদির স্থান পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। বিধুপাড়া গ্রামখানী বাহা পূর্বে ভাগীরথীর পূর্বকূলে স্থাপিত ছিল তাহা একদে বাকের সম্মুখ সংকীর্ণ ভূমি ধ্বংস হওয়ার নদীর পশ্চিম তীরবর্তী হইয়াছে। একদে একটা বিতীর্ণ বীধ ভাগীরথীর স্রাবন নিবারণার্থ পূর্বদিক দিয়া বরাবর সুশিখাবাদ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পলাশীর যুদ্ধকালে যে দুইটা বৃহৎ বীক বিদ্যমান ছিল একদে তাহাদের বিশেষ পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। এবং প্রশস্ত বীকটি একেবারে অস্তিত্বান করিয়াছে। এবং অর্ধ চক্রাকার বীকটি খেউনকারী ভাগীরথীর দুই মুখ এক হইয়া বীকটি একদে একপ্রকার বিলে পরিণত হইয়াছে। কৃষ্ণনগর হইতে সুশিখাবাদ পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত রাজবর্জী বিদ্যমান আছে তাহা যুদ্ধকালীন আত্মকুঞ্জের অস্তি সন্নিহিত ছিল। একদে উক্ত স্থান হইতে অর্ধচক্রাংশ উত্তরে লোকনাথপুর গ্রামের পাদদেশ দিয়া পূর্বাভিমুখে গমন করিয়াছে। এই হাবিতীর্ণ কেন্দ্রের

করিয়া সেনাপতির আজ্ঞা চাহিয়া পাঠান। ক্লাইব এই সময়ে নবাবের সুগম্যকূলে ছিলেন। সংবাদ শুনিয়া সোৎসাহে সানন্দে তিনি বাহিরে আসিলেন। এদিকে নবাব-শিবির হইতে প্রত্যাগমন করিয়াই মীর জাকর ক্লাইবকে ভৎক্ষণাৎ নবাব-শিবির আক্রমণের পরামর্শ দিলেন, এবং অন্ততম বিশ্বাসঘাতক রাজা জুলতান সিরাজকে রাজধানী প্রত্যাগমনের পরামর্শ প্রদান করিলেন এইরূপে সেই দিন পলাশী ক্ষেত্রে মুসলমানের সৌভাগ্যরসি চিরতরে অন্তমিত হইল। এদিন নদীয়ার আর একটি শ্রবণীয় দিন।

বঙ্গালায় ইতিহাস পাঠকমাত্রেরই হতভাগ্য সিরাজের পরিণাম অবগত আছেন—পলায়নপর সিরাজ কিরূপে মীরজাকর পুত্র মীরন কর্তৃক ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের তরা জুলাই জাকরগঞ্জের প্রাসাদে নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিধিত নাই। এইরূপে এই নিদাক্ষণ বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকা পতিত হইলে, ক্লাইব মীরজাকরকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভিযান করিলেন।

এই সময়ের ইংরাজ কোম্পানীর দপ্তর অমুসন্ধান করিলে দেখা যায়—যে তনানীশ্বন নদীয়াবিশিষ্ট রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সমসাময়িক ইংরাজগণ কর্তৃক অতীব সম্মানিত হইতেন কিন্তু সেই সময়ে যথাকালে রাজ্য হিতে না পারায় কোম্পানীর কর্মচারীগণের নিকট বিশেষ অপমানিত ও লাঞ্চিত হইয়া ছিলেন। কোন কোন ইংরাজ কর্মচারী তাঁহার জাতি নানের ব্যবহা, ও তদীয় পুত্র শিবচন্দ্রকে জামিন স্বরূপ করেন রাখিবার এবং তাঁহার হস্ত

হানে হানে অনেক সমাধি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ইহাদের মধ্যে কদীমতলার ককীর কদীম সাহেবের সমাধির পন্ডাতে সিরাজের বিষত সেনাপতি মীরনকনের সমাধি উল্লেখযোগ্য। ইংরাজের এই অটোরণ শতাব্দীর সহ্য বিজয়ের স্মৃতি চিত্ররূপ পলাশীক্ষেত্রে এখনে বেঙ্গল গবর্নমেন্ট কর্তৃক ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল, পরে বড় লাট লর্ড কর্জনের শাসনকালে তিনি পলাশীক্ষেত্রে দেখিতে আসিয়া এই স্মৃতি স্তম্ভটিকে পলাশির অমুপ-স্থিত স্তম্ভ মনে করিয়া একটি বৃহৎকার প্রস্তর স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহারই সন্নিহিতে পলাশী দর্শনোদ্ভূত জনসাধারণের থাকিবার জন্য একটি ডাক বাড়লা স্থাপিত হইয়াছে। পলাশী এক্ষণে রাণাঘাট সুবিধাবাদ রেলওয়ের উপর একটি রেল ষ্টেশন।

হইতে নদীয়া শাসনের কথতা গ্রহণের প্রস্তাব করেন * । ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে আগস্ট তারিখের গবর্ণমেন্টের মন্তব্যে দেখা যায় যে তদানীন্তন নদীয়ার রাজস্ব ৯ লক্ষ দুই ধার্য ছিল । এই ৯ লক্ষ দুইয়ার মধ্যে ৩৪ ৩৭৮ টাকা কোম্পানীর রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ৮৩৫,২৫২ টাকা নদীয়া রাজকে মুসলমান সরকারে রাজস্ব দিতে হইত । নদীয়া পূর্বে হইতেই মীরজাফরের অধীকৃত তনুখার নিমিত্ত ইংরাজ কোম্পানী বাহাদুরের নিকট বন্ধক থাকায় শেখোক্তা খাজানাও ইংরাজ কোম্পানীকে দিতে হইত । সে সময়ে রাজ্যের আত্যাত্তরিক গোলযোগের জন্য কৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষে যথা সময়ে রাজস্ব সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে । সেকারণ তিনি ক্রমাগত নানা ওজর করিয়া মালগুজারি দিতে বিলম্ব করিতে থাকেন । স্তবরাং কোম্পানীর প্রোপ্য আদায় করিবার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ার কোম্পানীর রাজস্ব সংগ্রাহকগণ নদীয়া রাজ্য নদীয়াধিপতির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া শোভাবাজারের স্বনামখ্যাত রাজগণের পূর্বপুরুষ রাজা নবকিশন বাহাদুর প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির সহিত তিনবৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দগস্ত করেন, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা আদায় সম্ভাব্যজনক না হওয়ার এবং রিচার্ড বিচিসাহেবের রিপোর্ট অনুযায়ী † সমগ্র কোম্পানী বাহাদুর বাঙ্গালার এক অভিসম্বাদিত বংশের

* Mr. Luke Scrafton writes from Maradabad to Government complaining of the arrears of revenue due in Nadia—‘It is possible that by threatening the Raja with loss of his caste and such corporal punishments as are in practice among those people, something more may be extorted from him. However, I suppose Raydullub will either pay the balance out of the treasury or pay the 9 lacks for the ensuing year, therefore, it is requisite some methods must be taken to make the best of the ensuing year. As the chief cause of balance is Raja's extravagance, it, therefore, appears to me to send a trusty person into his country to collect his revenue for him, only to deprive the Raja of all power in his country allowing him only Rs. 10,000 per annum or whatever your honour &c. may think proper for his expenses and keep the son in Calcutta as security for the father's good behaviour; if this method is persued, it is probable the Hon'ble Company, may within two years receive the full of Toncaws on him.

Vide Long's Selections from Unpublished Records No. 337.

† Fort William 28th April 1770.

To The Honble John Cartier Esqr. President & Governor and The gentlemen of the select committee.

“In Mr. Verelst and my joint addresses which accompanied the statement at the commencement of this season we informed you that the Rajah of Nuddea had behaved so ill and owed so considerable a sum

মধ্যাহ্নে হানি না করিয়া পুনরায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত নদীয়ার মালগুজারি বন্দবস্ত করেন এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও বাকী রাজস্ব কিস্তীবন্দী অস্থায়ী বিনা ওদরে কোম্পানীর কুঠীতে চালান দিবেন অঙ্গীকারে এক চুক্তি পত্র লিখিয়া দিয়া সে বাত্মা অব্যাহতি লাভ করেন । *

account his Mulguzary that the ministers recommended his not being confided in and we thought it prudent to endeavour to let the country to farm for three years on terms that would have proved very advantageous term to Employers and reserved to the Rajah his rights and a stipulated annual salary of one lac of rupees. Nobkissen & several other principal Calcutta Merchants offering themselves to become farmers on terms which appeared advantageous to the company, just to the Rajah and equitable to the ryots—their terms were accepted and they sent people to begin the collections but it was soon found that the farmers required being invested with powers that would deprive the Rajah of his just right and that they acted oppressively in the distress and did not pay the revenues according to their agreement. The Rajah at the same time jealous of their authority and earnest to be again reinstated offered to comply with the terms agreed on by the farmers to pay his former balance and to give security for the due completion of his agreement. The ministers were very urgent for closing with the Rajah's people and I was induced to acquiesce in the measure from the following consideration. The farmers absolutely demanded to be invested with the Rajah's rights of Zamindary which could not be granted without deposing the oldest Zemindar in the country of his hereditary right in which neither equity nor our Honble Master's orders would have justified us. The farmers have behaved ill and seemed either aiming at getting power and wealth than benefiting and improving the country committed to their charge. An English gentleman being appointed to supervise the Nuddea Province and superintend the collections. I thought he would be such a check on the Rajah as to prevent his being able to demand the Sircars of its just revenues or to distress his own Ryots. The security offered by the Rajah being indubitable was another motive with me for assisting to the measure which I still hope will prove to have been rightly judged, the only difficulty which seems to present itself is as to the sum of Rs 225000 said by the Rajah to have been received by the farmers does not prove this sum against the farmers he and his securities are to make it good if he does I hope there will be no difficulty in obtaining payment of Nobkissen and the other farmers. Mr. Ryder is now employed in setting this account. & &.

Moidepore
30th March. 1770.

With respect &c.

Richard Bechee.

Long's Selection of U. P. R. No. 5 & 10.

* "I promise to pay the above sum of Rs. 835, 952 agreeable to the kist-banói without delay or failure. I will pay the same into the Company's Factory. I have made this that it may remain in full force and virtue. Dated the 23rd of Julhaid (Sic) and the 4th August of Bengal year 1166."

Vide Hunter's Statistical Account Vol. II page 159.

এইকালে যখন লর্ড ক্লাইব বাহাদুর দিল্লীর দরবারে সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন তখন মিঃ সামনার বর্দ্ধমানাধিপতির লক্ষ রাজস্বাধিরাজ উপাধি ও কালরম্যার পালকী শিরোপা প্রার্থনা করিলে, রাজা নবকিশন বাহাদুর * আপনার নিজ ভবন হইতে দশ সহস্র মুদ্রা নজরানা দিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিমিত্তও ঐরূপ শিরোপা ও রাজ রাজেন্দ্র বাহাদুর উপাধি প্রার্থনা করেন । রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজ রাজেন্দ্র বাহাদুর এই উপকারের বিনিময়ে রাজা নবকিশনকে ১১৭৩ বঙ্গাব্দে শ্রীহামপুর বনাম মূল্যবোড় গ্রামখানি মহোত্তরাণ স্বরূপ প্রদান করেন । কিন্তু তদানীন্তন রেভিনিউ বোর্ডের নির্দেশমতে নদীয়ার কালেক্টর মিঃ রেডফার্নের আদেশে নদীয়াধিপতির একশ দানের কমতা না থাকা অজুহাতে উক্ত মূল্যবোড় গ্রাম গবর্ণমেন্টের খাস দখল ভুক্ত হয় ।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করার ভ্যান্সিটার্ট সাহেব বাঙ্গালার কোম্পানীর কুঠির গভর্নর ও অধ্যক্ষ হয়েন । এই ভ্যান্সিটার্ট বাহাদুর কিছুকাল নদীয়ার কালেক্টর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । ইংরাজদিগকে, অসীকৃত অর্থ পরিশোধ করিতে না পারায় স্কোজিল ভ্যান্সিটার্ট সাহেব মীরজাদারকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার সুচতুর জামাতা মীরকাশিমকে নবাব মনোনীত করেন । মীরকাশিম সদিদুয়না, কোপন স্বভাব ও কঠোর হৃদয় ও স্বাধীনচেতা, কর্মক্ষম শাসন কর্তা বলিয়া খ্যাত । তিনি যেকোন প্রকৃতির লোক ছিলেন তাহাতে কোম্পানীর সহিত তাঁহার সত্যাব যে স্থায়ী হইবে না তাহা তিনি পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন । সেইজন্য তিনি যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে যুদ্ধের রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন । তিনি বসনদে উপবিষ্ট হইয়া কোম্পানীর দানী পরিশোধের নিমিত্ত বাঙ্গলা বিহারের ভূস্বামীগণকে বন্দী করিয়া তাঁহাদিগের হৃদ্যপার একশেষ করিয়াছিলেন । সমুদ্র কৃষ্ণচন্দ্র ও বন্দীগণের মধ্যে ছিলেন । এবারও রাজস্ব বাকীর দ্বারে তাঁহার এই হৃদ্যপা সংঘটিত হইরাছিল । ইংরাজের অসীকৃত তনুখা পরিশোধ হওয়ার নদীয়া রাজা পুনরায় নবাবের এলেকাধীন আসিয়াছিল । এক্ষণে নব

* নবকিশন বাহাদুর বঙ্গ ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের পক্ষে যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন তাণ্ডা ভাংকালীন গবর্ণমেন্টের কাগজপত্র দৃষ্টে বেশ বুঝা যায় । এ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ নবকিশন বাহাদুরের উপযুক্ত ব্যক্তির রাজা বিজয়রূপ কেব বাহাদুরের নিকট বিদ্যমান আছে ।

নবাব মীরকাশিম রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট বহু অর্থ বাকী দেখিয়া বারবার তাঁহাকে রাজধানী সুরসিদাবাদে আহ্বান করেন ; কিন্তু রাজা, আজ লক্ষ্যহীন—কাল দেওয়ানী—তৎপর জীব অস্থির উত্থাপি নানা অস্থির রাজস্ব প্রদানে বিলম্ব করিলে, নবাব, ইংরাজ গভর্নর ডালিটোর্ট বাহাদুরকে রায় রায়ানের দ্বারা রাজাকে সুরসিদাবাদে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত এক লিপি প্রেরণ করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সদাশয় ইংরাজ পক্ষের শরণ লইয়া নজর ও রাজস্বের কিয়দংশ প্রদান করিয়া এবং নিজ মালতাজারী ১২৮,৭৫৫ টাকা বুদ্ধি স্বীকার করিয়া লইলে কিছুদিনের জন্য পরিজ্ঞাপ লাভ করেন। কিন্তু আবার অল্পদিনের মধ্যেই বন্দী করেন। নবাব, বাঙ্গালার প্রধান প্রধান ভূস্বামী ও ধনবান ব্যক্তিদিগকে বিশেষতঃ বাহাদুরগকে তিনি ইংরাজবাহাদুরের পক্ষভুক্ত বলিয়া সন্দেহ করিলেন—তাঁহাদিগকে মুন্ডের ছুর্পে অবরুদ্ধ করিয়া পরিশেষে নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন। এইকালে নবাবের আদেশে লগৎশেঠ, রাজবরত প্রভৃতি অসংখ্য বন্দীর সহিত সপুত্র কৃষ্ণচন্দ্রেরও প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, কিন্তু কোণলী কৃষ্ণচন্দ্র “বতকণ খাস ততকণ আশ” মনে করিয়া নবাবের কন্দর্ভচরীগণকে বিট কষায় ভুট্ট করিয়া তৎকালোচিত এক বজ্রের আয়োজন করেন এবং পূর্নাত্মে তাঁহাদের প্রাণ গ্রহণের নিমিত্ত সন্ধ্যাতরে প্রার্থনা করেন। সেজন্য তাঁহাদের প্রাণদণ্ডে বিলম্ব ঘটে। এদিকে ইংরাজের সহিত মীরকাশিমের যুদ্ধ বাধিয়া উঠে এবং বিজয় লক্ষী ইংরাজ বাহাদুরের সহায় হওয়ার নবাব পরাজিত হইয়া মুন্ডের ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন ; সুতরাং সপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সে বাত্মা রক্ষা পান। মীরকাশিম গুরুগণ ধাঁ প্রভৃতি সেমাপতিবর্ণের অকর্মণ্যতার পলাশী, অগ্রবীণ প্রভৃতি হানে বার বার পরাজিত হইয়া পরিশেষে অবোধ্যায় পলায়ন করেন ; পরে অবোধ্যায় নবাব ও দিল্লীখর সাহ আলখের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করেন। কিন্তু ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বকসারের যুদ্ধে পরাজিত হন এবং অল্পদিন মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

এইরূপে দেশব্যাপী রাষ্ট্র বিপ্লবের উপসংহার হইলেও দেশে শান্তি কিরিয়া আসিতে বহুদিন লাগিয়াছিল। এ সময়ে নদীরা রাজ্যে একরূপ অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। দেশ মধ্যে লুণ্ঠ ও তৎকর ভীতি অসম্ভব পৃথি প্রাপ্ত হয় ; তাহাদের দারুণ অত্যাচারে কত সোণার সংসার ঋণানে

পরিণত হইরাছিল তাহার ইরজা নাই। সামান্ত ধনশালী বা গৃহস্থ লোকের কথা দূরে থাকুক, এই সকল অসমসাহসিক দম্ভানিচর দোৰ্দ্দত্ত প্রতাপ কোম্পানীর কুঠীও লুণ্ঠন করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। এই সকল লুণ্ঠন কাহিনীর হইটী ঘটনা অল্প অল্পে ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। একটী তদানীন্তন কোম্পানীর শান্তিপুরের কাপড়ের কুঠী লুণ্ঠন করিয়া কোম্পানীর গোমস্তা মনোহর তট্টোচাৰ্য্যকে লইয়া বাওয়া এক অপরটী সারেশতা খাঁ নামক মুরসিদাবাদের জমৈনক মুসলমান সওদাগরের কর্ণচারী মহম্মদ মোবারিক ও মৃণা বদলু প্রভৃতির নিকট হইতে নদীয়ার সীমানার ত্রয়োদশ সহস্র মুদ্রা লুণ্ঠন করা; শেখোজ ব্যাপারটী লইয়া দেশ মধ্যে হলহুল পড়িয়া যায়। সারেশতা খাঁ বাদশাহ সরকারে বাইরা এ বিষয়ে জানাইলে তথা হইতে তদানীন্তন কোম্পানীবাহাদুরের গভর্ণরের উপর এ বিষয়ের বিচারের নিমিত্ত এক পরোয়ানা জারি হয় এবং পত্ৰবর সাহেব তাৎকালিক নদীয়ার মুসলমান কালেক্টরকে এ বিষয়ে সম্যক তদন্ত করিয়া দোষীর শাস্তি বিধান ও নদীয়া রাজের গোমস্তা প্রভৃতি যে কোন ব্যক্তির অমনোযোগিতার এ কার্য সংঘটিত হইয়াছে তাহাদের সকলের শাস্তি বিধান ও অপকৃত্ত অর্থ আদায় পূর্বক অভিযোগকারী সারেশতা খাঁকে পুনঃপ্রদানের অহুমতি প্রদান করেন।

তাৎকালিক নদীয়ার দম্ভা দলপতিদিগের মধ্যে একজনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে ব্যক্তি বিশ্বনাথ বাবু। বাড়ী গাড়রা, ভাতছালা থানা চাপড়ার ও ক্রোশ পূর্বদিকে। বিশ্বনাথ জাতিতে বাগদী এবং বাবসার ভক্তো-ধিক হীন হইলেও তাহার উদার চরিত্র ও কীর্তিচিহ্ন স্মরণ গঠন, ভ্রষ্টোচিত দানশৌভতা তাহাকে “বাবু” আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—দরিদ্র অসহায় প্রজাতুলকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করা। বিশ্বনাথ কৃপণ ধনীর বশ ছিল। ব্যয়কুঠ কৃপণের ধনে দরিদ্র পোষণ তাহার বড় আনন্দের কার্য্য ছিল। বিশ্বনাথ কত কতাদারগ্রহ দরিদ্রের বিবাহের ব্যয় কুলান করিয়াছে, কত অসহায় পরিবারের সংসার প্রতিপালন করিয়াছে তাহার ইরজা নাই। বিশ্বনাথের পুত্রাদি না হওয়ার বৈত্তনাথ নামক

এক গোপ বালককে সে পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিল; এই বৈজ্ঞান্য হইতে শেখ জীবনে বিশ্বনাথকে অশেষ বরণা ভোগ করিয়া পরিশেষে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বিশ্বনাথের যে সকল সহযোগী ছিল তাহাদের মধ্যে মেধা, কৃষ্ণসর্দার, নলদা এবং সন্ন্যাসী, প্রধান ছিল। ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে এক একটা বিশেষত্ব বিদ্যমান ছিল। নলদা ডুব দিয়া জলের তিত্তর বহুত্ব খাগ প্রকাশ রোধ করিয়া থাকিতে পারিত। বিশ্বনাথ স্বয়ং দৃষ্টান্তিত বহুত্ব প্রোভিত ছিল। রত্না নামক দীর্ঘ বংশ বটী অবলম্বনে সে এক স্নাত্রে বিন্দিত ক্রোশ পথ গমন করিয়া আবার তৎকণাৎ প্রত্যাগমন করিতে সক্ষম ছিল। বিশ্বনাথের সুবৃহৎ দলে সহস্রাধিক বলবান ব্যক্তি নরীয়া সপত্র প্রস্তুত থাকিত। এই সুবৃহৎ দলের প্রত্যেকের উপর তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বর্তমান ছিল। ইহাদের প্রত্যেকের উপর বিশ্বনাথের কঠোর আদেশ ছিল যেন কেহ কদাচ জীলোক, শিত্ত ও গোপাত্তির উপর কোন অত্যাচার না করে। বিশ্বনাথ বাবু এই সুবিপুল দস্যবলের সহিত প্রেকাশ্ত তাকে পালকী চড়িয়া দস্যুতা করিতে গমন করিত। বিশ্বনাথের আর একটা নিয়ম ছিল পূর্বেই গৃহস্থকে পত্র দ্বারা সতর্ক করা। উক্ত পত্র এই মর্মে লিখিত হইত “সদাশর মহাশয়! যদি পত্র বাহক দারকং প্রার্থিত অর্থ প্রদান করেন বিশেষ বাধিত হইব, অন্তথা প্রস্তুত থাকিবেন শীঘ্রই আপনার ত্রিচরণ দর্শনে গমন করিব।”

একবার বিশ্বনাথ কালী পুজার দিন অর্থ সঙ্কলন করিতে না পারার সমৃদ্ধি সহকারে যারের পূজা হয় না দেখিয়া হুঃখিতাত্ত্বকরণে উপবিষ্ট আছে এমন সময়ে তাহার গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে কালনার গদীতে বৈজ্ঞপরের নন্দীয়া এইমাত্র নগদ দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে সবিশেষ পুলকিত হইয়া বিশ্বনাথ তৎকণাৎ সাত্র তিন জন সঙ্গী সমতিব্যাহারে নৌকা যোগে কালনার উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ দারোগার নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে বাধ্য করিয়া এক একরার লিখাইয়া লইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়াই গদীতে উপস্থিত হইল। ঐ একরার এই মর্মে লিখিত হইল যে দারোগার বিশেষ যোগ সঙ্গগে এ

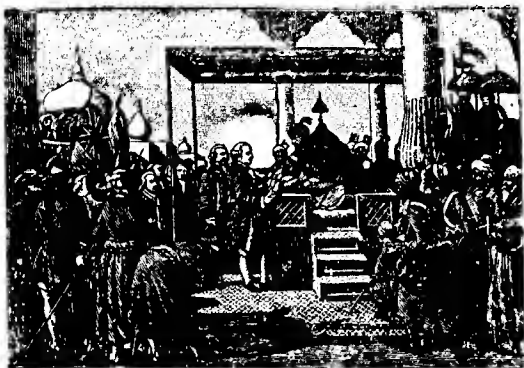
কার্য সমাহিত হইল। এইরূপে সেই কার্যের বর্ণাবধি অনুসন্ধানের মূলোচ্ছেদ করিয়া বিশ্বনাথ স্বীয় বিক্রমে সদী গুঠন পূর্বক সেই রাজ্যেই প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল।

আর একবার বিশ্বনাথের দল সংবাদ পার যে নদীয়ার ইনভিগো কনসার্নের ফ্যাডি সাহেবের বাঙ্গালার সেই দিন কলিকাতা হইতে বহু সহস্র মুদ্রা রায়তদিগকে দান দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। এই সংবাদে উৎসাহিত হইয়া বিশ্বনাথের দল রাজ্যে ফ্যাডির বাঙ্গালা আক্রমণ করে। মিসেস ফ্যাডি রাজির অন্ধকারে প্রচুর থাকিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে কোনরূপে নিকটস্থ পুকুরীতে কাল হাঁড়ি মাথার দিয়া দস্যুদলের দৃষ্টি বিব্রম ঘটাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্তু ফ্যাডি সাহেব শীঘ্রই ধৃত হইয়া দলপতির সম্মুখে নীত হইলে দুইদশী বিশ্বনাথ একজন সাহেবের প্রাণ নাপ করিলে সমগ্র সাহেব লোক তাহার বিরূপ ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে স্বরণ করিয়া সাহেবকে মুক্ত করিতে আজ্ঞা দেন। কিন্তু দলস্থ সকলেই এক বাক্যে ফ্যাডি সাহেবকে বিনাশ করিতে মত প্রকাশ করে এমন কি দলস্থ এক জন বিশেষ উত্তেজিত হইয়া ফ্যাডিকে সংহার মানসে তরবারি উত্তোলন করিলে বিশ্বনাথ কিপ্র হস্তে তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া সাহেবের প্রাণ রক্ষা করেন। পরিশেষে বহু বাকবিতণ্ডার পর সাহেবকে মুক্তি দেওয়াই স্থির হইলে বিশ্বনাথ সাহেবকে তাহার ভগবানের নামে শপথ করাইয়া অঙ্গীকার করাইয়া লন যেন মুক্ত হইয়া কিছুতেই তাহাদের বিপক্ষতাচরণ না করেন। ফ্যাডি সাহেব এইরূপে মুক্ত হইয়া দস্যুর নিকট প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই নহে মনে করিয়া বরাবর তাৎকালিক নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ইলিয়ট সাহেবের নিকট গমনপূর্বক আত্মপূর্বক সমস্ত ঘটনা বর্ণন করেন। ইলিয়ট সাহেব কলিকাতা হইতে ব্যালকুমার সাহেবের অধীনে কতকগুলি বলিষ্ঠ ইউরোপীয় পোরা আনাইয়া ও শান্তিপুর হইতে বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ গোড়ো উপর গোষ্ঠী সংগ্রহ করিয়া বিশ্বনাথের পালিত পুত্র বৈষ্ণব নাপের সাহায্যে শীঘ্রই বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হন। বিচারে বিশ্বনাথ ও তাহার দ্বাদশ জন সঙ্গীঃপ্রাণদণ্ডের আদেশ হয় এবং নদীয়া ঠগবণের খালেয় মাঠে বাঁশবেড়িয়া কুঠীর দক্ষিণে নদীতীরস্থ বটবৃক্ষে তাহাদের

কানি হয়। * বিখ্যাত মুক্তার পূর্বে যাত্রা চুই জনের উপর বিশেষ কোণ প্রকাশ করে। এখন তাহার বিশ্বাসঘাতক পালিত পুত্র বৈষ্ণব, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারী কাড়ি সাহেব।

রাজ্যের স্বধন একরূপ অরাজক অবস্থা তখন ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে সে যোগে ক্রাইব ইংলণ্ডের নিকট হইতে লর্ড উপাধি ভূষিত হইয়া মুসলমানের সহিত বিবাদ নিষ্পত্তা করিবার নিমিত্ত কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ কর্তৃক এদেশে পুনঃ প্রেরিত হন। তিনি কলিকাতার প্রত্যাগমন করিলে চতুর্দিক হইতে নবাব ও জমিদারগণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে নজর প্রেরণ করিতে লাগিলেন। নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র ও পঞ্চ যোদ্ধা ও তৎকালোচিত সৌভাগ্যপূর্ণ লিপি প্রেরণ করিয়া ভাগ্যবান ক্রাইবের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ক্রাইবের আগমনের পূর্বেই মীরকাসিমের মৃত্যু হয় এবং মীরজাফর দ্বিতীয় যার নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হন; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহারও মৃত্যু হওয়ার তৎপূত্র নাজিমদৌলা ইংরাজগণ কর্তৃক নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ক্রাইব মুরশিদাবাদে যাইয়া মৃত্যু নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বন্দোবস্ত করিলেন যে সৈন্য সংক্রান্ত ও রাজ্য রক্ষা সম্বন্ধীয় অস্তিত্ত ভার ইংরাজ কর্মচারীগণের হস্তে থাকিবে; কয় সংগ্রহ, শাসন ও বিচার প্রভৃতি কার্য নবাবের কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং ঐ সকল কার্য ও সাংসারিক ব্যয় নির্বাহার্থ নবাব বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা পাইবেন। অনন্তর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখের প্রবৃত্ত বাদসাহীসম্বন্ধ বণে প্রজ্ঞাপনক ইংরাজ বাহাদুর বাগলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলেন।

* নদীয়ার আরও প্রতি গ্রামেই হ, চারিজন চৌর বা ডাকাতের বাস ছিল, তন্মধ্যে হতীয়ার জাঙ্গলী, ডাকাতের কুলবেড়ে প্রভৃতির ডাকাতগণের নাম শুনিতে লোকের লজ্জা হইত। এই কুলবেড়ে লোকে বিধব কুলবেড়ে বলিত। মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় বাইতে তখন এই গ্রামের উপর দিয়া বাইতে হইত। ইহারই নিকট গোড়া সন্ন্যাসীর মঠ; তথা যার নবাব নিরাজউদ্দৌলা মঠের সন্ন্যাসীর উপর সন্তুষ্ট হইয়া এই মঠ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বিশ্বনাথের সমসাময়িক মহাপ্রাণের মধ্যে কড়ুর সর্দার ও বলরাম সর্দারের অভিচার কাহিনী প্রবণ করিলে রোমান্তিক হইতে হয়। অমানুষিক অভিচার ও নৃশংসতার তাহার বিবরণকেও প্রস্তুত করি ছিল তাহারও কয়েক মাস মধ্যে সমলে ধ্বংস হইয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়া।—Fifth Report of the Select Committee p. p. 817-20.



সমানি সাহ আলমের হস্ত চষ্টতে ক্রাটনের বাঙ্গালার দেওয়ানী গ্রহণ ।



লর্ড ক্লাইব ।



ওয়ারেন হেস্টিংস ।

নদীয়া-কাহিনী ।

নদীয়ায় ইংরাজাধিকার ।



বর্তমান ইংরাজ কোম্পানী সম্রাট সাহ-আলম দত্ত বঙ্গের দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইলে, তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড ক্লাইব বাহাদুর শুরসিদাবাদ-সরিকটহ মতি কীল প্রাসাদে ১৭৬৬ অব্দে পুণ্যাহ দিনে কার্য্যতঃ বঙ্গের শাসনভার হস্তে লইয়া এতদ্বৈশের রাজত্বের উন্নতি বিধানে যতঃসংযোগ করিলেন ; কিন্তু এ সকল বিষয়ে কোম্পানীর কর্মচারীগণের সম্যক অতিজ্ঞতা না থাকায় সমস্ত বিষয়ে প্রথম প্রথম বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে বাধ্য হইয়া কোম্পানী বাহাদুর কঠোর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন এবং তৎকাল প্রচলিত প্রথাভঙ্গী সিপাহী দ্বারা কর আদায় করাইতে লাগিলেন। * বিশেষতঃ এই সময় লর্ড ক্লাইব পুনরায় বিলাত যাওয়ার কোম্পানীর কর্মচারীগণের এবং রাজকার্য্যে নানারূপ সোলযোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাৎকালিক অধিদায়গণও কি জানি কিরূপ হাড়ার মনে করিয়া নিরীহ প্রজাকুলের নিকট স্বীয় স্বীয় প্রাপ্য আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন। রাজপরিবর্তনের অনিবার্য্য

* The Musalmans when they came into Bengal and acting on Fudal principles were opposed to that beautiful System of village Self-Government which had so long been tower of strength to the rayats, instead of it a military tenure was adopted and the revenues are collected by sepoy, the Zemindars were a semi-military collector of revenue, which was realized at the point of the Sword, a practice adopted even by the English when they first took possession of Burdwan Birbhum & Nadyia.

Introduction to Long's Unpublished Records page LIV.

কলে কিছুদিন দেশের এইরূপ অবস্থা হইল, ইহার উপর আবার ১৭৬৮—৬৯ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শতের সমূহ অনিষ্ট হওয়ার দেশে করালমূর্তি দুর্ভিক্ষ-রাকসী তরফর বেশে দর্শন দিল। এই দুর্ভিক্ষে দেশের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। * শুনা যায় অট্টালিকা, পূর্ণকূটারে, পণে, প্রান্তরে ঘাটে, হাটে, মাঠে, লোকালয়ে, যেখানে সেখানে দলে দলে মানুষ ও গৃহপালিত পশুাদি মরিয়া পড়িয়া থাকিত, কেহ কাহাকেও দেখিবার বা কেহ কাহাকে কেলিবার ছিল না। এই নিদারুণ ঘটনা বাংলা ১১৭৬ সালে সংঘটিত হওয়ার ইহা “ছিন্নান্তরে মনস্তর” নামে খ্যাত।

ইংরাজরাজ নবাবজারাজের রাজত্ব ও তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে মনোযোগী হইয়া পড়িলেন ও বলদেশকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া জমিদার গণের সহিত সুতন মেরাদী বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সুযোগ পাঠিয়া নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সমগ্র বিবর স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রের নামে সুতন প্রধারাবারী বন্দোবস্ত করিয়া লন এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এক “অভিলিখিত ব্যবস্থাপত্র” দ্বারা শিবচন্দ্রকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী মানানীত করেন। ইংরাজের সুশাসন প্রাৰ্জিত হওয়ার কল পরূপ আমরা এতদেশে মৃত্যুর পূর্বে বিবরাদির বিবিধবন্ধের জন্য এই প্রথম “উইল” পত্রের সৃষ্টি দেখিতে পাই। মহা-রাজা রাজেন্দ্র অগ্রিহোজীবাক্ষপেরী কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ এই সময়ে অতি বৃদ্ধ হইয়া ছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবন ব্যাপী ধারাবাহিক কর্তব্য নিচয় তাঁহার বাহ্যের সমূহ ক্ষতি করিয়াছিল। এক্ষণে কর্তব্যীর মহারাজা নিজের অস্তিমকাল নিকটবর্তী বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণনগর হইতে ক্রোধানৈক পূর্বে স্থিত অলকনন্দা তীরে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তপ্তত্যাগ করেন। এই প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত অলকনন্দার তীরে তাঁহার বংশের অবস্থারও পরিবর্তন আরম্ভ হয়। এইকাল হইতেই

* Vide Lord Macaulay's Graphic Description of the great Famine in his essay on Lord Clive.

† Vide Hunter's Unpublished Bengal Mss. Records No. 211.

ভারতবর্ষের সহিত সদাশয় ইংরাজের হারী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা শিবচন্দ্র ১৭৮২ হইতে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নদীয়ার রাজত্ব করেন। রাজা শিবচন্দ্র পিতৃ-গদীতে অধিষ্ঠিত হইলে তাঁহার নিজাধিকারে তাঁহার ক্ষমতায় কোম্পানী কর্তৃক হ্রাস করা হয়। এমন কি কোম্পানীর তদানীন্তন কর্মচারী জন্ শোর সাহেব নদীয়া রাজ্যের শিথিল হত হইতে রাজত্ব আদায়ের ভার পর্য্যন্ত অপসৃত করিয়াছিলেন। * কিন্তু নদীয়া-রাজ এ বিষয়ে তদানীন্তন সর্কোশিল গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস সাহেব বরাবর এ বিষয়ে আবেদন করেন, তাহাতে প্রার্থনা থাকে যে, বর্তমান সন তাঁহার সহিত রাজত্বের বন্ধোত্ত হইয়া হইলে তিনি প্রথামুদায়ী কিস্তীবন্দী হিসাবে কোম্পানীর সরকারে বর্তমান সনের রাজত্ব দাখিল করিবেন এবং সেই সঙ্গে কোম্পানীর বাকী বকেয়াও পরিশোধ করিবেন। যদি এ বিষয়ে সক্ষম না করেন, তাহা হইলে তখন যেন তাঁহাকে অধিকার-চ্যুত করা হয়। † ইহার উপর কি আদেশ প্রদত্ত হয়, তাহা পাওয়া যায় নাই কিন্তু ১৭৮২ খৃঃ ২৪ জুন তারিখের মিঃ ম্যাকডাইয়েল সাহেবের রিপোর্টামুদায়ী দেখা যায় যে সেই বৎসর নদীয়া-রাজ্যের কর্মচারীপন কর্তৃকই রাজত্ব সংগৃহীত হইয়াছিল। ‡

* Vide Letter from Mr. John Shore reporting that he has dispossessed the Zemindar of Nadiya from charge of collections (March 25. 1782).

Letter No. 100 Hunter's Unpub. Bengal Mss. Records.

† Vide petition from the Raja of Nadiya binding himself on the settlement of current year being made with him to pay up the revenue list together with balance of last year on pain of his for reicury of Zemindary in case of failure.

Letter No. 147 Hunters Bengal Mss. Records.

‡ Vid Letter from Mr. Mc. Dowel reporting that Zemindary officers have begun to collect revenue of Nadiya for current year (June 24. 1782).

Letter No. 166. B. U. P. Mss. Records.

মহামাফ হেষ্টিংস বাহাদুর ১৭৫২ অব্দে রাজস্ব সংগ্রাহক নিমিত্ত কালেক্টর-পদ সৃষ্টি করিয়া ইংরাজ কর্তৃচাৰী নিযুক্ত করিলেন এবং নদীয়া-তেই সৰ্ব্ব প্রথমে জেলা স্থাপিত করিয়া ইংরাজ কালেক্টরের অধীন করিলেন। বর্তমান কালে প্রেসিডেন্সী বিভাগ বলিয়া যে ভূভাগ আখ্যাত, মুরসিদাবাদ বাদে তাহাই এই সময়ে নদীয়া বিভাগ বলিয়া খ্যাত হয়। হেষ্টিংস সাহেব কলিকাতা কাউন্সিলের চারিজন সদস্যকে জমিদারগণের সহিত পাঁচ বৎসরের জন্ত খাজনার বন্দোবস্ত করিতে পাঠাইলেন, ও মুরসিদাবাদ হইতে খাজনা-দপ্তর নদীয়াসংগত “সুখসাগরে” * এবং অন্তান্ত বাবতীর সরকারী কাৰ্যালয় মুরসিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিলেন। বিচার কার্যের সুবিধার্থ প্রতি জেলার এক একটা দেওয়ানী এবং কোজদারী বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কুষ্ণনগরের সন্নিহিত গোবিন্দসড়কে (গোরাড়ীতে) নদীয়ার এই সকল আদালত স্থাপিত হইল। কালেক্টররাই দেওয়ানী বিচারালয়ে বিচারপতি হইলেন, কিন্তু কোজদারী বিচার মুসলমান কাজী ও মুক্তিয়র হস্তেই রহিল। আপিল শুনিবার নিমিত্ত কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত নামে দুইটা আদালত স্থাপিত হইল। পরিশেষে ইংরাজদিগের অপরাধের এবং রাজধানীর মকদ্দমা বিচারের নিমিত্ত কলিকাতায় মহামাফ ইংলণ্ডের ব্যবস্থানুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট নামে এক নূতন আদালত সংস্থাপিত হইল এবং ভারতবর্ষ সংস্কৃতানু-রূপী পণ্ডিত সুবিখ্যাত সার উইলিয়ম্ জোন্স সাহেব উক্ত বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি মনোনীত হইয়া আসিলেন। সংস্কৃতানু-রূপী জোন্স সংস্কৃত ভাষাধ্যয়নের নিমিত্ত ১৭৮৪ অব্দে গোরাড়ীতে কয়েক মাস অবস্থান করেন এবং তৎকালিক নদীয়ারাজ শিবাজীর নিকট এক জন উপ-যুক্ত অধ্যাপকের প্রার্থনা করেন। তখন দেশমধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করে নাই সুতরাং স্নেহকে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া নীতি-বিকল্প বলিয়া কোন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ঐ কার্যে স্বীকৃত হইলেন না। পরিশেষে মহারাজের ঐকান্তিক যত্নে ও চেষ্টায় বৈষ্ণব-কুলোদ্ভব রামলোচন কবিভূষণ সাহেবকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে স্বীকৃত করেন। এই রামলোচন সংস্কৃত এবং চিনিংসা



নদীয়ার সংস্কৃত-শিক্ষা প্রাপ্ত সার উয়লিয়ম্ জোনস ।



লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ।



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ।

নদীয়া-কাহিনী ।

শাস্ত্রে একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে একবার কোন ব্রাহ্মণ-কুমারের ব্যাধি ও ঔষধ নির্ণয়ে তাঁহার ভ্রম হয় এবং ঐ ভ্রম হেতু ব্রাহ্মণ-পুত্রের মৃত্যু হওয়ার তিনি চিকিৎসা ব্যবসার পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত অধ্যাপনায় ব্রতী হয়েন।

রাজা শিবচন্দ্র পূর্বের অসীকারানুযায়ী নদীয়ার রাজত্ব বণা সময়ে ইংরাজ সরকারে দাখিল করিতে না পারায় ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞাপন দ্বারা নদীয়া-রাজ কর্তৃক নদীয়ার রাজত্ব আদার পুনর্বার সর্বতোভাবে রহিত করা হয়। * কিন্তু পরবর্তী কালে মহামাত্র সর্কোনজিল গবর্নর জেনারল বাহাদুর পুনরায় নদীয়া রাজকে তাঁহার অধিকারে রাজত্ব আদার ও অস্তিত্ব কমতা প্রদান করেন। †

১৭৮৫ অব্দের প্রারম্ভে লর্ড হেষ্টিংস স্বদেশ বাত্মা করেন। এবং পর বৎসর লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্নর জেনারল নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় পদার্পণ করেন। ১৭৮৮ অব্দে রাজা শিবচন্দ্র পরলোক গমন করিলে, তৎপুত্র ঈশ্বরচন্দ্র নদীয়া-রাজ্যের অধিকারী হয়েন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত বিলাসী এবং অসিতব্যয়ী ছিলেন। ইনি ককনগর হইতে এক ক্রোশ পূর্ব-দক্ষিণে অজনা নামক অধুনা বড়-সলীলা নদী-তীরে ত্রীবন নামে এক প্রমোদ-উদ্যান স্থাপন করিয়া নদীতটে একটা সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন। এই অট্টালিকার দক্ষিণ দিকে যে কানন অধুনা বড় বনস্পতির গাঢ় ছায়ায় আবৃত থাকিয়া ব্যাত্যাহি হিংস্র পশু বা উভোদিকি হিংস্র দস্যু তদ্বরের আশ্রয়-স্থল হইরাছে, তাহা পূর্বে বিবিধ অগন্ধী পুষ্পের ও সুবাহু কলের বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ ছিল এবং ইহার আদরের নাম ছিল মধুগোল। এই

* 'Advertisement forbidding any collection being made in Nadiya by the Raja or his Amla 17th. April, 1783. ৮

No. 397, Hunter's U. P. Bengal Mss Records,

† Vide Letter from Governor-General in council respecting the repeeling the reestablishment of the Raja of Nadia in managemennt of his zemindary,

No. 995, Hunter's, U. P. B. Mss. Records.

অপূর্ণ আনন্দ কাননে জৈবরচন্দ্র সর্কদা আন্দোল আত্মদানে কালান্তিপাত করিতে থাকেন। তাঁহার রাজকাৰ্য্যে অমনোযোগ বশতঃ রাজকাৰ্য্যের সমুদ্র কতি হইতে থাকে।

এই সময়ে প্রজাহিঁতধী লর্ড কর্ণওয়ালিশ বঙ্গদেশের রাজস্ব আদায়ের সুবাস্ত বিধান, কৃষিকাৰ্য্যের উন্নতি সাধন প্রকৃতি দেশের হিত কাৰ্য্যনার নির্দিষ্ট রাজস্ব জমিদারগণের সহিত “দশশালা” বন্দোবস্ত করেন। এবং পরে ১৭২৩ খৃঃ অব্দে এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হয় এবং এতদ্বারা অবধারিত হয় যে জমিদারেরা নির্দিষ্ট রাজস্ব দিয়া অধিকৃত ভূমি পুরুষাভ্যুত্থানে ভোগ দখল করিতে পারিবেন। কিন্তু বৎসরের মধ্যে কতিপয় নিরুপিত দিনে রাজস্ব দিতে না পারিলে তাঁহাদের জমিদারী নিলাম হইবে।

যশাকালে কর দিতে না পারিলে জমিদারী নিলাম হইবার প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার বহু অক্ষম জমিদারের জমিদারী হস্তান্তর হইতে আরম্ভ হইল। বটে কিন্তু সুসম্মান অধিকারে জম্যধিকারীগণ বাকী খাজনার দায়ে কারারুদ্ধ হইয়া বেক্সত বর্করোচিত অকথ্য শাস্তি প্রাপ্ত হইতেন, তাহা এই সুসভ্য বিধানে এই সময়ে রহিত হইয়া গেল। নদীয়া রাজ জৈবরচন্দ্রের বিবরকাৰ্য্যে অমনোযোগিতা নিবন্ধন রাজকাৰ্য্যে স্বতই বিশৃঙ্খলা ঘটতে ছিল; এক্ষণে আবার ১৭২৬ অব্দেই সেপ্টেম্বর মাসে ভাগিরথী ও অভ্রান্ত নদীর জল অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়াতে, নদীয়ার এক মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়। * এই প্লাবনে লোকের কষ্টের অবধি ছিল না, দেশে ডাকা ছিল না, ডাকার ঘর ছিল না, ঘরে লোক ছিল না; কাজেই রাজস্ব আদায় কষ্টকর হইয়া পড়িল।

* Vide Letter from Collector of Nadiya forwarding a Petition from the Zemindar and rayats of Nadiya Complaining of the distressed State of Country from inundation.

No. 6188 Hunters U. P. B. Mss. Records

Collector ordered to enquire October 7th. No. 281796.

নদীয়া রাজ গবর্ণমেন্টকে দেশের আত্মপুর্নিক সমস্ত অবস্থা বর্ণন কারয়া রাজস্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে অস্বরোধ করেন।* কিন্তু তখন পূর্বোক্ত নিলামী আইন সর্বত্র প্রচারিত হওয়ার এ আবেদনে কোনই সফল হয় নাই এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত যে নদীয়া রাজ্যের ক্রমিক উন্নতি পরিলক্ষিত হইরাছিল, তাহা এই সময় হইতেই নিলামে বিক্রয় হইতে আরম্ভ করিল। বিধির নিয়ম এক ভাঙ্গে, আর গড়ে। এদিকে নদীয়া রাজ্যের যেমন অবস্থা হানি হইতে লাগিল, ওদিকে তাৎকালিক উদীয়মান সুবিখ্যাত ধনপতি রাণাঘাটের কৃষ্ণপাতি নদীয়া রাজ্যের নিলামী জমিদারি সকল ক্রয় করিয়া ধনে ও মানে অধিতীয় হইয়া উঠিলেন।

নদারাদিপতির এইরূপে দিন দিন আর্থিক অবস্থা হীন হইয়া পড়িলেও তাহার অধিকারস্থ নবদ্বীপে তখনও জ্ঞান-চর্চা একেবারে লোপ পায় নাই। দুই একটা ক্ষীণ জ্যোতি, তখনও পূর্ব সৌরবের সাক্ষ্য দিতেছিল। রাজ কার্যে তখনও দেশীয় তারিখের সমধিক প্রচলন ছিল অথচ বিত্তিক পঞ্জিকা সাধারণভাবে দেশ মধ্যে প্রচলিত না থাকায় জন সাধারণের বিশেষতঃ রাজকার্যের অনেক সময়ে গোলযোগ সংঘটিত হইত। এই অভাব দূরীকরণ মানসে গবর্ণমেন্টের যত্নে ১৭২২ খৃষ্টাব্দে নদীয়ার পণ্ডিতগণ কর্তৃক দেশীয় প্রচলিত জ্যোতিষের মতে সমগ্র পণ্ডিত মণ্ডলীর অস্বমোদিত এক বিত্তিক পঞ্জিকা প্রণীত হয়।‡ ইহাই বর্তমানকাল প্রচলিত "নব পত্রিকার" মূল ভিত্তি।

* Vide Letter from Collector of Nadiya enclosing representation from the Zemindar on the calamity of the season and his inability to discharge revenue. November 30th. 1791.

No. 2199 Hunter's U P. B. Mss. Records.

‡ Letter from Secretary to Board stating that he has repeatedly found difficulty in procuring an accurate Bengal Almanac and suggesting that Collector, Nadiya be directed to transmit one properly authenticated by Brahmanical Astronomy for the use of Office. July 5th 1799.

এই ১৭৯৯ অব্দে নদীয়ার নদী সকল অসম্ভব ক্ষীত হইয়া আবার দেশে বজ্রা আনয়ন করে। তদানীন্তন নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর প্রজার হ্রবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া সে বৎসর রাজস্ব আদায়ে শিথিলতা প্রকাশের ভক্ত গবর্ণমেন্টকে অনুমতি করেন। *

এই দাক্ষণ হ্রবস্থা হইতে দেশ উদ্ধার হইতে না হইতে ১৮০২ অব্দে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র প্রাণ ত্যাগ করেন এবং গিরিশচন্দ্র নদীয়ার রাজনী প্রাপ্ত হন। এই সময় মাকুটীস্ অব্ ওয়েলেসলী গবর্ণর জেনারল পদে অধিষ্ঠিত। পূর্বে লর্ড কর্ণওয়ালিশ রাজস্ব বিভাগের স্তায় শাসন ও বিচার বিভাগেও বহু পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। এতি ভেলার এক জন জজ ও তাঁহাদের প্রত্যেকের অধীনে একজন রেজিষ্টার ও কয়েক জন ম্যুন্সিফ ও তাঁহাদের সকলের বিচারিত মকদ্দমা আপিল ও নিবার নিমিত্ত কলিকাতা, মুম্বাইবাবাদ, ঢাকা ও পাটনার চারিটা প্রভিন্সিয়াল কোর্ট স্থাপন করেন এবং দেশের শান্তি রক্ষার ভক্ত কয়েক ক্রোশ অন্তর এক একটা থানা স্থাপন করিয়া প্রত্যেক থানায় একজন করিয়া দারোগা নিযুক্ত করিয়া বান। যদিও নদীয়া বিভাগেই সর্ব প্রথমে এই সকল বৃত্তাশ নিয়মাদি প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু এতাবৎ এ সকল রাজ-ব্যবস্থা জন সাধারণের বিশেষ অনুগ্রহ আকর্ষণ করিতে পারে নাই এবং কি কৌজদারী কি দেওয়ানী, কি সামাজিক সকল বিষয়ের মীমাংসাই নবদীপাধিপতি অথবা জমিদারবর্গ কিম্বা গ্রামস্থ প্রধানগণ কর্তৃক সমাহিত

No. 8217 U. P. B. Mss. Records.

Collector transmit the same, August 9th.

No. 8305. Hunter's B. Mss. Records.

পত্রিকা প্রণয়ন কালেটরের প্রতি উপদেশ ও কালেটরের কর্তৃক পত্রিকা প্রেরণ এই উভয়ের মধ্যবর্তী কাল অতি সংক্ষেপ, সে কারণে শব্দই প্রতীতি হইবে যে, এইরূপ পত্রিকা পূর্বে হইতেই প্রস্তুত ও প্রচলিত ছিল, কালেটর কেবল তাহা প্রেরণ করিয়াছিলেন মাত্র।

* No. 8385 Bengal Mss. Records.

হইতেছিল । § অল্পমান অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে (১২২০—২৫ সাল) নদীয়ার “দশ ঠাকুরী” প্রথা প্রচলিত ছিল দেখা যায় । গ্রামস্থ দশজন নিরপেক্ষ প্রধান ব্যক্তি এক যোগে সর্ববিধ মকদ্দমাই নিষ্পত্তি করিতেন । সুতরাং এখনকার জার বিচার-কার্য তখন এত ব্যয়-সাপেক্ষ ছিল না । কিন্তু ইংরাজী ভাব দেশে তখন শঠনঃ শঠনঃ প্রবেশ করিতেছিল এবং বাহা কিছু প্রতীচা, তাহাই আদরের সহিত গৃহীত ও বাহা প্রাচ্য তাহা সর্ব প্রযয়ে উপেক্ষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল ; সুতরাং এ সকল সনাতন প্রথা গীত্রই পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করে ।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে এই সময়ে নদীয়া-সিংহাসনে রাজা গিরীশচন্দ্র অধিষ্ঠিত । ইহার জীবদ্দশায় নদীয়া রাজ্য, বাহা কৃষ্ণচন্দ্রর সময়ে সুবিত্তীর্ণ চৌরাসী পরগণায় বিভূত ছিল, তাহা মাত্র ৫। ৭ খানি পরগণা ও কয়েক-খানি নিকর গ্রামে দাঁড়াইয়াছিল । ইহারই সময়ে নদীয়া-রাজ্যের সর্ব-প্রধান সুবিত্তীর্ণ ও সুবিখ্যাত “উগুড়া” পরগণা নিলাম হইয়া যায় এবং পরে ১৮০৬ অব্দে ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার সমস্ত অধিদারী বাকী খাজনার দ্বারে নিলামে উঠিয়াছিল । ‡

এই সময়ে কোম্পানীর সুবিখ্যাত শান্তিপুরের কাপড়ের আড়ং এর শ্রী পূর্কের জার না থাকিলেও বহু পরিমাণে বজার ছিল ।† তখনও বিলাতি

§ At the commencement of the period dealt with (1782—1807) the military and Political ascendancy of the East India Company had been firmly established in Bengal. The Company was the undisputed central Governing power but it had not yet been able to construct an orderly or efficient administration for the districts which had passed under its rule. * * * Each land-holder held his own Civil Court and kept up a private defensive Police.

Introduction, Bengal Mss. Records page 14—15.

‡ Vide Letter No. 13440 Hunter's Bengal Mss. Records.

† এই শান্তিপুরের আড়ং হইতে বাৎসরিক ১০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের মসলিন কোম্পানির কলিকাতা দপ্তরে প্রেরিত হইত ।

Vide Imp. Gazetteer of India Vol. X.

কাপড়ের আমদানী আরম্ভ হয় নাই ; তবে এ বিষয় তখন ইংলণ্ডীয়গণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে এবং কিসে ভারতের স্বায় স্বল্প বস্ত্র প্রস্তুত করা যায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা আরম্ভ হইয়াছিল। তখন শান্তিপুরে কোম্পানীর একজন কমারসিরাল রেসিডেন্ট বাস করিতেন। ১৮০৬ অব্দে কমারসিরাল এজেন্ট শান্তিপুরে দেনী মদ প্রস্তুত করিয়া রপ্তানীর জন্য গবর্ণমেন্ট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া এক সুবৃহৎ মদের ডাটা স্থাপন করেন। *

১৮০৭ অব্দে লর্ড মিণ্টো বাহাদুর গবর্ণর জেনারল হইয়া এদেশে আগমন করেন। তিনি নদীয়ার সংস্কৃত-চর্চার সমূহ অবনতি দেখিয়া গভীর চিন্তাপূর্ণ এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন এবং সংস্কৃত-চর্চার হ্রসবত্বাদির কারণ নির্ণয় করিয়া পরিশেষে বাণীর প্রিয়-নিকেতন নবদ্বীপে ও জিহটের অন্তর্গত ভাউর নামক স্থানে দুইটি সংস্কৃত কলেজ ও তৎসংলগ্ন পাঠাগারাদি স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেন এবং তদনুসারে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ পুনর্গ্রহণের সময় কোর্ট অব ডিরেক্টরের সভাগণ ভারত-গবর্ণমেন্টের প্রতি ভারতীয় প্রজাকুলের মধ্যে বিদ্যার উন্নতি ও পণ্ডিত-গণের উৎসাহদান-কল্পে অনূন এক লক্ষ টাকা বাৎসরিক ব্যয় করিতে আদেশ দেন।† এই টাকার নদীয়ার কোন সংস্কৃত কলেজাদি স্থাপিত হয় নাই বটে, কিন্তু ১৮২৩ সালের ১৭ জুলাই “কমিটি অব পাবলিক ইন-

* Vide Letter from Secretary to Government authorizing an assignment in favour of the commercial resident at Santipur for providing Rum. August 19th. 1806.

No. 13414 Hunter's Bengal Mss. Records

† That a sum of not less than a lac of rupees in each year shall be set apart, and applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India and for the introduction and promotion of a knowledge of the Sciences among the British Territories of India.

ট্রাকশন" নামে একটি সভা গঠিত হয়। ঐ সভা উক্ত অর্থ প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের মুদ্রাক্ষণ ও পণ্ডিতদিগের বৃত্তি আদিতে ব্যয় করিতে থাকেন

মুসলমানদিগের হস্ত হইতে দেশ সর্বতোভাবে ইংরাজদিগের হস্তে আসিয়া নিরুপদ্রব হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু নদীয়ার ভাগে বহু দিন ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন শান্তি-শ্রুতি বিধাতা লেখেন নাই। এই সময়ে— এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নদীয়ার রাজনৈতিক গগনে একটি অশুভকর জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয়; সেটি তিতুমীর নামে খ্যাত জনৈক ধর্মোন্মত্ত বলদ্বপ্ত মুসলমান। কিছু দিন তিতুর দৌরাভ্যো নদীয়ার শান্তি বিদূরিত হইয়াছিল। বলদ্বপ্ত তিতু তাহার মূখ্য অনুচরগণের সাহায্যে কেবল যে নদীয়া, যশোহর, ২৪ পরগণার জমিদারগণ ও নিঃসহায় প্রজা-কুলের উপর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা নহে; সে তাহার প্রায় নিরস্ত্র, নিরস্ত্র সঙ্গীগণের সাহসের ও আপনার অদ্বুত শক্তির উপর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পরাক্রান্ত বৃটিশ-রাজের বিপক্ষেও দণ্ডারমান হইতে পশ্চাদ্-পদ হয় নাই। ৭ তিতু ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে বর্তমান বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলওয়ের গোবরডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে আট মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে হারদারপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। গোবরডাঙ্গা প্রকৃতি স্থান তখন নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। এই হারদারপুর গ্রাম বানি জেলা নদীয়া ও ২৪ পরগণার সন্ধি-স্থলে ইচ্ছামতী নদী, যাহা নদীয়া ও ২৪ পরগণার সীমা নির্দেশ, করিতেছে তাহারই দক্ষিণ কূলে কিয়দূরে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে ইহা জেলা ২৪ পরগণার বাজুড়িয়া নামক থানার অন্তর্গত। শিশু-কাল হইতেই তিতুর মুসলমান ধর্মের উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত

৭ Forty-two years ago the case was very different and the fanatic leader Titu-Miyan found in Nadiya a sufficient body of disaffected Faraizi husbandmen, as to lead him to set up the Standard of revolt, for a short time to defy the British Government.

Hunter's Statistical Account Vol. II page 51

হইত । ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই ধর্মভাব ধর্মোন্মাদে দাঁড়াইরাছিল । ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিতু মক্কা বাজা করে । তথায় ওরাহাবি সম্প্রদায়ের নেতা সৈয়দ আহম্মদের সহিত তাহার পরিচয় হয় । মতান্তরে করাচী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক করিমপুরের অন্তর্গত বোলভপুর নিবাসী হাজি সরিফুল্ল্যার ধর্ম-মত গ্রহণ পূর্বক তিতু দেশে প্রত্যাগমন করে এবং স্বদেশীয় হীন জাতি মুসলমানগণের প্রচাচার ও স্থানে স্থানে হিন্দুৎসাহাচার করিতে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে নবমত প্রচার করিতে আরম্ভ করে । তিতুর নূতন মত সর্বতোভাবে কোরাণের সহিত ঐক্য না হওয়ার, কোন সম্ভাব্য মুসলমান তাহার ধর্ম মতাবলম্বী করেন নাই । কেবল কতকগুলি মুসলমান জোলা প্রকৃতি নিকটে জাতীর লোক তাহার মতাবলম্বী হইরাছিল । ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির বাস নদীয়া জেলায় । তিতু ইহাদের স্বার্থে দীক্ষিত করিয়া, টাকা কর্জ দিয়া স্ত্রম লইতে, আনন্দোৎসবে বাডোদায় করিতে, ও কাছা দিয়া কাপড় পরিতে নিষেধ করিল এবং সকলকেই হাড়ী রাখিতে অজুযতি করিল । মক্কা হইতে আসিবার কালীন একজন কবীর তিতুর সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিল । সে এই সময়ে নানারূপ বুদ্ধবগ দেখাইয়া তিতুর মূর্খ শিষ্যবগণকে বুদ্ধ করিতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে তিতুর দল পুটে হইতে লাগিল এবং এই অভ্য, ধর্ম্মাঙ্ক মুসলমানগণ হিন্দুগণের প্রতি, এবং যে সকল মুসলমান তাহাদের মতাবলম্বন করে নাই, তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল । বিশেষতঃ এই সময়ে তিতুর দল পুটে হওয়ার তাহার এখন দল বজায় রাখিতে অর্থের প্রয়োজন হইরাছিল । কিছু আয়ের কোন নিশ্চিষ্ট পহা না থাকায় সে হুই এক সবুজ গৃহস্থের বাটী লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল ।

তিতুর এই সকল অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া পুঁড়া গ্রামের জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তাহার জমিদারীর মধ্যে তিতুর দলের প্রতাপ হ্রাস করিবার মানসে উক্ত সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণের প্রত্যেকের হাড়ীর প্রতি ১০ পাচ শিকা কর দাবী করিলেন । জমিদারের এইরূপ অসমর্থিত চর্চার তিতু ঝংগরোনাতি ক্রুদ্ধ হইল ; তখন তাহার দলে সহস্রাধিক লোক যোগ দিয়াছিল সুতরাং এই অপমান নীরবে সহ্য না করিয়া পুঁড়া আক্রমণপূর্বক

উক্ত রায় মহাশয়কে লাহিত করিয়া মুসলমান কবিরার মানসে তিতু সদলে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের এক দিন বাজা করিল। পথে খানপুরে যে সম্রাট মুসলমান রায় মহাশয়কে তিতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার বাটী দূরত্ব পূর্বক তাঁহার কুমারী কন্ডার ধর্ম নাশ করিয়া তিতু পর দিন প্রাত্যহে ইচ্ছানতী উত্তীর্ণ হইয়া পূঁড়া আক্রমণ করিল। সে দিন কাপ্তিকী পূর্ণিমা উপলক্ষে সেখানে বারোইয়ারি পূজা হইতেছিল ও তত্ক্ষণপক্ষে প্রাতেই বাজা বসিয়াছিল। সদলবলে তিতুমীর পূঁড়া আক্রমণ করিতে আসিতেছে শুনিয়া বারোইয়ারি-তলা জনশূন্য হইয়া পড়িল। পুরোহিত তখন পূজার বসিয়াছিলেন, স্মতরাং পূজা ছাড়িয়া উঠিতে না পারিয়া তিনিই কেবল বারোইয়ারী মণ্ডপে উপস্থিত রহিলেন। এদিকে তিতু আসিয়া প্রথমে বারোইয়ারি তলার একটা গোহত্যা করিল। পূজারত ধর্মপ্রাণ পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় এই নিদাক্ষণ ব্যাপার ও বীভৎস দৃষ্ট সহ করিতে না পারিয়া মারের সম্মুখিত দীর্ঘ রূপাণ গ্রহণ করিয়া সেই নিষ্ঠুর ষাটকগণের মধ্যে পতিত হইয়া তাহারিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তখনই অগণিত পাবণ কর্তৃক বৃত্ত হইয়া নিজেও হত হইলেন। এদিকে জমিদারের লোকজন ও গ্রামস্থ সকলে লাঠী লইয়া বাহির হইলে তিতু গতিক বন্দ দেখিয়া, সে বাজা পলায়ন করিল।

বারাসাতে তৎকালে জেলা ছিল ও একজন অরেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সেখানে থাকিতেন। বসিরহাটে তখন মহকুমা বা বাহাড়িয়াতে থানা হয় নাই। এক কদমগাছিতেই থানা ছিল। বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এই ব্যাপার অবগত হইয়া বহুসংখ্যক বরকন্দাজ, লাঠিয়াল ও চৌকিদার লইয়া কদমগাছির ব্রাহ্মণ দারোগাকে তিতুকে গ্রেপ্তার করিতে পাঠান। কিন্তু তিনি করেক জন অস্ত্রচরসহ তিতুর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। তিতু এই দারোগা-অস্ত্র-ব্যাপারে সাতিশর প্রোৎসাহিত হইয়া আপনাকে অসীম বলশালী বালরা নির্ধারণ করিল এবং বৃটিশ-শাসন উপেক্ষা করিয়া আপনাকে ভারতের অধিতীর অধীশ্বর বালরা ঘোষণা করিল এবং টাকীর ও গোবরডাকার জমিদারগণের নিকট কর চাঙ্গিয়া পাঠাইল। গোবরডাকার এ সময় কালীপ্রসন্ন সুখোপাধ্যায় মহাশয় জমিদার ছিলেন। তাঁহার

এভাবে তখন বাঘে বধরিতে এক ঘাটে জল খাটত। অনান হুই শত লাঠিয়াল, তিন চারি শত পাইক ও নগদী ও কয়েকটা হস্তী তাঁহার সর্দার প্রভৃত থাকিত। তখনও দেশে চোর ডাকাতির তর সম্পূর্ণ দূরীভূত না হওয়ার, সকল অধিদার ও ধনবান ব্যক্তিরই কিছু কিছু লোকজনের ছলতানা রাখিতে হইত। এই সময়ে তিতুর দৌরাখো কালীপ্রসন্ন বাবু হুই শত বেতন-ভোগী হাবসী আনিয়া গোবরডাঙ্গার রাখার তাঁহার নিকট কর গ্রহণ করিতে আসিতে বা কর না দিলে তাঁহার সন্তক লইতে আসিতে তিতুর বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নাই। বাহা হউক এ সময় নিকটবর্তী গ্রাম সকল তাহার গোরাখো একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।

তিতু তাহার বাগের নিমন্ত ও সঙ্গীগণের আশ্রয়ের ভক্ত নারিকেল বেড়িয়া নামক স্থানে একটা গুহহুৎ আশ্র-কাননের চতুর্দিকে গড় বাটিয়া, বাশ পুঁতিয়া, কেহ কেহ বলেন মৃত্তিকাতান্ত্রে তাহার কেলা নির্মাণ করিয়াছিল। এখনও কোন বিষয়ে ক্ষণ-ভঙ্গুরতা প্রকাশ করিতে হইলে লোকে “তিতুমিরের কেলা” উল্লেখ করিয়া থাকে। এই বংশ ও মৃত্তিকা নির্মিত ক্ষণভঙ্গুর কেলায় বসিয়া ভারতের স্ব মনোনীত নব বাদসাহ কবে কোন্ গ্রাম ধ্বংস করিবেন, কাহার অর্থ লুণ্ঠন করিবেন এবং কখন কাহার কি সর্দানা করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। যে ধর্মপ্রাণতার উত্তেজিত হইয়া তিতু প্রথমে ধর্ম-সম্প্রদায় গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছিল, হুয়াশার ছলনার, অথচ অবিতৃপ্ত পিপাসার এক্ষণে তাহা পৈশাচিক ভাবধারণ করিয়াছিল; তাই নিত্য নূতন অত্যাচার করিয়াও তিতুর তৃপ্তি হইতেছিল না।

মোলাহাটির কুঠীর ম্যানেজার ডেভিস সাহেব হুই শত লাঠিয়াল ও সড়কীওয়াল লইয়া তিতুকে আক্রমণ করেন; কিন্তু তিতু কর্তৃক পরাজিত হইয়া কোনরূপে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইরাছিলেন। সাহেবের সঙ্গীগণ কেহ কেহ ইচ্ছামতী তীরস্থ গোবরা গোবিন্দপুরে বাইয়া আশ্রয় লইলে, তাহাদের রক্ষা করিতে বাইরা উক্ত স্থানের অধিদার রায় মহাপ্রসন্নের সহিত তিতুর বিবাদ হয়।

বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দিন দিন তিতুর এই অপ্রতিহত প্রতাপ

বন্ধিত হইতে দেখিয়া, গবর্ণমেন্টে রিপোর্ট করিয়া সৈন্ত সাহায্য প্রার্থনা করেন ; কিন্তু গবর্ণমেন্ট মুষ্টিমেয় জনকতক উন্নত মুসলমানের শাসনের অল্প প্রথমে সৈন্ত না পাঠাইয়া বারাসাতের নাজিরের অধীনে কয়েক শত চৌকিদার, বরকন্দাজ, লাঠিরাল এবং কয়েকজন অনিয়মিত সৈন্ত ও চারিজন গোরা অঝারোহী প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহারাও যখন এই বলদৃগ মুসলমানদল কর্তৃক পরাজিত হইল ও একটা ইংরাজ অঝারোহী ও কয়েকজন সিপাহী নিহত হইল, তখন গবর্ণমেন্ট তাহাদের দমনের নিমিত্ত ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে লেক্টাভ্যান্ট ষ্টুয়ার্টের অধীনে একদল ইংরাজ সৈন্ত, একদল দেশীয় পদাতিক ও কতিপয় কামান প্রেরণ করিলেন। লেক্টাভ্যান্ট ষ্টুয়ার্ট তাহার দলবল লইয়া ১৯ নবেম্বর রাত্রি থাকিতে আসিয়া তিতুর কেলা ঘিরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তিতু ও তাহার সঙ্গীগণ তখনও পর্যন্ত কিছুমাত্র ভীত না হইয়া এই সুশিক্ষিত সৈন্তগণের সাহিত বৃদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে লাগিল। তিতু তাহার ধর্মোন্মত্ত সৈন্তগণকে এই বলিয়া উত্তেজিত করিল যে, ধর্মবলে সে ইংরাজের গোলাগুলী গিলিয়া ফেলিবে। লেক্টাভ্যান্ট ষ্টুয়ার্ট এই বংশ-কেলাবাসী বীরগণকে ভয় দেখাইবার ভঙ্গ প্রথমে কতকগুলি ফাঁকা আওয়াজ করিতে আদেশ দিলেন ; কিন্তু মুখ মুসলমানগণ ইহাতে তাহাদের কোন অনিষ্ট হইল না দেখিয়া “হজরত গুলি খা ডালা” বলিয়া কেলা হইতে বাহির হইয়া সবেগে ইংরাজ-সৈন্তের উপর আসিয়া পড়িল। তখন বাধ্য হইয়া সেনাপতি গোলাগুলী ছাড়িতে আদেশ দিলেন। দেখিতে দেখিতে বাশের কেলা ভূমিসাৎ হইল। তিতুমীর ও তাহার বহু শিষ্য কেলায় মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিল এবং তাহার ভাগিনের নসিরদ্দি তিন শত মুসলমানের সহিত বন্দী হইল। অবশিষ্ট যে যেমন পারিল, পলায়ন করিল। বারাসাতে এই সকল বন্দীর বিচার হইয়া নসিরদ্দি ও অপর দেড় শত লোকের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। এইরূপে তিতুর দল বিধ্বস্ত হইলে দারুণ ভরে তাহার শিষ্য সেবকগণ দাড়ী কেলিয়া হিন্দু সাক্ষিতে আরম্ভ করিল। কথিত আছে তখন পরমাণিকগণ প্রতি দাড়ী কেলিতে ১১০ পাঁচ সিকা হিসাবে মজুরি লইয়াছিল। এ সময়ে তখন অনেক ব্যাক-কবিতা রচিত হইয়াছিল।

জোনালী উঠিয়া বলে উঠরে জোলা ঝাট ।
 হাজার বাড়ী গিয়া ঝাট মোচ দাড়ী কাট ॥
 কোথায় হাজার, কোথায় মোকাম কোথায় কার বাট ।
 দাড়ী কেড়ে দিবে কাট, দাড়ী কেড়ে দিবে কাট ॥
 তিতুমীরের গলা ধরি নসরদি কর ।
 ভোমার বুদ্ধিতে মাসু ঠেকলাম এবার দার ॥
 এসেছে রাজা গোরা, উদ্দি পরা ব্যাতের টোপর সাধার ।
 এরা ছাড়ছে গুলি, ভাঙছে খুলি, হজরত গুলি মানলেনা ।
 সারলে ইংরাজে মাসু ! এবার আর জানে রাখলে না ॥

এইরূপে তিতুর বিজোহ মনন হইলে নদীরার আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল। ১৮৪১ অব্দে রাজা দ্বিতীশচন্দ্র লোকান্তরিত হইলে তাঁহার দত্তক পুত্র ত্রীশচন্দ্র কমিসারীর ভার গ্রাপ্ত হইয়া নষ্ট বিষয়ের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। ইনি উদ্ভোগী হইয়া নদীরা জেলায় অনেক তত্ত্বলোককে সমবেত করিয়া নিজ প্রাঙ্গণে এক সাধারণ হিতকরী সভা স্থাপন করেন। এই সভার উদ্ভোগে নদীরাবাদীগণের একটা মতপত্র সাধিত হইয়াছিল। যে সকল ব্যক্তির নিজের ভূমি গবর্ণমেন্ট সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, এই সভা ভূমাদিকারীদের দ্বারা আবেদন করাইয়া গবর্ণমেন্টকে উহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

১৮৪৪ অব্দে সার হেনরি হার্ডিঞ্জ সাহেব গবর্ণর জেনারল মনোনীত হইলেন। ইনি সাতিশর বিভাগসাহী ছিলেন এবং এদেশে হার্ডিঞ্জ বিভাগর নামে গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে এক শত একটা বাঙালা বিভাগর স্থাপনা করিয়াছিলেন। ইহারি রাজত্ব কালে ১৮৫৬ অব্দের ১লা জানুয়ারি মহাসমারোহে ককনগর কলেজ খোলা হয়। সুপ্রসিদ্ধ ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ মনোনীত হইলেন। এই সময় হইতে নদীরার পাশ্চাত্য শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে বেশমর "বিধবা বিবাহের" এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। অনানুযায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বিষয়ে অগ্রণীকপে দণ্ডারমান হন। বিধবা-বিবাহের আন্দোলন পূর্ণ হইতে আরম্ভ হইলেও এই সময়ে ইহা বেশ মধ্যে

বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয় বিশেষতঃ এ বিষয় আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে রক্ষণশীল হিন্দু-মাজেই মহা আপত্তি উত্থাপন করেন; এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে নদীয়া জেলার “বৈচে থাক বিদ্যাসাগর” প্রভৃতি বহু কবিতা প্রকাশিত হয় * এবং শান্তিপুত্রের তাঁতিগণ কাপড়ের পাড়ে ঐ সকল গীত লিপিবদ্ধ করে। হিন্দু মাজেই তখন এ বিষয়ে কর্তব্যাবধারণের নিমিত্ত নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের মুখাপেক্ষী করেন। কথিত আছে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাণবিধবার পুন সংস্কার শাস্ত্র সম্বন্ধে কিনা এ বিষয়ে বিচারার্থী হইয়া নবদ্বীপে আসিলে তত্রস্থ পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাকে সাদরে স্বর্দ্বনা করিয়া গঙ্গাতীরে তাঁহার বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেন এবং পাকার্থ তত্ত্ব ও অস্তান্ত জব্য সম্বন্ধিত করিয়া রন্ধনের নিমিত্ত গঙ্গাতীর হইতে এক উচ্ছিন্ন মৃৎপাত্র আনিয়া প্রদান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইদ্রিতে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের অভিমতের আভাব পাইয়া সে যাত্রা বিনা বিচারেই প্রত্যাগমন করেন। বাহা হউক পরে ১৮৫৬ খ্রষ্টাব্দে বিধবা বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হয়। †

* “বৈচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ’য়ে ।
সদরে করেছ রিপোর্ট বিধবা রমণীর বিয়ে ।
কবে হবে হেন দিন, প্রকাশ হবে এ আইন,
জেলায় জেলায় খানার খানার বেরবে হুকুম
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম ।
কে যাবে এদের সনে বরণ ডালা মাথায় হ’য়ে ।
কবির হেসে কর, বুঢ়িল নারীর স্তর
সকলের হাতের খাড়ু হইল অক্ষর ।
সবে বল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জয় ।
দেখে শুনে মদন রাজা পলাইল ভয়ে ।”

এই গানের ব্যঙ্গ পালটা গানও হইয়াছিল ;

“ভয়ে থাক বিদ্যাসাগর চির যৌনী হয়ে ।”

‡ The first clause of the Act was—“No marriage contracted between Hindus shall be invalid and the issue of no such marriage shall be illegitimate by reason of the woman having been previously married or betrothed to another person who was dead at the time of such marriage, any custom and any interpretation of Hindu law to the contrary notwithstanding.”

১৮৪৮ অব্দে লর্ড ডালহৌসী গবর্ণর জেনারেল হইলেন। তাঁহার শাসন-কালে কলিকাতার বিখ্যাত বিদ্যালয়ের স্ক্রিপাং ও গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রাপ্ত-ইন এড-সিষ্টেম্ প্রবর্তিত হয় এবং নদীয়ার কলেজ ও দুই একটা স্কুলে উচ্চ সাহায্য প্রদত্ত হয়। তাঁহার যুগে এ দেশের যে সকল উন্নতি বিধান হইয়াছিল তাহার মধ্যে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও পোষ্টাল ডিপার্টমেন্ট এবং পুঁঠ বিভাগ সৰ্ব্ব প্রধান।

১৮৫০ অব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী পল্লিয়ারমেন্ট হইতে যে সনন্দ প্রাপ্ত হন তাহাতে বাঙ্গালার লেক্টেজান্ট গবর্ণর নামে একজন স্বতন্ত্র শাসন কর্তা নিয়োগের আদেশ থাকে এবং এতদ্ব্যবসায়ীপণ বিলাত হইয়া নিভিল সার্জিন্স দিবার অহুমতি প্রাপ্ত হন। ১৮৫৪ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে সার ফ্রেডরিক হালিডে বাঁহাছর বাঙ্গালার প্রথম লেক্টেজান্ট গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন * ইনি বঙ্গ মসনদে উপবিষ্ট হইয়াই প্রজাকুলের অবস্থা পরিদর্শন মানসে ইমার আরোহণ করিয়া অলপণে তাঁহার এলেকাধীন প্রধান প্রধান স্থান সমূহ পরিভ্রমণ করেন এবং তদনুসারে মাথাভাঙ্গা নদী বাহিয়া নদীয়া জেলা পরিদর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। এ বৎসর নদীয়ার লাক্ষণ প্লাবন সংঘটিত হইয়াছিল; † এবং সে কারণে প্রজা সাধারণের

* The extent of the provinces included within the Lient-anant Governorship of Bengal was stated in the first Adminis-tration Report of the year 1855—56. The provinces were divided into seven portions, namely :—

Bihar, having an area of about	...	42,000 sq. miles
Bengal,	85,000 ... "
Orissa,	7000 ... "
Orissa Tributary mahals	...	15 5000 ... "
Chota Nagpur and the tributary-	} ...	62,000 ... "
States on the S. W. Frontier		
Assam	...	27,000 ... "
Arracan	...	14,000 ... "

Total arrea—2,53,000 sq. miles.

† Sir F. Haliday, subsequently proceeded to Calcutta by the unusual route of the Matabhanga, to observe the

সংগোনাতি কষ্ট হইরাছিল। ডাঙ্গাডহর এক হইয়া বাওয়ার বহু গবাদি গৃহপালিত পশু ও মৃত্যুস্থে পতিত হইরাছিল।

এইকালে (১৮৫৬.৫৭ খ্রীস্টাব্দে) হিন্দুগণের চতুঃপূজা উপলক্ষে বাণকোড়া, জিবকোড়া, কাঁচি, ছুরী, সুর প্রভৃতি তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের উপর উক্ত হইতে পতিত হওয়া প্রভৃতি নির্মম অস্থানৈর প্রতি কেহ কেহ গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন, কিন্তু তদানীন্তন উপরতমনা বঙ্গেশ্বর হালিডে বাহাদুর ইহা জন সাধারণ স্বইচ্ছায় করে বলিয়া আইন দ্বারা এই প্রথা রহিত করিতে অস্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ বিশেষ মিসিনারী এবং গ্রাম্য পণ্ডিতগণের প্রতি সাধারণকে বুঝাইয়া এই নির্ভুর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পরামর্শ দেন। বাহা হউক এ বিষয়ে পুনরায় বঙ্গেশ্বর প্রাণ্টে বাহাদুরের শাসনকালে আন্দোলন হয় এবং বঙ্গেশ্বর জমীদারগণ ও সম্রাট ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে জনসাধারণকে বুঝাইয়া কচিং পুলিশের সাহায্যে ইহা দমন করিতে প্রয়াস পান এবং তিনি এইরূপে কৃতকার্য্যও হন।

এই সময়েই নদীয়ার তামাকের চাষ বিশেষভাবে জাঁকিয়া উঠে। এমন কি সুরদ্র বিদেশেও উহা জাহাজযোগে প্রেরিত হইতে থাকে। কথিত আছে এই নদীয়া জেলাতেই দিল্লীখর সাহান সা আকবরের সময় ইউরোপীয়গণ কর্তৃক তামাকের আবাদ আরম্ভ হয়। * অতাপি নদীয়ার সর্বত্র বিশেষ নদীয়া জেলার

state of Nadia district. It was evidently a year of high floods, as the whole country was one sheet of water, so that it was difficult to distinguish even the course of river; and the villages, except those on the higher lands were nearly submerged.

Vide Buckland's Bengal Under Lieutenant Governors. Page 32.

* "Nuddea was one of the places at which the tobacco plant was first introduced into India by Europeans during the reign of Achar, and it is still extensively cultivated in this part of the country.

Vide "Travels in India a
Hundred years ago"
by Thomas Twining,
p p 94.

রাণাঘাট মহকুমার অধীনস্থ চাকান্দহ, মদনপুর, চর-বাটা, কাঁচড়াশাড়া প্রভৃতি স্থানে হিংলী ভাষাকের চাব বিশেষভাবে হইয়া থাকে ।

১৮৫৬ অব্দে লর্ড ক্যানিংবাহাদুর গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া এদেশে আগমন করেন । ইংহারই রাজত্বকালে ১৮৫৭ অব্দে পলাশীর যুদ্ধের ঠিক এক শত বৎসর পরে ভরানিক সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় । এই বিদ্রোহ বৃটিশ রাজত্বের মূল পর্ব্বাঙ্ক কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল কিন্তু অকৌশলী সঙ্কল্পে মরাল ক্যানিংয়ের সনাতনভার শীঘ্রই বিদ্রোহাঙ্গি নির্মূলাপিত হইয়া দেশে আবার শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল । এই চুর্দ্দিনে নদীয়া বদিও প্রত্যক্ষভাবে কোন রূপ কতিগ্রহ হয় নাই, তথাপি স্বাভাবিক উদ্বেগ আবেগ ও ভীতির হস্ত হইতে পরিজ্ঞান পায় নাই । নদীয়া বলিলে সে সময়ে বর্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগকে বুঝাইত । বারাকপুর, বরনগর ছাউনির সিপাহীদের কেহ কেহ বিদ্রোহী হইলে তাহাদের দমনের জন্য সৈন্যাদি প্রেরণ করার, শাস্তিপ্রিয় অধিবাসীগণের মনে স্তব্ধই একটা অশান্তি ও আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল । এতাবৎ বাঙ্গালা ও অস্তান্ত বৃটিশাধিকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীন ছিল । বিদ্রোহ শান্তির পর ১৮৫৮ অব্দের ১লা নভেম্বর এলাহাবাদের দরবারে লর্ড ক্যানিং বাহাদুর এই মর্মে দরামরী ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন যে কোম্পানীর হস্ত হইতে এদেশের শাসনভার মহারানী বহন্তে গ্রহণ করিলেন ; * তিনি প্রজাসাধারণের জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে ধর্ম্ম ও জ্ঞানভ্রমোদিত বিচার ব্যাধি ত্যাগের স্বাক্ষর করিবেন এবং উপযুক্ত দেখিলেই রাজ্যের সর্ব্ববিধ উচ্চপদে তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন । গবর্ণর জেনারেলগণ অতঃপর রাজপ্রতিনিধী “ভাইসরয়” নামে অভিহিত হইলেন । *

এই ১৮৫৮ অব্দে এক দিকে সিপাহী বিদ্রোহ দমিত হইলে যেমন দেশে

* “Her Majesty the Queen, having declared that it is her gracious pleasure to take upon herself the Government of the British Territories in India, the Viceroy and Governor General hereby notifies that from this day all acts of the Government of India will be done in the name of the Queen alone.

শাস্তি পুনঃস্থাপিত হইতেছিল * তেমনি আবার নদীয়া, বশোহর, পাবনা প্রভৃতি নীল-প্রধান জেলাতে দেশীয় ও বিদেশীয় বহু নীলকরের সহিত চাষী রায়ত গণের বিবার বাধিয়া উঠিয়াছিল। একদিকে রায়তগণ যেমন কোন কোন নীলকরের অত্যাচারকাহিনী গবর্ণমেন্টের গোচর করিতেছিলেন, তেমনি অপরদিকে নীলকরগণও স্থানবিশেষের রায়তগণের দামন লইয়া কার্য্য না করা প্রভৃতি চর্য্যাবহারের কপা গবর্ণমেন্টকে জ্ঞাপন করিতেছিলেন।

From this day all men of every race and class who under the administration of the Honble. East India Company have joined to uphold the Honor and Power of England will be the servants of the Queen alone.

The Governor-general summons thus one and all, each in his degree, and according to opportunity and with his whole heart and strength to aid in fulfilling the gracious will and pleasure of the Queen as set forth in her royal proclamation from the many millions of her Majesty's native subjects in India, the governor general will now and at all times exact a loyal obedience to call which in words, full of benevolence and mercy their severing has made upon their allegiance and faithfulness."

* দেশ তখনও সর্ব্বতোভাবে শাসিত হয় নাই সুতরাং দেশের শাস্তি তখন প্রায়ই চৌর ডাকাতের উপক্রমে অব্যাহত থাকিত না। সুবিধা পাইলেই দেশের নিম্ন শ্রেণীস্থ বলিষ্ঠ দুই দশজনে একত্র হইয়া দল বাধিত ও দেশের সর্ব্বনাশসাধন করিয়া বেড়াইত। এইরূপ চৌর ও ডাকাত সব গ্রামেই দু চারিজন দেখা যাইত, এমন কি, চৌর তাড়াইতে জমীদারগণ কেহ কেহ ডাকাত পুৰিতেন। এই সময়ে বাহাদুর উপক্রমে নদীয়াবাসীগণ সর্ব্বনা সশস্ত্র ছিল তাহাদের মধ্যে মনোহর দাস সর্ব্বপ্রধান ছিল। মনোহর জাতিতে গোয়াল, নবাবীশের পশ্চিমদিকে একডালা পরাগপুরে তাহার বাসস্থান ছিল। মনোহর দস্যবযোগী বহুতরুণেই শোভিত ছিল। লাঠিখেলা, সিঁহুচুরী, ডাকাতি রাহাওয়ানি, নৌকামার প্রভৃতি কার্য্যে তাহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তাহাকে বাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা তাহার শাবিরীক শক্তি সম্বন্ধে বলেন যে "সে চিত হইয়া শুইরা থাকিত এবং তাহার গলার উপরে একখণ্ড বাঁশ দ্বারা বাঁশের দুই প্রান্তে দুইজন বলিষ্ঠ মনুষ্য চাপি

১৮৫৯ অব্দে সদাশিব সারথীকে নীটার গ্র্যান্ট মহাশয়ের বঙ্গেশ্বররূপে এদেশের শাসনভার হস্তে করেন। এ সময়ে নদীয়া ও বশোহর জেলার বহু প্রজাতি ও ভূমিদারবর্গের সহিত অনেক অত্যাচারী নীলকরের প্রকান্তভাবে বিবাদ বাধিয়া উঠে এবং লক্ষ লক্ষ প্রজাতি ধর্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞাক্রমে হয় যে আর নীলের দানন লইবে না বা নীলের চাব করিবে না ; সুতরাং এই বিষয়ে তখন মহাশক্তি গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হইয়া উঠে।

খাকিলেও মনোহর মুক্তিকার উপরে হস্ত পড়ের ভয় করিয়া বাঁশ সমেত সেই দুই জনকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিত না, মানিকা প্রভৃতি তাহার সময়ের নদীয়ার অন্ততম দাস্য নারক। সমগ্র নদীয়া জেলা এই দলশক্তিভরের কার্যক্ষেত্র ছিল। ইহারা তখন এতদূর অকুতোভয় হইয়া উঠিয়াছিল যে অল্প লোকের কথা দূরে থাকুক ইহারা কয়েকবার কৃষ্ণনগরের সাহেবদিগের মেস কোর্টের ও জজ ব্রাউন সাহেবের প্রয়োজনীয় অব্যাদি বোঝাই নৌকা লুট করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। মনোহর অল্পত্ন বাহাই কলক নিজ গ্রামে কখন সে চুরী বা ডাকাতি করে নাই। মনোহর তাহার জীবনে যে কত ভীষণ ডাকাতি কার্য সমাধা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, বাহা হউক পরিশেষে সে শাস্তিপুত্রের (বর্তমান রাণাঘাট) সবডিভিসনের ডেপুটি বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল এবং কৃষ্ণনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট মন্টেগু সাহেব বাহাদুরের বন্ধে ও নদীয়ার কর্মদক্ষ দারোগা বাবু গিরীশচন্দ্র বসুর চেষ্টা ও অসমসাহসিকতার এবং তাহার নিজ মাতুলের বিশ্বাসঘাতকতার দ্বন্দ্ব হইয়া তাহার আজন্ম কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করে। সঙ্গে সঙ্গে মনোহরের সঙ্গীদেরও রাজদণ্ড হয়। ইহাদের মধ্যে পূর্বস্থলীর গোপাল গোন্ধার বিশেষ প্রসিদ্ধ, সে মনোহরের “খাকিলার” অর্থাৎ মাস সামালদার ছিল। জজ ব্রাউনের বিচারে মনোহরের চিরনির্বাসন দণ্ড হয়। তদানীন্তন রীত্যাভুসারে এই আদেশ শব্দ নিষ্পত্ত হইতে কারেন হইয়া আসিলে মনোহর আলিপুর জেলে প্রেরিত হয় তথা হইতে কয়েকমাস পরে ১৮৬০ জন পঞ্জাবী ও পশ্চিমে দারমাণী আসামীর সহিত নির্বাসনের জন্য অল্পবেশে খায়েটমিউ নগরে ক্লাবিসা নামক জাহাজে চালান হয়। সমুদ্র মধ্যে মনোহর তাহার সঙ্গী কয়েকদলের সহিত এক যোগে মহাবিপ্লব বাধাইয়া জাহাজের কাপ্তেন ও অস্ত্র সাহেবকে অসতর্ক অবস্থায় পাইয়া বধ করে। কেবল জাহাজ চালাইবার জন্য কয়েকজন দেশী খালানী প্রাণরক্ষা করিয়া তাহাদের দ্বারা ভিন্ন রাজার এলেকার জাহাজ চালাইয়া পালাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ একখানা রণতরীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সেই মনোহরের



বাজরাজেশ্বরী করুণাময়ী ভিক্টোরিয়া ।

নদীয়া-কাহিনী ।

এই সময়ের অবস্থা এতই সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল যে তদানীন্তন উদার-স্বল্প রাজ প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং বাহাজুর তাহার একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—“বর্তমান নীলকর ব্যাপারে প্রায় সপ্তাহব্যাপী আমার এতই উৎকর্ষা হইয়াছিল যে বুঝি দিল্লীর ব্যাপারেও তত হয় নাই। আমি ক্রমাগত ভাবিয়াছি কোন এক নির্কোষ নীলকর যদি ত্বর বা ক্রোধ পরবশ হইয়া একটিনাত্র প্রজাকেও গুলি করে তবে সেই মুহূর্ত্তেই নিম্ন বঙ্গের সকল কুঠীগুলিই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে।”*

দেশের বখন এইরূপ ভয়ানক অবস্থা তখন সদাশয় গবর্ণর গ্র্যান্ট মহোদয় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; কিসে অশান্তি ও বিপ্লবের হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করা বাইতে পারে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তদানীপুর বাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ সম্ভান হরিচন্দ্র প্রজাবৃন্দের পক্ষ হইয়া “পেট্রিগেট” লেখনী ধারণ করিলেন এবং প্রতিদিন স্বয়ং সহস্র সহস্র প্রজাকুলকে প্রজাপালক গবর্ণমেন্টের নিকট বিচার প্রার্থী হইবার জন্য সংপরাশর্ম দিতে আরম্ভ করিলেন। † চতুর্দিক হইতে নীলকরগণের মধ্যে বাঁহারা

কাপ্তান তাহাদিগকে বৃত্ত করিয়া অকায়েব বন্দরে লইয়া যান এবং তথায় বিচার হইয়া তাহাদের ফাঁসী হয়।

* ‘I assure you that for about a week it caused me more anxiety than I have had since the days of Delhi, and from that day I felt that a shot fired in anger or fear by one foolish planter might put every factory in Lower Bengal in flames.’

Lord Canning,

Buckland's Bengal Under Lt. Govers. page 192.

† নদীয়ার প্রজাকুল হরিচন্দ্রের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিত। এ সময়ে কৃকনগরে নীল কমিসানের সমক্ষে সাক্ষী দিবার কালে তদানীন্তন নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডবলিউ, জে, হারসেল সাহেব ১৮৬০ সালে ৯ই জুলাই এইরূপ বলিয়াছেন :—

Commission—“Are you in a position to state, who in Calcutta or else where have furnished the rayats with advice?”

Mr. Harsehel—“ * * * I have heard that they used to go to the Editor of the Hindu Patriot; and the rayats,

অত্যাচারী তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইল কিন্তু ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে অকালে হরিণের মৃত্যু হটল। * বাহাই ইউক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ঐকান্তিক সাধনার স্কল ধরিয়াছিল। কারণ প্রধানত তাঁহারই চেষ্টায় স্বেচ্ছাসক গবর্ণমেন্ট ইণ্ডিগো কমিশন নামে নীলকর কৃত অত্যাচারের সত্যায়ন্য নিৰ্দ্ধারণের নিমিত্ত এক কমিশন নিযুক্ত করেন। †

এই কমিশনের সভ্যগণ ১৮ই মে কলকাতায়ই প্রথম অধিবেশন করিয়া প্রকৃতভাবে নীলকর ব্যাপারের তদন্ত আরম্ভ করেন। তিন মাস ব্যাপী কমিশন সর্বসমেত ১০৪ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ১৫ জন গবর্ণমেন্ট কর্মচারী, ২১ জন নীলকর, ৮ জন মিসিনরী, ১৩ জন জমিদার এবং ৭৭ জন রায়ত বা প্রজা। এই কমিশনে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাণাঘাটের হুসৈনিক জমিদার বাবু জয়চাঁদ

in the case which I referred to before, admitted the fact. But I have no reason to suppose that the advice was improper.

* হরিণের অকাল মৃত্যুতে নদীয়ার জন সাধারণ বিশেষ সন্দেহিত হইয়া মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য ১৮৬২ খৃঃ অব্দের ২৬ জুলাই তারিখে “নীলদর্পণ” প্রণেতা হুসৈনিক দীনবন্ধু মিত্রের উদ্যোগে এবং নদীয়াধিপতি মহারাজা বাহাদুর সতীন্দ্র প্রসাদের দেহান্তে কলকাতায় এক শোক-সভা আহ্বান করিয়া স্বর্গীয় মহারাজার স্মৃতিরক্ষা করে—যহ অর্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার ‘হরিকল্প স্মৃতি রক্ষা ত্রুতারা’ শ্রেণি করেন। এইরূপে আমরা ‘নীলদর্পণের’ অপর গ্রন্থকার দীনবন্ধু মিত্রকে (যিনি তখন নদীয়ার পোষ্ট হুপারি-রিক্টেডেট পদে বিদায়িত ছিলেন) নীলকর পীড়িত প্রজাকুলের অকৃত্রিম হিতৈষী হরিণের পূজার প্রধান পুরোহিত রূপে ঘোষিত পাই। এই সময়ে নদীয়ার হরিণ সম্বন্ধে যে সকল গান উঠিয়াছিল তন্মধ্যে এইমি বিশেষ প্রসিদ্ধ—

ভাসছে মন মনের হরিণে ।

(আগ) গুটে বেত এক হরিণে,

(এখন) বাঁচালে এক হরিণে ।

নুনে নুনে নীল কত জবি ধীল

(এখন) হতেছে তার অচর কলাই পরিবে ।’

প্রথম — (হরিণ নীল কুসীর এক অত্যাচারী কর্মচারী)

দ্বিতীয়—(হুসৈনিক হরিকল্প বুঝাপাওয়ার)

† Indigo commission ;—W. S. Seaton—Karr, Esq. C. S.

লাল চৌধুরীর সাক্ষ্য মাননীয় বঙ্গেশ্বর বাহাদুর বিশেষ উল্লেখ বোধ্য বলিয়া প্রাণশ্রম করেন। *

এদিকে যখন কমিসন প্রজাগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন সদাশয় বঙ্গেশ্বর এ্যান্ট মহোদয় কার্যতত্ত্ব ব্যাপদেশে নদীয়া ও বশোহর মধ্যে প্রাণহিনী “কুমার” ও “কালী গঙ্গা” দিয়া দীয়ার আয়োজনে গমন করিতেছিলেন। তিনি বলেন “তখন নদীতীরে দলে দলে প্রজাগণ সমবেত

—President. R. Temple. Esq. C. S, Member. Rev. J. Sale, to represent the interests of the rayats in the committee, and the missionaries. W. F. Fergusson Esq. nominated by the Indigo Planters' Association to represent the interest of that body and Babu Chandra Mohan Chatterjee nominated by the British Indian Association to represent the Landholders, interest.

* “Babu Joychand Pal Choudhury—a great Zemindar, who is or was a great indigo planter (having had thirty two concerns in his Estate and shares in 9 other concerns) is asked “If the rayats have for the last twenty years been unwilling to sow indigo, how then have they gone on cultivating the plant up to the present time”? To this he answers “by numerous acts of oppression and violence, by locking them up in godowns, burning their houses, beating them etc” The whole of this gentleman's evidence is very instructive as proceeding from a great Zemindar and practical native indigo planter. This diluted into becoming official language, I find to be the conclusion of the commission and it is certainly the inevitable deduction from the whole body of evidence.”

Minute of the Ltnt. Governor on the Report of the Indigo Commission. Para 40.

হইয়া আর নীল বুনিব না আপনি অনুবতি করুন এই কাতর প্রার্থনা উপস্থাপিত করে।” *

এইকালে বর্গীর দীনবন্ধু মিত্র কর্তৃক “নীলদর্পণ” প্রকাশিত হইল। নীলদর্পণ প্রকাশ হইয়া মাত্র দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল।

এই নীলদর্পণের ইংরাজি অনুবাদ ব্যাপার লইয়াই সুবিখ্যাত জেমস লঙ সাহেব ও মাহুয়েল সাহেবের ঐ পুস্তকের অনুবাদক ও প্রকাশক বলিয়া কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হয় ইহা লইয়া সে সময়ে দেশে হলদুল পড়িয়া যায়।

এইরূপে নীলদর্পণের শেষ ববনিকা পতন হইল বটে, কিন্তু এ বিষয় লইয়া বহুদিন ধরিয়া গবর্ণমেন্টের বহু কাগজ, কলম, কালী ব্যয়িত হইয়াছিল। †

* “On my return a few days afterwards along the same two rivers, from dawn to dusk, as I steamed along these 2 rivers for some 60 or 70 miles, both banks were literally lined with crowds of villagers, claiming justice in this matter. Even the women of the villages on the banks were collected in groups by themselves; the males who stood at and between the river-side villages in little crowds must have collected from all the villages at a great distance on either side. I do not know that it ever fell to the lot of any Indian officer to steam for 14 hours through a continued double street of suppliants for justice; all were most respectful and orderly, but also were plainly in earnest. It would be folly to suppose that such a display on the part of tens of thousands of people, men, women, and children has no deep meaning. The organisation and capacity for combined and simultaneous action in the cause, which this remarkable demonstration over so large an extent of country proved, are subjects worthy of much consideration.”

Vide Sir J. P. Grants Minute of 17th Sept 1860.

† Vide the different Minutes and the animated correspondence that ensued between the Government of India and Sir, J. P. Grant.



বঙ্গেশ্বৰ পিটার গ্ৰাণ্ট ।



ডব্লু এম্. সিট্‌নকৰ ।



ৰেভাঃ, জেম্‌স্‌ লং ।



দীনবন্ধু মিত্ৰ ।

নদীয়া-কাহিনী ।

পরে বহু বাহাদুরীদের পর মহামান্ন সদাশর প্রজাপালক গবর্ণমেন্টে, বাহাতে অসহায় প্রজাগণের উপর অবশ্য অত্যাচার না হয় এবং তাহাদের নিজ নিজ সম্পত্তিতে নিজের স্বত্ব স্বামিত্ব সম্পূর্ণ বজায় থাকে এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত ই, জ্যাকসন্ সাহেবকে নদীয়ার অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। এ সময়ে সন্তদর ডবলিউ, জে, হারসেল্ সাহেব নদীয়ার হারী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। সদাশর গ্র্যান্ট মহোদয় নদীয়ার কেবল অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; বাহাতে সুদূর মকঃবলেও অত্যাচারী নীলকর বা জমিদার অসহায় প্রজাগণকে উৎপীড়ন করিতে না পারে এবং বাহাতে প্রত্যেক প্রজা সহজেই রাজদ্বারে বিচার প্রার্থনা করিতে পারে সেই নিমিত্ত সমগ্র নদীয়া ডিভিসনকে—বাহা এক্ষণে প্রেসিডেন্সী ডিভিসন বলিয়া খ্যাত—করেকটী

মহামান্ন বজেশ্বর সার জন্ পীটার গ্রান্ট মহোদয়ের ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখের মন্তব্য (Minute) পাঠ করিলে নীল গোলোবেগোর সকল কথাই জানা যায়; এই রিপোর্টে সবিস্তারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছিল :—

“The Report gave an account of the various systems of Indigo cultivation existing in Bengal and Bihar; and divided the subjects of inquiry into three heads; (1) the truth or falsehood of the charges made against the system and the planters.

(2) The charges required to be made in the system; as between manufacturer and cultivator, such as could be made by the heads of the concerns themselves.

(3) The changes required in the laws or administration, such as could only originate with, and be carried out by, the legislative and executive authorities.

Vide Bengal under Ltnt Governors

By C. E. Buckland Esqr I, C, S CIE.

সবভিত্তিসনে বিতক্ত করিয়া* উহা এক এক জন ডেপুটীর অধীন করেন এবং প্রত্যেক সবভিত্তিসনের হেড কোয়ার্টার, গমনাগমনের সুবিধার্থ রেল, নদী বা বহুংরা জবজ্বাল সন্নিবিষ্ট স্থাপনা করেন। এইরূপে পূর্ববর্তী কালোপেক্ষা বিচারালয়ের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইলেও দেশের লোকের প্রতি অনুভবী প্রজাকুল অত্যন্তারী

যাহারা নীলগোলোবোগ সম্বন্ধে সবিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাহেন তাঁহার শ্রীযুক্ত বাকল্যাণ্ড বাহাদুরের “বেঙ্গল আণ্ডার লেন্টেন্যান্ট গবর্নরস” মিঃ, সিউন-কর প্রমুখ নীল কমিসনরগণের সবিস্তারিত রিপোর্ট বঙ্গের আণ্ডার বাহাদুরের ঐ রিপোর্টের উপর মন্তব্য, ঐ ব্যাপার সংক্রান্ত মহামাত্র ইণ্ডিয়া গবর্নমেন্ট ও বেঙ্গল গবর্নমেন্টের শত শত পত্রাদি এবং সুবিখ্যাত নীলবন্ধু মিঃের পুত্র ললিত মোহন মিত্র প্রণীত ‘ইণ্ডিগো ডিস্টারবেন্স ইন্ বেঙ্গল’ প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিবেন। এই নীল হান্সামার কিছুকাল পরে নানা কারণে বিশেষ বৈজ্ঞানিক উপারে নীল প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইলে দেশ হইতে নীলের আবাদ একরূপ উষ্ণিরাগিরাছে, নীলকর সাহেবগণের কেহ কেহ এক্ষণে নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার, তাঁহাদের সদর ব্যবহারে তাঁহাদের প্রজাগণ এক্ষণে সুখে আছে !

* In 1860, the Government of Bengal undertook the rearrangement of subdivisions in the districts throughout the Province, making a commencement with the Nadia (now the Presidency Division). No more important measure, with a view to bringing justice home to the doors of the people, was ever undertaken. The views of Government were contained in a resolution of the 7th November of the year. * * Subdivisions were placed (as was the case with Khulna) where perhaps some man of influence and power hapend to reside, who misused his position; or in the centre of some distant part of an unusually extensive district; * * On the otherhand, some of the older subdivisions had been constituted in large towns or marts, places of intrinsic and permanent importance; and such positions were in their nature fixed.

Bengal under Ltnt Governors

জমিদারের হস্ত হইতে যেমন নিষ্কৃতি পাঠতে লাগিল তেমনই বেমে পড়িয়া মকদ্দমা ঢালাইবার কোঁক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। *

পূর্ব হইতেই নদীয়ার সবভিত্তিসনের জায় ২। ১ টী ক্ষুদ্র : বিভাগ ছিল বটে + কিন্তু ১৮৬০ অব্দে মহামতি প্রাপ্ত নদীয়া বিভাগকে রীতিমত চারিটা ডিষ্ট্রিক্ট ও ১৮টা প্রধান-সবভিত্তিনে বিভক্ত করেন এবং এই ১৮টা সবভিত্তিসনের ১৮টি মহকুমা নির্দিষ্ট করেন ;—১। কুষ্টিয়া, গঙ্গা ও ই, বি, এস, রেলওয়ের উপর অবস্থিত। ২। মেহেরপুর। ৩। বিনোদ—নবগঙ্গার উপর। ৪। চুয়াডাঙ্গা—ই, বি, এস, রেলওয়ের উপর। ৫। কুষ্কনগর (সদর)। ৬। মাগুরা—নবগঙ্গার উপর। ৭। কোটচাঁদপুর—রেলওয়ে হইতে পাকা রাস্তার উপর। ৮। নড়াইল। ৯। যশোহর (সদর)। ১০। বনগ্রাম—সরকারি বড় রাস্তার উপর। ১১। শান্তিপুর—(বর্ডমান রাণাঘাট)। ১২। খুলনা এখন খুলনা সদর। ১৩। সাতক্ষীরা। ১৪। বসিরহাট। ১৫। বারানত। (এই নামের ডিষ্ট্রিক্ট এই সময়ে উঠাইয়া

* In 1796, there was only one Civil Court and one covenanted English officer. In 1800, there were 39 courts and two covenanted English officers in Nadiya. In 1883, there were 26 magistrial courts and of revenue and Civil 18, with four covenanted English officers.

Vide Hunter's Imperial Gazetteer Vol X.

‡ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের নীল কবিলনে সাক্ষ্য বিবাহ কালে নদীয়ার তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট হারনেল সাহেব এইরূপ বলেন :—

প্রশ্ন—“Previous to this year what number of Deputy and Asst. Magistrates were in this District, besides the Magistrate ?

উত্তর—“There was one Subdivision in Kareempur and another at Santipur ; and in the latter part of 1859 one was established at Damurhuda. and since then another at Bongong.

দিয়া উহাকে সন্মতিভাজন করা হয়)। ১৬। আলিপুর (সদর)। ১৭। পেট' মাতলা (বর্তমান বারুইপুর)—কলিকাতার বাইবার রাজ্যের উপর। ১৮। ডায়মণ্ডহারবার। এতদ্ব্যতীত বারাকপুর ও দমদম ক্যান্টনমেন্টকে ২টি ক্ষুদ্র সন্মতিভাজন করিয়া দুইজন জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীন করা হয় ও শিয়ালদহে একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রাখা হয়।

এতদ্ব্যতীত কুষ্টিয়া, বেহেরপুর, ককনগর, চুয়াডাঙ্গা, শাহিপুর ও বনগ্রাম লইয়া ক্ষুদ্রাকারে নদীয়া জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। নদীয়ার বিস্তৃতি পূর্বে মুসলমান শাসনে বাহা ছিল এ সময়ে তাহা পেন্কা বহু হ্রাস করা হয় এবং পরবর্তী কালে বনগ্রামকে বশোহরের অন্তর্গত করার ক্রমে উহা আরও ক্ষুদ্র কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছে এবং নদীয়ার রাজস্বও এই কারণে কমিয়া গিয়াছে।

পূর্বোক্ত উপারে ১৮৬২ অব্দে হিতকামী রাজার প্রজারক্ষার কল্যাণকর বিধানে নদীয়ার এবং অন্যান্য নীলকর প্রদীক্ষিত জেলার আভ্যন্তরীণ শান্তি পুনস্থাপিত হইলে, সার সিংস্‌ বিভিন্ন সাহেব বাহাদুর বন্দেব শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন। ইহার ৫ বৎসর কাল ব্যাপী রাজস্ব কালের মধ্যে নদীয়ার এক সদর বিদায়ক হৃদৈব উপস্থিত হয়। এই বৎসর নদীয়ার বিভিন্ন গ্রাম সমুদায়ে বিশেষতঃ নিম্ন ও আত্র জমিতে এক প্রকার রোগের উৎপত্তি হয় বাহা ক্রমে মহামারী আকার ধারণ করিয়া গ্রামকে গ্রাম জনহীন করিয়া দিয়াছিল। যে পবিত্র ধাম পূর্বে বাহ্য ও উৎকৃষ্ট জল বাধুর লব্ধ সুবিখ্যাত ছিল—যে নদীয়ার পূর্বকালে ইউরোপীয়গণও বাহ্যোন্নতির নিমিত্ত আগমন করিতেন—যে স্থানে প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে ভগ্নবাহ্য পুনর্গঠনের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া বহুদূরী চিকিৎসকগণের ব্যবহাভ্যবহারী তদানীন্তন ইংরাজ কোম্পানীর

Vide Minutes of evidence taken before the Indigo Commission at Krishnagar. Para 2867.

*The area of the district is at present smaller by third than it was in 1790. Land Tax was £ 13;593 in 1850, £ 117449 in 1870 and £ 91105 in 1883—84.

Hunter's Imperial Gazetteer. Vol X.

পূৰ্ণৰ বাহাদুৰ আসিয়া বৰ্ষদিন বাপন কৰিরাছিলেন * এবাং সে নদীয়াৰ উৎকৃষ্ট জল বায়ু হইতে তাঁহাৰ বিনষ্ট স্বাস্থ্য পুনৰ্জাত কৰিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া কিছুদিনে আবার তিনি যোগগুৰু হইল নদীয়াৰ পুনৰ্জাগমন কৰিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, † সেই স্বাস্থ্যময় ভূবৰ্গ নদীয়া এই সময় মহামারীৰ দাক্ষণ কবলে এক মহা ক্ষণানে পরিণত হইয়াছিল । যে দিকে তাকাইবে সেই দিকেই কেবল বিষাদপূৰ্ণ শোকের দৃশ্য । রাত্তা ঘাট জনহীন—কিচিং চুই একজন বৈজ্ঞ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন কৰি-

* January 3rd. 1713 A. D.

The Governor having for several months been very much indisposed and being advised by the physicians to go up to Nadyia for change of air as the only means left for the recovery of health. Agreed that during his absense the worshipful Robert Hedges Esq. act as chief and transact all affairs with the rest of the Council and also take charge of the cash. —Ordered that the doctor go with the Governor and considering the troubles in this Country that Captain Woodvil with fifty soldiers go as guards

Wilson's Early Annals of the English Vol. II page 96.

† February 23rd. 1713 A. D.

The Governor not being perfectly recovered of his illness and begining to relapse which the doctors impute to the difference between the air of this place and Nadyia where he has lately been for the recovery of his health and therefore advice him to go up thither again.

Ordered that thirty soldiers go up with the Governor as a guard, also that several of the Company's servants who are now indisposed go up with the Governor for the recovery of their health. Mr Hedges act as chief.

Vide Abstract of Letters from Bengal to the Court of Directors also Wilson's Early Annals of the English. Vol II page 96.

ভেঁহে অথবা শিবাকুল ও সারসের সম্প্রদায় অশ্রম হইতে বা গৃহ হইতে শব দেহ সংগ্রহ করিয়া ভীষণ কোলাহল করিতেছে। প্রথম প্রথম লোকে শবদ্বি অশ্রমে লইয়া দাহ করিতেছিল কিন্তু ক্রমে শব সংখ্যা বৃদ্ধি পায় অশ্রমে আর স্থান না পাইয়া বেধানে সেখানে দাহ করিতে বা বৃদ্ধিকাত্য-স্তরে প্রোথিত করিতে থাকে। ক্রমে যখন সকলেই রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল তখন আর কে কাহাকে অশ্রমে লইয়া বার—কাজেই লোক গৃহাত্যস্তরে সরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। গ্রামস্থ ২।১ জন বাহারা কোনরূপে নিজের পাইতে লাগিল তাহারা ধনসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া গ্রাম লইয়া পলায়ন পন্ন হইল। এইরূপে কত গোণার সংসার অশ্রমে পরিণত হইল—কত বড়িক পন্নী, জনহীন ও শ্রীহীন হইয়া পড়িল এবং কত শত শত গ্রাম, শিবাকুল ও শকুনী-গৃহিনী-শিশুদের ক্রীড়া ভূমিতে পরিণত হইল। এইরূপে যে সমস্ত গ্রাম শ্রীহীন হইয়া পড়িল নদীয়ার সমুদ্র সোতায় প্রাচীন গ্রাম বীরনগর তাহাদের মধ্যে প্রথম উল্লেখ যোগ্য * জন সাধারণের মধ্যে প্রবাদ আছে যে এই বীরনগরেই প্রথম অকৃত্ত তিথি নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে, একটা শব বাহকপণের স্বরূপ হইতে স্থানিত হইয়া বৃত্তিকার পতিত হওয়ার নদীয়ার এই দারুণ দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়। এখনও আমরা নদীয়াবাসী সন্ধ্যার অন্ধকার পাড় হইলে প্রাচীনের নিকট একাগ্রমনে কত বিতীৰ্ণিকা মর কৃত্ত শিশুটি এই জনহীন বীরনগরের অবীরোচিত কাহিনী শ্রবণ করিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠি। কতদিন গভ হইয়াছে কিন্তু বীরনগরের স্বাভা বা পূর্বাশ্রী কিছুই প্রত্যাবর্তন করে নাই; এখনও বীরনগরের শ্রীহীন অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলে সেই মহামারীর নিদারুণ স্মৃতির অশ্রুট ছাড়া কিছু কিছু উপলব্ধি হয়।

১৮৬২ সালের শেষভাগে এবং পরবর্তী কালে যখন এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি

* A fever of a mixed character made its appearance in a severely epidemic form at Birnagar in 1856, and at Huns-khali, Chakdah and Santipur, extending to Kanchrapara, Naihati and Tribeni.

Hunter's Statist. Account Vol. II. page 189.

নদীয়াতে কবলিত করিয়া বশোহর বায়াসাত বর্ধমান, হুগলীর দিকে অগ্রগর হইতে আরম্ভ করিল; * এবং সেই সেই স্থানে ও অসম্ভবরূপ লোককর করিতে আরম্ভ করিল তখন গবর্ণমেন্ট আর দ্বিগ্ধ থাকিতে না পারিয়া ডাক্তার জে, ইলিগট নামে একজন বিচক্ষণ চিকিৎসককে এই সর্বনাশী ব্যাধির কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয়ে নিযুক্ত করিলেন। ডাক্তার ব্যাধিগ্রস্ত স্থান সমূহ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই তবে তাঁহার নিদেশানুযায়ী অনেক গ্রামে জলবাধি কর্তন করিয়া বা দাহ করিয়া পুণিস সাহায্যে পুষ্করিণী প্রভৃতি কেবল পানীয়র নিমিত্ত নির্ধারণ করিয়া ও ডোবা ও বৃহৎ গর্ত্তাদি পরিপূরিত করিয়া এবং গ্রামাদিত জল নিকাশনের ব্যবস্থা করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা হইয়াছিল বটে কিন্তু রোগ দমনে এ সকল অতি সামান্যই কার্য্যকরী হইয়াছিল। কারণ পরবর্তী কালে বিশেষতঃ ১৮৮১ অব্দে

* It began to rise about ten years ago (1862) in Jessore and Nadiya and caused much consternation and havoc in several parts of the 24 Pargannas, and in 1864—65 crossed the Hugly district. In 1866 it appeared in the eastern and southern Parts of the Burdwan district. During 1867—68 it continued to prevail and spread in these districts along the course of the Damodar river and 1867 the town of Burdwan was attacked and many places in both districts suffered severely. In 1870 the type and mortality were not so severe, but in 1871 fever broke out with renewed violence, and was more wide-spread and fatal than ever. It also extended to the parts of Birbhum and Midnapur bordering on Burdwan and Hugly. The disease commenced in July and continued to cause more serious sickness and mortality throughout the whole of the cold season of 1871—72. The year 1871 closed with the epidemic in full sway throughout large portions of Birbhum and Midnapur.

Backlands' Bengal under the Lieut. Governor page 505.

নদীয়ার ইহার প্রেক্ষাপ ও প্রত্যাপ অত্যাধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইরাছিল এবং বৃহৎসংখ্যা একেবারে চরমে উঠিয়াছিল। এক শত জনের মধ্যে ন্যায্যিক ৬০। ৭০ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। দেশের বিত্তীয়ব্যয় হৃদয় বিদারক সেই শোকের ছবি ধর্ণনা করিতে হস্ত হইতে লেখনী স্থগিত হইয়া পড়ে। এই সময় সদাশর গবর্ণমেন্ট অত্যাধিক প্রজাহানী দর্শন করিয়া সবিশেষ বিচলিত হইয়া উঠেন এবং বৃহৎসংখ্যক চিকিৎসক ও ঔষধ দাতব্য হিসাবে গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করেন, কিন্তু কোনরূপেই এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস করিতে না পারিয়া ইহার কারণ নির্দেশার্থ ১৮৮১ অব্দে এক কমিসন নিযুক্ত করেন। কমিসন সমগ্র শীতকালে গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া অসিদ্ধার ও জনসাধারণকে বিতরু পানীয়ের উপকারিতা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অন্তান্ত উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহারা পরিশেষে নমুনা প্রকাশ করেন যে ব্যাধির কোন বিশিষ্ট কারণ নির্দেশ হইতে পারে না—তবে সংক্ষেপতঃ বলা যায় যে, জনসাধারণ নিজে নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে এবং লোকাল বোর্ড গ্রামাদি স্থানে মনোযোগী হইলে কালে এ ব্যাধি দেশ হইতে বিদূরিত হইতে পারে। এই সময়ে নদীয়ার মধ্যস্থল দিয়া ইষ্টারণ বেঙ্গল রেল লাইনের নিমিত্ত মৃত্তিকা নিক্ষিপ্ত হওয়ার অনেকের মনেই এই ধারণা হয় যে রেলের উচ্চ ভূমির দ্বারা জল নিষ্কাশনের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হওয়ায় এই দারুণ ব্যাধি উৎপন্ন হইয়াছে * কিন্তু কমিসন তদন্তে প্রকাশ করেন যে রেল ও রাস্তা প্রভৃতিতে জল নিষ্কাশনের যেরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত তাহা অবিকাংশ স্থলে বিশিষ্টরূপ বর্তমান থাকায় ইহা ব্যাধির কারণ হইতে পারে না। পরিশেষে সমগ্র বিষয় অনু-
ধাবন করিয়া বঙ্গেশ্বর সার জি, কাম্বেল বাহাদুর ১৮৭১ অব্দে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে “উন্নতিশীল বৈজ্ঞানিক উপায়ের সহায়তার দ্বারা এই ব্যাধি প্রশমনে যতই কেন প্রয়াস পাই না এখনও চিকিৎসা শাস্ত্রে

* Raja Diganwar Mittra had strenuously ascribed it to obstructed drainage but his facts and deduction were called in question.

Bucklands' Bengal under Lt. Governors.

এখন কোন উপায় উদ্ভাবন হয় নাই এবং বহুদিনেও হইবে কিনা জানিনা যদ্বারা দেশ হইতে এই ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিতে পারা যাইবে।† এই রূপে বহু বর্ষ ধরিয়া এবং ক্রমান্বয়ে বঙ্গের সার সিঙ্গল বিডন, সার উইলিয়ম গ্রে, সার জর্জ কাডেল, সার রিচার্ড টেম্পেল এবং সার এন্সলি ইডেন বাহাদুরের শাননকাল পর্যন্ত বেশ বিকৃত করিয়া এখন দারুণ ম্যালেরিয়া রূপে ইহা সমগ্র বঙ্গবাসীর অস্থি মজ্জায় প্রবেশ পূর্বক জীবনের দারুণতম শক্তি সামর্থ্য হরণ করিয়া দেশে সম্ভবাতীত অকাল মৃত্যুর আকর স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। জানিনা কত দিনে কিবা আদৌ কখনও বঙ্গবাসী ইহার করাল কবল হইতে পরিজ্ঞান লাভ করিবে কি না ?

সার সিঙ্গল বিডন মহোদয়ের আর এক চিরস্মরণীয় কীর্তি ১৮৬৪ অব্দে মফঃস্বলের মিউনিসিপালিটি ও দাংবা চিকিৎসালয় স্থাপন। দেশের স্বাস্থ্য এই সময়ে একেবারে নষ্ট হইয়া যাওয়াত তিনি জেলায় প্রধান প্রধান স্থানে মিউনিসিপালিটি স্থাপনে মনোবেগী হইলেন। তদনুসারে ঐ বৎসর ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে নদীরা জেলার সর্ব প্রথম রাণাঘাটে এবং ১লা নবেম্বর তারিখে কৃষ্ণনগরে দুইটি আদর্শ মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হয়, পরে ঐ দুইটির দ্বারা সম্ভোবজনক কল লাভ হইলে ১৮৬২ সালের ১১ জাম্বুয়ারী শাব্দিক পূরে ও ১৮৬৯ সালের ১লা এপ্রিল নদীরা, কুটরা, কুমারখালি, বীরনগর, মেহেরপুর এবং পরিশেষে ১৮৮৬ অব্দের ১লা মে তারিখে চাকদহে এক একটা মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হয়। এবং ১৮৬০ অব্দে কৃষ্ণনগর দাংবা

† The observation of the disease seem, however to show that it creeps over the country, taking hold in many cases of highlands and low lands alike and after a period of retaining its hold in a way, which seems to indicate, if not continuation or infection atleast of some kind of local progress in which we do not understand. And however we may mitigate the disease by drainage or other engineering expedients there is still much for medical science to discover before we can understand it so as to cope with it effectually."

Sir G. Campbell.

চিকিৎসালয় ১৮৬৩ অব্দে স্থাপিত, ১৮৬৪ অব্দে রাণাবাটে ও চাকমাহে চুয়াডাঙ্গার ১৮৬৮ অব্দে মেহেরপুরে ১৮৬৯ অব্দে বীরনগরে ১৮৭০ অব্দে কুড়ালগাছিতে ও শান্তিপুরে এক একটা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়।

সার সিসিল বিডন বাহাদুরের শাসনকাল নানারূপে নবীরায় স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ইহারই সময় ইষ্টারন বেঙ্গল রেলওয়ে কলিকাতা হইতে নবীরায় উত্তর সীমা কুঠিয়া পর্য্যন্ত রেল খোলা হয়। কার্য্যতঃ এই রেল পুলিশার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে ১৮৫২। ৫৩ খৃঃ অব্দে ইহার নিমিত্ত প্রথম প্রস্তাব উত্থিত হয়, তদনুসারে ১৮৫৪ অব্দে লেক্‌টেন্যান্ট গ্রেট হেড নানক একজন দক্ষ এন্‌জিনিয়ার কলিকাতা হইতে ঢাকা, তথা হইতে চট্টগ্রাম ও তথা হইতে আকোরাব পর্য্যন্ত জরীপ করিতে নিযুক্ত হইলেন। ইতি মধ্যে মিষ্টার পাউন নামে একজন এন্‌জিনিয়ার কলিকাতা হইতে কুঠিয়া পর্য্যন্ত পথের এক নক্সা ও পল্লার উপর একটা ব্রীজের আদর্শ অঙ্কন করিয়া গবর্ণ-মেন্টে পেশ করেন, তদনুসারে ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ৩০ এ জুলাই ১৮৭৫৯৬৭২ পাট ও মূলধনে লগুনে ইষ্টারন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী গঠিত হয়, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩১ মে ডিসেম্বর তারিখে ঐ পথের কন্ট্রাক্ট বিলিয়ার পরে ১৮৬২ অব্দের ১৬ নভেম্বর তারিখে ঐ পথে প্রথম বাজী গাড়ী চলিয়াছিল। পরে পরবর্তী শাসনকর্তা সার রিচার টমসনের সময় ১৮৭৭ অব্দের ১ লা এপ্রিল এই রেল গবর্ণমেন্টের খাস অধীনে আইসে এবং ইহার ইষ্টারন বেঙ্গল ট্রেট রেলওয়ে নাম করণ হয়। যে দিন প্রথম এই রেলপথে কোচ-শকট চলিয়াছিল সে দিন এক অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। মলে মলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা ছুর সুরাস্তর হইতে আসিয়া লাইনের দুই ধার প্রৌণিক হইয়া গাড়ীর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া থাকে এবং অনেককেই বিরূপ কোচ শকট অতলোক ও গাড়ী লইয়া অত ক্রম আসিবে সে বিষয়ে বিলম্ব সন্দেহ প্রকাশ করিতে থাকে। তাহাদের মধ্যে বাহারা পূর্বে ই, আই, আরের গাড়ী দেখিয়াছে তাহারা অনেক বুঝাইলেও অজ্ঞাত সকলে কিছু-তেই বতকণ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ না করিয়াছিল ততকণ এই অপূর্ব ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। পরে যখন বংশীধ্বনি করিয়া প্রথম গাড়ী দেখা দিল—ঐ সমবেত সোৎসুক জনসমূহ বিশেষ কোতূহলী হইয়া

আমল্য মিশ্রিত এক কোলাহল উত্থাপিত করিল এবং জীলোকগণ কল্যাণ সূচক হলুধ্বনি দিতে লাগিল। এইরূপে ই, বি, লাইন প্রথম কোহুলী জনসমূহ কর্তৃক সম্বদ্ধিত হইয়া দেশ মধ্যে ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া আসিতেছে। যখন প্রথম ই, বি, লাইন খোলা হয়, তখন গাড়ীতে প্রথম, বিতীরা, তৃতীয় ও চতুর্থ এই চারি শ্রেণী বিদ্যমান ছিল। জীলোকগণের নিমিত্ত স্বতন্ত্র গাড়ীর বন্দোবস্ত থাকিলেও সমুদ্র বন্দর জীলোকগণ সাধারণের সহিত তখন গাড়ীতে উঠিতেন না তাঁহাদের পালকী, গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়া হইত;—তখন নদীয়ার মধ্যে কাঁড়াপাড়া, চাঁদহ, বাগাঘাট, বগুলা, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া এই কয়টা টেবনে প্রধানতঃ যাত্রী ও মাল গতায়াত করিত।

১৮৬৪ অব্দে এই অক্টোবর এক দৈব দুর্ভিক্ষকে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ বিধ্বস্ত হইরাছিল। আন্নামান ধীপ পুঞ্জের নিকট হইতে এক আবর্জনাময় মহা ঝটিকা উৎখিত হইয়া বঙ্গাবর উত্তরমুখে ঘণ্টায় ২৬ মাইল বেগে ধাবিত হয়। উহা বাঙ্গালা ১২৭১ সালে আখির মাসে সংঘটিত হওয়ার “একাত্মের ঝড়” বা “আখিরে ঝড়” বলিয়া খ্যাত। অতি বৃদ্ধের মুখেও শুনা যায় এরূপ ভয়ঙ্কর ঝটিকা তাঁহারা কখন গল্পও শুনে নাই। যদিও ১৮৪২ অব্দ এবং ১৮৫২ অব্দের মে মাসে দুইটা প্রবল ঝটিকা সংঘটিত হইরাছিল কিন্তু এরূপ সর্বধ্বংসী, সর্বনাশী ঝড়ের সহিত তুলনার সে দুটা কিছুই নহে। তখন মাত্র রেল খুলিতেছে, লোকে তখনও নদী দিয়াই দেশ দেশান্তরে গমন করিতেন। বিশেষতঃ পূজার সময় যিনি যেখানে বিশেষে ছিলেন সকলেই নৌকাযোগে নিজ নিজ জন্ম ভূমিতে আগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পূজার পঞ্চমী দিনে বেলা ১০টা হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা ৪টা অবধি ভীষণরূপে ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া ও কয়লা বার্ষপাতে এক মহা প্রলয়ের সূচনা হইরাছিল এবং নদী বঙ্গের সমস্ত নৌকা ও জাহাজ একেবারে চিহ্ন রহিত হইয়া ধ্বংস হইরাছিল। প্রতাপনের সেই ভৈরব ভীম মূর্তি, স্বভাবের এই অস্বাভাবিক আক্রোশ, সেই সূতীক ভেরী নিনাদ-বৎ কর্ণভেদী হহকার যে কেহ দেখিয়াছে বা শ্রবণ করিয়াছে সে ইহকালে আর ভুলিবে না। এই ভয়ঙ্কর ঝটিকার নদী সকল উৎখলিত হইয়া বে মহা-

প্রাচীন আনয়ন করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে আজিও শরীর শিহরিয়া উঠে ও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। গবর্ণমেন্টের রিপোর্টে প্রকাশ এই প্রাচীন ১৫০০ বর্গ মাইল প্রাচীন হইয়া ৪৭,৮০০ মনুষ্য ১০৬,০০০ গবাদি পালিত পশু, ১,০০,০০,০০০, টাকা মূল্যের কলযানাদি ও ৪,৫০,০০০ টাকা মূল্যের গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি অননুসময়রূপে নষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এই বিপদে সর্বশয় গবর্ণমেন্টে দুঃস্থ, নিরাশ্রয়, নিরস্ত ব্যক্তিগণকে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিলেন। ভগবানের রাজ্যে কিছুই একেবারে ভাল বা একেবারে মন্দ হয় না। এই সর্বনাশী বিপদেও নদীয়ার এক মহান উপকার সাধিত হইয়াছিল। যে ভয়ঙ্কর ব্যাধি, মহানারী আকার ধারণ করিয়া নদীয়ার অগণিত লোকের কালস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা কিছুদিনের নিমিত্ত দেশ হইতে একেবারে দূরীভূত হইয়াছিল। * কিন্তু শীঘ্রই হতভাগ্য দেশ আবার উহার কবলে পতিত হয়।

১৮৬৪ অব্দের মহা ব্যতিক্রম নদীয়া জেলা একরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছিল বলা যায়। বিশেষঃ পর পর দুই বৎসর পর্যন্তাদব কালে বর্ষণ করিতে কৃপণতা প্রকাশ করার শস্তাদির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়।† বর্ষিতা সাধারণতা থা বা নবাব সুলতার সময়ের স্তায় টাকার অষ্ট মণ চাউল আর

* It is on record that "the epidemic fever disappeared entirely after the cyclone of 1864 and there was no return of it in 1865 to attract attention. But it reappeared in 1866 and 1867."

Buckland's B. U. L. G. page 292

‡ The collector of Nadiya reported on the 31st. October that the outturn of rice crop was expected to be less than half that produced in ordinary years; that in some parts of the district the plant was utterly destroyed, so as to be beyond the hope of saving, even in the event of a rain fall, and the cold weather crop was also threatened with comparative failure if the drought should continue.

কখনই বিক্রয় হয় নাই তথাপি লোকে তখনও টাকার একমণ, ত্রিশ সের চাউল অনায়াসে ক্রয় করিত এবং এতদপেক্ষা মূল্যাধিক্য হইলেই বিশেষ কষ্টে পতিত হইত। ১৮৫৯ অব্দের প্রাবনের পর ১৮৬০ অব্দে ২৫০ টাকা মণ চাউল বিক্রয় হওয়ার দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। * এই কষ্ট সাম্য অবস্থার পরিবর্তন হইতে না হইতে দেশে মহা কটিক সাংঘটিত হয় এবং ১৮৬৬ অব্দে দেশে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী করায় বেশে দর্শন দেয়। প্রথমে দীন দুঃখী পরে কিছু দিনের মধ্যে অনেকেই ইহার দাক্ষণ্য কবলে কবলিত হইতে থাকে। যে পরিমাণ চাউল পূর্বে ৩ পয়সা ৪ পয়সা মূল্যে বিক্রিত হইত তাহাই একশে চারি আনা বা পাঁচ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল। কিছুদিন পরে মূল্য দিলেও আর মিলিতেছিল না সুতরাং অনেকের পক্ষ পরিত্যক্ত ভাতের ফ্যান বা আনানী কিম্বা গাছের ডাল, পাতা, মূল সার হইয়া উঠিয়াছিল। গবর্ণমেন্ট যদিও পূর্ন হইতেই বাজার দর প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছিলেন তথাপি কার্যতঃ প্রথমে কোনও সাহায্য প্রদান করেন নাই। পরে যখন চতুর্দিক হইতে বিশেষতঃ নদীয়া কাপাস ডাক্তার মিশিনরীগণের পক্ষ হইতে সক্রিয় আবেদন গবর্ণমেন্টের গোচর হইল † তথা নদীরার কালেক্টরের উপর এ বিষয়ের তদন্ত করিবার ভার পতিত হইল। কালেক্টর বিশেষতদন্ত করিয়া ১৮৬৬ অব্দে ৩০ এপ্রিল

* The highest price to which rice has risen in Nadia district within the last 30 years, excepting in the famine year of 1866 was in 1860 when it rose as high as 7s. 6d. a hundredweight (Rs. 2/12 a mound) or about 3 farthings a pound. The high rates of 1860 were caused by the floods of 1859.

Hunter's Statistical Account of Bengal Vol. II. page 87.

† Rev. T. G. Lincke stated :—that “a certain measure of rice, which some years ago cost 3 or 4 pice, now sells at ten or fourteen pice, which alone is sufficient to account for the present distress of the poor. Were I to tell you of the

যে রিপোর্ট দেন তাহা পাঠ করিলে হৃদয়ে ক্রমশঃ বিদীর্ণ হইয়া যায় ।† এই রিপোর্টের ফলে শীতাই অনেক স্থানে সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপিত হইল এবং

instances of how long many must go without food and what sort of materials they can rive to convert into food, you could not believe it, for it is really incredible and yet it is true nevertheless "

Another missionary the Rev. F. Schuur of Kupasdanga stated that—"Respectable farmers are so much reduced in circumstances that they cannot employ so many day labourers as they used to do in former times and consequently the labouring classes are reduced to the point of starvation. They are now (March 1866) able to glean a little wheat, grain etc. but after a month all the crops will have been gathered in when nothing can be obtained by gleaning in the fields. They are now thriven upon roots, berries, etc for their chief support and when that supply is exhausted, they will be forced to eat the rind of trees, grass etc. I never witnessed such misery in my life.

Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. II. page 89.

† The collector on the 30th April, 1866, reported that the suffering was much less in the neighbourhood of Kustia and Choudanga and Meherpur than in other parts. Regarding the rest of the district the collector stated, all accounts agree, that there is great distress. There is no famine, for grain is to be had, but there is very little money to buy it at the prevailing prices. For some months the poor (and in this word I include all most all the working classes) have not had more than one meal a day and it is to be feared that many have not had even that. Nor can there be any doubt that there is a good deal of illness ; and I am afraid, there have already been a few deaths owing to a want of sufficient food for so long.

Hunters' Statis. Acc. Vol. II. page 92.

মলে মলে হুঃহ পরিবার আগিয়া সাহায্য প্রার্থী হইল। কিন্তু পরবর্তী জুন মাসে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ সমধিক বৃদ্ধি পাওয়ার সন্ধ্যায় গবর্ণমেন্ট প্রকার কষ্টে অস্থির হইলেন, তখন বহুস্থানে অন্নহজাদি স্থাপন করা হইল এবং কর্ণ-কৃৎন ব্যক্তিগণকে কাপড় বুনাইরা লইয়া সাহায্য দান করা হইতে লাগিল।* এই বাণায়ে গবর্ণমেন্টের মোট ২৪৫০ পাউণ্ড (৩৬৭৫০) টাকা এবং সাধারণের টানার ১১০০ পাউণ্ড (১৬৫০০) টাকা অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। আগষ্ট মাস হইতে আরম্ভ করিয়া অক্টোবর মাসেই এই দুর্দৈবের প্রকোপ মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হয় ও ক্রমে ক্রমে আবার শস্তাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতে আরম্ভ করে। তদনুসারে চলিত চতুর্বিংশতি সরকারী সাহায্য ভাণ্ডার ও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেসরকারি ভাণ্ডার ক্রমে ক্রমে বন্ধ করা হয়। এইরূপে মহামান্য গবর্ণমেন্টের সদাশয়তার ও বহু নদীয়ার লে দুর্দিন গত হয়। তদবধি এইরূপে প্রবাসির দুর্খল্যাভাবনতঃ বখনই দেশে দুর্ভিক্ষ বা অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় তখনই প্রবাসীরা প্রার্থী অপেক্ষা অধিক কষ্ট হয় মরিয়া গৃহস্থগণের সাহায্য সমাজে ভজন্যে অভিহিত কারণ সাহায্য প্রবাসীরা ন্যায় কারিক পরিপ্রবে তাঁহারা অনভ্যস্ত আবার অক্ষয়তা বশতঃ তাঁহাদের পক্ষে উপার্জনের অন্য পন্থাও বিরল, এক্ষেত্রে ১৮১০টি পোষা লইয়া, পুত্রাদির লেখাপড়া শিখাইয়া কস্তাদির সংপাত্রে বিবাহ দিয়া “ভজ্ঞতায়ে” সংসার চালান তাঁহাদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠে।†

* East of the Hooghly the District most afflicted with famine was Nadia in which the official courage of Lord Ulick Browne, the collector, secured efficient relief. In June the distress became very severe and money was rapidly expended both in giving employment to those who could work and feeding those who could not. On 18th June about 2,500 persons were employed in the special relief works and 4,000 on public works of all kinds. At the worst time the number fed exceeded 10,000.

Bengal under L. G's. page 353.

† সুখের বিষয় সর্বচ্ছন্দ্রান, হিতকামী, প্রজাপালক হসতা ইংরাজ রাজের প্রকার এই হুঃহ কষ্টের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রজারক্ষাকরে তাঁহাদের বহু ও চেষ্টা সমধিক এমন কি ১৭৮ বিজ্ঞানায় প্রতিবিধান অনুযায় সাধ্যাতীত হইলেও তাঁহার প্রতিকারকরও তাঁহাদের চেষ্টার ফল নাই। কিসে প্রজাসাধারণ হুঃহে থাকে, কিসে প্রবাসির দুঃখ অত্যধিক না হয়, কিসে দেশের সাহায্যভিত্তি হয়, কিসে জল কষ্টাদি দূর হয় এই সমুদয় বিষয়ে তাঁহাদের চেষ্টা

১৮৬৬ অব্দের দারুণ দুর্ভিক্ষের কোপ গ্রন্থন হইতে না হইতেই নদীয়ার আবার এক ভরস্বয় বৈষ বিপাক উপস্থিত হয় উহা সাধারণতঃ ৭৪ সালের বস্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। নদীয়ার বার বার এতই অল প্রাবল উপস্থিত হইয়াছে যে বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত তাহাদের প্রত্যেকের উল্লেখ অসম্ভব। * নদীয়া জেলার এসই নিম্নতম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বর্তমান যে যে বৎসর একটু অধিক পরিমাণে বারিপাত হয় সেই বৎসরেই নদীয়ার বস্তা হয়। এ সম্বন্ধে চলিত পদ "বুটি পক্ষে টাপুর টপুর নদের এল বাণ"—এটা সার্থক লেখা মনে হয়। কারণ টাপুর টপুর অর্থাৎ সামান্য মাত্র বর্ষণ হইলেই নদীয়ার বত বাণ আসে এত আর কুরাপি দৃষ্ট হয় না। বিগত ১৮৬৭ অব্দে নদীয়া ও বশোহরে বেরুণ বস্তা আসিয়াছিল এতদ্ব্যতীত বহুকাল সেরুণ সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু সৌভাগ্যের বিপর ইহাতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বেরুণ ক্ষতি হইবে অনুমান করা হইয়াছিল তাহা হয় নাই। বস্তার জল নামিয়া যাইলে সাধারণতঃ বেরুণ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ভয়ঙ্কর ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পায় সে বৎসর সেরুণ কিছুই হয় নাই।

অসাধারণ এবং এই চেষ্টার ফলেই আজ নদীয়ার বহুখানেকই বায়োগারিতর লব্ধ Anti Malarial Measure এর কার্য, ত্র্যাবাদির মূল্য বৃদ্ধির কারণগুলোর লব্ধ Commission of Enquiry into High prices of Food stuffs, সাধারণ বাহ্যতে অল্প হারে কর্তৃক পায়, সেই লব্ধ গ্রামে গ্রামে Co-operative Credit Society, জলপ্রাচীর নিবারণার্থে যেখানে প্রয়োজন সেইখানেই বাঁধ ও ললকট নিবারণার্থে নদী প্রভৃতি পরিভার রাখিতে অল্প অর্থব্যয় হইয়া থাকে, এই সব দেখিয়া বতই মনে ভরসা হয় যে, এই সুশিক্ষিত ভাষাবান রাজার অকপট যত্নে, উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়েই হউক বা অর্থ ও সামর্থ্য দ্বিরাই হউক দেশের প্রতি মৈত্রেয় প্রকোপও শীঘ্রই দূরীভূত হইবে।

* ইংরাজীকায়ের পূর্বের এতদ্ব্যপেক্ষাণন বিভাগের বিবাসযোগ্য স্বাধীন ইতিহাস না থাকায় তৎপূর্বের দুর্ভিক্ষাদির ও তৎসমিত অসংখ্য লোকক্লেশ, বিপর আবার কিছুই জানিতে পারি না, সুতরাং ইংরাজের দ্রুতকৃত বিবরণী বাহ্যতে এতদ্ব্যপেক্ষে বখন যে ব্যাপারটী ঘটয়াছে তাহা বতই ক্ষুদ্র হউক সুশিবিদ্ধ হইয়াছে তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে বখন ইংরাজীকায়ের পূর্বের ইতিহাসে দুর্ভিক্ষ বা জলপ্রাচীরাদির বিবরণ কিছুই লিখিত হয় নাই তখন ঐ সকল কালে কোনও রূপ দৈবশক্তিজন্য সংঘটিত হয় নাই। পরন্তু ঐ সব কালের বিবাসযোগ্য ইতিহাস থাকিলে আমরা দেখিতে পাইতাম যে ঐ সব কালে দুর্ভিক্ষাদি আরও কঠোরতর দুর্ভিক্ষে লেখা দিত, কেন না তখন এখানকার সত্তম প্রশাসন প্রণালী প্রবর্তিত না হওয়ার রাজার কর্তব্য কঠোর কথা পৌঁছিতে বহু বিলম্ব হইত এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে এত গহন রেল বা জাহাজযোগে চাউলাদি সাহায্য পাঠান অসম্ভব ছিল, প্রাচীরের সময় উপযুক্ত বাঁধ বাড়িয়া প্রাচীর নিবারণে এমন সব সুশিক্ষিত এমজিনিয়ারের প্রত্যয়ক অভাব ছিল। আর বন বন ঐ সকল দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হওয়ার বিবরণে বলা যায় যে এখনও অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জল প্রাচীর প্রভৃতি যে সব কারণে দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হয় তখনও ঐ সকল কারণ সম্পূর্ণ বিদ্যমান ছিল।

১৮৬৭ অব্দের বস্তার পর নদীয়ার পর পর আরও কতকগুলি দৈব
 ছবিপাক সংঘটিত হইয়াছিল। ১৮৬৮ অব্দে বাঙ্গালা ১২৭৫ সনে, ২৯শে,
 ৩০শে, ৩১শে প্রাণ অবিভ্রান্ত বৃষ্টি হইয়া সমগ্র নদীয়া ভাসিয়া গিয়াছিল।
 আবার এই মহাবৃষ্টির প্রেক্ষাপ হইতে উদ্ধার পাইতে না পাইতে পর বৎসর
 অর্থাৎ ১৮৬৯ অব্দে বা বাঙ্গালা ১২৭৬ সনের ২৮ আষাঢ় সমগ্র দিবাভাগ
 বাপি প্রবল ঝটিকার ও বৃষ্টিতে দেশের তরানক অনিষ্ট সংঘটিত হয় এবং
 পুনরায় পরবর্তী ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বা ১২৭৮ সালের দারুণ প্রাণে কত শত শত
 গৃহস্থ নিঃসহায়-সম্পত্তি হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।
 সে বৎসর ভাগিরথীর জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া দুরসিদ্ধাবাদ, নদীয়া ও যশোহরে
 দারুণ প্রাণ আনয়ন করিয়াছিল। দুরসিদ্ধাবাদের পান্থদেশে যে বাধ
 ভাগিরথীর প্রাণ নিবারণের নিমিত্ত বর্তমান আছে তাহা জল বেগে ধ্বংস
 হওয়ার ভাগিরথীর জল ঘোর বেগে নদীয়া প্রাণিত করিয়া পরিশেষে ইষ্টার
 বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের কতিপয় স্থান ভঙ্গ করিয়া যশোহরের দিকে ধাবিত
 হয়। কিন্তু এতদ্বারা নদীয়ার বেরণ কতি হইয়াছিল সেরূপ কতি আর
 কোন জেলায় হয় নাই। যদিও বহু নর নারী এই দারুণ দুর্দৈব বশতঃ
 প্রাণত্যাগ করিয়াছিল বটে কিন্তু গবাদি পালিত পশু এত অধিক সংখ্যক
 বিনষ্ট হইয়াছিল যে তাহা অপরিমিত। গবর্ণমেন্ট স্থানে স্থানে সাহায্য
 করিয়াছিলেন বটে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই কোনরূপ সাহায্য গৃহিত হয়
 নাই। যদিও এই দুর্দৈবে নদীয়ার সমুদ্র কতি হইয়াছিল বটে কিন্তু পর
 বৎসর বস্তাপ্রাণিত ঠাঠ সকলে অত্যাধিক কল উৎপন্ন হওয়ার প্রেক্ষাকালের
 অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল।

ইহার পর কিছুদিন নদীয়াবাসী হীপ ছাড়িতে সমর্থ পাইয়াছিল। কিন্তু
 আবার ১৮৮৫ অব্দে বাঙ্গালা ১২৯২ সনে দারুণ বস্তার সমগ্র নদীয়া ভাসিয়া
 গিয়াছিল। এই প্রাণে ২,২০০ বর্গ মাইল জলাকীর্ণ হইয়া দেশে মহা
 দুর্দশা আনয়ন করিয়াছিল এবং তদুপলক্ষে দুরিগ্রগণের সাহায্যার্থ টাকা
 সংগৃহীত হইয়া স্থানে স্থানে সাহায্য ভাণ্ডার উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। কমিটি
 ঘোট ৬৫,৬৬৫, টাকা টাঁকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তদ্ব্যয়ে সমগ্র হুং
 জেলার সাহায্যার্থ ঘোট ৩৭,০০০, টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল, বাকী অর্থ

ভবিষ্যতে হুর্জিক বা বস্তা পীড়িত বঙ্গের সাহায্যার্থ গবর্ণমেন্টের নিকট গচ্ছিত আছে।

পরবর্তী কালে ১৮২৭ অব্দে ১২ই জুন বাঙ্গালা ১৩০৪ সালের ৩০ তৈাষ্ট তারিখে সমগ্র ভারতবাসী যে মহা ভূমিকম্পন অনুভূত হইয়াছিল তাহারা নদীয়ারও বহু ক্ষতি হইয়াছিল। নদীয়াবাসী অতি আতীনের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহারা কখন গল্পেও এরূপ ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের বিষয় শ্রবণ করেন নাই। এই ভূমিকম্পে কতিগ্রহ হয় নাই এমন দাবীই ছিল না—এই মহা কম্পনের অব্যবহিত পূর্বেই মৃত্তিকাভাঙ্গুর হইতে যে রথচক্রধ্বনিবৎ গুরু গভীর নিনাদ উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করিলে আশিও ভূমিকম্পন উপস্থিত হয়। এই দেশ বাণী ভূমিকম্পে কত নদী শুকাইয়া গিয়াছিল—এবং কত উচ্চ ভূমি ও পর্বতাদি বসিয়া জলাশয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ইয়দা নাই।

এই মহান ভূমিকম্পের পরই নদীয়ার উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ১২০২ অব্দের অক্টোবর মাসের মহাবুড়ি। সপ্ত দিবস ব্যাপী এই মহাবুড়িতে সমগ্র নদীয়া জলপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং অসংখ্য মৃত্যু ও ইষ্টক নির্মিত গৃহ প্রাচীরাদি ভূমিসাৎ হইয়াছিল এবং বাট পথ বন্ধ হইয়া লোকে সশঙ্ক অবস্থায় কালাতিপাত করিয়াছিল।

সংক্ষেপতঃ আজ পর্যন্ত ইহাই নদীয়ার উল্লেখ যোগ্য ঘটনাবলী।



নদীয়ায় বিদ্যাচর্চা।

নবদ্বীপ আবহমান কাল জ্ঞান-গৌরবে গৌরবান্বিত। বিদ্যাচর্চার বিবরণ ও জ্ঞানী মহাত্মার জীবনী লইয়াই নবদ্বীপের ইতিহাস বিরচিত। সুবিখ্যাত হিন্দু-নরপতি বল্লালসেন যে অবধি নবদ্বীপে স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই অবধি নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চার গৌরব বৃদ্ধি হয়, একরূপ বলা যাইতে পারে। কথিত আছে, তাহার পূর্বে একজন যোগী গঙ্গার চরে ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া কেবলমাত্র কতিপয় ছাত্রকে ভ্রাতের পাঠ দিতেন। ইহার ছাত্রগণের মধ্যে শঙ্কর তর্কবাগীশ এবং ব্যাসপুত্র শিরোমণি প্রধান। ইহাদের উভয়েই ভ্রাতের বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শঙ্কর তর্ককবাগীশের অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও তৎকারণে জনসমাজে তাঁহার অসামান্য প্রতিষ্ঠা সন্দেহে নানাবিধ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, একদিন তর্কবাগীশ কোনও ধনী-গৃহে আমন্ত্রিত হইয়া সত্য উপস্থিত হইবার সময় উত্তীর্ণপ্রায় দেখিয়া তথায় ত্বরায় গমনমানসে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া সত্বরে তাঁহাকে পারে লইয়া বাইবার জন্ত নাবিককে বারবার আদেশ করায়, নাবিক তাঁহার কথার বিরুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিল “ঠাকুর ঘেন নদের শঙ্কর তর্ক-বাগীশ এলেন আর কি, তাই সব কাজ রেখে ওনাকে আগে পার করে দেও”। মূর্থ নাবিকের মুখে আগনার অসাধারণ প্রতিষ্ঠার এই রূপ অপূর্ব প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার যে আনন্দ হইয়াছিল, শত সত্য বিজয়েও বৃদ্ধি তত হয় নাই।

বল্লালসেন একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি সিংহাসনে অধিরুদ্ধ হইয়া বঙ্গের আধিপুত্র-অনীত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-গণের বর্জমান বংশাবলীকে আচারভ্রষ্ট দেখিয়া শিথিলপ্রায় সমাজবন্ধন দৃঢ় করেন। ইহার সময়ে নবদ্বীপে সংস্কৃত ভাষা বিশেষ উন্নতি লাভ করে। বল্লালসেনের পরে তদীয় পুত্র লক্ষণসেন বাঙ্গলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতৃকুল্য বিদ্যাৎসাহী, সংস্কৃত বিদ্যার বিশেষ পারদর্শী এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে অগাধ বিদ্যালবান ছিলেন। এই অল্প বিদ্যালয়েই পরে তাঁহার ও সমগ্র বাঙ্গলার

সর্বনাশের কারণ হইয়া উঠে। ইহার সময়ে হলায়ুধ, পশুপতি ও শূলপাণি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের আবির্ভাব হয়। সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেব এবং উদ্যাপতিধর ইহারই সভা-উজ্জলকারী রাজকবি ছিলেন।

হলায়ুধ “ব্রাহ্মণ সর্কষ”, “দ্বিতি সর্কষ” এবং “মীমাংসা সর্কষ” ও “ন্যায় সর্কষ” প্রভৃতি গ্রন্থের গ্রন্থকার। ইনি আপনাকে বাৎস্ত গোত্রীয় ধনঞ্জয়ের পুত্র বলিয়া বীর সংগৃহীত “ব্রাহ্মণ সর্কষ” গ্রন্থে আত্ম-পরিচয় দিরাছেন।

পশুপতি হলায়ুধের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইহার কৃত “শ্রাদ্ধাদি কৃত্য” পশুপতি-পদ্ধতি নামে প্রসিদ্ধ।

শূলপাণি ভট্টাচার্য্য স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন। ইহার কৃত গ্রন্থ সমূহ দ্বিবিবেক নামে খ্যাত। তৎসংগৃহীত “ব্রতমালাবিবেক”, “প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক” প্রভৃতি অদ্যাপি বিদ্যাজ্ঞানসমাজে সমাদৃত রহিয়াছে।

শ্রীধর দাস, লক্ষণ সেনের সেনাপতি বটুদাসের পুত্র। ইনি “সহজি কর্ণামৃত” নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ লক্ষণসেনের রাজ্যচ্যুতির ছই বৎসর পরে অর্থাৎ ১১২৯ বা ১১৩০ খৃষ্টাব্দে সংগৃহীত হয়।

জয়দেব গোস্বামী—ইহার নিবাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিষ গ্রামে। কিন্তু ইনি লক্ষণসেনের সময়ে রাজসভাসদ ও রাজকবি-রূপে নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। ইহার অমৃতময়ী লেখনী বঙ্গে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব ও জননীর নাম বামা দেবী। জয়দেব অল্প বয়সে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক জগন্নাথ ক্ষেত্রে গমন করেন এবং সরাস গ্রন্থে বাহ্য করেন। কিন্তু তাঁহার সে অতিলাব পূর্ণ হয় নাই। এক অপুত্রক ব্রাহ্মণের জগন্নাথদেবের নিকট মানসিক ছিল যে তাঁহার দ্বীর গর্ভে পুত্র বা কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে প্রথমটিকে জগন্নাথের পদে অর্পণ করিবেন। উক্ত মানসে ব্রাহ্মণ আপন প্রথম তনয়কে জগন্নাথসমীপে আনয়ন করিলে ব্রাহ্মণের প্রতি জগন্নাথদেব প্রত্যাশে করেন যে জয়দেবকে কন্যা দান করিলে সে তাঁহারই পাণ্ডা হইবে; এই কন্যার নাম পদ্মাবতী। ব্রাহ্মণের নির্লজ্জাতিশয়ে ও জগন্নাথ দেবের প্রত্যাশেক্রমে সন্ন্যাসী জয়দেব পদ্মাবতী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারী হন। জয়দেব রাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন; তিনি প্রেম-বিহ্বল হৃদয়ে সময়ে সময়ে যে মধুর কান্ত পদ্মাবতী রচনা করিতেন, তাহা

অকুলনীর । কথিত আছে, স্বয়ং বৈকুণ্ঠনারক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমে মর্ত্যে আসিয়া শ্রীহস্তে তাঁহার পুণির পৃষ্ঠার “দেহি পদপল্লবমুদারম্” লিখিয়া অপূর্ণ পাদ পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন । তৎকাল জয়দেব সম্বন্ধে বহু অদ্ভুত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে । জয়দেব প্রত্যহ কেন্দুবিষ হইতে অষ্টাদশ ক্রোশ পদত্রেজে চলিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন ; বৃদ্ধ বয়সে তিনি চলচ্ছক্তিহীন হইলে, তাঁহার প্রার্থনামতে কেন্দুবিষে গঙ্গা প্রবাহের আবির্ভাব হইয়াছিল । একবার তদগতপ্রাণা দেবী পদ্মাবতী কোন স্ত্রে অবগত হইলেন যে জয়দেবের মৃত্যু হইয়াছে । এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণমাত্রে পতিগতপ্রাণা সাক্ষী তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করেন । কথিত আছে, জয়দেব মৃত পত্নীর কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন । এইরূপ শতশত অলৌকিক গল্প তৎসম্বন্ধে প্রচলিত আছে । তাঁহার মাধুর্য্যময় “গীত গোবিন্দ” আজিও সর্বত্র সাত্ত্বিক আদৃত । শ্রীকৃষ্ণে ইহা অগঙ্গাধদেবের পূজার অঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । তিনি শ্রীকৃষ্ণাবনাদি ভীর্থে পর্যটন করিয়া বৃদ্ধ বয়সে কেন্দুবিষ গ্রামে অপ্রকট হন । অদ্যাপি তথায় প্রতিবৎসর মাবী সংক্রান্তিতে তাঁহার তিরোভাব উপলক্ষে বহু বাজীর সমাগম হয় এবং “গীত গোবিন্দ” গীত হয় ।

লক্ষ্মণসেনের রাজ্যচ্যুতির পর শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব কাল পর্যন্ত প্রায় ৩০০ বৎসর ব্যবধান । এই সুদীর্ঘকাল বঙ্গদেশ প্রায়শঃ মুসলমানগণের শাসনাধীন ছিল । ইহাদের সকলেই গোড়ে বাস করিতেন এবং গোড়েশ্বর বলিয়া খ্যাত ছিলেন । তাঁহাদের শাসনাধীনতার দেশে বিদ্যাচর্চা সমভাবেই চলিতেছিল । দেশে ভূম্যধিকারী সকলেই প্রায় হিন্দু ছিলেন, স্ত্রতরাং বিচার ও শাসন প্রত্যক্ষতঃ হিন্দুগণের হস্তেই ন্যস্ত ছিল এবং ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া বিদ্যাচর্চা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন । গোড়েশ্বরগণও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং সংস্কৃত ও গোড়ীয় ভাষায় বহুতর গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন । * যে “কৃত্তিবাস-রামায়ণ” আজ হিন্দুর গৃহে গৃহে আদৃত ও পূজিত হইতেছে, তাহা গোড়েশ্বরেরই আদেশক্রমে রচিত । এই সময়ের মধ্যে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি অন্তর্গত করিয়া তাঁহাদের মূলনিত প্রেমময় পদাবলী রচনা দ্বারা

* গোড়েশ্বর নসরত খাঁ মহাতারত অনুবাদ করাইয়াছিলেন ।

গোড়ে ভাবী বেশোয়াদকর বৈষ্ণব ধর্মের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া যান। চণ্ডীদাস ১৩২৫ শকে (১৪০৩ খৃষ্টাব্দে) * বীরভূম জেলার অন্তর্গত নারুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং বীর অলৌকিক প্রতিভা বলে সমগ্র দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন।

বিদ্যাপতি ঠাকুর চণ্ডীদাসের সমসাময়িক, তিনি মৈথিল।† মিথিলাই ভৎকালে দর্শন, স্মৃতি, সাহিত্য সকল বিষয়েই অগ্রগামী। এইখানে মহামুনি গৌতম ‡ বীর অদ্বিতীয় প্রতিভাবলে যে ন্যায় শাস্ত্রের হৃদ্যপাত করিয়া যান, উদয়নাচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশোপাধ্যায় ও ভৎপূজ বর্দ্ধমান উপাধ্যায় তাহাকে বহু টীকা ও ভাষ্য দ্বারা অলঙ্কৃত ও ভূষিত করেন।

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে পঞ্চদশ মিশ্র মিথিলার সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তাঁহার প্রকৃত নাম জয়ধর মিশ্র তর্কালঙ্কার। কথিত আছে যে, তিনি কোনও কথা একবারমাত্র শ্রবণ করিয়া বিনা আলোচনাতেও এক পক্ষকাল স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিতেন, ও যে কোনও শাস্ত্রীর বিচার এক পক্ষ কাল ধরিয়া করিতেন এবং তিনি পূর্ব বা উত্তর যে পক্ষেই থাকিতেন, তাহা কখন স্থলিত হইত না বলিয়া তাঁহার পঞ্চদশ উপাধি হইয়াছিল। ইনি আপনাকে বজ্রপতি উপাধ্যায়ের

“বিধুর নিকট নেত্র পক্ষ পক্ষ বাণ।

নবহ নবহ রস ইহ পরিবাণ।”

“জয়মদাতা যোর

গণপতি ঠাকুর

মৈথিলি দেশে ক’ বাস।

পক্ষ পৌড়াবীণ

নিব সিংহ ভূপ

কৃপাকরি লেউ নিজ পান।

‡ ভায় শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্তক মহর্ষি গৌতম, উত্তর্যায় পুত্র ও অঙ্গিরাস পৌত্র। ইহার নামান্তর—দীর্ঘতম্যঃ এবং অক্ষপাদ। শিষ্যত্ব ব্রহ্মপতির সাপে ইনি জন্মাদ্ব হন, তাই নাম হয় “দীর্ঘতম্যঃ”। পরে যোগবলে বীর পদে চক্ৰঃ উন্নীলিত করেন, তৎকর্ত্ত নাম হয় “অক্ষপাদ”। অনেকে এরূপও বলেন যে বীর শিষ্য বেদব্যাস তদীয় বোহাত হুত্রে ভায়নত বক্তনের চেষ্টা করিলে, ব্রহ্ম মহর্ষি গৌতম এ চক্ৰতে আর ব্যাসের মুখাবলোকন করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। পরে ব্যাস কতৃক বিশিষ্টরূপে সাংপুজিত হইয়াও প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ আত্মবিক নয়নে তাঁহার মুখদর্শন না করিয়া বীর পদে চক্ৰঃ হৃদয়ন করেন।

ছাত্র এবং হরি মিশ্রের প্রাতঃশুভ্র বলিয়া আশ্রয়প্রার্থী নিরাহর। পক্ষের মিশ্র তৎকালিক পণ্ডিতগণের শীর্ষস্থানীয় এবং মিথিলায় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বহুদূরদেশ হইতে তাঁহার নিকট বহু ছাত্র পাঠার্থ সমবেত হইত। অধিকাংশ ছাত্র ন্যায় পণ্ডিতের জন্যই মিথিলার আসিত, কারণ ন্যায়শাস্ত্র ও তৎসংক্রান্ত গ্রন্থাদি তখন অন্য কোথাপি পাওয়া বাইতনা। মিথিলার পণ্ডিতগণ সর্ব প্রথমে তাঁহাদের বহু পরিভ্রমের গ্রন্থগুলি অতিসংগোপনে ও যত্নে রাখিয়া ছিলেন। তৎকালে সূত্রাবলি ছিলনা, সকলকেই স্বীয় স্বীয় পাঠ্য পুথি বহন লিখিয়া লইতে হইত। যখন কোন ছাত্র ন্যায়শাস্ত্রার্থ মিথিলার আসিতেন, অধ্যাপকগণ তাঁহাদের অভ্যাসের নিমিত্ত পুথি সকল প্রদান করিতেন, আবার পাঠান্তে সে গুলি পুনঃগ্রহণ করিতেন, এবং পাছে কেহ কোন অংশ গোপনে লইয়া যান, এই জন্য সকল ছাত্রকেই বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া মিথিলার বাহিরে আসিতে দেওয়া হইত; এইরূপ এতাবৎ মিথিলার অধ্যাপকগণ বহু বয়ে ন্যায়শাস্ত্রে আপনাদের প্রাধান্য রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং সে সময়ে ন্যায়পাঠার্থী ছাত্রগণের মিথিলার গমন ব্যতীত গতাস্তর ছিলনা। বিশেষতঃ মৈথিলী অধ্যাপক ব্যতীত অপর কাহারও উপাধিদানের ক্ষমতা ছিলনা।

বাসুদেব সার্কভৌম ।

যে সকল ছাত্র মিথিলা হইতে উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন, তাঁহারা কোন না কোন ধনবানের আশ্রয়ে চতুঃপাঠী স্থাপন করিয়া দেশে শিক্ষার বিস্তার করিতেন। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র বেরূপ জটিল ও দুরূহোধ্য শাস্ত্র, উপযুক্ত গ্রন্থ ব্যতিরেকে তাহার সম্যক শিক্ষাদান অসম্ভব; সুতরাং উপযুক্ত গ্রন্থ অভাবে নবদ্বীপে তখন ন্যায়ের আশ্রয়রূপ অল্পশীলন ছিলনা, কিন্তু ত্রীতীয়ার্যের কৃপায় শীঘ্রই এ অভাব মোচন হয়। মিথিলার বহুবহুঅর্জিত গৌরব ধ্বংস করিতে শূদ্র চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পরম মেধাবী অসাধারণ বী-শক্তিসম্পন্ন ঐতিহ্য বাসুদেব সার্কভৌম নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ ভট্টাচার্য্য। তিনি স্বর্গ পণ্ডিত ছিলেন এবং আপনায় পুত্রকে তৎকালপ্রচলিত বীজ্যাসুরে ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পাঠান্তে দ্বি

অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করান। বাহুদেব অল্পকালমধ্যেই শিষ্টনির্দিষ্ট শাস্ত্র সমুদয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন এবং ন্যায় শিকার জন্য উৎসুক হইয়া পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে মিথিলায় গমন করেন। তৎকালে পঞ্চধর মিশ্র মিথিলার পণ্ডিতগণের মধ্যে একচ্ছত্রী সম্রাটরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। বাহুদেব মিথিলায় তাঁহারই চতুঃপাশীতে প্রবিষ্ট হইয়া ন্যায় শিক্ষা করিতে থাকেন।* ন্যায়শাস্ত্রাধ্যয়নে তিনি দিন দিন যতই উন্নতি করিতে লাগিলেন, ততই অসীম আনন্দে আশ্রুত হইতে লাগিলেন এবং কিরূপে এই অমূল্য রত্নে আপনার মাতৃ-ভূমিকে অলঙ্কৃত করিবেন, সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মৈথিল অধ্যাপক-গণের সম্ভাব্যধিক ঘণ্টে ন্যায়শাস্ত্রকে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে স্বদেশে লইয়া আসা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র বিশেষতঃ গণেশ-উপাখ্যায় কৃত চারিখণ্ড চিন্তামণি শাস্ত্র একেবারে কণ্ঠস্থ করিলেন, পরে যখন দেখিলেন, উক্ত শাস্ত্র সম্যক কণ্ঠস্থ হইয়াছে, তখন তিনি কুসুমাজলি কণ্ঠস্থ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, কিন্তু অচিরে তাঁহার উদ্দেশ্য প্রকাশ হওয়ারাত্র নৌকভাগ ব্যতীত আর তাঁহার কুসুমাজলি কণ্ঠস্থ করা হইল না; তখন তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন, এবং পঞ্চধর মিশ্র কর্তৃক “শলাকা পরীক্ষার” সমস্রমে উত্তীর্ণ হইয়া “সার্কভোম” এই সম্মানিত উপাধি-ভূষিত হইয়া দেশে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু পাছে তিনি কোন গ্রন্থ সন্ধানপনে সন্ধান লইয়া যান, এই আশঙ্কায় মৈথিলী পণ্ডিতগণ তাঁহার সমভিব্যাহারী প্রত্যেক বস্তু অতি সাবধানে পরীক্ষা করিলে বাহুদেব বলিলেন, “আমার স্মৃতিপটে সমুদয় গ্রন্থ অঙ্কিত রহিয়াছে, আমার কোন গ্রন্থ লইয়া ঘাইবার প্রয়োজন নাই।” এই কথায় মৈথিলী পণ্ডিতগণ স্তম্ভিত হইলেন বুঝিতে পারিয়া বাহুদেব, পাছে নিজের জীবনের উপর কোন অত্যাচার হয়, এই আশঙ্কায় নবদ্বীপের পথে না আসিয়া নবদ্বীপবাত্ম্যচ্ছলে কাশী যাত্রা করেন এবং কিছুদিন কাশীতে থাকিয়া তিনি বেদান্তে ব্যুৎপন্ন হইলেন; পরিশেষে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপে প্রত্যাগমন পূর্বক প্রথমে ন্যায় শাস্ত্র ও কুসুমাজলির মোক্ষাংশ

* কাহারও কাহারও মতে পঞ্চধর মিশ্র বাহুদেবের সহাধ্যায়ী, কোনও সময়ে পঞ্চধরের নিকট তর্কে পরাজিত হইলে বাহুদেব প্রতিজ্ঞা করেন যে তাঁহার কোনও শিষ্য দ্বারা তিনি পঞ্চধরের দর্প চূর্ণ করিবেন, পরে সেই অজ্ঞ রঘুনাথকে মিথিলায় প্রেরণ করেন।

লিপিবদ্ধ করিয়া পরে জারের চতুর্পাঠী স্থাপনা করেন। এই হইতেই নবদ্বীপে জারের বিধিমত চর্চা আরম্ভ হয়; এবং দলে দলে পাঠার্থী আসিয়া তাঁহার নিকট ন্যায়ের পাঠগ্রহণ করিতে থাকে, কিন্তু ন্যায়ের করেক খানি মাত্র গ্রহে তিনি পাঠ দিতেন, হুতরাং তখনও অনেকে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিবার জন্য মিথিলায় গমন করিতেন। বাহুদেবের বহুসংখ্যক ছাত্রের মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও রঘুনাথ শিরোমণি প্রধান মধ্যে গণ্য ছিলেন। এই রঘুনাথই স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে মিথিলা হইতে নবদ্বীপের অধ্যাপকপদের উপাধি দানের ক্ষমতা আনয়ন করেন। শ্রীচৈতন্য যৌবনেই ধর্মপথাবলম্বী হন এবং বাহুদেব জীবনের শেষ বয়সে (১৫২০ খৃষ্টাব্দে) যখন প্রবল প্রতাপাধিত গঙ্গাবংশীয় রাজা গঙ্গপতি প্রতাপ রুদ্রের ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁহার সভাসদরূপে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন*, তখন তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার মতানুগামী হইলেন। কথিত আছে, বাহুদেবের শেষ বয়সে নবদ্বীপে মুসলমানগণ বোর অত্যাচার করিতে থাকে, তিনি তাহাতেই বোর উত্তাক্ত হইয়া সপরিবারে উৎকলে যাত্রা করেন এবং তথায় রহিয়া “সার্কভোম নিরুক্ত” নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এক পুত্র রাখিয়া স্বর্গে গমন করেন। এই পুত্রের নাম হুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ। ইনি বোপদেব কৃত মুক্তবোধ ব্যাকরণের ও কবিকল্পদ্রুমের টীকা প্রণয়ন করেন। ঐ টীকার তিনি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন। যথা :—

“শাকে সোমরসেবু ভূমি গণিতে শ্রীসার্কভোমাত্মজো

হুর্গাদাস ইমাককার বিশদাং টীকাং স্ববোধাবধি।”

রঘুনাথ শিরোমণি ।

বাহুদেব সার্কভোম আপনার অনন্যসাধারণ মেধা ও স্মৃতি শক্তির সাহায্যে মিথিলার দারুণ কবল হইতে যে জারশাস্ত্র উদ্ধার করিয়া আপনার মাতৃভূমি অলঙ্কৃত করেন, তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য রঘুনাথ স্বীয় অদ্বিতীয় প্রতিভাবলে তাহার উন্নতি সাধন ও মিথিলা হইতে উপাধি দানের ক্ষমতা আনয়ন করিয়া নব-

* Vide L. 8854. Rajendra Lal Mitra's Notices of Sanskrit Mss., vols. I—IX, Sastri X—XI.

দীপকে তদানীন্তন দেবভাষার “বিশ্ববিদ্যালয়ে” পরিণত করেন। রঘুনাথ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নবদ্বীপে এক দ্বন্দ্বী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শিশুকালে তাঁহার পিতৃবিরোগ হয়, সুতরাং তাঁহার কাদালিনী মাতা সার্কভোমের বাটীতে পরিচারিকার কার্য্য করিয়া দ্বন্দ্বী দিনপাত করিতে থাকেন। মতান্তরে রঘুনাথ ঐহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বৈদিক সংবাদিনী নামক কুলগ্রন্থে প্রকাশ, সার্ক চারিশত বৎসর পূর্বে ঐহট্টের অন্তর্গত পঞ্চখণ্ডে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই পঞ্চখণ্ডে তাঁহার পূর্বপুরুষ ঐধর আচার্য্য মিথিলা হইতে ৫৩ খ্রিষ্টাব্দে বা ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। রঘুনাথের পিতা গোবিন্দ চক্রবর্তী একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি “দীপিকা প্রধান” নামী একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার মাতার নাম সীতাদেবী। রঘুনাথের পিতার অবস্থা বিশেষ সম্বল ছিল না। তিনি অল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত হইলে রঘুনাথের দ্বন্দ্বিনী মাতা অতিশয় কষ্টে শিশু রঘুনাথের তরুণ পোষণ করিতে থাকেন। এই সময়ে গঙ্গানান উপলক্ষে তিনি স্বগ্রামবাসী নিজ জনের সঙ্গে সপুত্র নদীয়ার যাত্রা করেন। এখানে আসিতে পথে তিনি কোন উৎকর্ষ রোগে আক্রান্ত হইলে তাঁহার সহযাত্রীগণ সপুত্র তাঁহাকে তদবস্থায় রাখিয়া চলিয়া যান। কিছু দিন রোগ ভোগের পরে আরোগ্য লাভ করিলে স্বজাতীয় স্বগ্রামবাসীর এই নিষ্ঠুর আচরণে তাঁহাদের উপর তাঁহার বিশেষ বিরাগ উপস্থিত হয়, সে কারণে আর স্বদেশে প্রত্যাগমন না করিয়া তিনি কোন এক বণিককে পিতৃ-সম্বোধন করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে সপুত্র নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাত্‌কালিক বিদ্যারাজ্যের অধিপতি বাসুদেব সার্কভোমের আশ্রয় লাভ করেন। জন্মাবধি রঘুনাথ একচক্ষুহীন ছিলেন; এই কারণে যখন তিনি লক্ষ প্রতীষ্ঠ করেন, তখন কাণভট্ট শিরোমণি নামে খ্যাত করেন। *

* কেহ কেহ বলেন যে তিনি আসল এক চক্ষু ছিলেন না, কোনও এক সপ্তমী নিশিতে আকাশের দিকে চাহিয়া যখন একপ্রমানে শাস্ত্রচিন্তা করিতেছিলেন, তখন একটা পতঙ্গ তাঁহার একটা চক্ষুর মধ্যে আঁটি হয়, তাহাতেই তাঁহার সেই চক্ষুটা নষ্ট হইয়া যায়। সপ্তমী রাত্রিতে পাঠ একে শাস্ত্রে বিবিদ্ধ, তাহাতে রঘুনাথের এই দৈব বিড়ম্বনার বৈরাগিকণ সপ্তমী রাত্রিতে একেবারেই শাস্ত্র-চর্চা করেন না।

রঘুনাথ বাল্যকাল হইতেই অতি মেধাবী ছিলেন। কথিত আছে, একদা তিনি মাতার নির্দেশানুসারে টোলের কোন ছাত্রের নিকট অগ্নি আনিতে যান। ঐ ছাত্র বার বার এইরূপ ত্যক্ত হইয়া রঘুনাথকে অপ্ৰস্তুত করিবার নিমিত্ত এক হাতা অলস্ত অঙ্গার লইয়া রঘুনাথের হস্তে দিতে বাইলে বালক রঘুনাথ পাত্রাভাবে স্বীয় প্রভুত্বপন্নমতিত্ব স্বপ্নে ব্যটিতি এক অঞ্জলি ধূলি গ্রহণ করিয়া অগ্নি লইতে প্রস্তুত করেন। ঐ সময়ে বাহুদেব স্বীয় চতুর্পাঠীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পঞ্চমবর্ষীয় বালকের এতাদৃশ বুদ্ধি দর্শন করিয়া রঘুনাথের মাতাকে বলিয়া স্বয়ং রঘুনাথের পঠনের ভার গ্রহণ করেন। কথিত আছে, রঘুনাথ “ক,” “খ” শিখিতে আরম্ভ করিয়াই “ক” অগ্রে না বলিয়া “খ” অগ্রে বলিলে কি দোষ হয় ; ব্যঞ্জনবর্ণে দুইটা “জ” দুইটা “ন” দুইটা “ব” তিনটা “স” ইহারই বা প্রয়োজন কি ইত্যাদি প্রশ্নজিজ্ঞাসু হইয়া, স্তব্ধরূপে রঘুনাথকে বর্ণমালা শিখাইতে গিয়াই সমস্ত ব্যাকরণ পড়াইতে হইয়াছিল। রঘুনাথ অতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ ও কাব্য অভিধান শেষ করেন এবং কিছু দিন স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিয়াই বাহুদেবের নিকট ন্যায়ের পাঠ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অতি মেধাবী রঘুনাথকে বাহুদেব সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন না, পরন্তু রঘুনাথ ইতিমধ্যেই “সার্বভৌম নিকৃষ্ট” নামক গ্রন্থের বহুদোষ বিচার করিয়া “কৃত বিদ্যো গুরুং বেষ্টি” এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন পুরঃসর নিজ গুরু সার্বভৌমের উক্ত পুস্তকের অসারতা প্রতিপাদন করিলেন। বাহুদেব রঘুনাথের এবিধ অসাধারণ ক্ষমতা দর্শন করিয়া তাঁহাকে মিথিলার ন্যায় আলোচনার জন্য প্রেরণ করেন। রঘুনাথ মাত্র বিংশতি বৎসর বয়সে (খৃঃ বোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে) মিথিলার উপস্থিত করেন। বাহুদেবের গুরু স্মপ্রসিদ্ধ পঞ্চধর মিশ্র তখনও জীবিত। রঘুনাথ তাঁহারই চতুঃপাঠীতে নিম্ন শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। নিম্নশ্রেণীতে প্রবেশ করিলেও অধিক দিন তাঁহাকে নিম্ন শ্রেণীতে থাকিতে হয় নাই, কারণ তিনি দ্বাবীপ হইতেই চিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া গিয়াছিলেন, স্তব্ধরূপে শীত্রেই সকল ছাত্রকে তর্কে পরাস্ত করিয়া উক্ত শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে পঞ্চধর মিশ্র ‘সামান্য লক্ষণ’ নামক পুথি প্রণয়ন করিতেছিলেন, রঘুনাথ এখন ন্যারে সম্যক ব্যুৎপন্ন হইয়া তাহারই দোষ বিচারে প্রযুক্ত হইলেন। পঞ্চধর মিশ্র তাঁহার এই

অসামান্য তর্কশক্তি ও অসামান্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দর্শনে চমৎকৃত হইলেন এবং যখন মনে আপনায় ভ্রম বুদ্ধিতে পানিলেও এবং পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মনাথের সহিত তর্কে পরাস্ত হইলেও লোকলজ্জার ও ব্রথা অভিমানে ব্রহ্মনাথকে প্রকাশ্যে কটুবাক্যে বিলম্ব অবমাননা ও বিদ্রোপ করিলেন । পক্ষধর কুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে স্বেচ্ছাকৃত ক্রম বাক্যে কহিলেন :—

“ককোজপানকং কাণ সংশরে জাগতি কুটে ।

সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপাতে ॥”

“যে তল্যপায়ী কাণা ; যখন জগদ্ব্যাক্ত সংশর বর্তমান রহিয়াছে, তখন কি করিয়া সূক্ষ্মা “সামান্য লক্ষণা” লোপ করিবে ?”

ব্রহ্মনাথ এক চক্ষুরীণ বিবাহ তাঁহাকে কাণা বলাতে তাঁহার বৎপরোন্মতি কষ্ট হওয়ার তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন :—

“বোদ্ধং কয়োত্যক্ষিমত্তং বচ বালং প্রবোধয়েৎ ।

তবেকায়াপকং মন্যে তবন্যে নামধারিণঃ ॥”

তখন পক্ষধরের সহিত তাঁহার সীতিন্ত বাগ্‌বুদ্ধ আরম্ভ হইল, তিনি অসামান্য বুদ্ধি ও অগুরূ তর্কশক্তি প্রদর্শন করিয়া অধ্যাপকের কূট বাগ্‌জাল হিন্‌জির করিয়া দিলেন ; তখন পক্ষধর উপাস্তর না দেখিয়া তাঁহাকে কংপরোন্মতি লাহিয়া ও অবমাননা করিলেন এবং তাঁহার প্রতি কীৰ্ত্তিবিজিত ছাত্রগণও তাঁহাকে অবস্থা বন্ধকষ্ট বিবাহ নিমিত্ত তাঁহার এক চক্ষুর প্রতি কটাক করিয়া বলিলেন :—

“আবঙলঃ সহস্রাকো বিরপাকজিলোচনঃ ।

অন্যে ছিলোচনাঃ সর্ক্রে কো ভবানেতলোচনঃ ॥”

ব্রহ্মনাথও ছাত্রিয়ার পাত্র নহেন, তিনিও সঙ্গেরবে উত্তর করিলেন—

“কুশীপনলবীপনরবীপনিবাসিনঃ ।

তর্কসিদ্ধান্ত-সিদ্ধান্ত-শিরোমণি নবীবিণঃ ॥”

আবারের ভিন্ন জনের উপাধি বধাক্রমে তর্কসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত ও শিরোমণি এবং বালকুণ্ডি কুশবীপ, কলবীপ ও নববীপ ।

এইরূপ অবস্থা সাহিত্য হইয়া ব্রহ্মনাথ তখনম্নে নিজ কাসার প্রত্যাগমন করিলেন এক বর খীর বচ স্থাপন নবুকা আশ্রমের প্রাণ হমন এই স্থির করিলে ঐক্যধার এক অন্ন গ্রহণ করিয়া বিশ্রামে শুক-মন্দিরে

উপস্থিত হইলেন । সে দিন পূর্ণিমা রাত্রি, পূর্ণিমার পক্ষের বিকল জ্যোৎস্না বিকিরণ করিতেছিলেন । রঘুনাথ তখন কিশোর ; শোকে, কোরে ও অপমানে উত্তেজিত হইয়া দারুণ প্রতিহিংসাবশে পক্ষধরকে অতুলকান করিতেছিলেন । দেখিলেন, পক্ষধর সঙ্গীক অসিদ্ধায় উপবিষ্ট এবং উত্তরে কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন । পক্ষধরগৃহিণী বিকল জ্যোৎস্নার প্রীতিপ্রকর হইয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—“নাথ ! অগতে এই জ্যোত্স্না অপেক্ষা বিকল প্রীতিপ্রব বস্ত আর কিছু আছে কি ?” পক্ষধর তখন উন্নত, বৃষি রঘুনাথের অবস্থা অপমানে আত্মরানি আনিয়াছে, জীর বারংবার প্রেমে আত্মহ হইয়া উত্তর করিলেন “কি ছার এই কলকী চাঁদের জ্যোৎস্নার প্রাণশো করিতেছ, তোমার গৃহে নববীণের বে অকলঙ্ক চক্স বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার বুদ্ধির নিকট অগতে বিকলতর আর কিছুই হইতে পারে না ।” রঘুনাথ অন্তরালে দাঁড়াইয়া সবস্ত শ্রবণ করিলেন এবং আপনাকে যিকার দিতে দিতে তরবারি হুরে নিক্ষেপ করিয়া সহসা গুরুপথে একেবারে আত্মসমর্পণ করিলেন । তখন গুরু ও শিষ্য উভয়ে উভরকে চিনিয়াছেন—উভয়ে বহুদশ বালকের ন্যায় জন্মন করিলেন এবং এই দুই মহাপ্রাণ এক হইয়া গেল । পরদিন প্রাতঃকালে পক্ষধর এক মহতী সজা আহ্বান করিয়া সর্বসমকে বীর পরাক্রম বীকর করিলেন এবং সর্ববাদিসমতিক্রমে রঘুনাথকে নববীণে থাকিয়া উপস্থি-
ধানের কবতা প্রদান করিলেন । তদবধি মিথিলার গর্ক থর্ক হইল এবং মিথিলার বশ্যপ্রী নববীণের অকস্মিনী হইলেন । এই দিন নববীণের একটি স্মরণীয় দিন ।

এইরূপে বোড়ন পতাকীর প্রথম ভাগে রঘুনাথ শিরোবনি নববীণে চতুশাস্তি স্থাপন করিতে অভিলাষ করিলেন । রঘুনাথ অতি দক্ষিণ ছিলেন, এমন কি চতুশাস্তি স্থাপন করিতে যে অর্ধের প্রয়োজন, তাহা তাঁহার ছিল না । এ সময়ে নববীণে করিবোষ নামে এক কল্যাণ গৌণ বান করিলেন ; তিনি মহাপ্রাণ হইয়া তাঁহার সুবিতীর্ণ গোশালা চতুশাস্তি স্থাপনের জন্য শিরোবনিকে বান করেন । এই গোশালাতই রঘুনাথ তাঁহার বহুপ্রাণিত বিরাটুদি নইয়া অনেক গৌণ স্থাপন করিলেন । এক্ষণে তিনি গৌণ স্থাপন করিয়াছেন তন্মিত্র নানা বিকল হইতে অসংখ্য ছাক আনিয়া তাঁহার সুবিতীর্ণ চতুশাস্তি পরিপূর্ণ করিল । এই

সমবেত ছাত্রমণ্ডলীর পাঠাভ্যাসকালীন কোলাহল বহুদূর হইতে শ্রবণগোচর হইত। এখনও লোকে কোনও স্থান জনাধিক্য বশতঃ কোলাহলপূর্ণ হইলে “হরিষোবের গোয়াল” বলিয়া থাকে।

রঘুনাথকৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে “চিন্তামণি-নীতি” সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা “নবজ্ঞান” নামেও খ্যাত। এতদ্ব্যতীত তিনি “পদার্থ খণ্ডন” “দ্বান্বতত্ব-বিবেকের টীকা” এবং সুবিখ্যাত বর্দ্ধমান উপাধ্যায় ও উদয়নাচার্য্য কৃত গ্রন্থ সমুদয়ের টীকা ও “নৈরুবাদ,” “প্রামাণ্যবাদ,” “নানার্থবাদ,” “আখ্যাতবাদ,” “কণ্ঠভ্রুরবাদ” প্রভৃতি বহুগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সকল সদ্ব্যুক্তিপূর্ণ ন্যায়ের গ্রন্থরাজি ব্যতিরেকে শ্রুতিশাস্ত্রীয় “মল্লিন্দু-বিবেক” (মলমাস) নামে একখানি গ্রন্থ দেখা যায়।

এই সময়ে ঐচৈতন্য দেবও নদীয়ার অধ্যাপকরূপে বিরাজমান। তাঁহার আলৌকিক দিগ্বিজয়ী মেধা, উজ্জলতরূপে পরিষ্কৃত হইয়া অসংখ্য ছাত্রের শিক্ষা সম্পাদন করিতেছিল; কিন্তু শীঘ্রই তিনি পার্থিব জ্ঞানকে জীর্ণবস্ত্রখণ্ডের ভার পরিত্যাগ করিয়া অপার্থিব সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্ত মনোনিবেশ করেন এবং ধর্মপথের পথিক হইলেন। নবদ্বীপের ইচ্ছাই সুবর্ণযুগ! রঘুনাথ ও চৈতন্যদেব হইতেই নবদ্বীপের মহিমা পূর্ণভাবে বিকশিত। তাঁহাদের উভয়ের জ্ঞানগরিমা ও অনন্যসাধারণ চরিত্রমহিমা জনসমাজে প্রচারিত হইবার পরেই সুদূর জাবিড়, কাঞ্চী, মিথিলা কাশী, তৈলঙ্গ প্রভৃতি স্থান হইতে ছাত্র ও ভক্তগণ আসিয়া নবদ্বীপকে এক তীর্থে পরিণত করে। তদবধি নবদ্বীপ ত্রীধাম ও সরস্বতীর পীঠস্থানরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে।

ঐচৈতন্য দেব ও রঘুনাথের সময়ে নবদ্বীপ সর্বতোমুখী বিদ্যালোচনার উন্নতির শিখরদেশে উন্নীত হইয়াছিল। এই সময়ে ও ইহার পরবর্ত্তী কালে বহু মেধাবী পণ্ডিত এই নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ কিংবা বাস করিয়া তাঁহাদের নিজরচিত মৌলিক পুস্তকাদির দ্বারা নবদ্বীপের জ্ঞানগরিমা উজ্জল হইতে উজ্জলতর করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের বিবরণ পাওয়া দুষ্কর এবং পাইলেও এ স্থলে বিশদভাবে উহা দেওয়া অসম্ভব, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় প্রধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াই সঙ্কট হইতে হইল। এই যুগে শ্রীমৎ মহাপ্রভুর পার্বণ ও অসংখ্য ভক্তবৃন্দের দ্বারা বলভাবে বিশেষরূপে অলঙ্কৃত ও সজ্জিত হয়। যে সকল

মহাত্মা এই স্বকোমল বক্তাব্যয় পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা অত্যধিক ; মধ্যে কতিপয় প্রধানের সংক্ষিপ্ত চরিত্র হানাত্তরে সন্নিবেশিত হইল । নবদ্বীপের প্রতি এই সময়ে বাণীর অসীম রূপা দেখা যায় । এই যুগে নবদ্বীপে ধেরূপ ন্যায়ের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল, সেরূপ আবার নবদ্বীপবাসী স্বাৰ্ভপ্রধান রঘুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও অন্যান্য বহু পণ্ডিত কর্তৃক স্মৃতি, তত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্র সবিশেষ উন্নতি লাভ করার নবদ্বীপ সমগ্র দেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল । পরবর্ত্তী অধ্যায়ে স্মৃতি, তত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইবে ।

বহু পূৰ্ব্ব হইতে নবদ্বীপে ন্যায়ের চৰ্চ্চা থাকিলেও রঘুনাথই নবদ্বীপে ন্যায়ের প্রাধান্য স্থাপন করেন এবং তৎকালে তিনিই প্রধান নৈয়ায়িক বলিয়া অঙ্গীকৃত হইলেন । তদবধি বঙ্গীয় নৈয়ায়িক সমাজে প্রধান নৈয়ায়িকের মৃত্যুর পর তত্পর্যুক্ত একজন ঐ পদে বৃত্ত হইয়া আসিতেছেন । রঘুনাথের পর তাঁহারই বংশাবলীকে বহুদিন ন্যায়-রাজ্যে একাধিপত্য করিতে দেখা যায় । রঘুনাথের পুত্র রামভদ্র । ইহার উপাধি সার্কভৌম । ইনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে জীবিত ছিলেন । ইনি স্বরচিত পদার্থমণ্ডলের টীকার নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারা আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন :—

“তাতস্য তর্ক-সরসী-কহ-কাননেবু

চূড়ামণে দিনমণেশ্বরং প্রণম্য ।

শ্রীরামভদ্র স্মৃতিঃ কৃতিনাং হিতায়

লীলাবশাৎ কিমপি কৌতুকমাতনোতি ।”

ইনি “পদার্থ মণ্ডলের” টীকা, “পদার্থ-তত্ত্ব বিবেচনা প্রকাশ” ব্যতীত উদয়নাচাৰ্য্য রূত সমগ্র “কুসুমাজলর” টীকা করিয়াছিলেন । “কুসুমাজলি কারিকা ব্যাখ্যা,” “শুণকিরণাবলী-রহস্য,” “সমাসবাদ,” “ব্যুৎপত্তিবাদ,” “প্রামাণ্যবাদ,” “নঞার্থবাদ,” “কণভঙ্গুরবাদ,” “আখ্যাতপদ,” “আত্মবিবেক টীকা,” “তর্ক দীপিকা প্রকাশ,” গলেশোপাধ্যায় রূত “চিন্তামণির ভাষ্য,” “খণ্ডনখণ্ড খাণ্ডা টীকা,” “শুণ কিরণাবলী,” “প্রকাশদীপ্তি,” “ন্যায় লীলাবতী প্রকাশ দীপ্তি,” “ভায় লীলাবতী দীপ্তি,” “ব্রহ্মস্বভূতি,” “মল্লিচূড় বিবেক,” “অবৈতৈষম্যবাদ,” “অপূর্ববাদ রহস্য,” “আকাক্ষাবাদ” প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ।

ইহারই সময় ইহারই সমাধারী পুত্ৰাঙ্কুরি ঐরাম ভৰ্ম্মলকারের পুত্র মধুরানাথ ভৰ্ম্মবাসীশ বীর অসাধারণ পাণ্ডিত্যভূষণে দেশমান্য হইলেন। তিনি পঠদশাতেই দীর্ঘিতির টীকা লিখিয়া বশবী হইলেন, পরে পিতৃ-নিদেশানুসারে গজেন্দ্রোপাধ্যায় কৃত চিত্তামণি গ্রন্থের এক অতি প্রাঞ্জল ভাষা প্রণয়ন করেন। কথিত আছে—মধুরানাথ কণাদ নামে একটা উপবৃত্ত শিষ্যের অহুরোধে “অবয়বের” টীকা লিখিয়াও প্রকাশ করেন নাই। কণাদের ঐকান্তিক বাসনা ছিল যে গুরুর গ্রন্থাবলীর সহিত তাঁহারও একখানি গ্রন্থ প্রচলিত হয়। মধুরানাথের টীকা গ্রন্থসমূহের মধ্যে কণাদকৃত অবয়ব টীকা অস্বাভাবিক বর্তমান আছে। মধুরানাথের ভিন্নোভাবের পর তাঁহার পুত্র প্রত্যক্ষ, অহুরান, উপরান ও শব্দ এই চারিখণ্ড চিত্তামণির পিতৃপ্রণীত টীকা পাঠ করিয়াই বিনা গুরুপদদেশেই জুগুপ্সিত হইলেন। মধুরানাথের এই সকল টীকা ব্যতীত বঙ্গভাষার “ন্যায়লীলাবতী প্রকাশের” ও শুশকিরণাবলীর ভাষা” নৈরাসিক সমাজে অতি আদরের বস্তু। তাঁহার কৃত অনন্য টীকা ও ভাষা “মাথুরী রহস্য” নামে খ্যাত। তাঁহার অনন্য হুজুর মধ্যে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ প্রধানরূপে পূজিত হইলেন। ইহার কৃত টীকা “ভবানন্দী” বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার কৃত “মণি দীর্ঘিতি” “গুড়ার্ণ প্রকাশিকা,” “শব্দার্থ সার স্বরূপ,” “লটার্ণবাস” “কারণবাদ বিচার,” “কারকবঙ্গ” প্রভৃতি পুস্তক অস্বাভাবিক সমাদরে গঠিত হইতেছে। বিখ্যাত “বৈশেষিক শাস্ত্রীর পদার্থ নিরূপণ,” “অধিকরণ” “চঞ্জিকা” “চিজ্ঞাপন,” “বাদ পরিচ্ছেদ” প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা রত্নরায় এই ভবানন্দেরই পুত্র। পিতার ন্যায় ইহার টীকাও আদরের সহিত পঠিত হয়; ইহার কৃত টীকা সাধারণতঃ রৌদ্রী নামে খ্যাত।

বিখ্যাত মধুরানাথ শিরোনামিত রূপে যে সকল মহাকাব্যোপাখ্যান পণ্ডিত ভাষ্য পরিগ্রহ করিয়াছেন, হরিশ্চন্দ্র ভৰ্ম্মবাসীশ, তাঁহার মধ্যে প্রথম; ইনি বৃহদ্রথ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যানান ছিলেন। ইহার সকল দেশের কোন ক্রিয়া কাণ্ডে ইনি ন্যায়ের প্রণালি বিচার প্রাপ্ত হইতেন; ইহার কৃত বহু গ্রন্থের মধ্যে “মহাবত রহস্য,” “লটার্ণবাসভরহস্য,” “মহাবাদ,” “প্রমাণপ্রমোদ” “অনুসৃত পরামর্শ,” “স্বপ্নবৃত্তি,” “বিবর্ততা বঙ্গ,” “বিশিষ্ট বৈশিষ্ট বোধ বিচার,” “প্রতিবর্তকতা বিচার,” “প্রত্যক্ষ বিচার” ও সপ্তদশ নিরূপণের ভাষা”

“রত্ন কোষের ব্যাখ্যা” প্রকৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহার টোলে বহু ভ্রমশ্রম হইতে ছাত্রগণ পার্শ্বার্থ আগমন করিত। এই সকল ছাত্রের মধ্যে রত্নদেব ন্যায়ালঙ্কার তত্ত্বাচার্য্য, ও পদার্থ তত্ত্বাচার্য্য প্রধান ছিলেন।

রত্নদেব মহর্ষীপের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের কৃতী ক্রি তত্ব পুরুষ অধস্তন কণ্ঠস্বর হইবেন। ইনি শিরোরশি-কৃত “নঞ বাদেহ” “নঞবাদ বিবেচন” নামক টীকা রচনাকালে প্রহারভে এইরূপ আত্ম-পরিতপ দিরাছেন।—

“শিবঃ ঐশম্য তৎপশ্চাত্তর্কবাগীশরঃ শুকম্।

ক্রিরতে রত্নদেবেন নঞর্থস্য বিবেচনম্।

এই শ্লোকে তিনি আপনার শুক হরিরাম তর্কবাগীশকে কন্দনা করিয়া প্রহ আরম্ভ করিয়াছেন; আবার প্রহের শেষে বলিতেছেন:—

“অত্র সূক্তং দ্রষ্টব্যং বা যৎ কিকিং ক্রিয়ন্তং যত।

তৎ সর্কং জগদীশত্ব প্রীত্যর্থং শিখিতং হি তৎ।

রত্নদেবকৃতগ্রন্থালোকনেন যনীষিঃ।

অধ্যাপকত্ব সত্তোবৈনঞবাদবিস্তারতঃ।”

ইচ্ছাতে স্পষ্ট বলিতেছেন যে, তিনি জগদীশ তর্কলঙ্কারের প্রীত্যার্থে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এতদ্বারা অহমিত হয় যে তিনি হরিরাম ও জগদীশ উভয়ের নিকটেই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার “পদার্থতত্ত্ব বিবরণ” ১৩৪১ শকে অর্থাৎ ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে রচিত হইরাছিল। এতদ্বিত্ত তিনি মহর্ষি কণাদের “বৈশেষিক সূত্রের” “কণাদ সূত্র ব্যাখ্যান” নামে টীকা, সঙ্গেশোপাখ্যায় কৃত “তত্ত্ব চিন্তামণির” স্তোত্রার্থে, “তত্বলীলিকা” নামী ব্যাখ্যা পুস্তিকা, “পরামর্শ বিচার,” “অকরব প্রহ” রত্নদেব কৃত “আখ্যাতিবাদের” টীকা, “আকাঙ্ক্ষাবাদ,” “কার্য কারণ ভাব বিচার,” “চিন্তাসংবাদ,” “জানম্বরবাদ,” “জানলক্ষণ বিচার,” “তর্ক বিচার” “নঞবাদ চিন্তনী,” “নবীন সিদ্ধান্ত,” “নানার্শ বাদ,” “নিকৃতি প্রকাশ,” “নন্দোবাদ,” “লক্ষণবাদ” “বিশিষ্ট বৈশিষ্টবোধ বিচার,” “বিশিষ্ট বৈশিষ্ট বাদ” “বিষয়তাবাদ” “স্বতি সংকার বিচার” প্রকৃতি বহুগ্রন্থ রচনা করেন। এই টীকাগুলি সাধারণতঃ “রত্নদেবী” নামে পরিচিত।

পদার্থ তত্ত্বাচার্য্য পানন্দ জেলায় লক্ষীতাপস প্রাচ্যের তত্ত্বাচার্য্য তত্ত্বাচার্য্য

পুত্র। কিন্তু বাল্যকাল হইতে জীবনের অল্পকাল পর্য্যন্ত নববীপে বাস করিয়া-
ছিলেন। ইহাঁর সময়ে নববীপের ছাত্রসংখ্যা হ্রাস হইয়া যায় এবং কথিত
আছে, গদাধর তাঁহার পৈতৃক জন্ম স্থান পাবনা হইতে ছাত্র সংগ্রহের নিমিত্ত
বিশেষ ক্রেশ স্বীকার করেন। এই কালে দেবভাষাধ্যয়নকারী ছাত্রসংখ্যা
হ্রাস হইবার প্রথম কারণ—মুসলমান সভ্যতার বিস্তৃতি ও তদনুযায়ী ফারসী
ভাষার উন্নতি ও প্রচার। এই সময়ে মুসলমানগণের দোঁড়িও শাসনে এবং বিলাস
আয়েস দর্শনে দেশ “মোছলমানী” ভাবে বিস্তার। দ্বিতীয় কারণ—শ্রীমন্
মহাপ্রভুর স্থাপিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ও তদনুভূত পদাবলীর রচনা ও প্রচার
এবং বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি।

কিন্তু এই সকল বাধা সত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষা তখনও সমাজে সমাদৃত ছিল এবং
তখনও মেধাবী অধ্যাপকগণের অভাব আদৌ অস্বত্ব হইয়া নাই। এই সময়ে “শঙ্ক
শক্তি প্রকাশিকা,” “তর্কামৃত” প্রভৃতির গ্রন্থকার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কা
লঙ্কার বর্তমান ছিলেন; জগদীশের জীবনী এক অদ্ভুত উপন্যাস। তাঁহার পিতার
নাম যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ইহাদের আদি নিবাস মিথিলা, জগদীশ তাঁহার পিতার
তৃতীয় পুত্র। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে জ্যেষ্ঠ বসীদাসের উপর তাঁহাদের পঞ্চ
ভ্রাতার ভরণপোষণের ভার বর্তে। বসীদাস চৈতন্যমুর্তির বৈষ্ণব ছিলেন।
তিনি চৈতন্যের সেবার কোনও রূপে সংসার নির্বাহ করিতেন। সুতরাং
ভ্রাতৃগণের বিদ্যাচর্চা ও নৈতিক উন্নতির দিকে আদৌ মনোনিবেশ করিতে
পারিতেন না। জগদীশ স্বভাবতঃ উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ছিলেন, এক্ষণে পিতৃ-
বিয়োগ ও ভ্রাতার অমনোযোগিতার উচ্ছৃঙ্খলতা যেরূপ হইয়াছিলে পরিণত হয়।
তখন তাঁহার বর্ণশিক্ষা হয় নাই বলিলেও হয়। ভাগ্যানেমির পরিবর্তনে কাহার
কিরূপ হয়, কে বলিতে পারে। কথিত আছে, একদিন জগদীশ পক্ষীশাবক
অগহরণেচ্ছ হইয়া এক বৃহৎ তালবৃক্ষে আরোহণ করেন, দৈববশতঃ এক
সুবৃহৎ বিবধর সর্প ঐ পক্ষিনীড়ে অবস্থান করিতেছিল। জগদীশ যেমন পক্ষি-
শাবক লইতে ঐ কুলার হস্ত প্রবেশ করাইয়াছিলেন—ঐ সর্পও কণা বিস্তার
পূর্বক তাঁহাকে দংশনোন্মত্ত হইল। অগদীশ শুদর্শনে কিয়ৎকাল কিংকর্তব্যবিমূঢ়
হইয়া চকিতে ঐ সর্পের কণা ধরিয়া ফেলিলেন। সর্পও তাঁহার শরীরের দ্বারা
তাঁহার হস্ত দৃঢ়রূপে বেঁধেন করিল; কিন্তু জগদীশ তৎক্ষণাৎ উহার মুণ্ড তালের

মৃত্যুগ্র বাকলে বর্ষণ করিয়া কর্তনানন্তর দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে আপনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বগুণে নাগপাশবৃদ্ধ হইয়া তিনি সহর্ষে বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

এতদ্ব্যপেক্ষ এক সন্ন্যাসী ঐ বৃক্ষশূলে বসিয়া অগ্নীশের কাণ্ড অবলোকন করিতেছিলেন। অগ্নীশ বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলে তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া তাঁহার অসৌম্য সাহস ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিলেন। কিয়ৎকাল বাক্যলাপের পর ঐ সন্ন্যাসী অগ্নীশের সমস্ত তথ্য অবগত হইলেন ও কৃপাপরবশ হইয়া অগ্নীশকে পাঠে মনোযোগী করিতে যত্নবান হইলেন। এতদিনে অগ্নীশের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল; তিনি সন্ন্যাসীর আগ্রহে তাঁহার নিকট পাঠগ্রহণে সম্মত হইলেন। এই দ্রুত অশিষ্ট অগ্নীশ পরে সুবিখ্যাত নৈমারিক হইয়া নবরীপের মুখোজ্জ্বল করেন। অগ্নীশ পাঠে মনোযোগী ছিলেন বটে, কিন্তু অর্থাভাবে তৈল ক্রয় করিতে না পারায় তাঁহার রাত্রিতে পাঠাভ্যাসের সুবিধা হইত না, কিন্তু অসাধারণ উদ্যমশীল অগ্নীশ দিবাভাগে শুষ্ক বংশপত্র সংগ্রহ করিয়া রাত্রিতে তাহারই আলোকসাহায্যে অধ্যয়ন করিতেন। হায়! একদা অসাধারণ অধ্যবসায় অধুনা দেশ হইতে একেবারে বিদায় হইয়াছে।

অগ্নীশ ক্রমে কাব্যাদি পাঠ শেষ করিয়া তবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের টোলে ভ্রাম্য-শিকার্ষ্য প্রবেশ করেন এবং শীঘ্র আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে তবানন্দের প্রিয় হইয়া উঠেন এবং তর্কালঙ্কার উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

উপাধি প্রাপ্তির পর গ্রাম্যসাহায্যে অগ্নীশ চতুশ্চাণী স্থাপনা করেন। এই সময়ে যদিও সংস্কৃত শিকার আদর কিছু কমিতেছিল, তথাপি তাঁহার টোল শীঘ্রই ছাত্রপূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু দরিদ্র অগ্নীশের অত ছাত্রের ভরপণোষণের ক্ষমতা কোথায়? অবশ্য অধ্যাপক বিদ্যারে তখনও তাঁহাদের বিশেষ প্রাপ্য ছিল, কিন্তু অধ্যয়ননিরত অগ্নীশের সর্বদা দূরদেশে গমনে নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল, অতএব তিনি গৃহে বসিয়া অর্থোপার্জননের উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইলেন। এই সময়ে মহাপ্রভুশাচরিত ধর্ম্মে, জনসাধারণের মধ্যে তুমুল আন্দোলনের হাট্ট হইয়াছিল। এতাবকাল মাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই ধর্ম্মাবিহিত শাস্ত্র পাঠ ও অধ্যয়ন করিতেন; কিন্তু মহাপ্রভুর উদার ধর্ম্মে শূন্যকেও শাস্ত্রে অধিকার দিয়াছিল এবং এখন শূন্য কর্তৃক শাস্ত্র অবীত ও রচিত হইতেছিল। তাঁহাদের মধ্যেও জ্ঞানী

লোকের অভাব ছিল না। সেজন্য অগণীশ জ্ঞানী আচারবান দেখিয়া শূদ্র শিষ্য গ্রহণ করিলেন; সুপণ্ডিত জ্ঞানবান অগণীশের শিষ্য হইতে সকলেই আগ্রহান্বিত হইলেন এবং শীঘ্রই ৩৬০ খর শিষ্য-সংখ্যা পূর্ণ হইল। তিনি নিয়ম করিলেন যে প্রত্যেক শিষ্যকে বৎসরে একদিন তাঁহার বাবতীর ঘরচের ভার লইতে হইবে; শিষ্যেরাও সাহসাদে এই ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বুদ্ধাবস্থাতেও গ্রন্থ লিখিতে সর্বদা রত রহিতেন। তাঁহার কৃত গবেষণোপাধ্যায় কৃত “অনুমানময়ুধ” গ্রন্থের “ভাষ্য” ও “প্রশস্তিবাদ”, আচার্য্যকৃত “বৈশেষিক শাস্ত্রীয় দ্রব্য ভাষ্যের” টিপ্পনী ও রঘুনাথের “ভায় লীলাবতী প্রকাশ” প্রভৃতি দীর্ঘিতি গ্রন্থের টীকা কি অসংখ্য বিচার শক্তি ও স্বল্প বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, তাহা আর্ধ্য ভায়পাঠক মাত্রেই গোচর আছে। তাঁহার গ্রন্থসমূহ ‘অগণীশ’ বলিয়া খ্যাত।

অগণীশের হই পুত্র—রঘুনাথ ও রুদ্রেশ্বর। রঘুনাথ “সংখ্য তত্ত্ব বিলাস” গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রুদ্রেশ্বর কোন গ্রন্থ বা টীকা প্রকাশ নাই। সুবোধিনী নাম্নী শব্দশক্তিপ্রকাশিকার টীকার রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ রুদ্রেশ্বর পুত্র।

অগণীশের তিরোভাবে পূর্বোক্ত গদাধর, প্রধান নৈয়ায়িকরূপে বৃত্ত হইলেন। ইনি ঐকান্তিক অধ্যবসয়ে দেশদেশান্তর হইতে ছাত্র আনাইয়া নবদ্বীপের মহিমা অক্ষুর রাবিরাহিলেন। তাঁহার কৃত চিন্তামণি অঙ্কুরাকের টীকা, “বৌদ্ধাধিকার” “নানার্থবাদ,” “নব্য মতবাদার্থ,” “রত্নকোষ পদার্থ,” “উপসর্গবিচার,” “সন্দ্বিধার্থ বিচার,” “সাহিত্যবাদ” “প্রথম ব্যুৎপত্তি,” “অনুকরণ বিচার,” প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থরাঙ্গী অদ্যাপি বিশেষ সমাদৃত হইতেছে। এই সময় হইতে কৃষ্ণনগরের রাজবংশের নবদ্বীপের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং পরে মহারাজ রামকৃষ্ণ নবদ্বীপের পণ্ডিত-মণ্ডলীর সাহায্যকমে বহু মুদ্রা আয়ের ভূসম্পত্তি দান করিলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে “নবদ্বীপাধিপতি” এই মহা সম্মান-সূচক উপাধিতে ভূষিত করেন।

সুবিধায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে নবদ্বীপের স্ত্রিয়মাণ বিদ্যাচর্চা আবার নবশক্তি প্রাপ্ত হয়। ইহারই অধিকারকালে নবদ্বীপের হরি-রাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি প্রভৃতি শ্রুতিপাণ্ডার প্রসিদ্ধ মুকবি বাণেশ্বর বিদ্যালভার, ত্রিবেণীর অগণাধ তর্কপঞ্চানন এবং শান্তিপুত্রের রাধামোহন গোস্বামী প্রভৃতি সুপণ্ডিতগণের যশঃসৌরভে বহুভূমি আয়োজিত হইতেছিল।

হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত গুরু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাউজ্জ্বলকারী পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুর পর নবদ্বীপে প্রধান নৈয়ায়িকরূপে বসিত হয়েন। ইহার মৃত্যুর পর শঙ্কর তর্কবাগীশ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্রের সভায় ও নবদ্বীপে প্রাধান্য লাভ করেন। ইহার সময়ে হুপ্রসিদ্ধ বুনো রামনাথ, কান্ত বিদ্যালঙ্কার, মধুসূদন স্কায়ালঙ্কার প্রভৃতি উদ্ভূত হয়েন।

বুনো রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ।

কথিত আছে, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত উদ্যানীশ্বর নৈয়ায়িকপ্রধান রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের শিষ্য। তিনি পঠদশায় বিবাহ করেন এবং অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত দান্তিক ছিলেন। সে সময়ে পাঠান্তে সকলেই নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণনগরের রাজার সাহায্য গ্রহণ করিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপনা করিতেন, কিন্তু দান্তিক রামনাথ তাহা না করিয়া নবদ্বীপের উপকণ্ঠে বনের মধ্যে কুটীর নির্মাণ করিয়া সমাগত ছাত্রবৃন্দকে বিদ্যাদান করিতে থাকেন। বনে কুটীর মধ্যে বাস করার লোকে তাঁহাকে বুনো রামনাথ বলিত। যদিও তাঁহার বশঃসৌরভে বিদ্যার্থীর অপ্রতুল ছিল না, কিন্তু সনাতনপ্রথাযুগ্য তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় বহন করিতে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহার ঐকান্তিক অভাব ছিল। এ সময়ে দেশের অবস্থাও শোচনীয়—ইংরাজ তখন কেবল আধিপত্য গ্রহণ করিতেছেন; দেশ হুশাসিত হয় নাই—দুহা ও চৌর্য্যভরে দেশ শশঙ্কিত—ধনী আর অর্থ ব্যয় করে না, পাছে ধনাপবাদে গৃহে ডাকাতি হয়, সুতরাং বহিঃসাহায্য তখন মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে; এ অবস্থায় বিদ্যা ও পুঁথিমাত্রসম্বল দরিদ্র অধ্যাপকগণের আর পূর্ব্বের ভায় ছাত্রপোষণে ক্ষমতা ছিল না, তাই রামনাথ তাঁহার ছাত্রগণকে কেবল বিদ্যাদান করিতেন, তাহারা নিজ ব্যয়ে আহাৰাদি ব্যবস্থা করিত। এই সময় হইতে “ছাত্র পোষণের” মনুপ্রচলিত সনাতন নিয়ম বিশিষ্টরূপে শিথিল হইয়া যায়।

রামনাথ দরিদ্র হইলেও সর্ব্বদা তাঁহার অবস্থার সন্তুষ্ট রহিতেন। রামনাথের গৃহিণীও তাঁহার ভায় অল্পে সন্তুষ্টা ছিলেন এবং সর্ব্বতোভাবে স্বামী উপবৃত্তা ছিলেন। কথিত আছে, একদিন ঘরে রন্ধনোপযোগী ব্যবসস্তার কিছু না থাকায় রামনাথগৃহিণী স্বামীকে কি ব্যঞ্জন হইবে জিজ্ঞাসা করার, শাস্ত্রচিত্তার তদ্বয়

রামনাথ উদাস দৃষ্টিতে উর্ধ্বে নিকটস্থ এক তিতিভী বৃক্ষের দিকে কিয়ৎকাল মাত্র তাকাইয়া চলিয়া যান। অবোধ গৃহিণী—বুঝি স্বামী তিতিভী পত্রের ব্যঞ্জন রাঁধিতে অমুদতি করিলেন ভাবিয়া, মধ্যাহ্নে স্বামীকে তিতিভী পত্রের ব্যঞ্জন ও অন্ন প্রদান করেন। পণ্ডিতও তখন সমস্ত বুঝিয়া সাহসাদে তাহাই অমৃত বোধে ভোজন করিলেন।

এইরূপে যখন তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষারহিত পুণ্যময় জীবন অভিযাহিত হইতেছিল, তখন তদানীন্তন নববীপাধিপতি রাজা শিবচন্দ্র তাঁহাদের এই হুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া কিছু সাহায্য-মানসে এক দিন তাঁহাদের কুটীরে পদার্পণ করেন। রামনাথ তখন একাগ্রমনে পাঠ দেখিতে ছিলেন, হুঃপ্রাণ প্রথমে রাজাকে দেখিতে পান নাই। পরে সর্বিশেষ আদর করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা উপবিষ্ট হইয়া কথান্তরে রামনাথকে তাঁহার কিছু অমুপপত্তি আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে রামনাথ উত্তর করেন, “মহারাজ! সম্প্রতি চারিখণ্ড চিন্তামণি শাস্ত্রের উপপত্তি করিয়াছি, আর এখন কিছুই ত অমুপপত্তি দেখিতেছিলা।” এই উত্তরে মহারাজ আশ্চর্য হইয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও সত্বক রামনাথ তাঁহার দান অস্বীকার করেন। এই সময়ে কলিকাতার রাজা নবকৃষ্ণ বাটী জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আগমন করেন ও তদুপলক্ষে এক মহতী সভা আহুত হয়। সেই সভায় ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপকানন, নববীপের নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ শিবনাথ বাচস্পতিপ্রমুখ পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু দিগ্বিজয়ীর প্রশ্নের উত্তরদানে সকলে অক্ষম হইলে এই নির্লোভী মহাপণ্ডিত বুনো রামনাথই নদীয়ার চিররক্ষিত সম্মান রক্ষা করেন।

শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি।

শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি তাঁহার পিতা শঙ্কর তর্কবাগীশের পরলোকের পর প্রাধাত্য প্রাপ্ত হইলেন। কবিত আছে, ইহার পিতার প্রাচীনসভার দেশমাত্র কবচীর অব্যাপকমণ্ডলীর সমাবেশ হয় এবং সেই সভায় ত্রিবেণীর হুঃপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপকানন এক পূর্বপক্ষ উপস্থাপিত করিয়া সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর উপর প্রাধাত্য স্থাপন করিতে ও নববীপের বশোহানি করিতে উদ্যত হইলেন। এই

সময়ে শিবনাথ দানোৎসর্গ করিতেছিলেন; তাঁহার সাক্ষাতে তাঁহার প্রিয় ভূমি নবদ্বীপের বশোহানি হয় দেখিয়া দানোৎসর্গ পরিত্যাগ পূর্বক অগ্নিভেদে সমুদ্রীন হইয়া তর্ক দ্বারা তাঁহাকে নিরস্ত করেন ।

শিবনাথের পর কাশীনাথ চূড়ামণি প্রধানরূপে গণ্য হইলেন । তাঁহার মৃত্যুর পর দ্বিতী নামে একজন কিয়দ্বিবসের অল্প প্রধানরূপে গণ্য ছিলেন । তৎপরে শ্রীরাম শিরোমণি প্রাধিক্ত লাভ করেন । ইহার সময়ে নলডাকার মাধব তর্ক-সিদ্ধান্ত নামে একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন, তিনি “সুবোধা” নামে শিরোমণি-কৃত পদার্থতত্ত্বের এক টীকা প্রণয়ন করেন । শ্রীরাম শিরোমণির পরে তৎপুত্র হরমোহন চূড়ামণি প্রাধিক্ত লাভ করেন । ইনি ১৭৮৫ শকে বা ১৮৬৩ খ্রষ্টাব্দে “সামান্ত লক্ষণা বাখ্যা” নামে একখানি টীকা প্রণয়ন করেন । ইহার প্রাধিক্ত সময়ে মাধব তর্কসিদ্ধান্ত ও প্রসন্ন তর্করত্ন প্রধান পণ্ডিত । এই সময়ে ১৮৬৪ অব্দে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ই বি কাউয়েল সাহেব গবর্ণমেণ্টনিয়োজিত হইয়া নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীর সবিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিতে আগমন করেন । তিনি যখন এখানে আসেন, তখন প্রধান পণ্ডিত সকলেই কুচবিহারের বুদ্ধ রাজার প্রাক্কে আবৃত হইয়া তথ্য গমন করিয়াছিলেন । তিনি এই সময়ে সমগ্র নদীয়ার ষাটশটী টোল ও সেই সকলে সার্ব্ব একশত মাত্র ছাত্র গণনা করিয়াছিলেন । এই সকল টোলের মধ্যে তিনি পূর্বোক্ত প্রসন্ন তর্করত্ন মহাশয়ের টোলই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করিয়াছিলেন ।* এই

* এই চতুষ্পাঠী গৃহ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :—

“It was built for him by a Hindu gentleman of Lucknow and is really an elegant building, occupying about half an acre of land. The quadrangle inside, is about 30 yds square and contains 30 rooms for the students. The rooms are generally about 9 feet long and 8 wide, with a window and a door; The corner rooms are rather longer. More than half of one side is given up to lecture-hall. This stands on a platform raised some five feet from the ground, it has two apartments, each about 33 feet in length, the outer is ten and the inner 12 feet wide, and the front is supported by 6 pillars, which produce a very good effect.” এই টোল নবদ্বীপে, সাধারণতঃ পাকা টোল নামে খ্যাত এক ইহাই বুনো রাজনাথের ছান বলিয়া নির্দিষ্ট হয় ।

টোলগৃহ বাবুলাল নামক অনেক লক্ষ্যবাসী বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তি নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া দেন এবং তথাগত ছাত্রবৃন্দের অশনের ব্যয়ও স্বীয় স্বন্ধে বহন করেন।

হরমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার সহোদর ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রধান পদে বৃত্ত হইলেন। ইনি গবর্ণমেন্ট হাইতে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ইঁহার প্রাধান্তকাল মধ্যে মহামহোপাধ্যায় ৮মধুসূদন স্মৃতি-রত্ন, ৮প্রসন্নকুমার তর্করত্ন, ৮হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, ৮ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ৮মধুরনাথ পদ্মরত্ন, ৮লালমোহন বিদ্যাবাগীশ, ৮প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন, ৮রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, ৮শ্রীনাথ শিরোমণি প্রমুখ অধ্যাপক মহাশয়গণ প্রাহুর্ভূত হইয়াছিলেন। পরে ৮ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হইলে মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় প্রধান নৈরায়িক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এক্ষণে নববীপে তাঁহার চতুস্পাঠী ব্যতীত মহামহোপাধ্যায় বহুনাথ সার্কভৌম, অবিনাশচন্দ্র ভায়রত্ন এবং আন্ততোষ তর্কভূষণ এই তিন জন অধ্যাপকের ৩ খানি ভায়ের চতুস্পাঠী আছে। এই চারিখানি ভায়ের চতুস্পাঠীতে বৎসরে অন্তত ৫০ জন ছাত্র ভায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত স্মৃতির দশখানি ও বেদান্ত পাঠের একখানি চতুস্পাঠী সম্প্রতি নববীপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

স্মৃতি ।

নববীপ বিগত কয়েক শতাব্দীতে ভায়শাস্ত্রে বেরূপ উন্নতি করিয়া দ্বিতীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, সেইরূপ স্মৃতিশাস্ত্রের আত্ম সংস্কার ও আলোচনা করিয়া উক্ত শাস্ত্রেও আপনার প্রাধান্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। স্মৃতির অপর নাম ধর্মশাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্র সকল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুনিগণ কর্তৃক তৎকালীন সমাজবন্ধনের জন্য সংগৃহীত। শাস্ত্রে ময়, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি প্রধামতঃ ঐনবিশ জন স্মৃতিকারের সবিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। * অনেক বিষয়ে এই সকল বিভিন্ন মুনির বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়,

* মতত্রি বিষ্ণুহারীত দ্ব্যজ্ঞবল্ক্যোশনাদিরাঃ ।

স্বাপত্তবসম্বর্তী: কাভায়ান বৃহস্পতী ।

হুতরাং কোন্ মত গ্রাহ্য অথবা কোন্ মত প্রামাণিক, তাহা স্থির করা অতি দুষ্কর—এই কারণে প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদী মতের মধ্যে একটা সাম্যতা রক্ষা করিবার জন্য সময়ে সময়ে তীক্ষ্ণবী পণ্ডিতগণ মীমাংসামাত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সকল মীমাংসকগণের মধ্যে জৈমিনী, মনুটীকাকার মেধাতিথি, কুসুমভট্ট, “ধর্ম্মরত্ন”কার ভীমুতবাহন, বিবাদচিন্তামণিকার মিশ্র বাচস্পতি, শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি এলং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রধান মধ্যে পরিগণিত। ইহাদের মধ্যে কুসুমভট্ট ও শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালী। কুসুম ভট্ট তৎকৃত মনুসংহিতার টীকা এইরূপে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন :—

“গৌড়ে নন্দনবাসিনামি হুজুনে বঁশে বরেপ্রয়াং কুলে।

শ্রীমন্ডট দিবাকরস্ত তনয়ঃ কুসুমভট্টোহভবৎ।

ইনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কানীতে অধ্যয়ন শেষ করিয়া “মহর্ষমুক্তাবলী”নামী মনুসংহিতার টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষকালে নববীপে বর্তমান ছিলেন। প্রসিদ্ধ শ্রীব্রজাচার্য্য ইঁহার পিতা, ইঁহার কৃত কৃত্যতত্ত্বার্ণব, দায়তত্ত্বার্ণব, উদাহতত্ত্বার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে আদৃত। ইঁহার সময় হইতেই নববীপে স্মৃতিশাস্ত্রচর্চার বিকাশ হয় এবং পরবর্ত্তী শতাব্দীতে হুপ্রসিদ্ধ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক উহার প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য।

রঘুনন্দন খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন।* ইনি মহা-প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। উদানীন্তন স্মার্ত্ত পণ্ডিত “সময় প্রদীপ”-

পরামর ব্যাসমথলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।

শাতাতপৌ বসিষ্টশ্চ বর্ষশাস্ত্র প্ররোজকাঃ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা

* “নবটি শতাব্দীনের শকাব্দাকেন পুরিতা”

জ্যোতিষতত্ত্বে রবি-সংক্রান্তি গণনা।

অর্থাৎ ১৪৮২ শকাব্দে পূরণ করিবে। তাঁহার কৃত জ্যোতিষতত্ত্ব সঙ্কলনের কাল এইরূপ

রচয়িতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঔরসে রঘুনন্দন জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবধি রঘুনন্দন যেমন মেধাবী, তেমনি শিষ্ট ও শাস্ত্র-স্বভাব ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ ও কাব্যাদিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং হৃদয় হৃদয় প্রোকরচনার পারদর্শী হইলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, এই সময় নবাবীপের নবযুগ। পরম ভাগবত শ্রীমন্ কৃষ্ণচৈতন্য, প্রসিদ্ধ নৈরায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ও বাহুদেব সার্কভোম, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভৃতি মনীষিগণ এই সময়ে বিদ্যমান। দেশ তখন সর্ববিধে নবহিঙ্গোলে টলটলায়মান।

মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ধর্মের বলে জাতিভেদপ্রথা শিথিল হইয়া আসিতেছিল। ব্রাহ্মণের গুরুত্বের অনেক লাঘব হইয়াছিল। রঘুনাথের নব জায় দেশে একপ্রকার নাস্তিকতা আনয়ন করিতেছিল, আগমবাগীশের তত্ত্বোক্ত মত বামাচারের কৃষ্ণ আধরণে ব্যভিচার ও সুরা স্রোতের প্রেত্নয় দিতেছিল; ওদিকে মুসলমানগণের হুদীর্ঘকালের শাসনে ও সংস্পর্শে সমাজের রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার সর্বপ্রকারে বিপর্য্যস্ত হইতেছিল। এই টলটলায়মান সমাজ হুটীকরণেও তৎকালোচিত সমাজগঠনের ঐকান্তিক প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল। এই প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিতে বর্তমান যুগের মনু, রঘুনন্দন অগ্রসর হইয়াছিলেন। রঘুনন্দন সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে সমাজের বর্তমান অবস্থায় ঋষিগণপ্রবর্তিত সমস্ত বিধি বধ্যাযথ আচরিত হইতে পারে না; সুতরাং এই সকল কঠোর বিধি কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দেশকাল পাত্ৰোচিতরূপে সংস্কারে মনোনিবেশ করেন এবং স্বীয় মত হুটীকরণের নিমিত্ত বহুপ্রচেষ্টা প্রণয়ন করেন। ঐ সকল প্রচেষ্টার তিনি এইরূপ তালিকা প্রদান করিয়াছেন :—

“মসিহ্নূ চৈ দায়ভাগে, সংস্কারে শুদ্ধিনির্গমে।

প্রায়শ্চিত্তে বিবাহেচ তথো জ্ঞাষ্টমীত্রেতে ॥

হুগৌংসবে দ্বাবজ্জতাবেকালস্তাদি নির্গমে।

তড়াপতবনোংসর্গে বৃহোংসর্গ ত্রে ত্রেতে ॥

লিখিত হইল। উক্ত গ্রন্থখানি তাঁহার শেষ বয়সের রচনা বলিয়া গ্রাহ্য করিলে ১৪২৫ হইতে ১৪৩০ শকের মধ্যে তাঁহার আকির্বাৎ কাল কল্পনা করিতে হয়। অতএব ঐচৈতন্যের জন্মগ্রহণ কালের প্রায় ১৫৭০ বৎসর পরে তিনি নবাবীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই অনুমিত হয়।

প্রতিষ্ঠায়াং পরীক্ষায়াং জ্যোতিষে বাস্তবজ্ঞকে ।

দীক্ষায়ানাহিকে রুত্রে, ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ॥

সামপ্রাভে বজুঃপ্রাভে শূদ্রকৃত্য-বিচারণে ।

ইত্যষ্টাবিংশতিস্থানে তত্ত্বং বক্ষ্যামি যত্নতঃ ॥”

সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র এইরূপে সংস্কৃত হইবার পর তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ-
নস্তর ও সর্বস্থানের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের সহিত বিচারে স্বীয় মত সংস্থাপন
করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বিচারার্থী হইলেন এবং দ্বীয় অসাধারণ
প্রতিভাবলে শীঘ্রই আশ্রমত স্থাপনে সমর্থ হইলেন । এই সময়ে স্মার্ত শব্দ
যোগরূঢ় হইয়া একমাত্র তাঁহাকেই নির্দেশ করিত । তাঁহার মত তখন সকলে
এতই আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে থাকেন যে, কথিত আছে—একদিন প্রাতঃকালে
নবদ্বীপের গঙ্গাতটে শিবপূজাকালীন রঘুনন্দনের বস্ত্রের কচ্ছদেশ তাঁহার অজ্ঞাত-
সারে মুক্ত হইয়া যায় । রঘুনন্দন তখন ধ্যানমগ্ন—বাহ্যবিষয়ে একেবারে
অজ্ঞান, হুতরাং কাছা শুলিয়া গিয়াছে, ইহা আদৌ জানিতে পারেন নাই ।
এই কালে নবদ্বীপের ষাট সমুদায় বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল । * সহস্র সহস্র লোকে
সকল সময়েই এই ষাট পূর্ণ থাকিত । বিশেষতঃ পণ্ডিতমণ্ডলীর জ্ঞান, পূজার্চনা,
পাদচারণ, এমন কি ছাবাধ্যয়ন ও তর্কযুক্ত প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই এখানে সমাহিত
হইত । সমবেত পূজানিরত পণ্ডিতমণ্ডলী স্মার্ত ভট্টাচার্য্যকে ঐরূপে মুক্তকচ্ছ
হইয়া পূজায় নিরত দেখিয়া উহাই শাস্ত্রোক্ত প্রথা মনে করিয়া সকলেই মুক্তকচ্ছ
হইয়া পূজা করিতে থাকেন । পূজান্তে স্মার্ত, সকলকে তদবস্থ দেখিয়া কারণানু-
সন্ধানে সমস্ত অবগত হইয়া মহাকৌতুক করিতে থাকেন ।

কথিত আছে :—রঘুনন্দন তাঁহার মত স্থাপনার্থ যখন দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া
৷গঙ্গাক্ষেত্রে পিতৃ মাতৃ কার্য্যের জন্য উপস্থিত হইলেন, তখন পর্যালী পাণ্ডাগণ অনেক
পণ গ্রহণ করিয়া তবে ৷গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে বাতীদিগকে পিণ্ডদান করিতে
দিতেন । লোকমুখে রঘুনন্দনের ধ্যাতি ও বশ শ্রুত থাকিলেও পাণ্ডাগণ তখনও

* নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ষিবারে পারে ।

এক গঙ্গাঘাটে লক্ষলোক জ্ঞান করে ॥

ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ ।

সরস্বতী প্রদায়ে সবাই মহাদক্ষ ॥

কেহ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই, সুতরাং তদানীন্তন প্রথামুখারী গয়ালী পাণ্ডাগণ তাঁহার নিকটেও উচ্চপণ চাহিয়া বসেন এবং স্মার্তের ঐকান্তিক কাতরতায় দয়াজ্ঞা না হইয়া অর্থের জন্য ক্ষেপ করিতে থাকেন। উহাতে স্মার্তপ্রধান রঘুনন্দন শাস্ত্রামুখারী ক্রোশব্যাপী গয়াক্ষেত্র ইত্যাদি বচন উক্ত করিয়া মন্দির হইতে দূরে একপ্রান্তরে পিণ্ডদানের উদ্যোগ করেন। এখন পাণ্ডারা তাঁহাকে স্মার্ত ভট্টাচার্য্য জানিতে পারিয়া নিজেদের ক্রটি স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে সমাদরে মন্দিরে আহ্বান করিয়া লইয়া যান। কারণ, তাঁহারা বেশ জানিতেন, সেই দিন স্মার্ত যদি প্রান্তরে পিণ্ড দান করিতেন, তাহা হইলে আর কেহ পাণ্ডাদের অবধা অত্যাচারে পীড়িত হইতে মন্দিরে গমন করিত না। এই সকল কাহিনী হইতে রঘুনন্দন তদানীন্তন হিন্দুসমাজে কি উচ্চতর আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বেশ উপলব্ধ হয়।

এই সময়ে হিন্দুবিধবাগণের আচার-ব্যবহার ঠিক শাস্ত্রসম্মত না থাকায় এবং তৎসম্বন্ধে সমাজের শিথিলতা দেখিয়া স্মার্ত একাদেশীতে উপবাসাদির কঠোর নিয়ম প্রচলিত করেন। তিনি তিথিতত্ত্ব নামক গ্রন্থে প্রত্যেক তিথিতে আচরণীয় কার্য্যাদির ও আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন; এবং আহারাদির বিষয়েও সুবিধে সংস্কার করিয়া যান। কথিত আছে, এই সময়ে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক গোপনে সিদ্ধ চাউল ও মসুর ডাউল ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। স্মার্ত উক্ত ব্যবহারের প্রকাশ্য ব্যবহারবিধি দেন। এইরূপে সর্ব্ববিষয়েই তিনি সংস্কার সাধন করিয়া যান।

স্মৃতিরাশ্যে এইরূপে একাধিপত্য করিয়া স্মার্তপ্রধান রঘুনন্দন সপ্ততি বৎসর বয়সে লোকান্তর গমন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ সার্কর্তোময় ।

রঘুনন্দনের মৃত্যুর পর অনেকেই তাঁহার গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া গ্রামে গ্রামে ব্যবস্থাদি দিবার নিমিত্ত টোল স্থাপন করেন। তিনি এইরূপে বহুশাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতের আয়ের সংস্থান করিয়া যান। অন্যাপি তাঁহার স্থাপিত নব্যস্মৃতি বঙ্গদেশ শাসন করিতেছে। ইহার পরে সময়ে সময়ে এক এক জন পণ্ডিত তাঁহারই গ্রন্থ সমূহের টীকা ও ভাষ্য সম্বলন করিয়া বণ্ণী হইয়াছেন। সুবিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ রাজা রামজীবনের সভায় শ্রীকৃষ্ণ সার্কর্তোমকে প্রধান

জ্যোতিষ ।

জ্ঞান এবং স্মৃতিশাস্ত্রের জ্ঞান নবদ্বীপে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। কত কাল পূর্বে ভারতবর্ষে জ্যোতিঃশাস্ত্রের অভ্যাস হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে পৃথিবীর আদিম জ্ঞানভাণ্ডার বেদের মধ্যেও নাতি-বিস্তৃত ভাবে জ্যোতির্বিদ্যার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বেদ যজ্ঞকর্মান্বক। যজ্ঞ করিতে হইলে কালজ্ঞানের আবশ্যক। জ্যোতিঃশাস্ত্রই সেই কাল-জ্ঞানের একমাত্র উপায়। এই জন্তই জ্যোতিষ বেদের ছয়টি অঙ্গের অন্যতম অঙ্গ।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে উল্লিখিত হইয়াছে,—ময়নামক অশ্বরের প্রার্থনার স্বরূপ সূর্য্যদেব তাহার অভীষ্ট পূরণের নিমিত্ত স্বীয় দেহ হইতে এক শ্ববিকে সৃষ্টি করেন; তিনি ময়ের প্রাণের উত্তর প্রদান করায় সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থ বিরচিত হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্ত রচিত হইবার পর আৰ্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্য, কেশবদৈবজ্ঞ, গণেশদৈবজ্ঞ প্রভৃতি অসংখ্য জ্যোতির্বিৎ ভারতীয় জ্যোতিষ-বিদ্যার অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। আৰ্য্যভট্টই সর্বপ্রথমে পৃথিবীর গতি নির্ণয় করেন। বরাহমিহিরের গ্রন্থে জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত নবাবিস্কৃত অনেক তত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়। ভাস্করাচার্য্যই প্রথম মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আবিষ্কার করেন। কেশবদৈবজ্ঞ ও গণেশদৈবজ্ঞ প্রভৃতির গ্রন্থে তিথি নক্ষত্র ও গ্রহণ-গণনাদির সুন্দর নিয়ম দৃষ্ট হয়। এতদ্বিধ অনন্তদৈবজ্ঞ-প্রভৃতি বহুসংখ্যক গ্রন্থকার জাতক-সংক্রান্ত (জন্মপত্রিকা প্রভৃতি নির্মাণ সম্বন্ধে) বহুগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গদেশে কতকাল পূর্বে জ্যোতিঃশাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, তদ্বিবরে কোন লিখিত বিবরণ না থাকিলেও বঙ্গীয় জ্যোতির্বিৎ-সম্প্রদায়ের কুল গ্রন্থ হইতে এদেশে জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চার একটা স্থূল সময় নির্ণয় করা যায়। এখন বঙ্গদেশ বলিলে যে সীমান্তগত জনপদ বুঝায়, পূর্বে তাহা বুঝাইত না। পূর্বে বর্তমান বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশ অর্থাৎ নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, দীনাজপুর, রাজসাহী পুর্ণিয়া মালদহ, মুর্সিদাবাদ, চব্বিশপরগণা প্রভৃতি জেলার অন্তর্গত স্থানকে “গৌড়” ও যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা, ঢাকা, বরিশাল, মৈমনসিং কমিল্লা, শিলেট, নওয়াখালি প্রভৃতি জেলার অন্তর্গত স্থানকে “বঙ্গ” বলিত। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে শশাঙ্ক নামে এক নরপতি মহাপ্রতাপের সহিত গৌড়রাজ্য শাসন

করিডেন। এক সময় উক্ত নরপতি কোন দাক্ষণ রোগে আক্রান্ত হন। তিনি নানাবিধ চিকিৎসার দ্বারা রোগমুক্ত হইতে না পারিয়া অবশেষে দৈবকার্য সম্পাদনের জন্য অভিলষী হইয়া শাস্ত্রজ্ঞানী ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন গোড় ও বন্ধে ব্রাহ্মণ বসতি ছিল না এমন নহে, সপ্তসতী নামে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা ক্রিয়াহীন মুখ্য। কারণ, তখন বৌদ্ধগণ দেশময় স্বীয় ধর্মের প্রচার কার্যে নিরত। রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মের বিরোধী এবং পরম আস্তিক ছিলেন। সুতরাং তিনি গ্রহযোগ সম্পাদনের নিমিত্ত মন্ত্রীর সাহায্যে সরযুতীর হইতে দ্বাদশটি বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন*। ঐ সকল ব্রাহ্মণের যজ্ঞের প্রভাবে রাজা রোগমুক্ত হইলেন এবং যাগকারী ব্রাহ্মণদিগকে

* “ঐশ্বর্য্য প্রাপিত্যাগ্রে তথৈব কুলদেবতাং।

ক্রিয়তে গ্রহবিপ্রাণাঃ কুলপত্নী যথাবিধি ॥

হরম্যে সরযুতীরে নানাবৃক্ষসমাকুলে।

হরসালকলৈঃ পুষ্পরাকীর্ণে চ মনোহরে ॥

বসন্তি বিশ্রান্দী ল বৈদবেদাঙ্গপারগাঃ।

নানাশাস্ত্রেণ কুশলা জপযজ্ঞপারগাঃ ॥

কদাচিৎ পতিশ্রেষ্ঠঃ শশাঙ্কো গৌড়ভূপতিঃ।

গীড়িতো গ্রহবৈশ্বগ্যাং ক্লেশং প্রাপ স ধার্মিকঃ ॥

বৈজ্ঞানিকচিকিৎসিতঃ সম্যক্ত্বং ন যুক্তো রোগ-সঙ্কটাতং।

ততঃ যন্ত্যয়নং কর্ত্তুমিহৈব নরপুংসবঃ ॥

মন্ত্রিণা প্রেরিতা দূতা আনীতা বিজসন্তমাঃ।

আহুয় সরযুতীরাং নৃপত্যাগেশতন্ততঃ ॥

*

.

গ্রহজ্ঞানং বিদিত্বাত্ত তেবাং রাজা মহাস্থনাং।

গ্রহযজ্ঞ-বিধানার্থং বৃতান্তে নিজমন্দিরে ॥

.

*

সম্পাদ্য বিধিবজ্রাজ্ঞো গ্রহযজ্ঞং বিজাতরঃ।

সদায়া নিবসন্তিস্ত গৌড়দেশে নৃপাজ্ঞরা ॥”

(নদীয়া-বঙ্গসমাজ—গ্রহবিপ্রকুলপঞ্জিকা)

দ্বীপ রাজ্যে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণেরাও শতশ্রমলা বহুভূমির স্বাভাবিক আকর্ষণে সমাকৃষ্ট হইয়া সপরিবারে আসিয়া এদেশে বসতি স্থাপন করিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণের জ্যোতিঃশাস্ত্রে সবিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল এবং সর্বদাই তাঁহারা গ্রহযাগাদি সম্পন্ন করিতেন, তজ্জন্তু এদেশে ‘গ্রহবিপ্র’ নামে বিখ্যাত হইলেন*। রাজা শশাঙ্কের সময়ে গ্রহবিপ্রগণ সুখে ও মহাসম্মান প্রাপ্তির সহিত গোড়দেশে বাস করিতেছিলেন। কিছুদিন পরে শুণ্ডবংশীয় শশাঙ্কের বংশধরগণের রাজ্য গেল, মগধে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালবংশ ও বঙ্গে পুন-রুখিত-হিন্দুধর্মাবলম্বী সেনরাজগণ রাজ্য করিতে লাগিলেন। এই শেষোক্ত রাজ-বংশের প্রথম রাজা আদিশূর (বীরসেন) কাঞ্চকুজ হইতে ১১১ শকাব্দে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। আদিশূর-বংশীয় কয়েকজন নৃপতির পর পালবংশীয়েরা গোড় অধিকার করেন। অবশেষে সেনবংশ প্রবল হইয়া পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপতিদিগকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। তখন হিন্দুনরপতির শাসনাধীনে কান্যকুজাগত ব্রাহ্মণগণের বন্ধে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। হুতরাং বঙ্গের আদিমনিবাসী সপ্তশতী ও সরস্বপারী-প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের অবস্থা হীন হইয়া পড়িল। কাঞ্চকুজাগত ব্রাহ্মণেরা বঙ্গের প্রাচীন অধিবাসী ব্রাহ্মণদিগকে প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণ বলিয়াই গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু শেষে দায়ে পড়িয়া বঙ্গের অন্য-তম আদিমনিবাসী আচারহীন শাস্ত্রজ্ঞানবর্জিত সপ্তশতী-ব্রাহ্মণের কন্যাগণের পানিগ্রহণ করিয়া বিস্তৃত সপ্তশতী-ব্রাহ্মণসমাজের অধিকাংশ সম্পন্ন গৃহস্থকে নিজকুক্ৰিগত করিয়া ফেলিলেন। সপ্তশতীরা আপন আপন গোত্র পরিত্যাগ-পূর্বক পঞ্চগোত্র গ্রহণ করিলেন। কেহ কেহ নিজ গোত্র রক্ষা করিয়াও কান্যকুজা-গত ব্রাহ্মণগণের সহিত চলিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে কনোজাগত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে গাঞি প্রতিষ্ঠিত হইল। ষটক বা কুলজ্ঞেরা প্রচার করিলেন;— “পঞ্চগোত্র ছাপান্ন গাঞি ইহা ছাড়া বামন নাই।” এই সময় সকলেরই কাঞ্চ-কুজাগত ব্রাহ্মণ-সমাজের সহিত মিলিত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল, অপেক্ষা-

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথবহু নদীয়াবঙ্গসমাজের গ্রহবিপ্র ও অন্তান্ত গ্রহবিপ্র, সকলকেই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। কিন্তু কুলপঞ্জিকার সরস্বপারীগ্রহবিপ্র ও শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্র পৃথক পৃথক সমাজে বিভক্ত বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়। রাজা শশাঙ্কের আনীত সরস্বপারী ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশকেইই নদীয়াবঙ্গসমাজ গঠিত।

কৃত হুর্দশাগ্রস্ত অবশিষ্ট আদিম সপ্তশতী ও জ্যোতিবী সরযুপারী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ একটু অবস্থাপন্ন হইলেই নানা কৌশলে প্রবল ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ে মিশিতে লাগিলেন । আবার কতকগুলি সপ্তশতী অবস্থা-হীনতা প্রযুক্ত সরযুপারী-গ্রহবিপ্রদের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছেন, তাহাও কুলজীতে লিখিত আছে । এই রূপে বঙ্গদেশের সপ্তশতী ব্রাহ্মণ-সমাজের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল ও সরযুপারী গ্রহবিপ্রগণ সমাজের অধিকাংশকে হারাইয়া নিতান্ত হুর্দশ অবস্থায় বঙ্গদেশে বাস করিতে লাগিলেন । দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দে যখন সেনবংশীয়গণ নবদ্বীপ-রাজধানীতে অবস্থান করিয়া বঙ্গদেশ শাসন করেন, তখনও গভাবশিষ্ট গ্রহবিপ্র বা জ্যোতিবী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইলেও নিতান্ত অল্প ছিল না । সেনবংশীয়দের সময়ে ও জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিলক্ষণ সমাদর ছিল ।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেও নবদ্বীপে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল । খ্রীষ্টোত্তরের জন্মকালে তাঁহার জীবনের ভাবি ফলাফল গণনা করিয়া নবদ্বীপের জ্যোতির্বিৎ গ্রহবিপ্রগণ পাণ্ডিত্যের বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নদীয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দমজুমদার যখন আনুলিয়া গ্রামে বাস করেন, সেই সময়ের কয়েকটা জ্যোতির্বিৎ গ্রহবিপ্রবংশের পরিচয় পাওয়া যায় । নিম্নে যথাক্রমে ঐ সকল বংশের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে ।

গর্গ-গোত্রীয়—

হৃদয়ানন্দবিদ্যার্ণব ।

হৃদয়ানন্দবিদ্যার্ণব একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন । ইনি গণিত ও জাতক উভয়বিধ জ্যোতিঃ শাস্ত্রেই বিলক্ষণ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন । তদানীন্তন কালে হৃদয়ানন্দবিদ্যার্ণবের জ্ঞান কৃতী জ্যোতির্বিৎ বঙ্গে কেহই ছিলেন না । ভবানন্দ মজুমদার এই বিদ্যার্ণব মহাশয়কে যথেষ্ট সম্মান ও বিশ্বাস করিতেন । হৃদয়ানন্দের কৃত “জ্যোতিঃসারসংগ্রহ” একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ । হৃদয়ানন্দবিদ্যার্ণব বোধ হয় অতিশয় দীর্ঘজীবী ছিলেন, তজ্জন্তই আমরা ভবানন্দমজুমদারের প্রপৌত্র

মহারাজ রামজীবনের সময়েও যে তিনিই নদীয়া রাজধানীর জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত ছিলেন, এইরূপ প্রাচীন পরম্পরার যুগে গল্প শুনিতে পাই। রাজা রঘুরামের সময় ছন্দরানন্দবিদ্যার্যবের পুত্র বিষ্ণুদাস জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত হন। ইঁহার কোন উপাধি ছিল কি না জানা যায় না। তাহার পর, রাজরাধেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়েই নদীয়ার রাজবংশের চরম উন্নতি হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের নবরত্নমন্ডার আকারে স্বীয় রাজধানীতে একটি “পঞ্চরত্নসভা” প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সভায় বরাহমিহিরের গ্রন্থ বিষ্ণুদাসের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রামরত্নবিদ্যানিধি অন্ততম রত্ন ছিলেন। এই রামরত্নবিদ্যানিধি অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁহার কৃত কতিপয় জ্যোতিষ গ্রন্থ এবং পঞ্জিকা গণনার সহজ সংক্ষেপ-সূচক পুস্তকসমূহ অদ্যাপি এই বংশের কোন আত্মীয়ের গৃহে বিদ্যমান আছে।

রামরত্নবিদ্যানিধি সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটি এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। এক সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় স্বীয় বিস্তৃত জমিদারীর কর যথাসময়ে না দিতে পারায় নবাবকর্তৃক আত্মহইয়া মুর্শিদাবাদে গমন করিয়াছিলেন। মহারাজ যখনই মুর্শিদাবাদ যাইতেন, তখনই কয়েকটি প্রিয়পাত্রকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। যে সকল পণ্ডিত মহারাজের প্রীতিভাজন ছিলেন, তন্মধ্যে রামরত্নবিদ্যানিধি অন্ততম। প্রতিদিনই মহারাজকে পারিষদগণ সহ নবাবের দরবারে হাজির থাকিতে হইত। নবাব তদানীন্তন বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের রাজা বলিয়া মহারাজকে বিশেষ সম্মান করিতেন এবং প্রায়ই তাঁহার নিকট কোন না কোন হিন্দুশাস্ত্রের কথা উপাশন করিয়া শাস্ত্রচর্চা-প্রসঙ্গে আনন্দ অমুভব করিতেন। এক দিবস মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পারিষদগণ সহ নবাবের দরবারে উপস্থিত আছেন, এমন সময় নবাব প্রশ্ন করিলেন;—“আজ কি তিথি?” মহারাজ রামরত্নবিদ্যানিধির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই তিনি বলিলেন “আজ পূর্ণিমা”। নবাবের জানা ছিল, পণ্ডিতদের অনেক সময় ভুল হয়, তিনি একটু রহস্য করিবার মানসে জিজ্ঞাসা করিলেন;—“আজ সমস্ত রাত্রিই জ্যোৎস্নাময় থাকিবে?” বিদ্যানিধি উত্তর করিলেন “হাঁ হজুর আজ সমস্ত রাত্রিই জ্যোৎস্নাময় থাকিবে”। নবাব হাসিয়া বলিলেন “পণ্ডিতজী আপনি মিথ্যাকথা বলিতেছেন”। বিদ্যানিধি একটু মিস্মিত হইয়া বলিলেন “না খোদাকব্ব !

আমি ঠিক বলিতেছি।” নবাব একটু কৃষ্ণভাবে বলিলেন “কেন আপনিই না পানিয়া লিখিয়াছেন, আজ “চন্দ্রগ্রহণ” এখন আবার কেমন করিয়া বলিতেছেন “সমস্ত রাতি জ্যোৎস্নাময় থাকিবে?” ঐ সময়ে বঙ্গদেশে একখানি মাত্র পঞ্জিকা প্রস্তুত হইত, ঐ পঞ্জিকার গণক উক্ত রামকৃষ্ণবিদ্যানিধি। তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, সুতরাং বিদ্যানিধি মহাশয় স্বয়ং পঞ্জিকা সংশ্লিষ্ট লিখিতেন। মহারাজ কৃষ্ণ-চন্দ্র একখানি পঞ্জিকা নবাব সরকারে ও বঙ্গের বিশেষ বিশেষ রাজা জমিদার ও স্রাস্ত্রপণ পণ্ডিতদিগের নিকট করেকখানি পঞ্জিকা প্রেরণ করিতেন। ঐ সময় রঘুনন্দনের স্মৃতির অপেক্ষা ও অপ্রতিহতপ্রভাবে এই পঞ্জিকার ব্যবস্থা বঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত হইত। নবাবের কথায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্মরণ হইল যে, সে দিবস চন্দ্র-গ্রহণ। পূর্ব দিবসেই গ্রহণ কালে কর্তব্য বৈধ কার্যাদির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া-ছেন। সুতরাং তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন “কি দুর্ভাগ্য! নিতান্ত গ্রহবৈভণ্যবশতই কৃষ্ণবিদ্যানিধির নবাবের সম্মুখে এই দুর্দশা ঘটিল।” মহারাজ লজ্জায় আর মাথা তুলিতে পারিলেন না। রামকৃষ্ণবিদ্যানিধি একটু চিন্তা করিয়াই সপ্রতিভভাবে বলিলেন “দেখাবাদ! আজ চন্দ্রগ্রহণ দেখিতে পাইবেন না, আজ সমস্ত রাতি জ্যোৎস্নাময় থাকিবে।” নবাব তখনি পঞ্জিকা আনাইয়া ঐ দিনের নিম্নের টিঙ্কনিতে অঙ্গুলিসংযোগ পূর্বক বলিলেন “সর্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ” এ কথাটা কাহার হাতের লেখা?” বিদ্যানিধি বলিলেন “আমি লিখিয়াছি বটে কিন্তু ঐ গ্রহণ আজ দেখা যাইবে না।” নবাব বলিলেন “বলি দেখা না যায়, তাহা হইলে পুণঃকৃত করিব কিন্তু বলি দেখা যায়?” বিদ্যানিধি বলিলেন “আপনার বাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন।” এমন সময় দরবার ভঙ্গ হইল। মহারাজ বাসায় আসিয়া বলিলেন “বিদ্যানিধি করিলে কি? নবাবীপের পণ্ডিতগণের রাজা বলিয়া নবাবের নিকট যে প্রতিপত্তি টুকু ছিল আজ হইতে সে সমুদ্রই নষ্ট হইল, এখন উপায়? আগামী কল্য তোমার কি দশা হইবে এবং কি প্রকারেই বা আমি নবাবের দরবারে মুখ দেখাইব।” বিদ্যানিধি বলিলেন “মহারাজ চিন্তা করিবেন না, গ্রহণ হইবে না।” মহারাজ বলিলেন “সর্বগ্রাস গ্রহণও কি কখন না হইয়া যায়, তুমি এ কি প্রলাপ বকিতেছ, এক বৎসর মাথা ঝামাইয়া বাহা হির করিয়াছ, এক কথায় বলিলে তাহা হইবে না?”

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররাজ হুঁচিড়ায় অভিভূত, তিনি তখন দানে ঘাইবার জন্ত প্রস্তুত

হইলেন। রামকৃষ্ণবিদ্যানিধি মহারাজকে বলিলেন “মহারাজ আপনি নিশ্চিন্তমনে
 নানা দি করুন। আমার একটি নিবেদন, অদ্য দিবারাত্রির মধ্যে আর আমাকে
 খোঁজ করিবেন না, আগামী কল্য প্রত্যুষে আসিয়া আমি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ
 করিব।” মহারাজ বলিলেন “বুঝিয়াছি তুমি পলাইবে, কিন্তু পলায়ন বৃথা,
 বাদসার মলুক ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যেখানে যাইবে, সেখানেই ধরা
 পড়িবে।” বিদ্যানিধি বলিলেন “মহারাজ! প্রাণের মায়া কি এতই অধিক যে,
 মহারাজকে ছাড়িয়া নিজের বিকৃত হৃদয় প্রাণ লইয়া পলায়ন করিব?” মহারাজ
 বিদ্যানিধির তেজস্বিতাপূর্ণ স্বভাব অবগত ছিলেন, আর কিছু বলিলেন না কিন্তু
 নানা সন্দেহ ও কল্পনায় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া রহিল। এদিকে বিদ্যানিধি
 মহারাজের কর্তৃচরীদের দ্বারা একশত আটটি লোহিতবর্ণ জবাকুম্ভ সংগ্রহ
 করিলেন এবং একটি তাহার ক্ষুদ্র কলস, একখানি তাম্রখালা ও অন্যান্য পুষ্পোপ-
 করণ লইয়া গঙ্গাগর্ভে অবতরণ করিলেন। তাহার পর, জলের ধার দিয়া বয়্যবর
 উত্তরাতিব্রুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। যতদূর দেখা গেল, মহারাজের লোকেরা
 তাকাইয়া রহিল; তাহার পর, ফিরিয়া গিয়া মহারাজকে সংবাদ দিল। মহারাজ কোন
 কথাই বলিলেন না। বিদ্যানিধি সহর অতিক্রম করিয়া বহুদূরে গঙ্গাগর্ভে এক
 নির্জন স্থানে পূজার জবা রাখিয়া স্থান করিলেন। তাহার পর সন্ধ্যা শেষ করিয়া
 একশত আটটি জবাকুম্ভ দ্বারা যথাবিধি স্বীয় কৌলিক উপাস্তদেব ভগবান্
 সহস্রাংস্তুর অর্চনা করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই তাম্র-কলসটি যথাস্থানে
 স্থাপিত করিয়া মন্ত্রবলে রাজকে আকর্ষণ পূর্বক ঐ কলসের মধ্যে প্রবেশ, করা-
 ইলেন। তাহার পর, উহার উপরিভাগে তাম্রখালাখানি রাখিয়া পাঁচটি শিবলিঙ্গ
 তদুপরি স্থাপনপূর্বক পূজা শেষ করিয়া একাগ্রমনে জপ আরম্ভ করিলেন। বজ্রনৌ
 সমাগত হইল, জ্যোৎস্না চতুর্দিক্ প্লাবিত। প্রাসাদের উপরিভাগে ছায়ে
 নবাব ও তাঁহার পারিষদগণের অস্ত আসন স্থাপিত হইল। সপারিষদ নবাব
 উৎসুকচিত্তে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। নক্ষত্রমালা-পরিশোভিত
 পূর্ণশশধর নবাবের উৎকণ্ঠা দেখিয়া দূর হইতে বেন হাজ করিতে লাগিলেন।
 প্রহরে প্রহরে বড়ী বাজিতে লাগিল। যখন রাত্রি একটা বাজিল তখনও আকাশ
 নির্মল, সামান্য একখণ্ড মেঘ পর্যন্ত আকাশে নাই, পূর্ণশশধরের অনন্ত জ্যোৎস্না-
 রাশিতে জগৎ উজ্জ্বলিত। নবাবের চক্ষু নিত্যর আকর্ষণে চুলু চুলু করিতেছে, আর

বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন—“মদীয়ার রাজার পণ্ডিতটা একটা বুদ্ধবাক, কেন না আমি মৌলবী সাহেবের পত্রেও জানিতে পারিয়াছি—মদীয়ার পঞ্জিকায় লেখা আছে, “৭টা রাত্রির সময় গ্রহণ লাগিবে, ১১টার সময় ছাড়িবে এবং পূর্ণগ্রাস হইবে” সেই গ্রহণ হইল না। আর বসিয়া থাকিয়া কি হইবে, চল আমরা শুইতে যাই।” নবাব শয়ন করিতে গেলেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের হৃদয় আনন্দে পুলকিত। তাঁহার এত আনন্দ হইয়াছে যে, বিনিত্র অবস্থায়ই তিনি রাত্রি কাটাইলেন। এদিকে জনপ্রাণিবিহীন গঙ্গাগর্ভে মাঘমাসের দারুণ হিম-পাতেও অটলদেহ রামকৃষ্ণবিদ্যানিধি নাসাগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন। আর রাত্রি নাই, রজনীর বিচ্ছেদ অরণ করিয়া নিশানাথের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল। জীর্ণজ্যোতি নক্ষত্রসকলও ক্রমে ক্রমে কোন্ অজানা প্রদেশে লুকাইতে লাগিল। বিদ্যানিধি জপ শেষ করিয়া গাত্রোথান করিলেন। তিনি শিব পাঁচটি গঙ্গাশ্রোতে বিসর্জন করিয়া তাল্লাধারটি তুলিলেই সেই প্রভাতকালে পৃথিবী যেন হুসর বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইল। নবাব শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখিলেন গ্রন্থাস্ত চন্দ্রের ছায়া আকাশপটে বিলীন হইতেছে।

বধন, বিদ্যানিধি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বাসায় আগমন করিলেন, তখন মহারাজ হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন “বিদ্যানিধি তুমি আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ, আজ আমি যথার্থ নবদ্বীপের পণ্ডিতের রাজা।” বধাসময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সপারিষদ নবাবের দরবারের উপস্থিত হইলেন। সেদিন নবাবের দরবারের সমস্ত রাজা, জমিদার, আমির ওমরাহের দৃষ্টি রাজার দিকে পড়িল। সকলেই বিদ্যানিধিকে দেখিবার জন্ত উৎসুক। বিদ্যানিধি, গৌরাঙ্গদেহ ডেকপুঞ্জ-কলেবর পরদের রুতি উত্তরীয় দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া মহারাজের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। নবাব, জ্যোতিঃশাস্ত্র ও যোগ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন এবং বিদ্যানিধির উত্তরে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর, একান্ত দরবারে বিদ্যানিধির প্রশংসা করিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিতে অস্বরোধ করিলেন। বিদ্যানিধি বলিলেন,—“ধোদাবন্দ! মহারাজের অভীষ্টের সহিত আমার অভীষ্টের কোনই পার্থক্য নাই। অতএব মহারাজকে সন্তুষ্ট করিলেই আমি প্রথম সন্তোষ লাভ করিব।” প্রভুর প্রতি এইরূপ অকৃত্রিম ঐতি দেখিয়া নবাব অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং বাকী রাজস্ব রেহাই দিয়া সে যাত্রায়

মহারাজকে সসম্মানে বিদায় দিলেন । এই রামকৃষ্ণবিদ্যানিধি পঞ্চকোট রাজধানী ও নদীয়া-রাজধানী উভয়স্থানেরই জ্যোতির্কিৎ সভাপণ্ডিত ছিলেন । রামকৃষ্ণবিদ্যানিধির যে সকল ছাত্র ছিলেন, তন্মধ্যে হরিদেববিদ্যানিধিই প্রধান । হরিদেবের গণনার নিপুণতার অনেক কিছদস্তা প্রচলিত আছে । হরিদেববিদ্যানিধি বর্দ্ধমানের মহারাজের জ্যোতির্কিৎ সভাপণ্ডিত ছিলেন । তিনি সময়ে সময়ে স্বীয় পাণ্ডিত্যের অসাধারণ প্রদর্শন করিয়া বর্দ্ধমান রাজের নিকট হইতে কয়েক সহস্র বিঘা ব্রহ্মভূমি ও বহু অর্থ লাভ করিয়াছিলেন । হরিদেববিদ্যানিধির বংশধরেরা বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া বর্দ্ধমান নগরের অনতিদূরে গোবিন্দপুরে বাস করিতেছেন । অদ্যাপি ঐ বংশীয় গ্রহবিপ্রগণই বর্দ্ধমানের মহারাজের জ্যোতির্কিৎ সভাপণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় ও পণ্ডিতরামকৃষ্ণ বিদ্যানিধি হইতে রাজবংশের এক এক রাজার সময়ে বিদ্যানিধি-বংশের এক এক পণ্ডিত পঞ্জিকাকার হইয়া আসিতেছিলেন ।

রাজ-বংশ ।

পঞ্জিকাকার বংশ ।

- (১) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় । (১৭২৮ খ্রীঃ) পণ্ডিত রামকৃষ্ণবিদ্যানিধি ।
- (২) „ „ শিবচন্দ্ররায় । (১৭৮২ খ্রীঃ) „ রামকৃষ্ণবিদ্যানিধি ।
- (৩) „ „ ঈশ্বর চন্দ্ররায় । (১৭৮৮ খ্রীঃ) „ প্রাণনাথবিদ্যাত্তরণ ।
- (৪) „ „ গিরিশচন্দ্ররায় । (১৮০২ খ্রীঃ) „ রামজয়শিরোমণি (১)

রামজয়শিরোমণি, একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন । তিনি সকল শাস্ত্রেই বিচক্ষণ ছিলেন । এক বার তিনি স্বীয় পঞ্জিকায় দুই দিনে শারদীয় তুর্গোৎসবের তিন পূজা হইবে লেখেন । সে সময়ে বঙ্গদেশে নবদ্বীপের পঞ্জিকা ব্যতীত আরও কয়েকখানি পঞ্জিকা গণিত হইত । ঐ সকল পঞ্জিকার তিন দিনে তুর্গা পূজার ব্যবস্থা লিখিত হয় কিন্তু অধিকাংশ লোক নবদ্বীপের পঞ্জিকার সতে মৈধ কার্য সম্পন্ন করেন, হুতরাং তাঁহারা অভ্যস্ত সন্দিহান হইলেন । বঙ্গে একটা হলু মুলু পড়িয়া গেল । এই বিষয়ের মীমাংসার নিমিত্ত কলিকাতা শোভা-বাজারের রাজবাটীতে এক মহতী পণ্ডিত-সভা আহূত হয় । তাহাতে বঙ্গদেশের

(১) মহারাজ গিরীশচন্দ্রের রাজ্যকাল হইতে মহারাজ ঈশচন্দ্রের সময়ের কিয়দংশ পর্যন্ত রামজয়শিরোমণি জ্যোতির্কিৎ সভাপণ্ডিত ছিলেন ।

প্রায় সমস্ত অধ্যাপক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। নবদ্বীপ-প্রদেশের অধ্যাপকগণ ব্যতীত সকলেই রামজয়শিরোমণির বিরোধী। সকলেই রামজয়কে অপদস্থ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু রামজয়শিরোমণি ভীত হইবার পাত্র নহেন, তিনি স্থির অচল। সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন;—“কে কে আমার ব্যবহার বিরোধী, তাঁহারা অমুগ্রহ করিয়া অগ্রসর হউন।” এই সময় স্মার্ত পণ্ডিতগণের মধ্যে একটা মহা কোলাহল উপস্থিত হয়। তাহার পর, তিনি সকলের মত অমুসারে প্রথমে তিথি গণনা করিয়া দেখান। তিনি যে দিন যে তিথি বতরুণ অবস্থিতি করিবে লেখেন, তাহা কেহই উল্টাইতে পারেন না। তাহার পর, স্মৃতিশাস্ত্রের বিচার আরম্ভ হয়। শিরোমণি স্মৃতিশাস্ত্রেও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিন দিন বিচারের পর তাঁহারই লিখিত ব্যবহার অমুসারে অধিকাংশ পণ্ডিত মত প্রদান করেন। তাহার পর, সর্কবাদি-সম্মতি ক্রমে দুইদিন পূজার ব্যবস্থা-পত্রে সমস্ত পণ্ডিত স্বাক্ষর করেন। ঐ বৎসর বঙ্গদেশের সর্বত্র রামজয় শিরোমণির ব্যবস্থা অমুসারেই শারদীয়-পূজা সম্পন্ন হয়। এই সভায় রামজয় শিরোমণি সর্বোচ্চ বিদায় প্রাপ্ত হন।

একবার পর্বর্ষজেনেবালু হার্ডিঞ্জ সাহেব নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী পরিদর্শনার্থ আগমন করেন। নদীয়ার সমুদয় পণ্ডিতমণ্ডলী ঈমারে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকারকালে লাটসাহেবকে একটু উৎকর্ষিত দেখায়। কথা-প্রসঙ্গে লাটসাহেব বলেন “তাঁহার পত্নীর যে দিবস কলিকাতা পৌছিবার কথা ছিল, সে দিবস অতীত হইয়াছে। লেডী হার্ডিঞ্জ বিলাত হইতে যাত্রা করিয়াছেন এ সংবাদও তিনি পাইয়াছেন, অথচ কলিকাতায় জাহাজ না পৌছায় সাহেব বিপদাশঙ্কা করিতেছেন”। সকল পণ্ডিতই রামজয়শিরোমণির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। শিরোমণি, সেই সময় যে লগ্নে প্রস্থ হইয়াছিল, তদমুসারে গণনা করিয়া বলিলেন :—“আপনার পত্নী এখন কলিকাতার আঁত লম্বিত হইতে স্থান পর্যাঙ্ক আসিয়াছেন। আপনি কলিকাতা উপস্থিত হইলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে”। লাটসাহেবের মুশিলাবাদে বাইবার কথা ছিল, তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা অতিবৃত্তে যাত্রা করিলেন। কলিকাতার গঙ্গার ঘাটে পৌছিয়াই দেখেন ‘লেডী হার্ডিঞ্জ, লাট-সাহেব মুশিলাবাদ গিয়াছেন শুনিয়া সেখানে বাইবার জন্য অন্য একখানি ঈমারে আসিয়া উঠিয়াছেন।’ গঙ্গার ঘাটেই

পদ্মস্বরূপ নরনাংক পতি পত্নীর সাক্ষাৎ হইল । লাটসাহেব রামজয়শিরোমণির গণনার অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া শিরোমণিকে তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নিমিত্ত নদীয়ার কলেक्टर-সাহেবকে একখানি পত্র লেখেন । ঐ পত্রে শিরোমণির প্রতি বধেষ্ট সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং পুরস্কার-প্রদানেচ্ছারও আভাস ছিল । কিন্তু শিরোমণি লাটসাহেবের নিকট হইতে কোন পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই ।

(৫) ,, শ্রীশচন্দ্র রায় (১৮৪২ খ্রিঃ) ,, শ্রীদামবিদ্যাবাহুধর ।

(৬) ,, ,, সতীশচন্দ্র রায় (১৮৬০ খ্রিঃ) } ,, তারিণীচরণবিদ্যাবাগীশ ।
মহারাজী শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দেবী ,, (১৮৭০ খ্রিঃ)

(৭) মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায় (বর্তমান) ,, হর্ষদাসবিদ্যারত্ন ।

উল্লিখিত রাজগণের অধিকারকালে যে সকল পঞ্জিকা গণিত হইত, উহার মজলাচরণের দ্বারক যে রাজার আদেশে এবং বাহার কর্তৃক পঞ্জিকা গণিত উভয়েরই নাম থাকিত । নবদ্বীপ রাজবংশের প্রথম হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছিল, ইহা নদীয়ার রাজবংশের হিন্দু-সমাজের উপর অসাধারণ আধিপত্যের প্রধান পরিচায়ক ছিল । বর্তমান মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্তক্ষিতীশচন্দ্ররায় বাহাদুর তাঁহার রাজ্য-প্রাপ্তির পর কিছুদিন এ প্রথা রক্ষা করিয়াছিলেন । তাহার পর, তিনি ইংরাজি-বিজ্ঞানশাস্ত্র পাঠ করিয়া দেশীয় পঞ্জিকার প্রতি বীতরাগ হ'ল এবং ক্রেকটেবলের অনুসরণে গণিত ইংরাজী-শিক্ষিত লোকের প্রকাশিত দুই একখানি পঞ্জিকার প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেন ।

মুসলমান রাজত্বের সময় নদীয়ার মহারাজের হস্তে মুর্শিদাবাদের নবাব প্রতি-বৎসর একখানি করিয়া পঞ্জিকা গ্রহণ করিতেন, ঐ পঞ্জিকা অনুসারেই তদানীন্তন কালে রাজকাৰ্য্যাদি সম্পন্ন হইত । ইংবেজ-রাজও উক্ত নিয়ম পরিত্যাগ করেন নাই ।* নদীয়ার জজ সাহেবের (এখন কলেक्टर সাহেবের) হস্তে নবদ্বীপের পণ্ডিতের গণিত একখানি পঞ্জিকা প্রতিবৎসর গ্রহণ করেন । উক্ত পঞ্জিকার সাহায্যেই বঙ্গদেশের পর্বদিনের অবকাশাদি সমুদয় নির্ণীত হইয়া থাকে ।

* এখন, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র জ্যোতির্বার্গ ঐ পঞ্জিকা গণনা করেন ।

মৌল্য-গোত্রী—

কমলাকরজ্যোতিষী ।

নদীয়ার আর একটি এসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্যেশ্বর আদিপুরুষ মুন্সিঙ্গ কমলাকরজ্যোতিষী । ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন । কমলাকরের কৃত জ্যোতিষশাস্ত্রের কয়েকখানি চীকা গ্রন্থ আছে* ।

কমলাকরের পুত্র সুধাকর । সুধাকরের পুত্র হরীকেশ । হরীকেশের পুত্র গৌলীনাথ । ইঁহারা সকলেই বংশপরম্পরায় জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত । গৌলীনাথের যে কয়েকটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে মুন্সিঙ্গ রাজীব-লোচনবিদ্যাসাগর বিখ্যাত । রাজীবলোচন পুরোহিত রামকৃষ্ণবিদ্যানিধির সম-সাময়িক । তিনি ব্যাকরণ কাব্য, অলঙ্কার জ্ঞান স্মৃতি জ্যোতিষ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন । তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় পাইয়া সময়ে সময়ে পণ্ডিত-সমাজ বিম্বিত হইতেন । শুনা যায়, রাজীবলোচন-বিদ্যাসাগরের একটি বড় চতুষ্পাঠী ছিল, তাহাতে তিনি ব্যাকরণ, কাব্য স্মৃতি জ্যোতিষ সকল শাস্ত্রেরই অধ্যাপনা করিতেন । গ্রাম্য ছাত্র ব্যতীত অনেক বৈদেশিক ছাত্রও তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত । তখনও বোধহয় প্লেটের ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই, কাঠকলকে ধূলা মাখিয়া বাঁশের কাঠীর সাহায্যে অঁক করা হইত † । রাজীবলোচনের বিদ্যাবতার পরিচয় পাইয়া কোন কোন রাজা ও

* মৌল্যবংশে গ্রন্থস্বরাগাঃ

হরীঃ স আনীৎ কমলাকরাখ্যঃ ।

বিবোধকো যঃ খিল বাতঃ সনাতাঃ

ভাবানু বধা পঞ্চম-কোরকপাখ্যঃ ।

(গ্রন্থিগ্রন্থ-পঞ্জিকা)

‡ বিদ্যাসাগরসমাজে বহিষক জ্যোতিষ পরাঃ প্রাপ্তবান্ ।

যেহন রাজীবলোচনঃ কৃতধিরাঃ সাংখ্যিকতানপ্রীঃ ।

যঃ ব্যাতো পণ্ডিতাঃসকলঃ সত্যবিজিঃ সেবিতঃ

ভক্তানতকঃ সত্যবিদুঃসকলোপী সর্বাভ্যুতঃ ।

(গ্রন্থিগ্রন্থ-পঞ্জিকা)

অনিবারের বাটী হইতে তাঁহার জ্যোতির্বিজ্ঞ-সভাপতিত্বের পদ গ্রহণের অহুরোধ আসে, স্বাধীনচেতাঃ রাজীব বিদ্যাসাগর তাহা গ্রহণ করেন নাই ।

রাজীবের পুত্র প্রাণবল্লভ । প্রাণবল্লভের প্রথম পুত্র কেশব-বিশারদ । ইনি বে পঞ্জিকা রূপনা করিতেন, তাহাও বহুস্থানে প্রচলিত ছিল । কেশবের হই পুত্র । তন্মধ্যে প্রথম পুত্র কমললোচনবিদ্যাবিনোদ । ইঁহার বংশধরেরা নানাস্থানে ছড়ান্ন পড়িয়াছেন । প্রাণবল্লভের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র হুণ্ডরামবাচস্পতি । তাঁহার শতানন্দ শ্রামানন্দ প্রভৃতি করেকটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন । প্রথম পুত্র শতানন্দ হুণ্ডিত ছিলেন । তিনি সিদ্ধান্তবাগীশ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশেরও নববীণ-প্রদেশে জ্যোতিঃশাস্ত্রে পারদর্শিতার অল্প বিশেষ ব্যাতি ছিল । তিনি প্রবীণ বয়সে কোন আত্মীয়ের অহুরোধে বর্তমান নদীরা ও করিমপুর জেলার সন্ধিস্থলে করিমপুরের অন্তর্গত ধরহাটীতে আসিয়া কিছুদিন থাকেন । তাঁহার অন্তান্ত ভ্রাতৃগণ নববীণেই বাস করেন । । নুতন বাসস্থলীতে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি হওয়াতে সিদ্ধান্তবাগীশ হুস্পত্তি গ্রহণ করিয়া ঐ স্থানেই সপরিবারে বসতি করেন । তাঁহার পাঁচপুত্র, তন্মধ্যে উমাকান্ত জ্যেষ্ঠ । উমাকান্ত বিদ্যানিধিও হুণ্ডিত ছিলেন । শাস্ত্রীয় ব্যবসায় ব্যতীত করেকখানি গ্রামের রাজস্ব আদায়ের ভারও তাঁহার উপর ছিল । অনিবারে অনিবারে বিবাহ হওয়ায় তিনি কোন পক্ষই অবলম্বন না করিয়া উক্ত গ্রাম পরিত্যাগপূর্বক উহার পশ্চিমভাগে রমধীর চন্দ্রনাথারী স্রোতস্রোতীর তীরে আসিয়া ভ্রাতৃগণ সহ বসতি করেন । অসংখ্য-নারিকেল-গুবাক-দুর্জশ্রেণী-পরিশোধিত উমাকান্তের পল্লীতটনের দৃষ্ট নদীতীর হইতে অতি মনোরম বোধ হইত । বিদ্যানিধি শাস্ত্রীয় ব্যবসারে বহু অর্থ অর্জন করিতেন কিন্তু ত্রুত নিরম পূজা অর্চনাও দানাদিতে সমস্তই ব্যয়িত হইত । তিনি তাঁহার যুত্য়কাল সন্নিহিত জামিতে পারিয়া বহু-ব্যয়-সাধ্য নৌকার আয়োজনপূর্বক কান্ধী বাতা করেন এবং বারাগলী-ধামে পৌঁছিব্য হইবিল পরে তৃতীয় দিবসের অরুণোদয়-কালে মনিকর্ণিকাতীরে সম্মানে দেহত্যাগ করেন ।

উমাকান্তের চারিপুত্রের মধ্যে তৃতীয় হুপ্রসিদ্ধ নীতাম্বরবিদ্যাবাগীশ । বিদ্যাবাগীশ কথার শৈশবে কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন, তাহার পর জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত হন । তিনি জন্ম-পত্রিকার বাহা বাহা লিখিতেন

অবিকল উহা কলিত। অনেকে উহা পরীক্ষা করিয়াও দেখিয়াছেন। কোন সময়ে বশের কোন ব্রাহ্মণ-জমিদারের একমাত্র পুত্রের এক জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করেন। উহাতে মাস কল লিখিত হইয়াছিল। উনিশ বৎসর সাত মাসে বিবাহ হইবে লেখা ছিল। ঐ জমিদার প্রতিজ্ঞা করেন, ঐ সময়ের দুই বৎসর পরে পুত্রকে বিবাহ দিবেন। তদন্ত অনেক সম্পন্ন কন্তাদারগণকে নিয়ত প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে এমন একটা অপরিহার্য ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হইল যে, ঠিক উনিশ বৎসর সাত মাস শেষ হইবার দুই দিন পূর্বে পুত্রের পরিণয় কার্য সম্পন্ন করিতে হইল। কতকগুলি বিখ্যাত নীলকুঠীর কর্তা এক সাহেবের কোন সময় একটি মূল্যবান্ দ্রব্য অগম্য হইল। এই দ্রব্যের জন্ত কুঠীতে ভোলপার উপস্থিত হয়। কুঠীর দেওয়ান ও অস্তান্ত কর্মচারীর প্রতি সাহেব হুকুম করেন—‘যদি এক সপ্তাহের মধ্যে ঐ দ্রব্যটি না পাওয়া যায়, দেওয়ান কর্মচ্যুত হইবেন’। মহাসঙ্কটে পড়িয়া দেওয়ান বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পরামর্শ লইলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় গণনা করিয়া যে স্থানে দ্রব্যটি আছে বলিয়া দেন। যে ভৃত্য ঐ দ্রব্য হরণ করিয়াছিল, সে মহাবিপদ গণনা করিয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পায়ে আসিয়া পড়ে। দয়ালু বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাহাকে ক্ষমা করিয়া বিদায় করেন। দেওয়ানের বিশেষ অমুরোধ-সত্ত্বেও ঐ ভৃত্যের সশ্রুতি নাম করেন নাই।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় প্রতিদিন ব্রাহ্মসমাজের উঠিয়া। স্বান সন্ধ্যা পূজাদি শেষ করিতেন। সমস্ত রাত্রি ঝড় বহিয়াছে, প্রভাতেও বৃষ্টির বিস্তার নাই, এ অবস্থায়ও তিনি প্রাতঃ-স্নান পরিত্যাগ করেন নাই। সদাচার ও নিয়ম পালনের নিমিত্ত তাঁহার ঘেহে কোনই ব্যাধি ছিল না। লোকে তাঁহাকে ‘বাস্তবিক পুরুষ’ বলিত। তিনি বাহ্যিক বাহা বলিতেন, তাহাই সিদ্ধ হইত। একবার তাত্রমাসে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় নৌকার তাঁহার বাটী হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে একটি গ্রামে কোন কার্যে-পলকে গমন করেন। ঐ গ্রামের একটি প্রধান ব্যক্তির পুত্রের তিনি ইতঃ পূর্বে একটি ঠিকুজী লিখিয়াছিলেন। ঝালের ধারেই ঐ ব্যক্তির বাটী, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় নৌকা হইতে ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া নৌকা বাধিতে বলিয়া ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি যে শিশুর ঠিকুজী লিখিয়াছিলেন, সেই শিশুকেই প্রাঙ্গণে শয়ন দেখিলেন। শিশুর পিতাও অস্তান্ত সকলে পরমবয়সেই সেই মৃতকর শিশুর

কর্ণের নিকট মুখ রাখিয়া ঐশ্বরের নাম করিতেছেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় উপস্থিত হইলেই শিশুর মাতা ও পিতামহী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাঁহাদিগকে ছিন্ন হইতে বলিয়া পুনরায় ঠিকুজী দেখিতে চাহিলেন। শিশুর মাতা ত্যাগাতাড়ি ঠিকুজীট বাহির করিয়া দিলেন। তিনি অভিনিবেশের সহিত ১০ মিনিট কাল ঠিকুজীট দেখিয়া শিশুকে আত্ম-প্রাণ হইতে বারান্ধার ভুলিতে উপদেশ দিয়া অতি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন;—“এ বালকের এখন মৃত্যু হইবে না, এ নিশ্চয় বাঁচিবে”। মৃতকর শিশুর পিতা একটি তালুকদার ও নিজ গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্ররোচিত। অনেকেই ঐ বিপদের সময় উপস্থিত আছেন, বালকের অবস্থা দেখিয়া কেহই আর বালককে বারান্ধার লইতে সাহস করিলেন না। বালকের পিতা ও আত্মাদিত বারান্ধার মৃত্যু হইলে অধোগতি হইবে ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বালকের পিতামহী বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে বড় বিশ্বাস করিতেন। তিনি শিশুকে বুকে করিয়া বারান্ধার লইয়া শোয়াইলেন। এদিকে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় স্থান সম্বন্ধ শেষ করিয়া গুপে বসিলেন। ইতঃপূর্বে বালকের শুধু জ্বর একটু একটু স্পন্দিত হইতেছিল, একঘণ্টা পরে সর্কান্ন বীরে বীরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। কিছুকাল পরে শিশু একটু হৃদয় গিলিতে সমর্থ হইল। অপরাহ্নে বালককে অনেক পরিমাণে প্রকৃতিস্থ দেখা গেল। বালকের পিতামহী বলিলেন—“আচার্য্য ঠাকুর! আপনি কি পরমেশ্বর, আমার খোকাকে বাঁচাইবার জন্য হৃদয়ে আসিয়াছেন?” ঐ শিশু এখন যুবা, সংস্কৃতভাবার এম এ, পাস্ করিয়া কোন গবর্ণমেন্ট-কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ঐক্লপ জ্যোতিঃশাস্ত্রে অসাধারণ অধিকার ব্যতীত দৈবকার্য্যে সফলতার ও অনেক বিবরণ প্রকৃত হওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থাবলীর প্রভাবে অনেকে অনেক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। একবার একটি বিদ্যুত জমিদারীর স্বত্বাধিকার লইয়া এক জমিদার-বংশের দুই সন্তকের দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদ হয়। নিম্ন পক্ষ ক্রমশঃ দুই আদালতে পরাজিত হইয়া হাইকোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোকদ্দমার আদালত করিবার পূর্বে তাঁহার বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে মোকদ্দমার কলাকল জিজ্ঞাসা করেন। তিনি অতি দৃঢ়তার সহিত বলেন—“এই মোকদ্দমার জর লাভ হইবে”। মোকদ্দমার বিচারের অব্যবহিত পূর্বে

উঁহারা বিদ্যাবাগীশ মহাশয় দ্বারা দৈব কার্য আরম্ভ করেন। আর পঞ্চকাল ব্যাপী গ্রহপূজা জন ও হোম করেন। হোমের পূর্বজ্ঞাতি হইবার তিন দিন পরে সংবাদ আসে নিম্ন পক্ষই জরী হইয়াছেন।

তিনি আত্মপন্থার বিশেষ নিপুণ ছিলেন। যে বালক অধিকদিন বাঁচিবে না, বহু অর্থ ও অমুরোধ সত্ত্বেও সে বালকের তিনি অঙ্গপত্রিকা লিখিতেন না। তজ্জন্ত তাঁহার তাঁহার প্রকৃতি জানিতেন, তাঁহারায় বরং কিছু না বলিয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উপরেই নির্ভর করিতেন। বাটীর সন্নিহিত গ্রামবাসী কোন বিখ্যাত অধ্যাপকের একটি পৌত্র উৎপন্ন হয়। অধ্যাপক স্মার্ত্তপণ্ডিত, নিম্নেও জ্যোতিষাভ্যাসে ব্যুৎপন্ন। বরং আত্মপন্থার বিচার করিয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে অভিনীত একটি অঙ্গপত্রিকা লিখিয়া দিবার জন্য অমুরোধ করেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় আত্ম কাল করিয়া ক্রমশঃ বিলম্ব করিতে থাকেন। অধ্যাপকের জ্ঞাতা বলিলেন “ছেলের কোনরূপ রিটি আছে, নচেৎ উনি এত তাগাদা সত্ত্বেও চুপ করিয়া আছেন কেন”? অধ্যাপক বলিলেন—“আমি উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখিয়াছি, বালকের অতি উৎকৃষ্ট লবল আছে”। তাহার পর, অধ্যাপকের জ্ঞাতা একদিন আসিয়া ঠিকুজীর লজ্জা দিয়া দিলেন। তাহার পর, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় স্পষ্টই বলিলেন—“ভিলম্বাস অতীত না হইলে আমি ঠিকুজী লিখিব না, কিন্তু এ কথা আপনি জায়গার মহাশয়কে বা বাটীর অন্য কাহাকেও বলিবেন না”। আশ্চর্যের বিষয় তিন মাস অতীত হইবার আট নশ দিন পূর্বেই বালকটি বৃদ্ধ্যমুখে পড়িত হইল।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিতেন কিন্তু সঞ্চয় করিতেন না, সবদরই সংকর্ষে নিয়োজ করিতেন। দোদ গুরুোৎসব বাসন্তী-পূজা প্রভৃতি নিত্য-ক্রিয়া তাঁহার বাটীতে অভিসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। এতদ্ভিন্ন সবদর ব্রত ও বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা স্ত্রীহোমসর্গ প্রভৃতি অনেক নৈমিত্তিক ব্যাপকও তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ও পরোপকারী ছিলেন। কুটিলানু সন্তোষেরা অনেক সময় প্রেমাদিনকে ধরিয়া লইয়া বাইত এবং আনন্দ করিয়া গতিত। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পাত্র পাইলে দেওয়ান বা অন্যান্য কর্মচারিগণ তৎকালে ঐ সকল কার্যসম্বন্ধ ব্যক্তিকে মুক্তি দিতেন। ঐ প্রদেশের শীলকুটীর সন্তোষ, অমিলান, কেলার অন্য, মাজিষ্টেট

গোলিশ সুপারিশওট সকলেই তাঁহাকে আনিডেন এবং বাহালী কর্তৃচাঙ্গিণ ত তাঁহাকে দৈবকমভাসম্পন্ন পুরুষ বলিয়া দেবতার ভায় ভক্তি করিডেন।

শর সকল লোকেই তাঁহাকে বিশ্বাস করিত, তাঁহার যে বিভব ছিল, তাহার বিংশতিগুণ টাকাও তাঁহাকে প্রতিভূ রাখিয়া লোকে বণ নিত। এ অল্প আদিনি হইয়া সেই টাকা অধমর্ণের নিকট হইতে আদার করিয়া দিতে তাঁহাকে অনেক সময় বহুকষ্ট ভোগ করিতে হইত। কিন্তু এতদ পুনঃ পুনঃ কষ্ট পাইয়াও দয়ালু স্বভাব বলিয়া আদার আদিনি না হইয়া পারিডেন না। হুঁভিকের সময় প্রায়ের অনেক নিঃস পরিবার তাঁহার বাটী হইতে ধান্য কিংবা চাউল ধার লইত কিন্তু শেষে উহা প্রত্যর্পণ করিতে আসিলেও বিদ্যাবাণীশ মহাশয় উহা লইতে ব্যরণ করিডেন। একবার তিনি হুঁভিকের সময় অনেক টাকার ধান চাউল কিনিয়া বাড়ী করিতেছিলেন, সঙ্গে ধান চাউল বোকাই কতকগুলি বলন ছিল। পথিমধ্যে একটি ত্রীলোক কল্‌হার ফ্রিট করেকটি সম্ভান বিদ্যাবাণীশ মহাশয়ের পারের কাছে কেনিয়া ঘোড়িয়া পলাইয়া তিনি উহা দেবিয়া অল্প সংরূপ করিতে পারিডেন না, একটি ধান চাউল বোকাই বলন সেই হুঁভিনী নববীর বাড়ী পাঠাইয়া। অবশিষ্ট বলনগুলি লইয়া পূহে আবদন করিডেন। বিদ্যাবাণীশ মহাশয় চিরকাল সদাচার এবং সুশ্রমেহে পূণ্যকর্মের অমুঠান করিয়া বাট বৎসর বরসে পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার চাঙ্গিপুত্র বিদ্যা-মান। ইঁহার সকলেই পুনরায় পূর্বপুরুষদের আধুবিভ নববীরে আসিয়া বাস করিতেছেন।

প্রথম। শ্রীমুক বিশ্বস্তর জ্যোতির্বার্ণব। এখন ইনি নববীরের একমাত্র জ্যোতির্কিৎ এবং পঞ্জিকাকার। দুর্গাদাস, বিদ্যানিধিংশের শেবপুরুষ। তাঁহার পর-লোক গমনের পর জ্যোতির্বার্ণব মহাশয়ই হাইকোর্টের পঞ্জিকা প্রণয়নের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। নদীয়ার কলেজের হজে হুইখানি পঞ্জিকা দিতে হয়। একবারি নদীয়ার কলেজের অকিরে থাকে, অপরখানি কলিকাতা হাইকোর্টে প্রেরিত হয়। শুদ্ধ-প্রেস পঞ্জিকাই এখন বাঙালার একমাত্র বিত্ত পঞ্জিকা। এই পঞ্জিকার প্রবেতা ও জ্যোতির্বার্ণব মহাশয়। তাঁহার অভ-পাত্রে দৈপুণ্য এবং জ্যোতির্পাত্রে ও শুভিপাত্রে বহুবর্ণিত প্রভুত এই পঞ্জিকার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। এখন সমস্ত বঙ্গের ও ভারতবর্ষের প্রায় বেগানে বাঙালীর দশতি আছে, সর্বত্রই জ্যোতির্বার্ণব মহাশয়ের প্রস্তুত শুদ্ধপ্রেস পঞ্জিকার অস্তিত্ব। বৈক কার্যের অমুঠান হইয়া থাকে।

বিভী। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী। ইনি শৈশব হইতে নববীপ বাবাণসী দক্ষিণাপথের পুণা প্রভৃতি বহু স্থানে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। কবি সংস্কৃতকণ্ঠে উপাধি-পরীক্ষা ও পুণা নগরীতে শাস্ত্র-পরীক্ষা প্রদান করিয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। শাস্ত্রী মহাশয় আৰ্য্যাবর্ত ও দক্ষিণাপথের অধিকাংশ স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। দক্ষিণাপথে ভ্রমণকালে তিনি উজ্জয়িনী, বড়োদা, পুণা-প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণের সহিত মাসাধিক কাল নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথনে বাপন করিয়াছিলেন। ইনি নানাচ্ছন্দে মূললিপি সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে পারেন। অক্সফোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও জনপ্রিয় ভাষাতত্ত্ব-ভট্ট মোক্ষমূলর ইঁহার রচিত মূললিপি সংস্কৃত কবিতা পাঠে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার উচ্চ প্রশংসা করিয়া পত্র লেখেন। আর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে কাশ্মীরের মহারাজের নিকট যে সংস্কৃত অভিনন্দনপত্র প্রেরিত হয় উহারও রচনা শাস্ত্রী মহাশয় করেন। এতদ্বির নানা ঘটনায় ইনি অনেক সংস্কৃত কবিতা লিখিয়াছেন। ইঁহার রচিত একখানি সংস্কৃত কাব্য অমুদ্রিত অবস্থায় আছে। এখন ইনি কলিকাতা রাজকীয় হিন্দুবিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক। শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ প্রত্যেক মাসিক পত্রিকায়ই প্রকাশিত হয়। তন্মির ইঁহার প্রণীত দক্ষিণাপথভ্রমণ, শতরাত্র্য-চরিত ও রামায়ণ-চরিত প্রভৃতি কয়েকখানি বাঙ্গালাগ্রন্থ এবং মূল্যপাঠ্য সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তক সকল অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

তৃতীয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, পি, এইচ, ডি। ইঁহার নাম সভ্যজগতের সর্বত্রই প্রসিদ্ধ, সুতরাং ইঁহার বিষয় অধিক লেখা বাহুল্য। মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত ও পালিভাষার অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য। এতদ্বির ইনি বেঙ্গল এসিয়াটিক্-সোসাইটির কার্য্যকরী সভ্যর সদস্য এবং ভাষাতত্ত্ব-সমিতির সহযোগী সম্পাদক। কয়েক বৎসর পূর্বে গবর্ণমেন্ট ইঁহার বিদ্যাবতার পুরস্কার স্বরূপ মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভারতবর্ষ, সিংহল ও ইউরোপের বহু বিদ্যাসমিতির সভ্য। ইঁহার রচিত ও সম্পাদিত সংস্কৃত, পালি, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও তিব্বতীয় ভাষার বহুগ্রন্থ প্রসিদ্ধ। এতদ্বির বিদ্যাভূষণ মহাশয় Bibl. Indica Serica. এর অন্যতম সম্পাদক এবং

তিনি কিছুদিন পূর্বে জৈনব্যায় সম্বন্ধে মৌলিক অভ্যুৎকৃষ্ট এক ইংরাজি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, উক্তন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে Ph. D. (Doctor of Philosophy) এই উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন।

চতুর্থ। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রভূষণ আচার্য্য। ইনিও একজন বাহালা সাহিত্যের সেবক। অত্যন্ত মাসিক পত্রিকারই ইনি গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন। যতীন্দ্র বাবু এখন গরার একসাইজ-সবইনেন্সপেক্টর।

কাশ্যপ-পোত্মীয়—

স্ববুদ্ধি শিরোমণি।

নবদ্বীপের আর একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিৎ বংশের আদিপুরুষ স্ববুদ্ধি শিরোমণি। ইনি জ্যোতিঃশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার পূর্বনিবাস যশোর জেলার অন্তর্গত চৌগাছা গ্রামে ছিল। চৌগাছা গ্রহবিপ্রকুল-পত্রিকার “চতুঃপলানী” নামে কীর্তিত হইয়াছে। পলানী অর্থ বৃক্ষ (পাছ) চতুর্ অর্থে (চারি) সুতরাং চতুঃপলানী অর্থে চৌগাছা। “চিত্তাকুমারোশ্মিবিধৌতপাদঃ” চৌগাছা গ্রামের এই বিশেষণ দ্বারা বোধ হয় ঐ গ্রামের নিকটে চিত্রা এবং কুমার নদের সংযোগ হইয়াছিল ও সর্বদা ঐ নদীদ্বয়ের উর্দ্ধিমালা দ্বারা ঐ গ্রামের প্রান্তভাগ বিধৌত হইত। এক সময়ে ইনি কোন কার্যবশতঃ নদীয়া জেলার আশুনিয়া গ্রামে আগমন করেন। তখনও ভবানন্দ মজুমদারের উন্নতির সূত্রপাত হয় নাই। একজন অধ্যাপক ভবানন্দ মজুমদারের বিশেষ প্রজ্ঞাভাজন ও প্রিয় পাত্র ছিলেন। তাঁহার সহিত স্ববুদ্ধিশিরোমণির সাক্ষাৎ ও আলাপ হইলে তিনিই শিরোমণিকে সঙ্কে করিয়া ভবানন্দ মজুমদারের নিকট উপস্থিত করেন*।

* যশোরস্থান্যে নবদ্বীপ কেন্দ্রে

বলীমতানে হুবিলালদেশে।

লতাবিভাটনঃ পরিশোভমানে

আসিদ্ধিবাসো মহাবীরকীর্তেঃ ॥১॥

স্ববুদ্ধি-সংজ্ঞত হুবিবরত,

কার্ভাভিকতত্র যশোহরিতত।

মজুমদার নিজের জীবনের কলাকল্যানিতে চাহেন। সুবুদ্ধিশিরোমণি কোষ্ঠী দেখিয়া বলেন “আপনারা! অল্পক সময় হইতে অল্পক সময় পর্যন্ত জীবনের উৎকৃষ্ট সময়। এই সময় আপনার এত সৌভাগ্য হইবে যে, তদ্বারা আপনি চিরস্থায়ী ও বহুসম্মানে সম্মানিত হইতে পারিবেন”। ভবানন্দমজুমদার উহার অর্থ কিছুই বুঝিলেন না, বলিলেন “এমন কি সৌভাগ্যের সম্ভাবনা আছে, বন্ধুরা আমি চিরস্থায়ী হইব”। তাহার পরই মানসিংহ আহাঙ্গীর বাহসাহের নৈমিত্ত সহ প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য বাঙ্গালায় আগমন করেন। ভবানন্দ বর্তমানে গিয়া মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মজুমদারের সাহায্যে মানসিংহ কৃত কার্য্য হইয়া দিল্লি গমনকালে মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া যান। ভবানন্দমজুমদার বাহসাহকে সন্তুষ্টকরতঃ বহু জমিদারির মনস্ লইয়া গৃহে আগমন করিয়াই সুবুদ্ধিশিরোমণিকে ডাকিয়া পাঠান। শিরোমণি মাটিরারিতে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করেন এবং মাটিরারিতেই শাস করিতে অহরোধ করেন। শিরোমণি তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ। তিনি এই বয়সে বাসস্থান ও ভূমিবিভক্ত ত্যাগ করিয়া আসিতে সম্মত হন না।

তাঁহার প্রপৌত্র গোতুলানন্দবিদ্যামণি বিলম্ব পণ্ডিত হইয়াছিলেন। নদীর প্রবলবেগে দ্বীপ ভবনও ভূমিবিভক্ত অলসাত হওয়ার তিনি কৃষ্ণনগরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকট আগমন পূর্বক তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহের পরিচয় প্রদান করিয়া কিছু বৃত্তি প্রার্থনা করেন। মহারাজ পরম্পরাগত জনশ্রুতিতে সুবুদ্ধিশিরোমণির পঞ্চদশ কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি বলেন “আমি তোমাকে অন্ততম জ্যোতির্বিদ পদে নিযুক্ত করিয়া বৃত্তি দিতে পারি কিন্তু এখানে আসিয়া

চতুঃপলাশীতি ররাজ গ্রামঃ

সিদ্ধাক্ষারোক্ষি-বিধৌত-পাশঃ ২২।

সমোত্তরবর্তনৈর্ব্যবহিতকলমকৃৎ ভাবনা-জাবিতাঙ্গা,

বিত্তানাং লাতকামঃ প্রথিত-জনপদে পুণ্যপুত্ৰ-অঞ্জনঃ ।

দাক্ষিণ্যাদীশুমায়া বিপুলবিভববান্ শ্রীভবানন্দসংজ্ঞাঃ

লেভে স কাশ্যশের ত্রিকুবনবিভিতং তং হি বোদ্ধুম্ভব্যাঃ ৩৩ † (গ্রহবিগ্রহুল-পঞ্জিকা)

† তৃতীয় সোক্ত ব্যাকরণাওদ্ধি-বোঝে দুবিত। কিন্তু প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রহবিগ্রহুল-পঞ্জিকার লিপিকর-প্রমাদবশতঃ বোধ হয় ঐক্লপ লিখিত হইয়াছে। আমরা আর উহার কোন পরিবর্তন করিলাম না। ঐ হুলপঞ্জিকার আরও অনেক স্লোকে ঐতিহাসিক কথা দৃষ্ট হয়।

বাস করিতে হইবে। অল্প স্থানে থাকিলে এ বৃত্তি পাইবে না। গোকুলানন্দ মহারাজের নির্দেশ অনুসারে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিলেন। †

গোকুলানন্দ এক উৎকৃষ্ট বটীয়স্ত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। তখন বৈদেশিক বড়ীর স্টি হয় নাই, এই বড়ীর সাহায্যে সময় নির্ণীত হইত। তন্ত্রের চারিদিক মন্ত্র পরস্পর মুখো মুখী করিয়া গঠন করা হইত। এই মন্ত্রগণের পুচ্ছ উর্দ্ধ ও মস্তকস্থিত তাম্রাধারে সংলগ্ন থাকিত। উহাদের মস্তকে একটি তাম্রাধারে অতি উচ্চ তরল পারদ রাখা হইত। তাম্রাধারের পাত্রে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে লুপ্ত লুপ্ত হিঙ্গ ছিল। এই হিঙ্গ দিয়া পারদ পরবর্তী আধারে পতিত হইত। পারদের ন্যূনতা অনুসারে দণ্ড পল বিপল অল্পপল পর্য্যন্ত স্থির হইত। ছায়াভূটে অন্ধ কসিয়া মধ্যাহ্নকাল নিরুপগ পূর্বক তাহাতে পারদ রঞ্জিত হইত। পরদিন মধ্যাহ্নে বটিকা বস্ত্রের একটি স্থান টিপিলেই মন্ত্র পুচ্ছ দিয়া পারদগুলি প্রথম পাত্রে উথিত হইত। গোকুলানন্দ নিজে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু বড়ী নির্মাণের উপদেশ তাঁহার পূর্ব পুরুষগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন।

অতিপূর্বে নবদ্বীপে এক সিদ্ধপুরুষ আগমন করেন। তিনি নবদ্বীপের মালকপাড়ায় গঙ্গাতীরে (এখন প্রাচীন গঙ্গার চিহ্ন পলতা এই স্থানে বিদ্যমান) এক কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গোকুলানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিমাই বহুদিন পরে এই স্থানে সমাগত অপর এক সিদ্ধ পুরুষের নিকট নীক্ষিত হইয়া বামাচার মতে সাধনা করিতেন। গঙ্গীর স্রোতে নিমাই সিদ্ধ পুরুষের প্রতিষ্ঠিত কালীর সম্মুখে বসিয়া অপ করিতেন। কিছুদিন পরে তিনি সম্যক গ্রহণ করিয়া কালীতে চলিয়া যান। পরে গোকুলানন্দের পৌত্র নন্দরাম ব্রহ্মচারী ও এই স্থানেই সিদ্ধ হন। সিদ্ধ পুরুষের প্রতিষ্ঠিত কালী পদ্মোমাতা সিদ্ধেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ। এই কালী অতিশয় আগ্রহ। নদীয়ারাজ গোকুলানন্দের প্রতি এই কালীর সেবার

† গোকুলানন্দনাথসিং সিদ্ধান্ত-কোষিণীঃ

সিঙ্গতিরিব বাচি স বিবোধজনকঃ স্তবীঃ ।

তরঙ্গবেগাৎ পরিত্যজ্যমানে

নিকেতনে ভক্ত সমূলধাতে ।

শশাঙ্করাশিসবকীর্তিভাজং

সমাজিতোক্তনৌ নৃপকৃষ্ণকরঃ । (প্রহবিপ্রমূল-পত্রিকা)

তার অর্পণ করেন। এই কালীর অনেক দেবোত্তর ভূমি ছিল, এখন গঙ্গার তাজিরা সিন্নাছে। নববীশের অনেক প্রসিদ্ধ সাধক পদ্রীমাতা বা পাড়ার মার সম্মুখে জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। নববীশের পাড়ার মা সর্কাপেকা প্রাচীনদেবতা, ইনি আগমবিদ্যাবাণীশের প্রতিষ্ঠিত আগমেশ্বরীর অপেক্ষাও পূর্ববর্তিনী।

গোহুদানবের তৃতীয় পুত্র কার্তিকচন্দ্র আচার্য্য রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব ছিল। তিনি “রাজবংশাবলী” নামক নদীয়া-রাজ-বংশের কীর্তি সূচক একখানি বাঙ্গালা কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ভবানীশঙ্কর। ভবানীশঙ্করের পুত্র কালীনাথ আচার্য্যের প্রপৌত্র ও কয়েকখানি বাঙ্গালা কবিতা গ্রন্থ খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায়। কালীনাথের তিন পুত্রের তিন পৌত্র আছেন। প্রথম পুত্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত সিংকর্ণ আচার্য্য। দ্বিতীয় পুত্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত পঞ্চানন আচার্য্য। তৃতীয় পুত্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ কবিভূষণ। ইনি কলিকাতা সেণ্টমেরি হাই স্কুলের হুপারিণ্ডেণ্ট।

অন্যান্য জ্যোতির্বিদ-বংশ।

এতদ্ভিন্ন নদীয়ার গোতমগোত্র-সম্ভূত গণিতাচার্য্যের বংশ পাণ্ডিত্যের উচ্চ অভিশর বিখ্যাত ছিলেন। এই বংশে বিবেকরবাচস্পতি, হারাধনবিদ্যাভরণ, সম্ভোষ তর্কবাগীশ, বিজয়রামবিদ্যার্ণব প্রভৃতি কয়েক জন বিখ্যাত পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা ব্যাকরণ ভ্রায় স্মৃতি জ্যোতিষ প্রভৃতি বহুশাস্ত্রে কৃতী ছিলেন। চুঃখের বিষয় এইবংশের আর এখন কেহই নাই। অতিরাম চক্রবর্তী, রূপরাম অধিকারী এবং নরসিংহসুন্দর বংশধরেরাও বেশ পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু ওলা যায়, কিছুকাল পূর্বে ইঁহারা কোন প্রবলসমাজে অন্তর্গত হইয়াছেন।

নববীশের আর একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ যোগেন্দ্রনাথের গৌরীবরবিদ্যা-লঙ্কার। তাঁহার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ বাববেন্দ্রবিদ্যাবাচস্পতি পূর্ববঙ্গের চন্দনানদীর তীরবর্তী মধুরাপুরে অনেক সময় বাস করিতেন। নবাবী আমলের প্রাচীন বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারী রাধাকান্তরায় ইঁহার বিদ্যাভক্তার পরিচয় পাইয়া পদ্মাতীরে

স্বপ্রতিষ্ঠিত মেঘনা গ্রামে লইয়া স্থাপন করেন। ইঁহার বংশধরেরা ধারাবাহিক
ক্রমে জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত। এই বংশের পরম পণ্ডিত মৌরচাঁদবিদ্যালয়কারের
মুখে নৈবধচরিত্রের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য কাব্যরসজ্জেরা একান্ত উৎসুক হইতেন।
ইঁহারা রাখাবস্তুত রানের প্রদত্ত প্রকৃত ব্রহ্মভূমি ভোগ করেন। এখনও এই
বংশে জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চা আছে। ঐহুক্ত নগেন্দ্রনাথ আচার্য্য প্রভৃতি কয়েকটি
বংশধর এখন বিদ্যমান। শান্তিপুরের দ্ব্যতকৌশিকগোত্রীয় কালিদাস চক্রবর্তী
শিরোমণিও জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশেষ কৃতী ছিলেন। পাটুলির জমিদার হরশঙ্কর
রায় ও সীতারাম রায়, শিরোমণি মহাশয়কে অনেক ব্রহ্মভূমি প্রদান
করেন। কয়েক পুরুষ ভোগ করার পর গঙ্গার প্রবল বেগে উক্ত ভূমি
জলসাৎ হয়। সেই সময় শান্তিপুর-সংলগ্ন সূত্রগড়ে কেবল নতুন বসতি
হইতেছিল। জমিদারের নিকট উক্ত ব্রহ্মভূমি নষ্ট হওয়ার সংবাদ দেওয়ার তাঁহারা
সূত্রগড়ের মধ্যে পুনরায় ঐ পরিমাণ জমি দান করেন। এখনও চক্রবর্তী
শিরোমণির বংশীয়েরা উক্ত ব্রহ্মভূমি ভোগ করিতেছেন। কিছুকাল পরে কুষ্-
নগরের রাজবংশীয় কোন রাজা পাটুলির জমিদারের কঙা গ্রহণ করার বৌদ্ধ
স্বরূপ সূত্রগড় প্রাপ্ত হন। এখন সূত্রগড় কুষ্ণনগরের মহারাজার। চক্রবর্তী
শিরোমণি-বংশীয় ঐহুক্ত কিশোরীলাল আচার্য্য হুশিক্ষিত। ইনি কিছু কাল
তিব্বতের গিয়াংসি নগরে গবর্নমেন্টের অফিসে কার্য্য করিয়া এখন কলিকাতায়
অপর কোন গবর্নমেন্ট অফিসে চাকুরী করিতেছেন।

যে সকল জ্যোতির্বিৎ বংশের বিষয় উল্লিখিত হইল, উহা ব্যতীত নদীয়া
জেলার হরধাম, কুষ্ণনগর নৈদিয়ার পাড়া, নৃসিংহ দে পাড়া, বুরসিদপুর, চুনিরাদহ,
হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি আরও অনেক স্থানে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের বংশধরেরা বাস
করিতেছেন। বাহ্যিক ভাবে সে সমুদয়ের উল্লেখ করা হইল না।

তত্ত্ব ।

বৌদ্ধদিগের অবনতির পর হইতেই ভারতে তত্ত্বমতের উদ্ভব হয় ; * কিন্তু এভাবে বাংলাদেশে উহার বিস্তৃতি ও চর্চা সেরূপ হয় নাই ।

লক্ষণ সেনের রাজ্যচ্যুতির পর বঙ্গদেশ হিন্দুশাসনচ্যুত হইয়া শঠনঃ শঠনঃ অধোগতির দিকে অগ্রসর হয় । লোক বধেচ্ছাচারী, হুসারী ও সর্ববিষয়ে ব্যভিচারী হইয়া উঠে এবং ইহার ফলে বঙ্গে তান্ত্রিক মতের প্রচার হয় । তন্ত্বে আরণ্য, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের সবিশেষ প্রশংসা থাকায় তুর্কলচিত্ত, বাসনাচালিত অনেকেই তত্ত্বমতাবলম্বী হইয়াছিলেন । কেহ কেহ অমুমান করেন, কোনও কোনও কুলগুরু স্ব স্ব কাপুরুষ শিষ্যগণকে অভ্যাচারী মুসলমান-গণের বিপক্ষে উত্তেজিত করিবার জন্য এই উত্তেজনাপূর্ণ বীরাচার গ্রহণে তাহা-দিগকে বাধ্য করেন । যে কারণেই হউক, সমগ্র দেশ তখন তান্ত্রিকমতে অমু-প্রাণিত হয় । এই নববীণ হইতেই উক্ত মত সমৃদ্ধ হইয়াছিল । তান্ত্রিক গুরুগণ স্থানে স্থানে ষটস্থাপনা করিয়া নীর নীর ইষ্ট মন্ত্র সাধন করিতেন ; কেহ কেহ বা মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া সিদ্ধপুরুষরূপে লোকের নিকটে সম্মানিত হইতেন । নববীণে যে “পোড়ামাতা” দেবীর পাঠাস্থান দৃষ্ট হয়, উহা পুর্ণানন্দ পরমহংস নামক জনৈক ভেজরী ক্রিয়াবান সন্ন্যাসী দ্বারা স্থাপিত । কথিত আছে, উক্ত সন্ন্যাসী নববীণের কোনও ব্রাহ্মণভূমারের সেবার সত্ত্বষ্ট হইয়া তাঁহাকে দীক্ষা-দান করেন এবং দীক্ষাদানকালে ভ্রমবশতঃ নীর সিদ্ধমন্ত্র উপদেশ দেন । সিদ্ধ-মন্ত্র প্রকাশ হওয়ার সন্ন্যাসী বিশেষ চুঃখিত হইয়া উক্ত শিষ্যকে তাঁহার স্থাপিত ষট দক্ষিণাকালিকাদেবীর পূজা করিতে উপদেশ দিয়া চিরদিনের নিমিত্ত নববীণ পরিত্যাগ করেন । ঐ ব্রাহ্মণভূমার ও গ্রামস্থ অনেকেই ঐ ষটে পূর্ববৎ পূজা করিতে থাকেন । পরে যখন বান্দেব সার্কভৌর নববীণের ভ্রায়দর্শনের চতুঃপাঠী স্থাপন করেন, তৎকালে গ্রামের প্রান্ত হইতে এই ষট আনয়ন করিয়া গ্রামের মধ্যস্থানে এক বটবৃক্ষস্থলে স্থাপন করেন । তদ্বধি উক্ত দেবী গ্রাম্য বৌদ্ধরূপে পণ্ডিতমণ্ডলী ও সাধারণ কর্তৃক পূজিতা হইয়া আসিতেছেন । কিছু

দিন পরে উক্ত ঘটনায় অসুস্থ হইলে ঐ স্থান পোড়া বটতলা ও দেবী “পোড়া মা” বা বিদগ্ধ জননী নামে খ্যাত হইয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, ‘পোড়া মা’ শব্দ ‘পরামায়া’ শব্দের অপভ্রংশ।

তখন পূর্বানন্দের ভায় বহুলোকেই মন্ত্র সিদ্ধ হইতেন। প্রতি গ্রামেই ২১ জন অমাত্যনিক কর্মতাপর বামাচারী পাওয়া যাইত; তাঁহাদের অনেকেই পতীর নিশীথে দুর্গম স্থানে বসিয়া সাধনা করিতেন। “পঞ্চ মকার”* তখন গ্রামে গ্রামে আধিপত্য করিতেছিল এবং দেশ এক বীভৎস মূর্তি ধারণ করিয়াছিল। এই ভয়ঙ্কর ভ্রোতে বাধা দিতে নবমীপে শীতাই এক শক্তিশালী মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। এই মহাপুরুষ আগমবাণীশ নামে খ্যাত। ইঁহার একুত নাম কৃকানন্দ; তাঁহার পিতার নাম মহেশ্বর পোড়াচার্য ও কনিষ্ঠের নাম মাধবানন্দ সহস্রাক্ষ। এই মাধবানন্দ একজন বিজ্ঞ শাস্ত্র বৈজ্ঞ ছিলেন এবং গোপালের উপাসনা করিতেন। আধুনিক প্রসিদ্ধ কবি ও নৈরায়িক অজিত নাথ ভায়রত ইঁহার বংশধর। কৃকানন্দের আবির্ভাবকাল লইয়া অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। স্থানীয় জনশ্রুতি হইতে ও তাঁহার বংশাবলীর নিকট হইতে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, তিনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাকীর সাহেব তাঁহার “ষ্টাটিসটিকেল অ্যাকাউন্ট” নামক পুস্তকে নদীয়ার রাজবংশের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে কৃকানন্দকে মহারাজ কৃকচন্দ্রের সভাসদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।† কিন্তু এমনটী নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল। বাহাহউক তিনি যে একজন মহা কর্মতাপশালী সাধক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃকানন্দই প্রথমে তন্ত্রোক্ত দেবী মূর্তি সকলের সাকার পূজা প্রবর্তন করেন। বর্তমান সময়ে যে শ্রাব্যমূর্তি পূজিত হইয়া থাকে, তাহা এই কৃকানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। কথিত আছে, দেবার তন্ত্রোক্ত মূর্তি কিরূপ নষ্ট হইবে এবং বরাদরপ্রদ হস্ত-ধরের কি ভঙ্গিমা ও লবঙ্গ কি রকমে রঞ্জিত হইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি দেবার পরমাপন্ন হইলেন। পরমায়ী দেবী বলে আদেশ করেন, “কল্য প্রভাতে উঠিয়া বাহার মূর্তি সর্বত্রবনে দেখিবে, তাহারই ভবিষ্যৎ ও রূপে

* বংগ, বঙ্গ, বাস, বৈষ্ণব ও মুসলিম।

† Vide Hunter's statistical account Vol II. Page 156.

আমাকে পঠিত করিবে।" কৃষ্ণানন্দ সোংহুকে প্রভাতে গাত্রোথান করিয়া যেমন বহির্দেশে পদার্পণ করিলেন, অমনি দেখিলেন, এক স্ত্রীমাতৃনী গোপমালা দক্ষিণ-পদ অগ্রবর্তী করিয়া গৃহের ভিত্তিমূলে দণ্ডায়মানা হইয়া বামহস্তখিত গোময় গ্রন্থ পূর্বক দক্ষিণ হস্ত উত্থাপিত করিয়া ভিত্তিগারে গোময়পিষ্টক রচনা করিতেছে; প্রমাণিত্যে ঐ রমণীর কপোল দেশে বর্ষাক্ত হওয়ার দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশ দিয়া ললাটের বর্ষ মোচন করায় তাহার সীমস্তের সিন্দূরবিন্দু জ্বলন্ত রঞ্জিত করিয়াছে, অবগুণ্ঠন স্থানচ্যুত হওয়ার আলুলায়িত কেশরাজি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এতদবস্থায় সহসা তাঁহাকে দর্শন করিয়া তিনি রমণীমূলত লজ্জার দস্তাবেজ জিহ্বা দ্বৈব কর্তন করিলেন, কৃষ্ণানন্দ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ছলছল নেত্রে এই মুষ্টি দর্শন করিয়া হৃদয়ে মায়ের কাল্পনিক মূর্তি অঙ্কিত করিয়া গইলেন এবং পরে তাহাই প্রকাশ করিয়া পূজাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিলেন। এতদবধি তুতচতুর্দশীতে দীপদানের প্রথা স্থলিত হইয়া আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে ও ক্রমে এই প্রথা সমগ্র ভারতব্রাহ্মণ হইয়াছে।

শিবদূষ হইতে আগত পার্শ্বভী হৃদয়ে পূত এবং কেশবের ইহাই মৃত বলিয়া তত্ত্বের অপর নাম আগম। তত্ত্ব অসাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকায় তিনি আগমস্বাক্ষর নামে খ্যাত হইলেন। উচ্ছৃঙ্খল বামাচারীগণের যথেষ্টাচার রহিত করিতে তিনি 'তত্ত্বসার' নামে এক গ্রন্থগ্রন্থ তত্ত্বগ্রন্থ সংকলন করেন। তত্ত্বের নাম করিয়া যে সকল নিষ্ঠুরতা ও মদ্যপানাদি কুক্রিয়া প্রচলিত ছিল, এই গ্রন্থ প্রকাশের পর হইতেই দেশ হইতে তাহা অনেক পরিমাণে তিরোহিত হয়। কৃষ্ণানন্দের পৌত্র গোপাল "তত্ত্বদীপিকা" নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

"সিদ্ধান্ত কুহুণ চন্দ্রিকা" গ্রন্থকার দ্বার্ত্ত রামকৃষ্ণ ভায়ালাভারের পুত্র "রামেশ্বর" একজন সাধক বলিয়া খ্যাত। তৎকালে সকলেই ইহাকে রামেশ্বর ভাস্কর বলিয়া ডাকিত। ইনি দীক্ষা ও হোমাদি বিষয়ে "তত্ত্ব প্রমোদন" নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার সহোদর রঘুনাথ "আগমসার" নামক পুস্তকের গ্রন্থকার, এইরূপ উল্লেখ আছে।

সেই সময়ে দেশের পণ্ডা রাজ ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেও তত্ত্বের প্রচার হইয়াছিল। রাণী ভবানীর পুত্র রামকৃষ্ণ একজন উৎকৃষ্ট সাধক ছিলেন। তাহার মৃত্যুকালীন সাধনা "আমের ভোলা জপি মালা" প্রভৃতি গান দেশ-

বিখ্যাত । বিখ্যাত সাধনসঙ্গীতরচয়িতা রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন বামাচারী ছিলেন । রামমোহন রায় নামক একজন বিখ্যাত গায়কের বহুতর সাধনসঙ্গীত দৃষ্ট হয় । কৃষ্ণনগর রাজবংশের অনেকেই সাধক ছিলেন । রাজা গিরীশচন্দ্র শেষ জীবনে দেবীসাধনায় নিযুক্ত হন এবং নবদ্বীপে দুই বৃহৎ মন্দির স্থাপন পূর্বক ভবতরিনী ও ভবতারণ নামে দুই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন । ইঁহারই সময়ে শান্তিপুরের নিকটবর্তী ব্রহ্মশাসন গ্রামে চন্দ্রচূড় জ্ঞানপঞ্চানন নামে জনৈক জিহ্মাবান তান্ত্রিক জগদ্ধাত্রী-মূর্তি প্রকাশ ও তন্ত্রোক্ত পূজাপদ্ধতি প্রণয়ন করেন । এই সময় হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রের জ্ঞান তন্ত্রেরও অবনতি ঘটিতে থাকে এবং মহাপ্রভুর আচরিত ধর্মের প্রবল প্রোতে তন্ত্রোক্ত মত তাসিয়া যায় ।

ইহাই সংক্ষেপতঃ নবদ্বীপের সংস্কৃতচর্চার ইতিহাস । ১১১ শকে মহারাজ আদিশুর কাম্বুক্স হইতে এজন ব্রাহ্মণ আনিয়া এতদকালে বিদ্যাচর্চার যে রীজ বপন করিয়াছিলেন, কালে মহারাজ বদ্রালসেনের সময় উহা অক্ষুরিত হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর যুগে সমগ্র নবদ্বীপকে এক মহানু কলক্রমে পরিণত করে । এই সময়ে নবদ্বীপ সর্ববিষয়েই উন্নতির শিখরদেশে আরুঢ় । নৈয়ায়িকপ্রধান সার্বভৌম অজ্ঞেয় তর্কিক শিরোমণি, তান্ত্রিকশ্রেষ্ঠ আগমবাগীশ এবং পরমভাগবত হরিনাম-মূর্তি মহাপ্রভু ঐ মহাক্রমের অমির কল । সমগ্র ভারতবর্ষ তখন এই অমৃতময় ফলের সুধাধিক রসাস্বাদনে মগ্ন, কালে কলক্রমে শুষ্ক হইতে থাকে । মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের যত্নে এই শুষ্কপ্রায় বৃক্ষে দুই একটা নবমুকুল মুগ্ধুরিত হইয়া তাহাদের দশঃসৌরভে দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল । ইঁহারা—বাণেশ্বর, ভারতচন্দ্র, কবিরঞ্জন, বীরেশ্বর প্রভৃতি ।

বৈদেশিক শাসনে দেশ তখন সংস্কৃত বিদ্যার প্রতি দিন দিন হতপ্রভ হইয়া আসিতেছিল; কারণ তখন উহা আর অর্থকরী বিদ্যা ছিল না । মুসলমান শাসনে কারসীর আদর ছিল, কিন্তু এই সময়ে কোম্পানীর হস্তে রাজস্ব বাওরায় উহার আদরও কমিয়া আসিতেছিল । ক্রমে এই দুই ভাবার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠে । শাসন কোম্পানীর হস্তে আসিলেও সর্বদা শাসনমৌকর্ষ্যার্থে উপযুক্ত সংস্কৃতব্যবস্থাপক ও মৌলবীর সাহায্য প্রয়োজন হইত, কিন্তু অনেক সময়েই উক্ত কার্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিত । তন্নিমিত্ত এই অভাব দূরীকরণার্থ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে হেলিওসের সময়ে মুসলমানগণকে কারসী ভাবায় শিকা

নিয়ার অস্ত্র এক মাস্রা ও ১৭১২ খ্রষ্টাব্দে জোনাথান ডান্‌কান নামক কোন ইটেরোপীয়ের বহু কাশীবারে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতির শিকার অস্ত্র চতুর্দশ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক ব্যয় নির্ধারণে এক সংস্কার কলেজ স্থাপিত হয়। ১৭১৩ খ্রষ্টাব্দে ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর নুতন সনন্দ গ্রহণের সময় উপস্থিত হয় এবং পার্শ্বায়মেন্ট মহাসভায় উক্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে চার্লস জ্যাক্ট এবং ক্রীত দাসের চিরবন্ধ উইলবারকোর্ন সাহেব প্রমুখ্যৎ কতিপয় উন্নতজন্মের সাহেব ভারতবাসীদের মধ্যে বাহাতে বিদ্যাশিক্ষা ও নৈতিক উন্নতির সমধিক প্রসার হয়, তৎসংক্রান্ত এক প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। দেশের অবস্থা তখন আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সংস্কারচর্চা দেশ হইতে একরূপ অপসারিত হইয়াছিল বলিলেও হয়; কচিং কোথাও হুই একটা পাঠশালা এক কিছুত কিম্বাকার শিক্ষা বিস্তার করিতেছিল এবং এইসময়ে দেশের এই বিদ্যাহীনতাব্যাপ্ত গবর্ণমেন্টের সর্বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিন্টো বাহাদুর এ সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ এক মন্তব্য প্রকাশ করেন।* তাহাতে তিনি

“It is a common remark that science and literature are in a progressive state of decay among the natives of India. From every enquiry which I have been able to make in this interesting subject, that remark appears to me but too well-founded. The number of the learned is not only diminished but the circle of learning even amongst those who still devote themselves to it, appears to be considerably contracted. The abstract sciences are abandoned, polite literature neglected, and no branch of learning cultivated, but what is connected with the peculiar religious doctrines of the people. The immediate consequence of this state of things is the disuse and even actual loss of many books, and it is apprehended, that unless Government interpose with fostering hand, the revival of letters may shortly become hopeless from want of books or of persons capable of explaining them”. হুতরাং তিনি প্রস্তাব করেন “I would accordingly recommend that in addition to the College of Benares (to be subjected, of course, to the reform already noticed) colleges be established at Nadiya and Tirhoot.

Vide

LORD MINTO'S MINUTE, DATED FORT WILLIAM,
the 6th March, 1811. as in Rev. J Long's selection
from unpub. Records Gov. Appendix D—page, 554

তৎকালীন দেশের বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অবনতির বিষয় বর্ণন, ও কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন “এ দেশে কেবল যে বিষয়জ্ঞানের দ্বাঙ্গ হইতেছে তাহা নহে, তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যার কেন্দ্রও নিত্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। মনোবিজ্ঞান, দর্শন আর অদীত হয় না; সুকুমার সাহিত্যের আর আদর নাই এবং জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ধর্মগ্রন্থ ভিন্ন অন্য সাহিত্যের চর্চা নাই। এই অনাদরের ফলে দেশ হইতে সঙ্গ্রহ একেবারে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে এবং ভয় হয়, অচিরে উপযুক্ত গ্রন্থ ও অধ্যাপক অভাবে দেশ হইতে সংস্কৃত শিক্ষা একেবারে তিরোহিত হইবে। আমার মতে এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইলে কাশীতে যেরূপ সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে, সেইরূপ বিদ্যালয় নদীয়া ও মিথিলাতেও স্থাপিত হউক।” এই মন্তব্যের পর মহামতি মিষ্টো বাহাদুর নদীয়ায় ক্রীড়া ধরণে ও ব্যয়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে কার্যকর হইবে, তাহারও একটা আভাস দিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব কেবল প্রস্তাবমাত্রেই পর্যাবসিত হয়। পরন্তু, নদীয়ার সুবিখ্যাত রাজবংশের বদান্ত রাজগণ তাঁহাদের নিজ বিষয়ের আর হইতে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের হস্তে নদীয়ার টোলে মাসিক সাহায্য-কল্পে যে ১২০ পাউণ্ড বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি দান করেন এবং কমিটি অব রেভিনিউ বাহা এতাবৎ সঙ্কর করিয়া নিরমিত দিয়া আসিতেছিলেন, তাহা ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বন্ধ করা হয়। পরে নদীয়ার ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দের

কল্পে ব্যয়ে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত ও কি ভাবে ইহা চালিত হইবে, তৎসম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিপিবদ্ধ করেন।

		<i>Annual Prices.</i>	
2 Pandits at Rs. 100 each	2400 Rs.	For the best scholar	800 Rs.
12 Pandits at Rs. 60 each	7200 Rs.	For the next	400 Rs.
	9600 Rs.	For the 3rd	200 Rs.
		For the 4th	100 Rs.
		For other good scholars an	
		honorary dress to each (con-	
		sisting of a cloth of little	
		value)	300 Rs.
			1700
		Besides a substantial building to	
		be erected.	
<i>Library.</i>			
The librarian to be one of the			
Pandits receiving pensions.			
2 Writers as assistants at			
Rs. 10	240 Rs.		
2 Duftries at Rs. 4	96 Rs.		
Paper, ink etc at Rs.	40 Rs.		
Purchase of copying books	1000 Rs.		
	1,376 Rs.		

এবং মূর্শিভাবনের কবিসনের সাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় উহা আবার মজুর করা হয় ।* তদবধি নিম্নলিখিত মাসিক ২০০ টাকা নদীয়ার বদৌলী ছাত্রপণের বৃত্তি-স্বরূপ নির্ধারিত হইয়া নদীয়া কালেক্টরেট হইতে প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে । ভূতপূর্ব ছোটলাট স্বর্গীয় সায় জন উডবরণ মহোদয় নদীয়া দর্শনে আসিয়া পণ্ডিত-দিগের নির্বন্ধাভিলাষে আর একশত টাকা মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া যান,† তাহাতে প্ৰবৰ্ধকৈবৃত্তি মোট মাসিক ৩০০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে । এতদ্ব্যতীত নদীয়াবলের রাজবৃত্তি, ভূদেব বৃত্তি, গিরীশচন্দ্র বহুর দত্ত বৃত্তি, বৈকুণ্ঠচূড়ামনি বনবালী রায় প্রদত্ত বৃত্তি প্রভৃতি অনেকগুলি বৃত্তির অর্থে বর্তমান চতুপ্পাঠীগুলি কোনরূপে চলিতেছে । সংপ্রতি নবদ্বীপে টোলার সংখ্যা পঞ্চদশ; ইহাদের মধ্যে চারিখানিতে ভ্রায়, আট খানিতে স্মৃতি, একখানিতে বেদান্ত এবং একখানিতে স্মৃতির সহিত বৈকুণ্ঠ শাস্ত্র ও যট্‌সম্বর্ভ ও আর একখানিতে স্মৃতির সহিত ব্যাকরণ ও কাব্যের পাঠ দেওয়া হয় । এতদ্ব্যতীত বিশ্বপুত্রবীণী, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, উলা, রাণাঘাট প্রভৃতি স্থান সমূহে আরও কতিপয় চতুপ্পাঠী বিদ্যমান আছে ।

যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত সংস্কৃতজ্ঞানের স্পর্শ করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই নবদ্বীপে অধ্যয়নার্থ আসিয়াছিলেন । খৃষ্টীয় ১৭৮৪ অব্দে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি সুপ্রসিদ্ধ উইলিয়াম জোস সংস্কৃত শিক্ষার্থ এই স্থানে বহুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন । নবদ্বীপনিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব রামমোপাল কবিভূষণ তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন । ডাক্তার কেরিসাহেব ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কিছুদিন এখানে অতিবাহিত করেন । ডাক্তার লিডেন বহুদিন এখানে ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং কথিত আছে, তদানীন্তন কমিটি অব্‌ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সম্পাদক ডাক্তার এইচ, এইচ উইলসন সাহেব এই বিদ্যামন্দিরেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন ।

সেকালের পণ্ডিতগণ কিতাবে সভ্যরোহণ করিয়া তর্ক করিতেন ও কি কি গ্রন্থে সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাহা জয়নারায়ণ সেন কৃত চণ্ডীকাব্যে হুচার-

* Vide Hupter's Statistical Account of Nadiya. P. III.

† এই উপন্যাস নদীয়ার পণ্ডিতমণ্ডলী সঙ্গায় উডবরণ সাহেবকে “ভায়নিবি” উপাধি প্রদত্ত করেন ।

ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত অংশটী উদ্ধৃত করিয়া আমরা নদীয়ার সংস্কৃত বিদ্যা-চর্চার ইতিহাস সম্পন্ন করিব।

“ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে, পাইয়া পত্র নিমন্ত্রণে, উপনীত সভা আরোহণে ।
কেবল অধিষ্ঠানমাত্র, দান নিতে নহে পাত্র, ধর্ম সংস্থাপন কারণে ।
তেজঃপূর্ণ হুকীরণ, শুক্লবর্ণ হৃৎমন, ভালেতে গঙ্গা মৃত্তিকা ছোটা ।
শুক্ল যজ্ঞ উপবীতে, রক্ত ভোট আসনেতে, বসিতে হি বিচারের ঘট ।
অনুমান প্রত্যক্ষতে, পরস্পর সম্বন্ধেতে, তार्কিক ঘটায় নানা তর্ক ।
প্রমাণ কুহুমাল্ললী, নানামতে ব্রহ্ম বলি, একে আর ঘটায় সম্পর্ক ।
পদ পদার্থ বিচারেতে, একদণ্ড সমাসেতে, কার কত নিশ্চিত ঘটাইয়া ।
বৈরাগ্যরসিরা সবে, বিচার করুণ রবে, গোপীনাথ পরিশিষ্ট লইয়া ।
মধুর কাব্যের বাণী, অলঙ্কার শুনি ধ্বনি, একদিকে কহিছে রসেতে ।
ধ্বনি বাক্য ক’রে ক’রে, ব্যঞ্জনারিকল’রে, কাব্য প্রকাশ উদাহরণেতে ।
নাানাচ্ছন্দে মোকপাঠ, সাহিত্যে বিচার ঠাট, কত মত বর্ণনা ভাবের ।
রসিক বিবৃৎগণে, মধ্যস্থ পণ্ডিত মানে, রঘু, ভট্ট, মাঘ, নৈবধের ।
পৌরাণিক পণ্ডিতে, নানামত এসঙ্গেতে, বিচার করিছে ভাবি মনে ।
বশিষ্ঠাদি বেদ জানে, স্তম্ভক ভাবগণে, অন্ত প্রত্যস্তর লিখি ।
দশা, বিদশা বসতি, জ্ঞানায় সাধু প্রতি, হৃদয়সিদ্ধান্তের মত দেখি ।
সকলেতে ব্রহ্মময়, বেদান্তে এ মত কর, পাশ পুণ্যায় নিরঞ্জন ।
শত্রু মিত্রময় তিনি, জ্ঞানভেদে ভিন্ন মানি, শঙ্করাচার্যের লিখন ।
পড়িলে বিপত্তি-কালে, দোষ যদি ঘটে বলে, ধর্মশাস্ত্র মতে পাশ নহে ।
মৃত্তিশায়ে লেখা এই, শূলপাশি মত এই, মুক্তকণ্ঠ হ’রে মনু কহে ॥”

বঙ্গভাষা ও শিক্ষা ।

বঙ্গভাষা কতদিনের পুরাতন, সে সম্বন্ধে এখনও কিছু স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে বৌদ্ধদের সময়ে বঙ্গের পৃথক্ বঙ্গলিপি ছিল, তখন যে পৃথক্ বঙ্গভাষাও ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলা ভাষার আদিরকালে ডাকের বচন বৃষ্টি হয়। ডাক অর্থাৎ প্রচলিত বাক্য প্রথমে একটী, পরে আর একটী, এইরূপ দিনে দিনে উহা বর্দ্ধিত আয়তন হইয়া বংশপরম্পরার বাঙ্গালীর মধ্যে চলিয়া আসিতেছে এবং বাঙ্গলাভাষার ক্রমোন্নতির সহিত এগুলিও কালে মার্জিত ও পরিণত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের আড়ম্বরহীন সরল ভাষা ও ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহাদের প্রাচীনত্ব বেশ উপলব্ধি হইবে। এই ডাকের পর তাহারই অনুসরণ করিয়া শুভ মুহূর্ত্তে ধনার বচন প্রকাশিত হয়, ইহাদের বর্ণিত জ্ঞানগর্ভ উপদেশমালা চিরদিনই বাঙ্গলাভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিবে। বাঙ্গালীমাত্রেই সাধারণতঃ শাস্ত হিন্দু পূজা। সাধারণ দেবদেবীতে তাহার চিরদিনই অচলা ভক্তি, সুতরাং যে মুহূর্ত্তে বৌদ্ধধর্মের অবনতির সূত্রপাত হয়, সেই মুহূর্ত্তে পৌত্তলিক হিন্দু আবার চিরঅভিলষিত দেবদেবীর গঠনে ও পূজনে নিমুক্ত হয়। বাঙ্গালী তখন আপনার একটা ভাষা পাইয়াছে, সুতরাং আপনার ভাষায় আপনার অভীষ্ট দেবদেবীকে পূজা করিতে ও তাঁহাদের মহিমা কীর্তনে যতঃই আগ্রহবান হইয়াছে, সুতরাং তদানীন্তন অব্যবহিতধর্ম বাঙ্গালী বীরবীর কল্পনা অমুদারী দেবতার মহিমা গাহিয়া গিয়াছেন। কালে শিব, চণ্ডী, মনসা, নীতলা প্রভৃতি দেবদেবীর বাহাঙ্গ্য-কাহিনী “পালা” কারে ভাষায় রচিত হইয়াছে এবং এই আন্তরিক আগ্রহ হইতেই কালে আমরা কৃষ্ণিবাসের মধুর রামায়ণ, কবিকল্পণের চণ্ডী, কাশীদাসের মহাভারত প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীমদ্ মহাপ্রভুর রূপ-কটাকে এই সুসুন্দর ভাষা ভদীর অসংখ্য প্রেমিক তত্ত্ব বর্জক নানালঙ্কারে সুশোভিত হইয়া বর্তমান কল্পনার ভাব ধারণ করিয়াছে। যে দিন নদীয়া দেবগ্রাম-বাসী শ্রীকৃষ্ণচরণের প্রসিদ্ধ ঠীকাকার বিংশনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ সংস্কৃতে প্রগাঢ় জ্ঞানশালী, পণ্ডিতমণ্ডলী বাঙ্গালীর নিমিত্ত গ্রন্থ প্রণয়নে সংস্কৃত অপেক্ষা বাঙ্গলাকে প্রধান দিয়া বৈকব্যগ্রন্থ সকল বাঙ্গলাভাষায় প্রণয়ন, এমন কি বঙ্গভাষায় রচিত

“পদামৃত সমুদ্রের” সংস্কৃত গ্রীক রচনা করিয়াছিলেন, সেই দিন বঙ্গভাষার ইতি-
হাসে চিরস্মরণীয় রহিবে ।

বঙ্গভাষার বৃষ্টি ও পুষ্প নদীয়ার । যদিও বাঙ্গলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি ও রচনা
বহুদিন হইতে দেখা যায় বটে, ও “বিদ্যাপতি” প্রভৃতি আধাবাঙ্গালী কবি বঙ্গকবি-
রূপে পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন বটে, কিন্তু প্রসিদ্ধ রামায়ণকার কৃত্তিবাসই
ধাস বাঙ্গালী আদি কবি । ইনি নদীয়ারঙ্গেলার অন্তর্গত ফুলিয়ার জন্ম গ্রহণ
করেন । ইহার আবির্ভাবকাল লইয়া অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু
তিনি যে মহাপ্রভুর বহুপূর্বে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,
সে বিষয়ে মতবৈধ নাই । কৃত্তিবাসের জন্মভূমি ফুলিয়া, বাহা এক্ষণে বনাকোর্ণ
হইয়া আছে, তাহা তাঁহার সময়ে গঙ্গাভীরব এক সমৃদ্ধ স্থান ছিল । কবি অনেক
স্থলেই

“স্থানের প্রধান সে ফুলিয়ার নিবাস ।

রামায়ণ পান ছিন্ন মনে অভিশাপ ॥”

প্রভৃতি বাক্য দ্বারা তাঁহার জন্মভূমির যশোপান করিয়াছেন । স্থানে স্থানে
তিনি ইহাকে “গ্রামরস” বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন । চকলা ভাগীরথী এখন
ফুলিয়ার বহুদূরে প্রবাহিত । কিন্তু দ্বিতীয় ১৬৮২ অব্দেও ফুলিয়ার নিকটে গঙ্গা
বহত ছিলেন । ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্যাপ্টারি সমূহের এজেন্ট ও গবর্নর হেজ
সাহেব তাঁহার রোজনামচার ইহার উল্লেখ করিয়াছেন ।*

* Hedge's Diary Oct. 15th, 1682—Being Sunday, we dined ashore at
Fulia under a great shady tree near Santipur where all our Saltpetre boats
are ordered to stop.

এই গ্রন্থ রচনাকালে আমি আমার জ্ঞাতাপদবন্ধ “মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনী” প্রভৃতি বহু
গ্রন্থ প্রণেতা সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত বোমেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এবং বহুভাবাবিৎ ও প্রস্তুত অক্লান্তব্রত
পণ্ডিত অমূল্যচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ এম. এ, মহোদয়ের সহিত কৃত্তিবাস সম্বন্ধে জাতব্য বিষয় অক্লান্তকর
নিমিত্ত ফুলিয়ার বাইরা তথাকার কতিপয় জ্ঞতি বৃন্দের নিকটে সন্ধান করিয়া আসিতে পারি যে
কবির নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় বখন রাধাঘাটে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তৎকালে বহু অক্ল-
সন্ধান কৃত্তিবাসের এক মোলসক আবিষ্কার করিয়া তাহার চতুঃপার্শ্ব ভূমি সাধারণের অর্থে জম
করিয়াছিলেন ; এবং একটা পাকা ইন্দ্রাণী খনন করিয়াছিলেন ; উহা অর্ধস্বাভাব্যে এখন
পড়িয়া রহিয়াছে । ইহারই কিয়দূরে একজন বৈক্য, যখন হরিদাস ঠাকুরের পাঠ আবিষ্কার

কৃতিবাস সম্বন্ধে আশা বাহা জানি, তাহা তাঁহারই স্বরচিত আশ্চর্য্য হইতে গৃহীত। সম্প্রতি এই পঞ্চমর জীবনীটা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে হস্তলিখিত বহু পুরাতন পুঁথিতেই এই বিবরণ দেখা যায়; সুতরাং ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কবি স্বয়ং নিঃসন্দ্বাদ। তাঁহার পিতৃব্য অনিরুদ্ধের বংশাবলী অদ্যাপি ফুলিয়াতে বাস করিতেছেন।

কবি কৃতিবাসের রামায়ণ রচনার কালে গোড়েশ্বরগণ এতদকালে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহারা বিদ্যোৎসাহী ও স্বয়ং বিদ্বান ছিলেন; ইহাদের অনেকেই মুসলমান হইলেও উদারচরিত্র ছিলেন এবং নিজেরাও হিন্দু পৌরাণিক-কাহিনী বহুভাষায় লিখিতে ও লিখাইতে কৃত্রিম হইতেন না। সুপ্রসিদ্ধ হসেন সাহার যত্নেই কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী কর্তৃক মহাভারত অনুবাদিত হয় এবং গণপ্রাচ্য খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন।

লক্ষ্যসেনের রাজ্যাভ্যন্তে মহাপ্রভুর সময় পর্য্যন্ত অমূল্যলন করিলে আমরা বহু ঐশ্বর্য্যের নাম প্রাপ্ত হই। কত অমূল্য প্রাচীন পুঁথি বহুভাষ্যে কত পত্রীতে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যতগুলি এ পর্য্যন্ত সময়ে রক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আমরা অনেক মেধাবী লেখকের পরিচয় প্রাপ্ত হই। ভারতব্রহ্মবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত প্রভৃতি এবং মঙ্গলচণ্ডী ও মনসায় ভাসান প্রভৃতি গীত প্রণেতাগণ বাঙ্গালা ছড়ায় গীত রচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি এই সময়েরই কবিতাক্ষরের কলকর্ষ কবি। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় যে প্রেমের বীজ বপন করিয়া বান, কালে তাহাই অঙ্কুরিত হইয়া শ্রীচৈতন্যরূপ প্রেমরূকের উদ্ভব হয়। এই মহাপুরুষের অনন্ত কৃপায় দীন বহুভাষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। ইহারই অসংখ্য ভক্তবৃন্দ, অসংখ্য প্রেমময় পদাবলী রচনা দ্বারা

পূর্বক একটা কুঠারি নির্মাণ করিয়া তাহাতে শ্রীশ্রীবাংলাকুলের বৃন্দলব্ধি স্থাপনা করিয়াছেন। হরিদাসের সন্নাধি বেখানে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারই উক্তর সীমায় গ্রামবাসীরা কৃতিবাসের ভিত্তি বলিয়া নির্দেশ করেন, কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু দোলমঞ্চসম্বন্ধে দেখা যায় যে বহু প্রাচীনসময় উক্ত স্থানটী কখন কর্ষিত হইতে দেখেন নাই এবং একটা ক্ষুদ্রস্তম্ভের ভূগুণ অদ্যাপি এখানে দৃষ্ট হয়।

বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই অসংখ্য মেধাবী গ্রন্থকার-
গণ দ্বারা সমগ্র বঙ্গভূমি পরিব্যাপ্ত। আর প্রতি জেলাতেই দুই দশজনের
আবির্ভাব দেখা যায়। ইহাদের কেহ কেহ নদীয়ার ভ্রম গ্রহণ করিয়াছেন এবং
কেহ কেহ বা আজীবন এখানে বাস করিয়াছেন।* শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্শ্বদৃশ্য
যেখানেই ভ্রমগ্রহণ করিল না কেন, এই নবদ্বীপকেই তাঁহারা প্রাথমিক ভাল
বাসিভেন এবং এই নবদ্বীপচন্দ্রকে লইয়াই তাঁহাদের কাব্য ক্ষুধা পাইয়াছিল।
হুতরাং ইহাদের প্রস্তুতকৃত বস্তুর উপর নদীয়ার সম্পূর্ণ দাবী আছে। শ্রীচৈতন্য
দেবের সমসাময়িক ও পঞ্চাষত্তী তত্ত্ব পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক একদিকে বঙ্গভাষার
প্রেমের সাহিত্য যেরূপ পুষ্ট হইতেছিল, অন্যদিকে দামুড়াবাসী প্রসিদ্ধ চতৌললেখক
কবি কঙ্কণ মুহুন্দরাম চক্রবর্তী, শিবসংকীর্তন প্রণেতা রামেশ্বর তট্টাচার্য্য,
ধর্মরাম চক্রবর্তী, পদ্মাবতীপ্রণেতা আলোয়াল এবং কান্দীয়া দাসপ্রমুখ মহা-
ভারত অম্ববাদক পণ্ডিতমণ্ডলী তাহাকে সর্বদ্বন্দ্বীন হৃদয় করিতে চেষ্টা করিতে
ছিলেন। চৈতন্যমঙ্গলের গ্রন্থকার জয়ানন্দ এইসময়ের ও ইহার পূর্ববর্তী
কালের সাহিত্যের একটা হৃদয় সংকীর্ণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।
যথা:—

“চৈতন্য অনন্ত রূপ অমৃতভাবতার।
অনন্ত কবীন্ড গারে মহিমা বাঁহার।
রামায়ণ করিল বাগ্মিকী মহাকবি।
পাঁচালী করিল কৃষ্ণিবাস অমৃতবি।
শ্রীভাগবত করিল ব্যাস মহাপর।
ভগবান শ্রী কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল একাংশ।

* জগদানন্দ দাস, প্রেমদাস, ছোট হরিদাস, বরুণদাস, বন্দীধন দাস, মাধব দাস, গদাধর
দাস, বলাদেব দাস, রামচন্দ্রদাস গোস্বামী, হরিবল্লভ দাস, সুবাসী ভট্ট, বহুদাশ দাস, শিবানন্দ
দেব প্রভৃতি অসংখ্য বিখ্যাত পদকর্তার ভ্রমগ্রহণ করিয়াছেন। আবার ইহাদের ভ্রম নবদ্বীপে বহু
অন্য শ্রীচৈতন্যের প্রেমে বদ্ধ হইয়া নবদ্বীপে আসিয়া বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের
সংখ্যাও অত্যধিক, বিখ্যাত পদকর্তাদের আর সকলেই এই ভ্রমগ্রহণ।

সার্কভোম ভট্টাচার্য ব্যাস অবতার ।
 চৈতন্যচরিত্র আশে করিল একাশ ।
 চৈতন্য সহস্র নাম লোক একে ।
 সার্কভোম রচিল কেবল প্রেমানন্দে ।
 ঐ পরমানন্দপুরী পোসাকি মহাশয়ে ।
 সংক্ষেপে করিল তিহি পোবিল বিজয়ে ।
 আদি বণ্ড, মধ্য বণ্ড, শেষ বণ্ড করি ।
 ঐ বৃন্দাবন দাস রচিল সার্কগরি ।
 গৌরী দাস পণ্ডিতের কবিত্ব হলেণী ।
 সংগীত প্রবন্ধ তার পদে পদে খনি ।
 সংক্ষেপে করিলেন তিনি পরমানন্দ গুণ ।
 গৌরান্দ বিজয় গীত শুনিতে অক্লুত ।
 গোপাল বহু করিলেন সংগীত প্রবন্ধে ।
 চৈতন্য মঙ্গল তার চামর বিজ্ঞপ্তে ।
 ইবে শব্দ চামর সংগীত বাধ্য বসে ।
 কয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গল পাএ শেষে ॥”

এই ক্রমোন্নত বক্তৃতা পরবর্তী কালে বিদ্যোৎসাহী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের যথেষ্ট সমর্থিত্রী সম্পাদনা হয়। বক্তৃতাটির ঐতিহাসিক সাধনে নদীরা বতুটুকু চেঁচা করিয়াছে, তাহাতে মহাশয়ের পর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই উদ্বেগবোধ্য। ইহার অসাধারণ বুদ্ধি ও অর্থব্যয়ে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিসমূহ কর্তৃক অন্তর্দামহন, বিদ্যাহৃদয় প্রভৃতি বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষা এই সময়ে আর কটকটিত প্রায় ভাব ও ভাষা দুই পক্ষী গীত নহে, ইহা তখন অলঙ্কারবহুল, রসপ্রতিভা, কবিকল্পিত, রাজানুগৃহীত, বিদ্বজ্জনাদৃত হুজলিত ভাবের এক মধুর ভাবার পরিণত হইয়াছে। ইহার পূর্ববর্তী কালে বৈষ্ণব কবিত্বের কাব্যে যেমন মৈথিলী ভাষা ও ব্রজবুলির মিশ্রণ দেখা যায়, এই সময়ে তেমন হুসলমানী ভাব ও ভাষা একান্তরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান অধিকার করে। বাঙ্গালা ভাষা এইরূপে সংকৃত হইতে উদ্ধৃত এবং মৈথিলী, ব্রজবুলী প্রভৃতি ভাষা দ্বারা পুষ্ট হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে হিন্দী, কান্দসী, ইত্যাদি ভাষা দ্বারা অলঙ্কৃত হয়।

এইরূপে হুচাকভাবে অলঙ্কৃত কমলীর বজ্রভাষা ক্রমে উন্নত হইয়া জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ দত্ত, দিনবন্ধু নিত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি বিবুধ মনোবিগ্ণ কর্তৃক পরিমার্জিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। এই বর্তমানকাল প্রচলিত বজ্রভাষার উন্নতি সাধনে ইহারা ঐকান্তিক বহুঐ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, ঈশ্বর গুপ্ত, মদন মোহন তর্কালঙ্কার, জামাচরণ সরকার, প্রভূম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু নিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি অনেকেরই জন্মভূমি নদীয়ায়। স্থানান্তরে তাঁহাদের কতিপয়ের মাত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট হইতে হইল।

জয় গোপাল তর্কালঙ্কার ।

ইনি নদীয়া জেলার (বর্তমান বশোহর জেলার) অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে ১৭৭৫ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা কেবলরাম ভট্টাচার্য্য তর্কপঞ্চানন নাটোররাজের সভাসদ ছিলেন। তাঁহার ৫ পুত্র। জয়গোপাল সর্বকনিষ্ঠ। বৃদ্ধ বয়সে কেবলরাম জয়গোপালকে সঙ্গে লইয়া ১৭৮১ খ্রষ্টাব্দে কালীবাগী হয়েন ও তথায় শিক্ষালাভ করেন। সাহিত্যশাস্ত্রে তিনি অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার কালে তাঁহার তুল্য শাস্ত্রিক আর দেখা যায় না। ১৭৯৫ অব্দে তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। পরে ৪৬ বৎসর বয়সে তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন। ১৮০৫ অব্দে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে তাঁহার সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হয়। বহুস্থানে বহুচেষ্টার পর ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৮০৫ খ্রষ্টাব্দে তিনি ঈরামপুরের কেদী সাহেবের অধীনে কর্মগ্রহণ করেন। পরে ১৮১৩ অব্দে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৬ বৎসর তিনি এই কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগর, তারাপ্রসাদ, মদনমোহন প্রভৃতি স্নানবিশিষ্ট সকলেই তাঁহার ছাত্র। তিনি তদানীন্তন হুদীয়া কোর্টের জজ পদভার অর্ভভব ছিলেন। মিসলদী কেদী ও মারশিয়ান সাহেব তাঁহার নিকট সংস্কৃত ও বাঙ্গলাভাষা শিখা করেন। তাঁহার ঈরামপুরে সর্বপ্রথম বঙ্গভাষা মুদ্রণের প্রতিষ্ঠা করিলে সর্বপ্রথম জয়

গোপাল তর্কালঙ্কার কর্তৃক পরিশোধিত হইয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত প্রকাশিত হয়। সুতরাং তিনিই বঙ্গভাষার বর্তমান উন্নতির সূত্রপাত করিয়া যান স্বীকার করিতে হয়। তিনি একজন সুকবি ও ক্ষমতাপন্ন লেখক ছিলেন। তিনি বহিঃ রামায়ণাদি প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি প্রাচীনতম বঙ্গগ্রন্থ রামায়ণের ও মহাভারতের পাঠ বিকৃত করিয়া সাহিত্যের ঘোর অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই দুই গ্রন্থ ব্যতীত, বিশ্বমঙ্গলকৃত হরিতক্যান্নিকাসংস্কৃত কবিতাগুলির বঙ্গানুবাদ, ‘পারদী অভিধান’ নামাভিধেয় একখানি অভিধান ও কতিপয় ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৮৪৪ অব্দে কালগ্রাসে পতিত হন। তিনি বিশ্বমঙ্গলের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় আপনার আবাসস্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

“চারি সমাজের পতি কৃকচন্দ্র মহামতি,

ভূমিপতি ভূমিহর পতি।

তঁার রাজ্য শ্রেষ্ঠ ধাম, সমাজপুঞ্জিত গ্রাম

বজ্রা পুরেতে নিবসতি ॥

শ্রীজয় গোপাল নাম, হরিতক্তি লাভ কাম,

উপনাম শ্রীতর্কালঙ্কার।

তত্ত্ববুদ্ধ মধ্য রবি, শ্রীবিষ্ণু মঙ্গল কবি

কবিতায় প্রকাশে পরায় ॥”

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

ইনি কাঁচড়াপাড়া নিবাসী হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। ১৭০২ শকে (১২১৮ সালে) ২৫এ কাঙ্কন শুক্রবার ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা কাঁচড়াপাড়ার সম্বিহিত শিলালডাঙ্গার নীলচুঠীতে চাকুরী করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বালাকালে সাতিশর মুদ্রক ছিলেন। কবিতা আছে, তাঁহার দশবর্ষ বয়স্ককালে মৃত্যবিরোগ হইলে তাঁহার পিতা পুনরায় দ্বার পরিগ্রহ করেন।

এই বিবাহ বালক ঈশ্বরচন্দ্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হওয়ার পরম অভিমানী বালক ঈশ্বরচন্দ্র ইহাতে মর্ষাহত হইয়া সাক্ষণ ক্রোধে পিতার কাকনপত্রীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় মাতুলালয়ে আসিলেন এবং এখানে থাকিয়া ইংরাজি বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন । ঈশ্বর গুপ্ত অল্পকবি । বাল্যকালে বধন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাপুত্র মহেন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতি পার্শ্বী পড়িতেন, ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাঁহাদের মুখে সেখ সাদী প্রভৃতি কবিতার অর্থ শুনিয়া বাজলার পদ্য রচনা করিতেন । তাঁহার জ্যেষ্ঠতাপুত্র মহেন্দ্রচন্দ্র বাল্যকাল হইতে কবিতা রচনা করিতেন এবং তিনিও একজন ছকবি ছিলেন । একদিন ঈশ্বরচন্দ্র কোড়ক করিয়া তাঁহাকে বলেন, “দাদা লেজ লুকালে কেন,” তাহাতে মহেন্দ্রচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন—

“ওরে ছই ভায়ের ছই থাকলে লেজ, থাকত না সংসার ।

একে তোমার লেজে গেছে মলে, সোণার লকা ছার খার ॥”

বাহাইউক তাঁহাদের ছই ভাইয়ে বেশ সম্প্রীতি ছিল । ঈশ্বরচন্দ্রের বন্ধভাষা ও সংস্কৃতানুরাগ তাঁহার ইংরাজী শিক্ষার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় । সুতরাং তিনি ইংরাজি পরিত্যাগ করিয়া মাতৃভাষা অনুশীলনে মনোযোগী হইলেন । ১৫ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে গুপ্তিপাড়া নিবাসী পৌরহরি মন্ডিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় । দুর্গামণি, রূপে সুসজ্জিত ও নিতান্ত নির্ভীক ছিলেন, একারণে স্বামীর সহিত জীবনে একদিনও তাঁহার মিলন হয় নাই ।

পাণ্ডুরিয়াটার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহনের সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল । ইহার সাহায্যে ১২৩৭ সালে ১৬ই মাঘ ঈশ্বরচন্দ্র “সংবাদ প্রভাকর” নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন, কিন্তু ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইলে ‘প্রভাকর’ উঠিয়া যায় । অনন্তর ১২৪২ সালের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ বৃধবার হইতে তিনি কানাইলাল ঠাকুরের সাহায্যে পুনরায় প্রভাকর বাহির করিতে আরম্ভ করেন । ১২৪৫ সালের ১লা আষাঢ় হইতে ‘প্রভাকর’ দৈনিকরূপে বাহির হয় । ইহাই বন্ধভাষার সর্বপ্রথম দৈনিক পত্রিকা ।

১২৫০ সালের ৭ই আষাঢ় তিনি “পাখণ্ড-পীড়ন” নামে একখানি পত্র প্রকাশ করেন । এই সময় “ভাস্কর” সম্পাদক সৌরীশচন্দ্র তর্কবাগীশ (ওড় গুড় ভট্টাচার্য্য) “রসরাশি” নামে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কবিতাবুদ্ধি প্রবৃত্ত হন । ঈশ্বরও পাখণ্ডপীড়নে তার প্রতিবাদ করিতে থাকিলে

বতদিন ধরিয়া বহু সুসঙ্গীত রচনা প্রকাশিত হয়। উহা তখনকার সমাজে একটি আয়োজনের বিষয় হইয়াছিল, কিন্তু শীঘ্রই পত্র স্থানি উঠিয়া যায়। অন্তঃপত্র ১২৫৪ সালে জৈশ্বর গুপ্ত “সাদুরঞ্জন” নামে আর একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। ইহাতে বঙ্গরচন প্রভৃতি তাঁহার ছাত্রপণ্ডের কবিতা প্রকাশিত হইতে থাকে। ১২৫০ সালের ১লা বৈশাখ হইতে তিনি একখানি বৃহৎ কলেবর মাসিক ‘প্রভাকর’ বাহির করেন। ইহাতে অধিকাংশই তাঁহার স্বরচিত কবিতা প্রকাশিত হইত। ১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখের ‘প্রভাকরে’ তিনি ‘প্রবোধ প্রভাকর’ নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে থাকেন। উহা ১লা ভাদ্র শেষ হয়। পরে “হিত প্রভাকর” ও “বোধেন্দু বিকাশ” শেষ করেন। তিনি দশ বংশের কাল বঙ্গদেশের বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া বহুকষ্টে রামপ্রসাদ সেন, রাম বহু, রামনিধি সেন (নিধুবাহু), হর ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, লক্ষীকান্ত বহু, সুসিংহ প্রভৃতি বহুখ্যাতনামা প্রাচীন বঙ্গ কবির জীবনচরিত, গীত ও পদাবলী প্রকাশ করেন। পরে ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ ভারতচন্দ্রের জীবনী ও অনেক সুপ্ত পদাবলী প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অসংখ্য ব্যঙ্গ কবিতা ও কুত্র হুড়া প্রভৃতি রচনা করিয়া বহুভাবকে সম্বন্ধিক গৌরবাভিত করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন কবির কাব্য ও জীবনচরিত প্রকাশে তিনিই প্রথম পথ-প্রদর্শক। এই গুরু উদ্যোগী পুরুষ তাঁহার বঙ্গেশ্বর কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বিদ্বান, কি বৃদ্ধ সকলের কল্লুক সমভাবে সম্মানিত হইয়া ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ স্বর্গে গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অনুল্ল রামচন্দ্র ‘প্রভাকরের’ সম্পাদক হইলেন। তখন প্রাক্তন মহেশচন্দ্র মুখ্য করিয়া লেখেন :—

“সাত বেড়াতে জড় হ’রে নষ্ট করলে প্রভাকর।

অল্পে কলম ধরেনিক রাম হ’লেন এডিটর।

আখা পাছা বাদ দিয়ে শ্যাম হলেন কমেণ্ডার”।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার ।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপ্রসাদ মদনমোহন জন্ম গ্রহণ করেন।

করেন। তাঁহার পিতা রামধন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের এক জন পুস্তকলেখক ছিলেন। মদনমোহন অল্প বয়সেই পিতৃহীন হন এবং এখানে স্বগ্রামের চট্টোপাধ্যায়ের কিছু ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ করিয়া ১৮৪২ খ্রষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ইংরাজীতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে এক কলেজে অধ্যয়ননিরত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে। তিনি পাঠ্যাবসাতেই “রঙ্গ-তরঙ্গিনী” ও “বাসবদত্তা” নামে দুই খানি মূল্যবান পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার এইরূপ অসাধারণ কবিত্বশক্তি দেখিয়া অরগোপাল তর্কালঙ্কারপ্রমুখ অধ্যাপকমণ্ডলী তাঁহাকে কাব্যরসিকের উপাধি দেন, পরে তিনি বহুগুণ কর্তৃক তর্কালঙ্কার উপাধিভূষিত হইলেন। পাঠ সমাপন করিয়া তিনি বধাক্রমে বারাসাত, কলিকাতা কোর্টউইলিয়ম কলেজে ও কৃকনগর কলেজে অধ্যাপনা করিয়া পরিশেষে ১৮৪৭ খ্রষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যাধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই সময় তিনি কতিপয় দেশহিতকর কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি কলিকাতার ‘সংস্কৃত যন্ত্র’ নামে মুদ্রাবন্ত্র স্থাপন করিয়া বহু প্রাচীন অনেক বাহুল্য ও সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। এই কালে শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ জে, ই, ডি, বেথুন সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। প্রধানতঃ তাঁহারই সাহায্যে ও পরামর্শে বেথুন সাহেব, হেহুয়ার ধারে বাহুল্যী বালিকাগণের শিক্ষার্থে বেথুন কলেজ স্থাপনা করেন। মদনমোহন মহানীকরণ তন্ত্র হইতে “কন্ধ্যাপেবং পালনীয়া, শিকনীয়াতি যত্নতঃ” বচন উদ্ধৃত করিয়া সাধারণকে বালিকাবিদ্যালয়স্থানী করিতে প্রয়াস পান এবং সমাজের ভ্রষ্টতা অবহেলা করিয়া প্রথমেই আপনায় দুই কন্যাকে এই বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। এই সময় তিনি বালিকাগণের পাঠোপযোগী গ্রন্থের অভাব অনুভব করিয়া প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ “শিশুশিক্ষা” পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং “সর্ব স্তম্ভকরী” নামী এক খানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন।

১৮৫০ খ্রষ্টাব্দে তিনি মুরসিদাবাদের অল্প পন্ডিতের সহ প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করেন এবং ছয় বৎসর এই কার্যে ব্যাকিয়া পরে এই স্থানেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইলেন। অকস্মৎ ১৮৫৮ খ্রষ্টাব্দে বিহুচিকা রোগে তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে।

মদনমোহন তাঁহার হৃদয় রচনা ও অসাধারণ মানসিক বলে বহু বিষয়ে বাঙ্গালী ভাষায় ও বাঙ্গালী জাতির উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সকলের অনু-
করণীয়। বাঙ্গালী কবিতা রচনা বিষয়ে রায়গুণাকর তারতম্যকে পরাজিত
করিবেন, এইরূপ আশঙ্কা পূর্বক তিনি কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু
তত্নুর পারক না হইলেও তাঁহার কবিতাও যে অতিশয় মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী,
সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। “রস ভরদ্বিজী” তাঁহার প্রথম রচনা, বাসব-
দত্তার পয়ারে বঙ্গানুবাদ তাঁহার দ্বিতীয় উদ্যম। অতঃপর তিনি “শিশুশিক্ষা”
সকলন করেন। প্রথমভাগের শেষে অসংখ্য হলধৰ্মে তিনি যে সরল ও সুমধুর
কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা অনুগম্যের। তাঁহার সেই মূলনিত কবিতাটী
বাঙ্গালীর কেনা জানে ?

“পাখিসব করে রব রাতি গোহাইল
কাননে হুমুকলি সকলি কুটিল।” ইত্যাদি।

শ্রামাচরণ সরকার।

শ্রামাচরণ নদীয়া জেলার অন্তর্গত মামজোরান গ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণবংশীয়
হরনারায়ণ সরকারের পুত্র। অল্প বয়সে শিষ্টিবিরোগ হইলে শ্রামাচরণের ছদ্মনি
মাতা বহুদিন পর্যন্ত তাঁহাকে গ্রাম্য পাঠশালার বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন।
এই সময়ে তাঁহাদের এক আত্মীয় কৃপাপরবশ হইয়া এবং শ্রামাচরণের বিদ্যা-
শিক্ষার আশ্রয় দেখিয়া কৃষ্ণনগরের বীর ভবনে রাখিয়া পার্শ্ব শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া
দেন। ঐহার বাটতে তিনি থাকিতেন, তাঁহার হাট বাজারাদি ভৃত্যোচিত সমস্ত
কার্যই তাঁহাকে করিতে হইত; সুতরাং অবসর মতে পাঠ্য পুস্তকাদি গ্রহণে
লিখিয়া তাহাই পাঠ করিয়া বহু কষ্টে উচ্চ ভাষা শিক্ষা করেন। এই সময় তাঁহার
টাকার নিত্য প্রয়োজন হওয়ার তিনি রীড সাহেব নামক এক জমিদারের
সেবস্তায় ১০ টাকা বেতনে এক কর্ণে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু নানা কারণে
ঐ প্রভুই তিনি এ চাকরী পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহার সহিত প্রসিদ্ধ
রামতল্লু লাহিড়ী মতাপরের আলাপ হয়। তাঁহারই পরামর্শে শ্রামাচরণ কলিকাতার
আগমন করেন এবং রামতল্লু বাবুর বাগার থাকিয়া ইংরাজি অধ্যয়নে মন দেন।

ঐ সময়ে তাঁহার বয়স ২০ বৎসর। এই বয়সে অদম্য উৎসাহে দিবা রাত্রি পরিভ্রম করিয়া তিনি ইংরাজী ভাষার ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি প্রত্যহ বিকালে গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন এবং কোন সাহেবের সহিত আলাপ হইলে যদ্যপি তিনি বাঙ্গালা ভাষা শিখিবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে স্বয়ং সে ভাষা শ্রবণ করিতেন। এইরূপে বহু সাহেবের সহিত তাঁহার আলাপ হয় এবং কিছু উপার্জনও হইতে থাকে। এই সময়ে বড় লাট সাহেবের কোমিসলের মেম্বার সার চার্লস ট্রিভিলিয়ন সাহেব ইংরাজী, বাঙ্গালা, উর্দুতে একখানি সূত্র অভিধান প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন। এই উপলক্ষে ভ্রামচরণের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং সাহেব তাঁহাকেই একাধারে ভ্রামচরণ করেন। এই সময় তিনি কয়েকখানি উর্দু গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। উক্ত সাহেব তাঁহার এই সকল কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কলিকাতা মাদ্রাসার একটী চাকরী করিয়া দেন। এখানে থাকিতে থাকিতে তিনি ফ্রেন্স, ল্যাটিন, গ্রীক, ইটালি প্রভৃতি নানা ভাষার ব্যাকরণ মুখস্থ করেন। এইরূপে ত্রিশবৎসর বয়সের পূর্বেই ভ্রামচরণ বহুভাষাবিদ হইয়া উঠেন। এই সময় ঐশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডাক্তার হর্নাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর সহিত তাঁহার সৌজন্য আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগ্রহে তিনি সংস্কৃত অধ্যয়নে রত হইলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে ঐ ভাষা আয়ত্ত করিয়া লইয়া সংস্কৃত কলেজে দ্বিতীয় শিককের পদে নিযুক্ত হইলেন। এখান হইতে তিনি সদর দেওয়ানীতে পেশকারের পদে নিযুক্ত হন। পরে ঐ আদালতে উকিল হইবার অল্প প্রার্থনা করেন। এই সময়ে উক্ত আদালতে তর্জমা দপ্তরের বরী হইলে অল্পকাল তাঁহাকেই ৪০০ টাকা মাহিয়ানার প্রধান অনুবাদক নিযুক্ত করেন। পরে কয়েক বৎসর দফতার সহিত উক্ত কার্য করিলে তিনি ৬০০ টাকা বেতনে হুজুর কোর্টের ইনটার প্রেটার অর্থাৎ দ্বিতাবী নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি অকাতরে পরিভ্রম করিয়া হিন্দু ও মুসলমানগণের ব্যবহার আইন অধ্যয়ন করেন; এবং পরে ইংরাজীতেও বাঙ্গালার দারভাদারদ্বারা এক সুহৃৎ “ব্যবহারের সংগ্রহ” নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। অল্প দিনেই উক্ত গ্রন্থ বাঙ্গালার ও বিলাতে প্রামাণিক ‘গ্রন্থ বলিয়া গণ্য’ হয়। এই গ্রন্থের প্রসারে উৎসাহ পাইয়া তিনি মিডাক্সারদ্বারা ব্যবহৃত চক্রিকা নামক পুস্তক রচনা করেন। পরে মুসলমানগণের মিসিক উক্তরূপ

দ্রষ্ট রচনা করেন। বাচ্চালা ভাষার আইনের গ্রন্থরচনার তিনিই প্রথম পথ-প্রদর্শক। এই সময়ে তাঁহার ভাষা ভঙ্গ হইয়া যায় এবং সাধারণের উপকারের নিমিত্ত ব্রজোষে একটী কূল, দুইটী রাক্ষ, দুইটী কূপ, ও একটী অতিথিশালা স্থাপন করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় C. I. E.

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি-এল।

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী গোদামী-চূর্ণাপুরে ১৮৪৫ খ্রঃ ৩১শে অক্টোবর তারিখে রাধিকাবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আনন্দ চরণ মুখোপাধ্যায় এক নীলকুঠীতে কর্ম করিতেন এবং তৎসূত্রে বহু অর্থ উপার্জন করিলেও অসাধারণ দাতা বিধায় মৃত্যুকালে কিছুই রাধিরা বাইতে পারেন নাই। তাঁহার দুই পুত্র; প্রথম রায় রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর C. I. E. এবং কনিষ্ঠ রাজকৃষ্ণ। পিতার মৃত্যুতে দুই ভাই কষ্টে পড়িলেও লেখা পড়ার একদিনও কেহ অমনোযোগী হয়েন নাই। জ্যেষ্ঠ রাধিকাপ্রসন্ন প্রশংসার সহিত “জুনিয়ার” “সিনিয়ার” পাশ করিয়া পরে দ্বীপ অসাধারণ গুণে বঙ্গবিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত হইলেন। এই কালে তিনি বঙ্গভাষার বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া বশবী হইলেন। বহুদিন উক্তপদে অবস্থান করিয়া পরিশেষে কিছুদিন স্পেশাল পেন্সন ভোগ করিয়া এবং পর্বমেষ্ট কর্তৃক C. I. E. উপাধি ভূষিত হইয়া চারিটী উপযুক্ত পুত্র রাধিরা বৃদ্ধ বয়সে বর্গে গমন করেন।

কনিষ্ঠ রাজকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠের বন্ধে অক্লান্ত থাকিয়া একে একে F. A., B. A., M. A., ও B. L. পরীক্ষার অতি যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে কলিকাতার আসিয়া প্রভূত অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত, ফারসী, জার্মানি, উর্দু, হিন্দি, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। এইরূপে সর্ববিদ্যা-বিপ্লব হইয়া তিনি ক্রমান্বয়ে জেনারেল এসেম্বলিক কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কটক কলেজ, বহরমপুর কলেজ প্রভৃতিতে অধ্যাপনা কার্য করেন। পরে কিছু দিন কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিয়া পরিশেষে ১৮৭৯ খ্রঃ অব্দে বাচ্চালা পর্বমেষ্ট কর্তৃক ৭০০ টাকা বেতনে অনুবাদকের কার্যে নিযুক্ত হইলেন। তিনিই পর্বমেষ্টের প্রথম বাচ্চালা-অনুবাদক। তিনি কার্যোপলক্ষে বহু স্থানে

অবস্থিতি করিলে এবং শত কার্যে ব্যস্ত থাকিলেও চিরদিনই মাতৃভাষার সেবার নিযুক্ত ও অমুরক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রস্তুত বৌবনউদ্যান, মিত্রবিলাপ, কাব্য-কলাপ, রাজবালা, রাজ্যালার ইতিহাস, রাজালা এলজিবর, কবিতামালা এবং নানা প্রবন্ধ প্রভৃতি পুস্তকাবলী বাঙ্গালীর মনে চিরদিন তাঁহার নাম জাগরুক রাখিবে। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সাতিশর আনুমানিক দৃষ্ট হইত।* ১৮৮৬ খ্রঃ অব্দের ১০ই অক্টোবর তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অক্ষয়কুমার দত্ত ।

নবদ্বীপ মণ্ডলাভ্যন্তরগত চুপী নামক গ্রামে ১২২৭ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ শনিবার দিনে অক্ষয়কুমার জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পিতাম্বর, মাতা দয়াময়ী, অক্ষয়কুমারের প্রথম শিক্ষা চুপী গ্রামেই আরম্ভ হয়; পরে ১০ বৎসর বয়সে খিদিরপুর আসিফা কলিকাতা গৌরমোহন আচ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারি নামক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ার অর্ধাভাবে তাঁহাকে স্কুল পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু অসীম অধ্যবসায়ী অক্ষয়কুমার এক দিনের অভাবও পাঠে বিরত হইলেন না। বরং অত্যধিক পরিশ্রম সহকারে গৃহে থাকিয়াই ইংরাজী, অর্ধাৎ, ফরাসী প্রভৃতি ভাষাপাঠে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে হুপ্রসিদ্ধ ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তাঁহারই অনুরোধক্রমে অক্ষয়কুমার “প্রভাকরে” প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৭৬২ শকে কলিকাতার “তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা” প্রতিষ্ঠিত হয়, অক্ষয়কুমার

* লক্ষণ সেন সত্বে যে অধ্যাপি টিরহটে প্রচলিত আছে, এ বিষয় তিনিই আবিষ্কার করেন। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ H. Beveridge সাহেব ১৮৮৮ সনের জুলাই মাসের Calcutta Review পত্রে ৪৪ পাত্রে এইরূপ লিখিয়াছেন।

It is pleasant to be able to record that the natives of India no longer neglects the study of history. The venerable Dr. Rajendra Lal Mitra has devoted a lifetime to historical and Philological inquiries and it was another Bengali, Babu Raj Krishna Mukherjee who discovered that the Lachman Sen Era is still current in Tirhoot.

† যদিও চুপী গ্রাম বর্তমান জেলার অন্তর্গত বটে, কিন্তু উহা নবদ্বীপ গ্রামের নিকট সম্মিলিত হওয়ার অক্ষয়কুমারের জীবনের উপর কলিকাতার প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ইহাতে আট টাকা মাহিনার ভূগোলনিকক নিযুক্ত করেন। ১৮৬৫ শকে শুভ-
বোধিনী পত্রিকা প্রচারিত হয়—অক্ষরজ্ঞান ইহার সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইলেন
এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে দ্বাবশ বৎসর কাল তিনি উহা যোগ্যতা সহকারে সম্পাদন
করেন। এই কালেই তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি সবধিক আগ্রহবান হইলেন;
১২১০ সালের আষাঢ় মাসে একদিন উপাসনা কালে তিনি অকস্মাৎ মুচ্ছিত হইয়া
পড়েন, ইহাই তাঁহার নিদ্রারূপ শিরশীকার নিদান। ১২১৩ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ
৩৬ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার লিখিত পুস্তক
সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ :—“বাতবস্ত্র
সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার”, চারুপাঠ প্রথম ভাগ, চারুপাঠ দ্বিতীয়
ভাগ, চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ, পদার্থ বিদ্যা, বর্ষনীতি। ভারতবর্ষীয় উপাসক
সম্প্রদায় প্রথম ভাগ এবং ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় দ্বিতীয় ভাগ—ইহাই
তাঁহার সর্বশেষ গ্রন্থ।

দীনবন্ধু মিত্র।

নদীয়া কাঁচকাপাড়ার কয়েক ক্রোশ দূরবর্তী চৌবেড়িয়া গ্রামে ১২০৬ সালে
দীনবন্ধু জন্ম গ্রহণ করেন। এই চৌবেড়িয়া পূর্বে বহু সমৃদ্ধ নগরী ছিল
এবং চতুর্দিক হুগু নামে খ্যাত ছিল। দীনবন্ধুর মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই
গ্রাম নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল, এক্ষণে ইহা বশোহরের এলেকাদীন হইয়াছে।
দীনবন্ধু আপনাকে নদীয়াবাসী বলিয়া সর্বদা গৌরব অনুভব করিতেন।
কলিকাতার থাকিয়াই দীনবন্ধু লেখা পড়া নির্বাহাছিলেন। ১৮৫৫ খ্রষ্টাব্দে তিনি
কলেজ ছাড়িয়া দেহশত টাকা বেতনে পাটনার পোটমাস্টার পদে নিযুক্ত হইলেন।
পরে এই পোটমাস্টার পদেই তিনি সবিশেষ উন্নতি লাভ করেন। এই
উপলক্ষে তাঁহাকে সর্বদা অকস্মলের লানা হাব পরিলক্ষণ করিতে হইত; এইরূপে
তিনি নতুনচরিত্র পার্টির সুখোপ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কলে তাঁহার অতুল-
নীয় ব্যতিক সকলের বন্ধি হয়। কার্যোপলক্ষে তিনি উড়িষ্যা হইতে নদীয়ায়,
পরে নদীয়া হইতে ঢাকায় প্রেরিত হইলেন; এই সময়ে নীলের হাঙ্গামা উপস্থিত

হর, এবং দীনবন্ধু তাঁহার সৰ্ব্বপ্রধান নাটক “নীলদর্শন” প্রণয়ন করেন । তাহার পর “নবীন তপস্বিনী”, “বিদে পাগলা বুড়ো”, “সধবার একাদশী” পরে “লীলাবতী” । অতঃপর “সুপ্রভা কাব্য”, এবং “জামাই বারিক”, লিখিত হর ও দাদণ কবিতা প্রকাশিত হয় । “কমলেকামিনী” দীনবন্ধুর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বাহির হইয়াছিল । “সমাগরে জীরঙ্গ নাহুব”, “পোড়া মহেশ্বর”; “কুড়ে গরুর ভিন্ন গোষ্ঠ” এবং “গুপ্ত সংগ্রহ” নামে আর কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থও তিনি রচনা করেন । দীনবন্ধু বড়ই পরিচাস রসিক, খোস খেয়ালী ও সমানন্দ পুরুষ ছিলেন । পরিহাসের অবসর পাইলে তাহার সম্বাদহার তিনি সর্বদাই করিতেন । তাঁহার লেখাতে তাঁহার চরিত্রের পরিচাস প্রিয়তা পূর্ণভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই স্তণেই তাঁহার রচিত নাটক সকল সাকল্য লাভ করিয়াছে । দীনবন্ধুর অতিশয়দয় বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—“দীনবন্ধুর অনেক গুলি গ্রন্থ প্রকৃত ঘটনামূলক এবং অনেক জীবিত ব্যক্তির চরিত্র তাঁহার প্রণীত চরিত্রে অমূল্য হইয়াছে । “সধবার একাদশীর” প্রায় সকল নায়ক নায়িকাগুলিই জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি, তদ্বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে কিরদংশ প্রকৃত ঘটনা । “জামাই বারিকের” দুই জীর বৃত্তান্ত প্রকৃত । “বিদে পাগলা বুড়ো” জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল । প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তির চরিত্র, প্রাচীন উপন্যাস, ইংরাজী গ্রন্থ প্রচলিত খোস গল্প হইতে সার সংগ্রহ করিয়া দীনবন্ধু তাঁহার অপূর্ব চিত্ররঞ্জক নাটক সকলের সৃষ্টি করিতেন । “নবীন তপস্বিনী”তে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । রাজা ‘রমণীমোহনের’ বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত । “হোদল-কুৎসিত” ব্যাপার প্রাচীন উপন্যাসমূলক । “জলধর” “জগদবা” “মেরী ওরাইতল অফ উইণ্ডগর” হইতে নীত ।”

১৮৭০ খৃঃাব্দে দীনবন্ধু কলিকাতার সুপার নিউমারি ইনস্পেকটিং পোষ্ট-মাষ্টার পদে নিযুক্ত হইলেন, পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের সাহায্য করাই এ পদের কার্য । ১৮৭১ সালেইনি বুকের ডাকের বন্দোবস্ত করিতে কাজাড় গমন করেন এবং তথায় অতি দক্ষতার সহিত কার্য সম্পাদন করার তিনি গভর্নমেন্ট কর্তৃক “রায় বাহাদুর” উপাধি ভূষিত হইলেন । এই সময়ে কোনক কারণে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ও ডিরেক্টর জেনারেলের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত

হয়, দীনবন্ধু পোষ্টে ম'ষ্টার জেনারেলের পক্ষ অবলম্বন করেন, ফলে তাঁহাকে পোষ্ট বিভাগ ছাড়িয়া কাৰ্য্যান্তরে নিযুক্ত হইতে হয়। এই সময়ে তাঁহার বহুমুখ রোগ দেখা দেয় এবং তাহারই ফলে ১২৮০ সালের আশ্বিন মাসে তিনি কৃতনিশ্চয় করেকটী পুত্র রা'খরা স্বর্গারোহণ করেন। পিতার উপযুক্ত পুত্র শ্রীমলিতমোহন মিত্রও একজন শুলেপক। নীলফামার চাঁরাজী ইতিহাস লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছেন, ইঁহারা এখন কলিকাতাবাসী।

জগদীশ্বর গুপ্ত ।

জগদীশ্বর গুপ্ত কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সটীক “চৈতন্য চরিতামৃত” “লীলাসুন্দর” এবং “চৈতন্য লীলামৃত” প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থমালার সঙ্গলিতা ও প্রণেতা। এতদ্ব্যতীত ইঁহার লিখিত বহু গবেষণ পূর্ণ এবং সাময়িক সাহিত্যে দৃষ্ট হয়।

১২৫২ সালের ভাদ্র মাসে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি মেহেরপুর গ্রামে মাতুলালয়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। মেহেরপুরের বিখ্যাত মন্দির বংশই ইঁহার মাতুলালয়। জগদীশ কৃষ্ণনগরে থাকিয়াই বিজ্ঞাত্যাস করিতেন এবং আপনায় মেধা প্রভাবে প্রবেশিকা হইতে বি, এল পর্যন্ত পরীক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করেন এবং প্রবেশিকার চৌদ্দ ও এল, এ, পরীক্ষার ২৫ টাকা বৃত্তি পান। কিছুদিন দিনাজপুরে ওকালতী কবিয়া তিনি মুন্সেফী পদ গ্রহণ করেন এবং এতদ্ব্যপেক্ষে মেদিনীপুর, নীলফামারী, রাঁচি, বাঁকুড়া, কাজপুর, কাটোয়া, বশোহর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি বহুস্থানে অধ্যয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থ ও দর্শনীয় স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৯২ সালের ৮ই জুলাই বহু রোগে কলিকাতায় প্রাপত্য প করেন।

কালীময় ঘটক ।

“চরিতাষ্টক” প্রণেতা পণ্ডিত কালীময় ১২৯১ সালের কোম্পাগর বার্ষিকে রাণাঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নাম চন্দ্রশেখর তর্কসিদ্ধান্ত ইঁহাদের স্থানল উপাধি বন্দোপাধায়। পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া

কালীময় পিতা, পিতামহের জায়গা পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার যেমন প্রগাঢ় অধ্যয়ন হুইত, তেমনই নন্দীয়াস্কুলে পাঠ্যভিত্তিক বঙ্গ ভাষার প্রতিও তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। তাঁহার প্রথম চাকরী নদীয়াস্বর্গত ভালুক গ্রামের বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে, পরে তথা হইতে বর্তমানের অন্তঃপাতি বেলেড়া গ্রামে বঙ্গবিদ্যালয়ে আগমন করেন। তথা হইতে নিজগ্রাম রাণাঘাটে আসিয়া রাণাঘাটবাসী জনসাধারণের সাহায্যে একটা বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্বয়ং তাহার প্রধান পণ্ডিত হইলেন। এই বঙ্গবিদ্যালয়টা পরে রাণাঘাটের ইংরাজি বিদ্যালয়ের সহিত এক হইয়া যায় এবং কালীময় ইংরাজি স্কুলের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি বহু পরিচ্রমে, স্বয়ং বহু স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দুইভাগ চরিতাষ্টক রচনা করেন। বাঙ্গলা ভাষার স্বল্পপাঠ্যরূপে এক্ষণে স্বদেশী লোকের জীবনচরিতপ্রকাশ এই প্রথম; সে কারণে ইহা টেক্সট বুক কমিটী কর্তৃক পাঠ্যরূপে নির্দ্বিধিত হইয়াছে। এই চরিতাষ্টক ব্যতীত তাঁহার “ছিন্নমস্তক” “শরঙ্গী” “ইংরাজী ফলাহারের বাঙ্গালী চাট” নামে কয়েকখানি উপন্যাস ও “পদ্যময়”, “মেলা”, “স্ববিলাপ”, “কৃষিক্ষেত্র”, “কৃষিপ্রবেশ” প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও কতিপয় পুস্তক হুইত হয়। সন ১৩০৭ সালে ৬০ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

জগদীশ চন্দ্র নাহিড়ী ।

সন ১২৬৫ সালের ২৩শে কার্তিক তারিখে শান্তিপুরে মাতুলপ্রায়ে জগদীশ চন্দ্র নাহিড়ী জন্ম গ্রহণ করেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিবনিবাস টেকমন্ডল গ্রামিকট মাজদিয়া গ্রাম জগদীশের পৈতৃক নিবাস। জগদীশের পিতার নাম উমাচরণ, তাঁহার তিনটা পুত্র, দুইটা কন্যা, জগদীশ পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া জগদীশ তাঁহার পিতামহী কর্তৃক প্রতিপালিত হইলেন। পঠকলাতেই জগদীশের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতি অধুয়ান স্থাপিত হয়। সে কারণে ১৮৭৯ অব্দে ফাট’ আর্টস্ স্কুলকার উত্তীর্ণ হইয়া জগদীশ মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় অন্তীর্ণ হইলেন। বাঙ্গলা দেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রচার ব্যক্তি

তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি বেরুগ কঠোর পরিচর্যা করিয়াছিলেন ও অকাতরে অর্থ ও সময় ক্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকটই অস্বীকার্য। সয়ল বাঙ্গলায় হোমিওপ্যাথিকসংক্রান্ত পুস্তক রচনার তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শক। তাহার লিখিত পুস্তকগুলির নাম হইতেই তাহার সমস্ত সত্ত্ব পরিষ্কৃত হইবে যথা—(১) হোমিওপ্যাথি মতে গৃহ চিকিৎসা। (২) হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে আশঙ্কি বণ্ডন, (৩) ওলাউঠা চিকিৎসা, (৪) নরশরীর-তত্ত্ব, (৫) ক্ষয়চিকিৎসা, (৬) চিকিৎসাতত্ত্ব, (৭) তৈবজ্যাতত্ত্ব, (৮) সূক্ষ্ম চিকিৎসা বা “প্রোকটিস অক মেডিসিন”, এই সকল পুস্তক ব্যতীত তিনি “হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক” নামে একখানি বাঙ্গলা মাসিক পত্র ও “ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ড” নামক একখানি ইংরাজি মাসিক পত্র সম্পাদন করিতেন। কেবল হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া ও সাময়িক পত্র বাহির করিয়া তিনি কাত ছিলেন না, পরন্তু বাহাতে দেশে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের অভাব দূরীভূত হয়, সে কারণে একটী স্কুল ও হোমিওপ্যাথি বিদ্যুত ঔষধ প্রাপ্তির সুবিধার জন্য “লাইফী এণ্ড কোম্পানি” নাম দিয়া কলিকাতায় একটা হোমিওপ্যাথি ঔষধালয় স্থাপন করেন। এই ঔষধালয় এখনও কলিকাতার মধ্যে একটা উৎকৃষ্ট ঔষধালয় এবং তারতবর্ষের নানা স্থানে ইহার শাখা স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বহুল প্রচারে বাহারা চেষ্টা করিয়াছেন, জননীশের নাম তাহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর এই কর্ণ-বীরের লোকান্তর হইয়াছে।

বহুনাথ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গভাষার চিকিৎসাসম্বন্ধীয় পুস্তক লিখিয়া বাহারা বশবী হইয়াছেন। ডাক্তার বহুনাথ তাহাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট গুণবান ব্যক্তি। ১২৪৬ সালে ৩৭শাব্দিপূরে বাহুল্যক্রমে ডাক্তার বহুনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কালীদাস মুখোপাধ্যায়, নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত (সম্প্রতি যশোহর জেলার) বরিশপুর। পিতার বয়ে বহুনাথ জন্মে ক্রমে জুনিয়ার স্কলারশিপ প্রাপ্ত

উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যখন বহু সম্মানে মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং রাণাধিপাধ্যায় সমধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। রাণাধাটাই যখনাথের প্রথম কর্মক্ষেত্র এবং এই স্থানেই তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ বাত্বীশিকা রচনা করেন। ১২৭৬ সালে যখনাথ রাণাধাট ত্যাগ করিয়া চুঁচুড়ায় গমন করেন, এবং ৬ ভূদেব সুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার, ৬ রামগতি স্তায়রস্ব ৬ বসন্ত চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনোবি গণের সহিত পরিচিত হইলেন। এইখানে তিনি চুঁচুড়া নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষার্থীদের জন্য “উদ্ভিদ বিচার নামক” গ্রন্থ রচনা করেন। এবং ইহার পর ভূদেব বাবুর অনুরোধে “শরীর পালন” নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক রচনা করেন ইহা বহুদিন বিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল। তৎকালে চিকিৎসা বিষয়ক কোনও সাময়িক পত্র না থাকায় যখনাথ “চিকিৎসা পত্র” নাম দিয়া একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন, কিন্তু বহুদিন এ পত্র প্রকাশিত হয় নাই। ইহার পর “চিকিৎসা কলকাতা” নাম দিয়া একখানি সুবহু পুস্তকের আয়োজন করেন, কিন্তু নানা কারণে ঐ পুস্তক সম্পূর্ণ হয় নাই। এই সময়ে যদুবাবুর নাম চিকিৎসক মহলে জাহির হইয়াছিল এবং তিনিও চুঁচুড়া ছাড়িয়া কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে আসিয়া তিনি “ইণ্ডিয়ান এম পায়ার” নামে একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন এবং ইহাতে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে ধার্মবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই কালে তিনি অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিগণের শিক্ষা কল্পে “সরল অর চিকিৎসা” নাম দিয়া তিন ভাগে এক সুবহু পুস্তক বাহির করেন। সেই পুস্তকের কল্যাণে আজ এই ম্যালেরিয়া পীড়িত বহুভূমে বহু ভক্ত সম্ভান আপনার জীবিকা সংগ্রহ ও যোগ্য কল্যাণ সাধন করিতেছে। শেষ বয়সে যখনাথ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া জাহার রাণাধাটের বাটীতে বাস করিতে থাকেন পরে ১২৯৫ সালের পর হইতে বরীষপুরে স্থায়ীরূপে বাস করেন, এই স্থানেই ১৩০০ সালের ১২ই চৈত্র তিনি সুভ্রামুখে পতিত হইলেন।



দেওয়ান কার্তিকের চন্দ্র রায়।

ইহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ,—“কিতিশ বংশাবলী চরিত”। এই পুস্তক সংস্কৃত “কিতিশ বংশাবলী চরিতম” নামক পুস্তকের অনূকরণে লিখিত। এই সংস্কৃত পুস্তকখানি এখন অতি দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে ইহা পার্চ সাহেব কর্তৃক ১৮৫২ খঃ অব্দে বালিন নগরীতে ছাপা হইয়াছিল। ১২৭৭ সালের কার্তিক সংক্রান্তিতে কার্তিকের বাবু কৃষ্ণনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাদের বংশ দেওয়ান চক্রবর্তীর বংশ বলিয়া খ্যাত। এই বংশের অনেকেই কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ানের কার্য্য করাই পূর্বোক্ত খ্যাতির কারণ।

কার্তিক বাবু প্রথম বয়সে পার্শী শিক্ষা করেন, পরে বাঙ্গলা, ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষার ব্যুৎপন্ন করেন। ইনি কিছুদিন কলিকাতার মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিদ্যাভাস করেন। পরে রাজা শ্রীশ চন্দ্রের আশ্রয়ে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে কর্ষে নিযুক্ত হইলেন। এইস্থানে থাকিয়া তিনি আপনার আদর্শচরিত্র বলে সামান্য পদ হইতে মাসিক ৩০০ শত টাকা বেতনে সর্বোচ্চ কর্মচারীর পদে উন্নীত হইলেন। তিনি একদিকে যেমন কৃষ্ণনগরের রাজাগণ ও কৃষ্ণনগরবাসীগণ কর্তৃক পূজিত ও আদৃত হইতেন তেমনি গবর্ণমেন্টেও তাঁহার অতীব সম্মান ছিল। “কিতিশবংশাবলী” চরিত্র ব্যতীত আত্মজীবন চরিত্র নামে আপনার জীবনী কথা লইয়া একখানি হুন্দর পুস্তক লিখিয়াছেন এবং গীতমঞ্জরী নামক একখানি সঙ্গীত পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার অন্ত্যস্ত ঔপের মধ্যে তিনি একজন সুপারক ছিলেন, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর ৪টী কৃতী পুত্র রাখিয়া তিনি স্বর্গ গমন করেন। পুত্রগণের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্র বাবু বি এল পাস করিয়া উকিল হইলেন, হুদ্রেজ বাবু নদীয়াধিপতির বর্তমান ম্যানেজার, এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা সুলেখক স্বনাম-প্রসিদ্ধ বিজ্ঞেন্দ্র লাল রায় মহাশয় নিজগুণে দেশ বিখ্যাত হইয়াছেন। এই মহাশয়ের জীবনে আর এক মহাবীৰ্য্যকর মহাপ্রাণের ছায়া হুস্পষ্ট পরিস্কৃত হইয়াছিল তিনি কৃষ্ণনগরের স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রাভঃস্ববন্দীর রামভট্ট শাহিড়ী মহাশয়। ইহার পরামর্শ নিকট সম্পর্কীয়। রামভট্ট ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া আত্ম চরিত্র বলে, আজ প্রাভঃস্ববন্দীর হইয়াছেন। ধারাবাহিক সংকল্পমালা

হার। ইহার সমগ্র জীবন সমুজ্জ্বল । ইনি উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন ১৮১৮ অব্দে ইনি স্বর্ণ গমন করেন । কলিকাতার বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা এস, কে, লাহিড়ী ইহার পুত্র । পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও সুবিখ্যাত লেখাব্রজ সাহেব এই মহাত্মার ২৫শি জীবনচরিত লিখিয়াছেন ।

যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ ।

নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামের সন্নিকটস্থ সুবর্ণপুর গ্রামে সংব্রাহ্মণ কুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন । কলিকাতা সহরেই ইহার শিক্ষালাভ হয় । পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভরত শিরোমণি জয়নারায়ন তর্করত্ন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতির সাহায্যে ইহার শিক্ষা সৌষ্ঠব সম্পন্ন হয় এবং এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । এক দিকে ইংরাজীতে যেমন তিনি বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন তেমনি সংস্কৃত ভাষায় ইহার সবিশেষ দখল ছিল । স্বনামপ্রসিদ্ধ মদন মোহন তর্কালঙ্কারের বিদ্যুৎ কন্ডাই ইহার প্রথমা স্ত্রী । ক্যাথিড্রাল মিসন কলেজে ইনি কিছু কাল সংস্কৃতের অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন । এই সময়েই ইহার ‘আর্য্যদর্শন’ নামক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয় । তদানীন্তন বঙ্গসমাজে আর্য্যদর্শনের সবিশেষ প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হইয়াছিল । ১৮৮০ খ্রষ্টাব্দে ইনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন । এই সময়ে তিনি অবসর কাল পুস্তক রচনায় সমর্পন করেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেন যথা,—(১) গ্যারিবাস্তির জীবনচরিত, (২) ওয়ালেসের জীবন বৃত্ত ; (৩) আশ্বোৎসর্গ ; (৪) জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন বৃত্ত ; (৫) ম্যার্টিনির জীবন বৃত্ত ; (৬) ছন্দোজ্ঞান, (৭) প্রাণোজ্ঞান, (৮) মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবন বৃত্ত, (৯) শান্তি পাগল, (১০) কীর্ত্তিমন্দির ; (১১) সমালোচনা মংলা ; (১২) জ্ঞানসোপান ; (১৩) চিন্তাতরঙ্গিনী । (১৪—১৬) শিকাসোপান ৩ ভাগ ; (১৭—২৪) আইন সংগ্রহ ৮ ভাগ ; (২৫—২৭) জ্ঞানসোপান ৩ ভাগ ইত্যাদি । পুস্তক রচনার অগ্ৰান্ত পরিশ্রমে এবং বকঃস্বরের দ্বিত জল বাষ্পে ভুগিয়া তিনি শীঘ্রই ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন এবং ১৩১১ সালের ৩০ জৈষ্ঠ কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করেন । তিনি তদানীন্তন সমাজের একজন

প্রথম সংস্কাররূপে গণ্য ছিলেন। বর্তমান কালের কলিকাতার অন্ততম সুপ্রসিদ্ধ বিলাত প্রভাণত ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

হরিনাথ মজুমদার।

সাপু হরিনাথ ১২৪০ সালে নদীয়ার কুমারখালি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবেই তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু হয়, একারণে তাঁহার পিতব্য পত্নীই তাঁহাকে লালন পালন করেন। দরিদ্রের সংসারে জন্ম হইলেও পাঠের প্রতি তাঁহার অতিশয় বৃত্ত ছিল। অর্থের অভাবে স্কুলে যথারিতি পাঠ্যভ্যাস তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই বটে কিন্তু তিনি স্বীয় অধ্যবসায় বলে বাঙ্গলা ভাষায় যেরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন তাহা কৃতবিদ্যা অনেকের ভাগ্যেও ঘটে না, তাঁহার লিখিত ফকিরচন্দ ভণিতা যুক্ত সহস্র সহস্র সাধন সঙ্গীত এবং সুবিখ্যাত পুস্তক বিজয়বদন্ত ও পরমার্থপাখা, কবিকল্প, দক্ষযজ্ঞ, বিজয়, অক্লুর সংবাদ, ভাবোচ্ছাস, মাতৃমহিমা, ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রভৃতি তাঁহার প্রকৃষ্ট জ্ঞান ও শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিতেছে। পদ্য রচনায় কবি ঐশ্বর চন্দ্র শুষ্ঠ তাঁহার পথ প্রদর্শক। “সংবাদ প্রভাকরে” তাঁহার বহু প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছিল। ১২৭০ সালে ১লা বৈশাখ “গ্রামবর্তী প্রকাশিতা” নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। প্রথমে ইহা ছিল মাসিক পরে হয় পাক্ষিক পরে সাপ্তাহিক। বাইশ বৎসর কাল এই পত্র চলিয়াছিল। হরি নাথ একদিকে যেমন হুলেধক ছিলেন তেমনি অপর দিকে তত্ত্বদর্শী ও সাধক ছিলেন, তাঁহার সরল উদার ভাব তাঁহাকে “কাজাল” উপাধি দিয়াছিল। ১৩০৩ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে হরিনাথ দেহত্যাগ করেন। তিনি শেষ জীবনে একখানি সুবৃহৎ আত্মচরিত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, উহা এক্ষণে তাঁহার পুত্রের নিকট আছে কিন্তু এখনও ছাপা হয় নাই, তাহাতে কুমার খালির ইতিবৃত্ত, সামাজিক ও ব্যক্তিগত ইতিহাস ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে।

মনমোহন ও লালমোহন ঘোষ ।

ভারতের এই দুইটী উপযুক্ত সন্তানকে বন্ধে ধারণ করিয়া নদীয়া গোঃবাধিত হইয়াছে। ইহাদের পূর্ব পুরুষের নিবাস বিক্রমপুর। ইহাদের পিতা রাম লোচন ঘোষ তদানীন্তন “সদরআলা” পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং তদুপলক্ষে বহুস্থানে চাকুরী করিয়া পরিশেষে কৃষ্ণনগরে স্থায়ী বাসবাটী নির্মান করেন, এবং এখানেই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। রাম লোচন বাবু তদানীন্তন সমাজ সংস্কারকগণের মধ্যে একজন রাজা রাম মোহন রায়ের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। তাঁহার প্রথম পুত্র মনমোহন ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ১৩ই মাঘ ঢাকা ‘বয়রাগাড়ীতে’ জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার অপর দুই পুত্র সুবিখ্যাত লাল মোহন (১৮৪৯ খৃঃ) ও মুরলী মোহন কৃষ্ণনগরের বাটীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মনমোহনের ও লালমোহনের বাঙ্গা শিক্ষা কৃষ্ণনগর কলেজ স্কুলেই সমাহিত হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালীর গৌরব মণি প্রিয়ুত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও মনমোহন একসঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন, এবং পরিশেষে একজন প্রথম সিভিলিয়ন ও একজন প্রথম ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। যদিও জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি একদিনও স্বদেশে আসিয়া এই পথ অবলম্বন করেন নাই, সুতরাং মন মোহনকেই এতদ্বন্দ্বীয়া আদালতে বাঙ্গালীর প্রথম ব্যারিষ্টার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। (নভেম্বর ১৮৬০ খৃঃ) তিনি অচিরকাল মধ্যেই আপনার অনন্ত সাধারণ গুণে নীলুই একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার হইয়া উঠেন। * ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লাল মোহনকে ব্যারিষ্টারির জন্ত বিলাত প্রেরণ করেন, ইনিও আপনার অগ্রজের স্তায় আপনার অসাধারণ মেধা বলে

* মনমোহন ঘোষ মহাশয়ের চলিত বিখ্যাত মর্কদ্দম সমূহের বিবরণ বাবু রাম গোপাল সান্যাল লিখিত History of celebrated criminal cases নামক পুস্তকে ও messrs. Thacker spink & co. কর্তৃক ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Romance of criminal administration of Bengal নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য। এই সকল বিবরণী হইতে তিনি কিরূপ স্বার্থভাগ করিয়া অকুতোভয়ে অত্যাচারী ও ভ্রমপ্রসারণ জন ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ কর্মচারীগণকে কবল হইতে কত দরহু ও অসহায় ব্যক্তিগণকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতেন তাহা জানা যাইবে। কৃষ্ণনগর student's case এও তাঁহার নাম উল্লিখিত করিয়াছিল।

শীত্ৰই সমস্ত পরীক্ষা উত্তীৰ্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যগমন করেন এবং অজকালের মধ্যেই শ্রীৰ অসাধারণ ক্ষমতায় ও বাগ্মীতা প্রভাবে দেশপূজ্য হইয়া উঠেন। তাঁহার দ্বায় বাগ্মী আজ পর্য্যন্ত ভারতে আর জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। সাহিত্য জগতেও তাঁহার স্থান অতি উচ্চে মাইকেল মদুসুদন দত্তের মেঘনাদ বধের ইংরাজি অনুবাদে তাঁহার কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিলাতে পার্লিয়ামেন্টে প্রবেশ লাভে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ছুই ভাতার আন্তরিক বন্ধু ও চেষ্টায় ভারতের জ্ঞানশালা কংগ্রেস আজি সাফল্য লাভ করিয়াছে। মনমোহন নদীয়ার নীলহাঙ্গামাকালে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রজার পক্ষে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন এবং “হরিষের” অকাল মৃত্যুতে হিন্দু পেটিয়ন্টের অবস্থা হানি ঘটিলে মন মোহনই প্রথমে পাব্লিক “ইণ্ডিয়ান মিরর” বাহির করেন (১৮৬১) খৃঃ পরে মাননীয় নরেন্দ্র নাথ সেনের হস্তে ইহা দৈনিকরূপে পরিবর্তিত হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মন মোহন তাঁহার উপযুক্ত পুত্র মহীমোহনকে ১৩বৎসর বয়সে বিলাত লইয়া যান, ইনি এক্ষণে সিবিలిয়ান। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মন-মোহন ষোষ ও ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে লালমোহন পরলোক গমন করিয়াছেন।

পূৰ্ব্বোন্নিধিত গ্রন্থকারগণ ব্যতীত নদীয়ার গ্রন্থকারগণের মধ্যে শ্রীমজাগবত অনুবাদক ভক্তব্যাস কুলোডব লালু নন্দ রায়, মেটেরী গ্রামবাসী রামায়ণ লেখক ৮ রায় মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপুর নিবাসী কোকিলদূত প্রণেতা ৮ হরিমোহন গ্রামাণিক, মেহেরপুর নিবাসী বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী সংগ্রহকার ৮ রমণী মোহন মল্লিক, হরিপুর নিবাসী “চপলা” ও কবিতা গ্রন্থন প্রণেতা ৮ কৈলাস চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শান্তিপুর নিবাসী “বান্ধুদেব বিজয়ম” “প্রভাত স্বপ্নম” প্রণেতা ৮ রায় নাথ তর্করত্ন, কাঁচড়া পাড়ার বৈদ্য নাথ আচার্য্য, প্রেমচাঁদ কবিরত্ন, হরি-মোহন সেন শুপ্ত, মুদগর সম্পাদক ৮ শ্রাম চরণ সান্যাল, শান্তিপুর নিবাসী বৈষ্ণব গ্রন্থকার ৮ মদন গোপাল গোস্বামী ৮ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, কবির গান রচয়িতা বৈষ্ণী নিবাসী ৮ সাতু রায়, রাণাঘাট নিবাসী ৮ জয়গোপাল মুখো-পাধ্যায়, প্রসিদ্ধ যাত্রাকার নবদ্বীপবাসী ৮ মতি লাল রায়, সরল ব্যাকরণ প্রণেতা

‡ ইহাদের বিবৃত জীবনী সকলেরই জানা উচিত সেক্ষত সে বিষয়ের বিভিন্ন পুস্তকাবলী পাঠ করুন।

কৃষ্ণনগরবাসী লোহারাম শিরোমণি, রাণাঘাট বাসী কবি ৮ কালীনাথ মুখোপাধ্যায়, নবোপাধ্যায় নামক, বর্তমান সামাজিক নজর প্রণেতা, রাণাঘাট নিবাসী জমিদার ৮ রাধাময় দে চৌধুরী এবং কর্তৃত্বাদিগের সাধন সম্বন্ধে রচয়িতাদের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমান লব্ধ প্রতীক লেখকগণের মধ্যে কুমারখালি নিবাসী সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতি গ্রন্থলেখক সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, হিমালয়, পথিক প্রভৃতি ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রণেতা, বহুমতীর ও হিতবারি ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন, মেহেরপুর নিবাসী উপজাতি লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশ কুমার রায়, শান্তিপুর নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয় গোপাল গোস্বামী ও তৎপুত্র ব্যঙ্গকবি লেখক শ্রীযুক্ত বেনোয়ারি লাল গোস্বামী, শিবনিবাসী বাসী বঙ্গবাসীর ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবদ্বীপ নিবাসী দক্ষিণাপথ ভ্রমণ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণ নগর নিবাসী হাস্যরসিক কবি শ্রেষ্ঠ নাটককর শ্রীযুক্ত বিজ্ঞেন্দ্র লাল রায়, শ্রীচন্দ্রশেখর কর, আইসমালি নিবাসী বিখ্যাত সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরেশ চন্দ্র সমাজপতি, কুড়ুলগাছী নিবাসী লেখক রায় রাধা নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, উলা (বীরনগর) নিবাসী দার্শনিক লেখক, বেদান্ত দর্শন, স্বষ্টি, অধিকার তত্ত্ব প্রভৃতি প্রণেতা শ্রী চন্দ্র শেখর বসু, তত্ত্ব কবি স্বরূপ গঙ্গা নিবাসী শ্রীকেশব নাথ ভক্তি বিনোদ ও তৎপুত্র জ্যোতিষী বিমলা প্রসাদ ভক্তি সিকান্দ, ভাঙ্গনঘাট নিবাসী ‘দাবানল’ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা ডাক্তার শ্রীহরেন্দ্র নাথ গোস্বামী, রাণাঘাট নিবাসী ‘বেলা’ ‘পরিমল’ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা লুকাবি গিরিজা নাথ মুখোপাধ্যায়, বাগাচড়া নিবাসী “ভূতের খেলা”, “বদেশরেণু” প্রভৃতি লেখক শ্রীচণ্ডী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপুর নিবাসী হরিদা প্রভৃতি লেখক, “নবজীবন” প্রকাশক শ্রীহরি চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাত্রীশিকা প্রভৃতি লেখক ডাক্তার শ্রীযত্ননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘বালিকার পদ্য শিকা’ ‘সাবিত্রী’ প্রভৃতি লেখক শ্রীযত্ন চরণ সেন গুপ্ত, জগদানিবাশী ‘চিত্র গুপ্তের দপ্তর’ প্রণেতা ভূতপূর্ব ‘সমায়ণ’ সম্পাদক শ্রীমাধব লাল দত্ত, বিখ্যাত পাঁচালীকার ব্রহ্মশাসনবাসী শ্রীশুদ্ধদাস চট্টোপাধ্যায় শান্তিপুরের “অদ্বৈত চরিত” প্রণেতা, শ্রীবীরেশ্বর প্রামাণিক মেহেরপুরের শ্রীরাধিকাবন্ধু গুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কৃতবিদ্যা ব্যক্তিগণের মধ্যে কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত এসিদ্ধ ব্যাধিটার

মিঃ মনোমোহন ঘোষ ও তদীয় ভাতা মিঃ লাল মোহন ঘোষ; ত্রেজিলের সেনাধ্যক্ষ হুরেশ বিশ্বাস, সাহিত্যসেবী ৮ শ্রামাধব রায় মহাশয়, উমেশ চন্দ্র দত্ত, ৮২য় বহুনাথ রায় বাহাদুর তদীয় ভাতা কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার রায় দেবেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর কলিকাতার অশ্রুতম প্রসিদ্ধ ডাক্তার বি, এল, চক্রবর্তী মহাশয় প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য ।

এতদ্ব্যতীত বর্তমান কৃতবিদ্যা গণের মধ্যে নদীয়ার বর্তমান মহারাজা দার্শনিক শ্রীযুক্ত দ্বিতীচন্দ্র রায় বাহাদুর বাগাঁচড়া নিবাসী মুন্সের কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীবৈদ্য নাথ বহু, কুমারখালি নিবাসী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীহরেশ্বর চন্দ্র মৈত্র কৃষ্ণনগর নিবাসী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীজ্যোতি ভূষণ ভাঙ্গুরী ও তদীয় ভাতাগণ বেঙ্গল ক্যামিকেল এণ্ড ফার্মেসিটিক্যাল ও ওয়াক্সের সর্ব্বময় কর্তা শ্রীরাজ শেখর বহু, রায়চাঁদ স্থলার শান্তিপুুরের শ্রীকণীশ নাথ ঝাঙ্গুলী মহাশয় বিলাত প্রত্যাপনগণের মধ্যে প্রেসিডেন্সি ডিভিজানের জু ল ইনস্পেক্টর জয়দিয়াবাসী মিঃ পি, মুখার্জী, কৃষ্ণ নগরের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ এ, চৌধুরী, মিঃ জে চৌধুরী মি, কে, এন, চৌধুরী, মিঃ এ, চৌধুরী, ডাক্তার চৌধুরী ; কৃষ্ণ নগরের মিঃ বি, কে, লাহিড়ী, আড়বন্দা গ্রামবাসী ব্যারিষ্টার মিঃ এস, সি, ব্যানার্জী । শান্তিপুুর নিবাসী ব্যারিষ্টার মিঃ সত্যচন্দ্র বাগচী শান্তিপুুর নিবাসী সিভিলিয়ন মিঃ অতুল চন্দ্র চ্যাটার্জী; সিভিলিয়ন মিঃ জ্যোৎস্না কুমার ঘোষাল, কৃষ্ণ নগর নিবাসী সিভিলিয়ন মিঃ মহী মোহন ঘোষ, কলিকাতার ডাক্তার এম, এন, ব্যানার্জী, ডাক্তার ইউ, এন, ব্যানার্জী, মহেশগঞ্জ নিবাসী দার্শনিক বি, পাল চৌধুরী প্রভৃতি কৃতবিদ্যা ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য ।

নদীয়ার ধর্মচর্চা।

একদিকে বাণীর কুণায় নদীয়ার নাম যেমন চিরউজ্জ্বল, তেমনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীঅম্বৈত প্রভু, আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি দেব প্রকৃতি মহাত্মা গুণের নিমিত্ত নদীয়ার খ্যাতি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। সমগ্র নদীয়ার যত সংখ্যক শ্রীপাঠ বা বিখ্যাত দেবস্থান, মন্দির ও মসজিদাদি পরিদৃষ্ট হয় নিম্ন বক্তের অন্ত্র কোনও জেলার সেরূপ নাই। এখানে প্রায় প্রতি পল্লীতেই কোনও না কোনও মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনর অনন্তসাধারণ চরিত্র বলে লোকের প্রকৃত ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বা দ্বীয় প্রতিভাবলে ধর্ম সঞ্চে কোনও নতুন মত গঠন করিয়া এক নব সম্প্রদায় স্বজন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী কালের এদেশের কোনরূপ প্রামাণিক ইতিহাসাদি না থাকিলেও ইহা স্থির নিশ্চয়ে বলা যাইতে পারে যে, যখন আসমুজ্জ হিমচল সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের বিজয়ডঙ্কা নিনাদিত হইয়াছিল তখন নিজীব বঙ্গদেশ কোন মতেই তাহার হিন্দুত্ব রজায় রাখিতে সমর্থ হয় নাই। পরন্তু মগধ রাজ্যের সম্বিহিত বলিয়া এখানে যে বৌদ্ধধর্ম সূদৃঢ়রূপে বহুশুল হইয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের সহিত সংবর্ধণেও নদীয়ার বন্ধ হইতে উহার চিহ্ন এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। বক্তের অন্ত্রতম প্রাচীন স্থান বর্তমান রাণাঘাটের সম্বিহিত আনুলিয়া গ্রামের বাৎসরিক কার্তিক সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত ধর্ম-গাজন, বক্তের সুবিখ্যাত পল্লী উলার (বায়নগর) চণ্ডীদেবীর পূজাকালীন পূজাপদ্ধতি এবং এবস্থিধ অরও বহু স্থানের অজ্ঞাত নানা দেবদেবীর সম্মান ও পূজা প্রণালী মনোযোগ দিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে বৌদ্ধধর্ম দেশ হইতে এখনও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই।

হরেন্দ্র সাং দ্বঃ সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের সবিশেষ প্রভাব দেখিয়া গিয়াছেন। মুক্তার হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত যে সমস্ত নগর তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি সর্বত্রই ১৭টি সংঘারাম দর্শন করিয়াছিলেন, ওখন

ঐ সংস্কারময় সকলে ১১৫০ জন ভিক্ষু বাস করিতেছেন। দেবমন্দিরের সংখ্যা ছিল ৪৪২। প্রত্যেক ভিক্ষুর বাৎসরিক ব্যয়ভার অন্ততঃ এক শত গৃহস্তুকে বহন করিতে হইত; সুতরাং তখন ঐ সকল স্থানে ১১৫০,০০০ গৃহস্থ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। তদন্তে সাং কেবল ৮টী কি ৯টী নগরের কথা লিখিয়া গিয়াছেন; উহাতেই বৌদ্ধমতাবলম্বী লোকের সংখ্যা ১১৫০,০০০; সুতরাং সেই সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে যে অসংখ্য বৌদ্ধ মতাবলম্বী লোক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমোন্নতির পথে নানা অন্তরায় উপস্থিত হয়। শশাঙ্ক নামে একজন প্রভাপশালী হিন্দু রাজা বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদকল্পে যত্নবান হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি কতদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। সপ্তম শতাব্দীতে শুগু নরপতিগণই মগধে রাজত্ব করিতেছেন। পরে নবম শতাব্দীতে পাল বংশীয় বৌদ্ধ নরপতিগণ মগধের সিংহাসনে আরুঢ় হইলেন। উহাদেরই রাজত্ব কালে হিন্দু কুল চূড়ামণি মহারাজা আদিশূর ঐহর্ষধর্মুখ ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে গোড়বঙ্গ হইতে বৌদ্ধধর্মের বিলোপসাধনে যত্নপরিকর হইয়া উঠেন এবং বহুল পরিমাণে কৃতকার্য হইলেন। কিন্তু সহস্রা তিনি কালমুখে পতিত হওয়ায় তবংশীয়গণের পরাক্রম ধ্বংস করিয়া মগদধিপতি পাল রাজগণ গোড়বঙ্গের অধীশ্বর হইয়া উঠেন, এবং নবদ্বীপের সম্রিকটস্থ সুবর্ণ-বিহার নামক স্থানে নিম্ন বঙ্গের রাজধানী স্থাপনা করেন। পালরাজগণ বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন সেই কারণে তাঁহাদের রাজধানীর “সুবর্ণবিহার” এই নাম করণ করেন। এখানে অন্যান্যি তাঁহাদের প্রস্তরাদি নির্মিত প্রাসাদের স্বেচ্ছাবশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই পাল রাজগণের রাজত্ব কালেই নদীয়ার বহুল পরিমাণে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার কল্পনা করা বোধ হয় অসম্ভব হইবেনা।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালবংশীয় নরপতিগণ কিছু কাল রাজত্ব করিলে পর সেন বংশীয় হিন্দুরাজগণ পুনরায় মন্তকোত্তর করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দেশ হইতে আবার ধীরে ধীরে অন্তর্মিত হইতে লাগিল। ‘দেব ধর্মাবলম্বী সেন রাজগণ প্রবল হইয়া উঠিলেই পালবংশীয়গণের প্রভাব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। দেশমধ্যে তখন হিন্দু ও বৌদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইল। ভগবান শঙ্করাচার্য্য ঋঃ নবম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের মূলে যে কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছিলেন তাহারই ফলে উহা এতদিনে ক্রমে হীন হইতে হীন বল হইতেছিল

এক্কে রাজশক্তির সাহায্য পাইয়া শৈবধর্ম যতদূরে বহল পরিমাণে প্রচারিত হইয়া পড়িল। এই সেন রাজগণের অন্ততম রাজা সামন্ত সেন যুদ্ধবয়সে গঙ্গাবাসের নিমিত্ত বর্ত্তমান নবদ্বীপের অনতিদূরে এক উপনিবেশ স্থাপন করেন। সামন্ত সেনের প্রপৌত্র সুবিখ্যাত বদ্রাল সেন এই নবদ্বীপ নগরীতেই তাঁহার অন্ততম রাজধানী স্থাপনা করেন। কথিত আছে এই নবদ্বীপের প্রাসাদে থাকিয়াই তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত সামাজিক সংস্কার সাধন করেন। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বাঙ্গলার যতপ্রায় হিন্দুধর্ম পুনর্জীবিত হইয়া উঠে। হিন্দু পারিষদ, হিন্দুমন্ত্রী, হিন্দু কবি, হিন্দু দার্শনিকে রাজসভা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পৌত্তলিক হিন্দুপণ্ডিতগণ স্বধর্মী রাজার শাস্তিপূর্ণ কোমল আশ্রয়ে থাকিয়া নূতন নূতন ধর্মমত স্বজনে মনোনিবেশ করিলেন। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব সকলে মিলিয়া স্ব স্ব ইষ্ট দেবদেবীর উপাসনার নিরত হইয়া বৌদ্ধধর্মের মূলোৎপাটনে যত্নবান হইলেন। হিন্দু স্মৃতিকারণ “নখা” (বৌদ্ধদ্বারা) দর্শনে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিলেন, কাজেই তখন আশ্রয়হীন বৌদ্ধধর্ম গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বিভাঙিত হইতে লাগিল। যে চিন্তাশীলতা দেশ হইতে বৌদ্ধের উচ্ছেদসাধনে যত্নবান হইয়াছিল তাহাই এক্কে আবার বিষ্ণু, শিব ও শক্তি পূজার মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করিল। কেহ বিষ্ণুর পদাশ্রয় গ্রহণ করিল কেহ শিবকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিল কেহ বা শক্তি পূজার নিরত হইল। শৈব রাজা লক্ষণ সেন শেষ বয়সে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জয়দেবের অমৃতময় “গীতাগোবিন্দের” সৃষ্টি হইল। এই থানেই দেশে ভাবী দেশোদ্ভাদকর বৈষ্ণব ধর্মের বীজ নিহিত হইল। এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া অচিরেই বৈষ্ণবধর্মরূপী মহাপাদপের স্বজন করিতে পারিত কিন্তু এই সময়ে মহম্মদ-ই-বখতিয়ার কর্তৃক নবদ্বীপ বিজীত হওয়ার নবগত মুসলমান গণের অত্যাচারে হিন্দু মাত্রেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। হিন্দুর শাস্ত্র, হিন্দুর ধর্ম, হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান, হিন্দুর শিক্ষা সমস্তই বিজেতা যবন ভূপতির নিকট অনাদৃত হইতে লাগিল; তখন লোকে জাতিধর্ম লইয়া শশব্যস্ত হইয়া পড়িল। অপ্রতিহত প্রভাব সম্পন্ন হুর্দাজ মুসলমানগণের সম্মুখে শাস্ত প্রকৃতি বৈষ্ণব ও শৈব অনেকটা হীনবীর্য হইয়া পড়িল। কেবলমাত্র বীরাচারী জাতিক গুরুগণ লোককে বাঘাচারী হইয়া শক্তির আশ্রয়গ্রহণ পূর্বক অত্যাচারী মুসলমানের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করণে উদ্বেজিত করিতে লাগিলেন এবং ধর্ম্মাচার্যের কঠোর বন্ধন

শিখিল করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তন্মের দোহাই দিয়া অবাধে দেশে সুরা ও ব্যতীচারের স্রোত প্রবাহিত হইল এবং কিছু দিনেই প্রেলোভন পরিশূন্য স্নানশক্তি বৌদ্ধধর্ম, শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম পরিহার পূর্বক বাঙ্গালী নবাবিকৃত পন্থায় গা ঢালিয়া দিল। অন্তঃসার শূন্য নরনারী তন্তোক্ত সত্যধর্ম ভুলিয়া বামাচারের কৃক অবরোধে কুকর্মী ও কদাচারী হইয়া উঠিল। যুগধর্মের জগন্মতা ভগবতীর জগন্মতল আরাধনা ভুলিয়া লোকে পিশাচ হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, একত্র পান ভোজন আরম্ভ করিল। পৃথক পরিবারস্থ বিভিন্ন বর্ণপ্রমী স্ত্রী পুরুষ একত্রে বসিয়া পঞ্চমকারের সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। বীরাচার, পশাচার, ভৈরবীচক্র, পঞ্চতন্ত্র সাধনায় লোকে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে সিদ্ধিলাভ করিতে যাইয়া মানুষ্য ইঞ্জির সেবার দাস হইয়া পড়িল। লোকে তন্মের দোহাই দিয়া হৃদয়ের স্নেহমার বৃন্তি নষ্ট করিল। স্ত্রী সংস্রবে লোকে পশাচারী হইয়া উঠিল। এমন কি পূর্বে যে দেশে “অহিংসা পরমোধর্ম” বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল তথায় জীবহিংসা এমন কি নরহত্যা পর্যন্ত পরম ধর্ম মধ্যে পরিগণিত হইল। ধর্মের নামে ধরিত্রী বক্ষে সহস্র ধারায় শোণিত স্রোত প্রবাহিত হইল।

কেবলমাত্র তন্তাই যে তৎকালীন নদীয়ায় এবং সমগ্র বঙ্গদেশের এইরূপ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবনতির জন্ত প্রকৃষ্টরূপে দায়ী তাহা নহে তখনকার মুসলমান নরপতিগণের হিন্দুর প্রতি অমানুষিক বর্ষনোচিত অত্যাচার, ও মুসলমান সংস্পর্শে দেশবাসীর বিলাস প্রিয়তাও দেশের এই নৈতিক অবনতি সংঘটনে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছে। মুসলমানের অযথাপিড়নে কত অসংখ্য হিন্দুর যে জাতিনাশ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ মুসলমান ধর্ম্য দীক্ষিত হইয়াছে কেহ বা সংস্পর্শদেবজনিত পাপে চিরদিনের জন্ত “পীরদা” নামে অভিহিত হইয়া সমাজের নিয়ন্ত্রণে যাইয়া পড়িয়াছে।

সমাজ ও ধর্মের যখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থা তখন, সমাজ ও ধর্ম রক্ষাকর্ত্তা ব্রাহ্মণ মণ্ডলী ভক্তিশূন্য জ্ঞান স্পৃহায় মত্ত হইয়া সমগ্র নবদ্বীপকে এক রিয়ারিট পাঠশালায় পরিণত করিয়াছিলেন। অস্ত্রাস্ত্র পাঠের মধ্যে তখন নবদ্বীপে জ্ঞানের চর্চ্চাই বিশদরূপ চলিতেছিল, যে তর্ক বহুল বিফল গ্রন্থ শতবার শাস্ত্রে ভগবানকে স্থাপনা করিতেছে এবং প্রমাণাভাবে সহস্র বার তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছে সেই শুষ্ক জ্ঞান দর্শন তখন নদীয়ায় অহিমজ্জা ও শোণিতে প্রবেশ

লাভ করিয়াছে ; তখন লোকে প্রমাণ, যুক্তি ও তর্ক দ্বারা সীমান্বিত না হইলে কোন কার্য্য করিত না বা কোন বিষয়ই সুসিদ্ধ হইত না । ধর্ম্মাধর্ম্ম, ক্রিয়াকাণ্ড সমগ্র ভুলিয়া কেবল বিদ্যা বিদ্যা করিয়াই তখন নবদ্বীপ উন্নত । এই সার্কজ্ঞানী বিনোদ্যাদির সম্মুখে তখন পার্থিব ও অপার্থিব সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইতে বসিয়াছিল । ধর্ম্মেরতো কথাই নাই এমনকি মোহময় সংসারও উপেক্ষিত হইতেছিল । তাহার ফলে সমাজমধ্যে এ+দেশদর্শিতা, যথেষ্ট চারিতা ও বিশ্বজ্ঞানতা প্রবেশ করিল, তখন দেশ হইতে প্রেমভক্তিময় ধর্ম্মতত্ত্ব অঙ্কিত হইয়া গেল ।

প্রায়শঃ দেখা যায় কোনও একটা বিষয় উন্নতি বা অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইলে তখন তাহার পুনরায় পরিবর্তন আরম্ভ হয় । এইরূপে দেশ আধ্যাত্মিক অবনতির চরম সীমায় উপস্থিত হইলে, দেশের এই ভক্তিশূন্য শোচনীয় অবস্থা অবলোকনে নদীয়াবাসী জনকয়েক ভক্ত মহাপুরুষ অতিশয় মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন । এই ভক্তধর্ম্মের মধ্যে শান্তিপুর নিবাসী শ্রীঅষ্টৈতাচার্য্য অগ্রগণ্য । তিনি পৃথিবীতে ভক্তির অভাব দেখিয়া, ক্রীকপে এই হৃদশার বিমোচন হয়, কিসে আন্তঃকরণের হস্ত হইতে জগৎকে রক্ষা করা যায়, কিসে এই পাপ মোহের অবসান হয়, ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন । তিনি বুঝিতে পারিলেন ভগবানের বরুণা ব্যতীত এই নারক হুর্গতি দূরীভূত হইবে না, তাই আকুলহৃদয়ে, জীবকল্যানার্থ সেই পরমুৎকৃষ্ট মহর্ষি মহাতপে নিযুক্ত হইলেন । তাঁহার পুত্র হৃদয়ের অকপট প্রার্থনা শ্রীশ্রী পরম পিতার মহাসিংহাসন সম্মিথানে উপনীত হইল । তখন একদিকে উচ্ছৃঙ্খল তান্ত্রিকের তন্ত্রের নামে যথেষ্টচার নিবারণ করিতে নবদ্বীপে যেমন শক্তিদয় মহাপুরুষ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের আবির্ভাব হইল তেমনি জীবে দয়া, নামে রুচি শিক্ষা দিতে ভক্তাধীন ভগবান ব্যাকুলভক্ত শ্রীঅষ্টৈতের মহাকর্ষণে বিচলিত হইয়া স্বয়ং সপরিবারে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।

শ্রীচৈতন্য ভাগ্যবান পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ মিত্র । পুত্রস্বরূপ তাঁহার আর এক উপাধি ছিল । তাঁহার আদি নিবাস শ্রীহট্টে । তাঁহার বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ

ছিলেন। তিনি অধ্যয়নার্থে বাণীর প্রিয় নিকেতন নবাবীপে আগমন করেন এবং পাঠ সমাপনাতে নবাবীপবাসী নীলাম্বর চক্রবর্তির সর্ব হুল্লল্লাহা কন্যা “শান্তমুর্তি শচীদেবীর” পাণিগ্রহণ করিয়া নবাবীপের বে পদ্মাতে শ্রীহট্টিয়াগণ বাস করিতেন সেই পদ্মাতে বসতি স্থাপন করেন।

শচীর গর্ভে জগন্নাথের পরপর আটটী বচ্ছা জন্ম পরিগ্রহ করেন। কিন্তু সকলেই অল্প বয়সে গত হু হইলেন। শিশু কঙ্কাগণের শোকে যখন ত্রাক্ষণদম্পতি স্মিরমান তখন তাঁহাদের একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আদর করিয়া এই রূপবান পুত্রের “বিশ্বরূপ” নাম করণ করেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই পুত্র সর্ব শাস্ত্রাদিতে উত্তমরূপে ব্যুৎপন্ন হইলেন। বিশ্বরূপের ষোড়শবর্ষ বয়ঃকালে শ্রীনিমাই জন্ম পরিগ্রহ করেন।

বে স্তম্ভ নিশিতে চৈতন্যদেব জন্ম পরিগ্রহ করেন সেটী সুনির্মল কাকদ্বী পূর্ণিমা এবং বে যুহর্তে তিনি ভূমিষ্ট হইলেন তখন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল, হুতরাং সমগ্র হিন্দুস্থান তখন চিরপ্রচলিত প্রথামুযায়ী দান ধ্যানাদি সংকল্পে রত এবং মঙ্গলমুচক হুল্লল্লাহা ও হরিলক্ষ্মণিতে তখন সমস্ত নদীয়া মুখরিত। এইরূপ অনন্ত কণ্ঠ নিঃসৃত হরিলক্ষ্মণির মধ্যে “সিংহরাশী, সিংহলম, উচ্চগ্রহণে, বড়বর্ণ অষ্টবর্ণ, সর্ব হুতকপে,” জগন্নাথ মিশ্রের নবাবীপস্থ ভবনে, নিম্নমূলস্থ হুতিকাগৃহে শ্রীগৌরাজ ভূমিষ্ট হইলেন। হুতিকাগারে ডাকিনী, পিশাচ ও উপদেবতার কুদৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে মেরেরা তাঁহার “নিমাই” নাম রাখেন। পরবর্তী জীবনে অসংখ্য ভক্ত বর্জিত তিনি সহস্র নামে আখ্যাত হইলেও, হুতিকাগৃহের এই আশ্রয়ের নাম তাঁহার প্রিয়তমে একদিনও ভুলে নাই। জগন্নাথ অন্নপ্রাশন কালে পুত্রের নাম রাখিলেন “বিশ্বস্তর”, উপনয়ন কালে তাঁহার আর একটি নাম হইল “গৌরহরি”। ভক্তগণ তাঁহার “শ্রীগৌরাজ” নাম রাখিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার সর্বশেষ নাম হইয়াছিল “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”।

শচীহুলাল পিতৃগৃহে শুক্লপঙ্কজ শশীকলার জায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। এই অলৌকিক সুবর্ণলাভিত হুউজ্জ্বলবর্ণশালী, সুঠাম গঠন ও মনোহর ভঙ্গিমা শালী সর্বাঙ্গমুন্দর অপ্রাকৃত শিশুটী ঠিক অভ্রান্ত শিশুর জায় ছিল না। শিশু ক্রন্দন করিতেছে, কিছুতেই প্রবোধ মানিভেছে না, সহস্র চেষ্টা সহস্র বস্তু বিকল হইয়া বাইতেছে তখন একবার হরিলক্ষ্মণি কর, শিশু অমনি উৎকর্ষ হইয়া ওঠিলে,



সপরিবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভাগবত শ্রবণ ।



নদীয়া-কাহিনী ।

মায়ের ফ্রোডে স্থির হইয়া রহিলে । এইরূপে শিশু নিমাই বাড়িতে লাগিলেন । তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সহিত শৈশবের দুরন্তপনাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ক্রমে প্রভু পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিলে, জগন্নাথ পুত্রকে পাঠশালায় দিলেন । যে একাগ্রতার শটীচুলাল শৈশবে চাপল্য ক্রীড়া করিয়াছেন সেই একাগ্রতার এখন তিনি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন । এই সময় জগন্নাথের সংসারে এক মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল । তাঁহার ষষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ এখন যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন । অদ্বৈত সকাশে সৰ্ববিদ্যা বিশারদ হইয়া ও ভাগবতাদি ধৰ্ম্মশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া, সংসারের অনিত্যতা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায় যখন তাঁহার জনকজননী তাঁহার বিবাহের উদ্যোগে ব্যস্ত হইলেন তখন সংসারবিরাগী বিশ্বরূপ এক দিন গভীর নিশায় গৃহত্যাগ করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন । বৃদ্ধ পিতামাতা উপযুক্ত পুত্র বিরহে বিহ্বল হইলেন ও অসুস্থতা তাঁহার নাম ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ।

কালে তাঁহারা দুর্লভ পুত্রবৎ বিশ্বস্তরের যুগচন্দ্র অবলোকনে বিশ্বরূপের শোক ভুলিতে চেষ্টা করিলেন । এই সময় হইতেই শ্রীনিমাইয়ের দৌরাত্ম্য ও চাপল্য একেবারে অন্তহিত হইল এবং তিনি ধীর ও শান্ত ভাবে পিতৃমাতার সেবা-শুশ্রূষায় ও পাঠে মনোনিবেশ করিলেন । তাঁহারাও ক্রমে নিমাইয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া বিশ্বরূপের বিরহ ব্যথা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন । বৃদ্ধ মিত্র এইকালে পুত্রের এইরূপ অনন্ত সাধারণ জ্ঞানম্পৃহা দেখিয়া সাক্ষাৎ তাঁহাকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে দিলেন । শীঘ্রই অলৌকিক মেধা বলে ও অসাধারণ অধ্যবসায়গুণে তিনি গঙ্গাদাসের টোলের সৰ্বপ্রধান ছাত্র হইয়া উঠিলেন । এই সময় তাঁহার বয়স মাত্র নয় বৎসর সুতরাং জগন্নাথ তাঁহার উপনয়ন দিবার আয়োজন করিলেন । এই উপবীত কালে মণ্ডিত কেশ রক্ত বস্ত্র পরিহিত নবীন ব্রহ্মচারীকে যখন পিতা শাস্ত্রসম্বৃত ক্রিয়াদির পর কর্ণে মন্ত্র দিলেন তখন শিশু নিমাই আবিষ্ট হইয়া হস্তার ও গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে মুচ্ছিত হইয়া ধরায় পতিত হইলেন । সকলে দেখিলেন তখন সেই দেব শরীর হইতে অলৌকিক ডেজ বাহির হইতেছে ও অশ্রু পুলক, বৈবৰ্ণ্যাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব পুনঃ পুনঃ দেখে স্ফূর্তিত হইতেছে এবং অবিরল ধারায় নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বহিয়া পৃথিবী সিক্ত হইতেছে । উপস্থিত পণ্ডিত বণ্ডলী নিমাইয়ের এই

আবেশ ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং তাঁহার দেখে যে গোপাল বিয়াক করিতেছেন ইহাই সকলের ধারণা হইল। তাঁহারা সেইক্ষণ হইতে নিমাইয়ের “গৌরচরিত্র” নামকরণ করিলেন ।

নিমাইয়ের একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ভাগ্যবান মিশ্র জগন্নাথ ইহধাম ত্যাগ করিলেন । পিতৃ বিয়োগে বালক নিমাই মহাহুঃখে নিপতিত হইলেন; কিন্তু হুঃখে পড়িয়াও তাঁহার বিদ্যাশুরাগ কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই বরং এই সময় হইতে তিনি আরও নিষিদ্ধচিত্তে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন । এই অল্প বয়সে স্বপ্নে বসিয়া নিমাই একখানি ব্যাকরণের টিঙ্গনী করিয়াছিলেন । উহা সেই তদানীন্তন নবদ্বীপের জ্ঞায় বিশ্বজ্ঞান সমাজে এবং পূর্ববঙ্গের সর্বত্র বিশিষ্ট-রূপে অদ্বৃত হইয়াছিল । ব্যাকরণ পাঠ সমাপনাতে জ্ঞায় শাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত তিনি বাসুদেব সার্কভোমের টোলে প্রবেশ করিলেন । সার্কভোমের চতুঃস্পাঠী তখন নদীয়ার মধ্যে সর্বপ্রধান, শত শত বিদ্যার্থী তাঁহার টোলে অধ্যয়ন করিতেন । এই সকল ছাত্রগণের মধ্যে দীধিতির প্রস্ফুট মিশিলার গর্ববর্ধক-কারী রঘুনাথ তখন সর্বপ্রধান । কিন্তু এই বালক নিমাইয়ের সর্বতোমুখী প্রতিভায় তিনিও শীঘ্র মলিন হইয়া পড়িলেন ।

এই সময়ে চতুদ্ভিক হইতে এই রূপবান সুপণ্ডিত সুপাত্রেয় উপর কুমারী কস্তাগণের পিতা মাত্রেয়ই দৃষ্টি পড়িল । শচী দেবীও পুত্রকে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিতে ব্যস্ত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে নবদ্বীপ নিবাসী-বল্লভ আচার্য্যের সাক্ষাৎ কমলা স্বরূপা কস্তা লক্ষীদেবীর সহিত পুত্রকে পরিণয় সূত্রে বদ্ধ করিলেন ।

এই সময়ে নিমাই মুকুন্দ সঙ্কর নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের সুহৃৎ চণ্ডীমণ্ডপে স্বয়ং এক চতুঃস্পাঠী স্থাপনা করিলেন । শীঘ্রই এই তরুণ অধ্যাপকের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দিকে দিকে পরিচাপ্ত হইয়া পড়িল এবং অসংখ্য ছাত্র নিত্য নিত্য যোগদান করতঃ তাঁহার চতুঃস্পাঠী পূর্ণ করিল । এইরূপে দিন দিন তাঁহার টোলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল । এই সময়ে নবদ্বীপের বিশ্বজ্ঞান সমাজ আলোড়িত করিয়া নবদ্বীপের জ্ঞানগরিমাকাশে দিগ্বিজয়ীকল্পী এক ধুমকেতুর আবির্ভাব হইল । দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাম্বীরী ভারতবর্ষীয় বাবতীয় পণ্ডিত প্রধান স্থান অর করতঃ বহুপন্নিবার ও শিষ্য সমভিব্যাহারে নদীয়ার উপস্থিত

হইলেন। নবদ্বীপের বশোহরণ করিয়া বিদ্যারাজ্যে একচ্ছত্র হওয়া তাঁহার অভিলাষ; তিনি নবদ্বীপে “আটোপটকারে” ঘোষণা করিলেন “যদি কোন পণ্ডিত সাহসী হন তবে আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হউন নতুবা সমগ্র নবদ্বীপ আমাকে অয়পত্র লিখিয়া দিউন।” সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র কেশবের সহিত বিচার করিতে হইবে ভাবিয়া নবদ্বীপস্থ তাবৎ নবীন প্রবীণ অধ্যাপক ভীত হইলেন; সুক্লান্ত এতদিনে নবদ্বীপের বশোহানি হয়, কিন্তু তরুণ নিমাই সহস্রাশঙ্কে গঙ্গাতীরে তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বিচারে দ্বিধিজয়ীকে পরাস্ত করিয়া নদীয়ার বশঃ শ্রী অক্ষয় রাখিলেন। দ্বিধিজয়ীও তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দণ্ড কমণ্ডলু ও কোপিন গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ ভজনে প্রণিপাত করিলেন। দ্বিধিজয়ী বিজয়ের পর হইতেই প্রভু নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইলেন।

এই তরুণ অধ্যাপকের অনন্ত সাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভামণ্ডিত হস্তে ও শ্লেষে যখন নবদ্বীপস্থ সমগ্র বিবুদ্ধজন ব্যতিব্যস্ত, যখন ব্যাকরণের ও ভ্রাতৃর অতলগর্ভে ভক্তির কথা ডুবিয়া যাইতেছিল তখন একদিন এমন একটা ঘটনা সংঘটিত হইল যে নিমাইয়ের জীবনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ পথে প্রধাবিত হইল। এই সময়ে একদিন নিমাই যখন দশিষ্যে রাজপথে যাইতেছিলেন তখন মুকুন্দ দত্ত ও গঙ্গান্নানে যাইতেছিলেন। মুকুন্দ চট্টোপাধ্যায় একজন বৈদ্য কুমার, নবদ্বীপে অধ্যয়নার্থ আগমন করেন এবং কিয়দিন শ্রদ্ধার সহপাঠীও ছিলেন। এক্ষণে সর্ব্বশাস্ত্রের কচ্চকি পরিত্যাগ করিয়া বিমুক্ত ভক্তি মার্গের পথিক হইয়া পরম হরিভক্তি পরায়ণ হইয়াছিলেন এবং সুগায়ক বিহার অষ্টমতের সভায় কীৰ্ত্তন করিতেন। মুকুন্দ হঠাৎ নিমাইকে রাজপথে দেখিয়া পাছে বহির্মুখ সম্ভাষণ করিতে হয় এই ভয়ে তটস্থ হইলেন ও অঙ্গপথে প্রস্থান করিলেন। পরম মেধাবী নিমাই তাহা বুঝিতে পারিয়া শিষ্যগণকে কহিলেন “দেখ, দেখ, মুকুন্দ আমাকে অবৈক্যব মনে করিয়া পলাইয়া গেল, কিন্তু ভোমাদিগকে বলিয়া রাখিতেছি—

এমন বৈক্যব আমি চাইব সংসারে।

অজ্ঞানব অসিবেক আমার হুরারে ॥

এই সময় হইতেই তিনি নিমাই ধর্ম্মাচরণে মনোনিবেশ করিলেন।

ভক্তিগ্রন্থ তাঁহার কণ্ঠস্থ থাকিলেও তিনি ভক্তির যাজনা একদিনও করেন নাই। এক্ষণে এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহাতে একজন শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে পরম ভাগবত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত শ্রীভূর মৈত্রি জন্মে এবং দুইজনে সর্বদা ভক্তিশাস্ত্র-পঠন ও ভক্তি কথ্য প্রসঙ্গে কালাতিপাত করিতেন। কিন্তু ঈশ্বরপুরী শীঘ্রই নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করেন। এখন নিমাইয়ের বয়স মাত্র অনতিক্রান্ত বিংশতি বৎসর। এই অল্প বয়সেই তাঁহার আচার্য্যত্বাতি দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যপ্ত হইয়াছিল। এই সময়ে দয়ালপ্রভু একবার পূর্ববঙ্গে পরিভ্রমণে ইচ্ছা করেন এবং জননী ও পত্নী শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর নিকট বিদায় লইয়া সশিষ্য পূর্ব বঙ্গে যাত্রা করেন, এবং শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও পদ্মা তীরবর্তী স্থান সমূহ পরিভ্রমণ করিয়া সজ্জন, দুর্জ্জন, আচার্য্য, বিচারী, পতিত, অধম, নীচ কান্দাল যে যেখানে ছিল সকলকে অকাতরে হরিনাম নিধি বিলাইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। নিমাই ঘরে ফিরিয়া মাতৃচরণে প্রণত হইলেন। পরে যখন শুনিলেন যে তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিনী তাঁহার বিচ্ছেদ কালের মধ্যে সর্গ দংশনে বৈকুণ্ঠলাভ করিয়াছেন তখন কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন পরে বৈধ্যাবলম্বন পূর্বক শোকাকুলা জননীকে প্রবোধ দিলেন। মাতা আপাতঃ দৃষ্টে প্রবুদ্ধ হইলেন বটে কিন্তু সরলমতি পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবনার বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তাঁহার আন্তরিক ভয় পাছে বিধবরূপের শ্রায় নিমাইও সংসারে বীতরাগ হয়, বিশেষ পুত্রের এই নবযৌবনে তাহাকে বন্ধনহীন অবস্থায় সংসারে রাখিতে শচীমাতার বড় ভয় হইল তাই অনতিবিলম্বে নিমাইয়ের দ্বিতীয় বার বিবাহ দিতে তিনি উদ্যোগী হইলেন। মাতৃ অনুরক্তা শিশুপ্রকৃতি নিমাইও মাতৃ আদেশে রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের সূশীলা কন্যা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীকে বিমুগ্ধিয়া দেবীর পাণীগ্রহণ করিলেন।

বিবাহের পর প্রায় ২ বৎসর কাল নিমাই নবদ্বীপের টোলে অসংখ্য ছাত্রকে বিদ্যাদান করতঃ স্থিরভাবে সংসারে থাকিয়া শচীর মনে হর্ষোৎপাদন করিলেন। এই সময়ে অর্থাৎ তাঁহার একবিংশতি বর্ষ বয়সে এক দিন তিনি পিতৃগণ পরি-শোধার্থ গয়াকেত্রে বাইবার নিমিত্ত শচীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। 'স্নেহময়ী শচীদেবী এ বিষয়ে পুত্রকে নিষেধ করিতে পারিলেন না, তাই সঙ্গে নিমাইয়ের

যেসো চন্দ্রশেখর ও তাঁহার কতিপয় শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা আশ্বিন মাসে বাটী হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে বহুপথ অতিক্রম করিয়া শ্রীধাম গয়া প্রবেশ করিলেন। এই পবিত্র গয়াক্ষেত্রে তাঁহার সহিত পূৰ্বপরিচিত ভাগবতাগ্রগণ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মিলন হইল। ভক্ত পুরীর ভক্তির উচ্ছ্বান দর্শনে ভক্তাবতার নিমাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ভক্তিময় ঈশ্বরপুরীর দেবমূর্তি তাঁহার চক্ষে অপার্থিব প্রতীয়মান হইল; আর অমনি আকুলকণ্ঠে ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি পুরীর নিকট দশাঙ্কর মন্ত গ্রহণ করিয়া শূগভীর, শূপবিত্ত, শূমহান, শূমধুর কৃষ্ণপ্রেমমাগরে নিমজ্জিত হইলেন। পরে শ্রীমন্দিরে শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে আসিলে গয়ালী বিপ্রগণ ভক্তিগদগদকণ্ঠে যখন শ্রীপদের প্রভাব বর্ণনা করিলেন তখন, সেই বিরিকিবাঞ্ছিত, অজ্ঞভবপূজিত, যোগীগণ হুল'ত শ্রীপাদ দেখিতে দেখিতে প্রেমাবেশে শ্রীনিমাই একেবারে মুচ্ছিত হইয়া শ্রীপুরীর বক্ষে পতিত হইলেন। পরে সঙ্গীগণের যত্নে যখন মুচ্ছা ভঙ্গ হইল তখন অজ্ঞান পুলকানন্দ গোমুখী নিঃসৃত গঙ্গাশুভারানিত তাঁহার নয়ন বহিয়া বদনে, বদন হইতে বক্ষে, বক্ষ হইতে সহস্র ধারায় ধারায় পতিত হইয়া সেহনকে জলময় করিল। উপস্থিত সকলে সেই পবিত্র বারিতে স্নাত হইয়া জীবনে সৰ্বপ্রথম একরূপ আশ্চর্য প্রেমবিকাশ ও অপূৰ্ণ অশ্রুপাত দর্শন করিতে লাগিলেন। যখন কাদিতে কাদিতে আর্তি কণ্ঠে নিমাই চন্দ্রশেখরাদি সঙ্গীগণকে কহিলেন “তোমরা দেশে প্রত্যাবর্তন কর আমি সংসারে যাইব না আমি প্রাণেশের উদ্দেশে মথুরায় চলিলাম, আমার বৃদ্ধা জননীকে তোমরা সাঙ্গনা করিও”, তখন তাঁহারা বড়ই বিপদে পড়িলেন, পরে বহুযত্নে অনেক প্রবেদ দিয়া ও একরূপ বল প্রকাশ করিয়াই তাঁহারা এই আবেশময় ভক্তির প্রতিমাটিকে পৌষ মাসের শেষ ভাগে নবদ্বীপে ফিরাইয়া আনিলেন।

নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিলে সকলে দেখিলেন সেই উদ্ধতের শিরোমণি নিমাইয়ের পূৰ্ব ভাব একেবারে অজ্ঞান হইয়াছে গৃহে আসিলেও নিমাই গয়ার সেই শূমধুর স্মৃতি বৃহত্তের জন্তও বিম্মত হইতে পারিলেন না। পরন্তু এই সময়ে তাঁহাতে প্রেমোদ্যানের লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পাইল। এই দ্বিবা প্রেমোদ্যানের মধ্যে যখন বাজ জগৎ তিনি একরূপ বিম্মত প্রায় তখন এক দিন তাঁহার অসংখ্য ছাত্র, তাঁহাকে বেষ্টিত করতঃ পাঠ গ্রহণ করিতে

অসিল। তিনিও সকলকে পাঠ দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সে সময়ে তিনি যাহা কিছু ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন সে সমস্তই হরিপক্ষে হইতে লাগিল, এতাবৎ আবার তাঁহার অধিক দিন স্থায়ী হইল না। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ছাত্রগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সৰ্ব্বকালের জন্য কৃষ্ণপ্রদেশমাগরে ভাসমান হইলেন। তাঁহার ভাগ্যবান শিষ্যগণও সেই দিন হইতে তাঁহার ভক্তভ্রমী মধ্যে গণ্য হইলেন এবং তাহাদের লইয়া তিনিও অপূৰ্ণ নাম কীৰ্ত্তন হাট করিলেন। শীঘ্রই এই ভক্তসংবাদ নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত হইল আর শ্রীবাস আদি ভক্তগণ আসিয়া একে একে তাঁহার পার্শ্বে মিলিত হইতে লাগিলেন। এই শ্রীবাসের গৃহেই নিমাই হরিসভা স্থাপন করিলেন ও সমস্ত দিবারাত্র হরিগুণ কথন, ও নাম সংকীৰ্ত্তনে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রতি দিন নিতাই, অদ্বৈত, হরিনাস, গদাধর, শ্রীবাস, যুরারী মুকুন্দ, নরহরি, পুণ্ড্রবোস্তম, পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি, গঙ্গাদাস, দামোদর, পেরিন্দ, বাহু ঘোষ, বাক্রেশ্বর, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি শত শত ভক্ত আসিয়া প্রভুর সঙ্গিত মিলিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে যখন প্রেমে মত্ত হইয়া শ্রীবাসের আদিনায় নাম কীৰ্ত্তনে রত হইতেন তখন নবদ্বীপস্থ কতকগুলি কুচরিত্র অশ্লীল পরায়ণ ব্যক্তি বহির্দেশ হইতে নানাবিধ অত্যাচার ও চৌকর করিয়া তাঁহাদিগের তপে বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিল। এই দলের প্রধান ছিল দুই ভ্রাতা। তাহারা সাধারণতঃ জগাই মাধাই নামে খ্যাত। ইহাদের মত পাতকী তখন সমগ্র নদীয়ার আর ছিল না। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারা পাপের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিল, তাই দরাল নিত্যানন্দ ও হরিনাস ইহাদের উদ্ধারার্থ দৃঢ় সংকল্প করিলেন। এক দিন নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ যখন জীবে নাম বলিয়াই ফিরিতেছিলেন তখন জগাই ও মাধাই আসিয়া সহসা তাঁহাদের আক্রমণ করিল। মাধাই একটী তম্ব কলসীর কাণা লইয়া নিত্যানন্দ প্রভৃৎ মধ্যায় এমন দারুণ আঘাত করিল যে তাঁহার মস্তক হইতে অজস্র শোণিতধারা বহিতে লাগিল। নিতাই সে দারুণ আঘাত উপেক্ষা করিয়া প্রেমবিহ্বল হৃদয়ে মাধাইকে বক্ষে লইতে উদ্যত হইলে মদোন্মত্ত মাধাই আবার তাঁহাকে প্রহার করিতে আসিল। নিত্যানন্দের দেহভুলভ চরিত্র বলে পায়ণও বিগলিত হইল। জগাই এতাবৎ মত্তমুগ্ধবৎ মাধাইয়ের কার্য্য দর্শন করিতেছিল এক্ষণে যখন দেখিল সে পুনরায় নিত্যানন্দকে

প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে তখন ক্ষিপ্রগতি আসিয়া বজ্র মূর্তিতে মাথাইয়ের হস্ত ধারণ পূর্বক তাহাকে ভংগন করিল। লোকে আসিয়া যখন প্রভুকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল তখন তিনি লোকশিক্ষার্থ যৎপরোনাস্তি কোপ প্রকাশ করিয়া সেই দুই পাষণ্ডকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলে অক্রোধী পরমানন্দ নিত্যানন্দ আসিয়া প্রভুর নিকট তাহাদের ক্ষম্ম ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। প্রভুর কৃপায় এই দুই মহাপাতকী ব্রহ্মার হৃদয় পদ প্রাপ্ত হইল।

জগাই মাথাইয়ের জায় ধনশালী, হৃদ্যন্ত ও প্রবলপ্রতাপারিত ব্যক্তিব্যয়ের এইরূপ অভাবনীয় পরিবর্তনে যদিও অনেকের চিত্ত আলোড়িত হইল তথাপি দুই চারি জন বলস্বভাব ব্যক্তি কিছুতেই শ্রীগোরাঙ্গের একরূপ নির্ভীকতা ও সম্মান সহ করিতে পারিল না। তাহারা তদানীন্তন নদীয়ার মুসলমান কাজীর নিকট যাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কত মতে নালিস বন্ধ হইল। কাজীও গীর স্বাভাবিক দৈত্য প্রকৃতি বশে চালিত হইয়া নবদ্বীপে সংকীর্ণ নিবেদাজ্ঞা প্রচার করিল। তখন হরিনামমূর্তি শ্রীগোরাঙ্গ ভক্তের কারণে উদ্বিগ্ন হইয়া প্রচার করিলেন যে “তিনি অন্যাই কাজী দমনে গমন করিবেন, ভক্ত যে কেহ আছেন, আসিয়া মিলিত হউন।” প্রভুর শ্রীমুখ হইতে এই আদেশ প্রচার হইবামাত্র বিদ্যুৎগতি এ সংবাদ দিকে দিকে রাষ্ট্র হইল, আর অমনি অপরাহ্ন সময়ে একে একে, দশে দশে, শতে সহস্রে লক্ষ লক্ষ লোক এক এক দাঁপ ও তহপুস্ত তৈলাদি লইয়া প্রভুর বাটী বেষ্টন করিতে লাগিল। কাজী এতাবৎ উদ্বিগ্ন হইলেও বিশেষ ভীত হয়েন নাই এক্ষণে যখন সেই অসংখ্য কর্ণের হরিক্ষনি ক্রমে তাঁহার নিকটবর্তী হইতে লাগিল তখন ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিলেন ও পলাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ প্রেমাবিষ্ট ভক্তের চক্ষু হইতে, ঐ উজ্জ্বল আলোকে অল্প সংখ্যক মুসলমান কোথায় পলাইবে? হুতরাং কাজী আর প্রচুর ভাবে থাকা বুঝা মনে করিয়া গলগলীকৃতবাসে দীনভাবে শ্রীগোরাঙ্গের পদে শরণ লইল, তখন অক্রোধী শ্রীগোরাঙ্গ লৌকিক ক্রোধ অপসারণ করিয়া কাজীকে সম্বৰ্দ্ধনা করিলেন।

এইরূপে প্রভু কাজী দমন পূর্বক হরিক্ষনি দিয়া তাঁহার অসংখ্য ভক্তবৃন্দকে আশস্ত করিলেন এবং নবদ্বীপে নাম মাহাত্ম্য পূর্ণরূপে স্থাপনা করিয়া, গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই অপূর্ণ ঘটনার পর হইতে দৌরহরির কাহিন্য

ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। এখন কখন নামরসে বিতোর থাকেন আবার কখন আবিষ্ট হইয়া বিমুগ্ধতার উপবেশন পূরক ভক্তবৃন্দের পূজার্তনা গ্রহণ করেন। কখন বা নানাবিধ অলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করেন। শ্রীবাসের মৃত পুত্রের প্রাণদান, সদ্যরোপিত বৃক্ষ হইতে অলৌকিকরূপে ফলোৎপাদন, সদ্য অসাধ্য ব্যাধি বিনাশ, স্পর্শ মাত্রেই অপ্রেমিকের প্রেমলাভ ইত্যাদি কত শত অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার এই সময় সংঘটিত হইতে থাকে। কিন্তু সেই অলৌকিক প্রেমময় হৃদয়ের অপূর্ণ ভাবোচ্ছাসের নিকট এ সকলের মূল্য কি ? এই সময় তাঁহার বয়স চতুর্বিংশতি বৎসর মাত্র। এই বয়সে তাঁহার প্রেমবৈকল্য সাতিশর বুদ্ধি পাওয়ায় তাঁহার দেহ চেষ্টাদিগু তিরোহিত হয়, এমন কি দিবারাত্রির প্রভেদ জ্ঞানও একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময়তা লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংসারে বিরাগ উপস্থিত হইল এবং দীন দয়াল প্রভু আসমুদ্র হিমালয় সমগ্রদেশে প্রেমবিলাইতে বিশেষতঃ বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ী ও সম্ম্যাসীগণের সান্নিধ্যলাভ করিতে, এবং স্বর্গগণের মন হইতে বিবেচ্য ভাব দূর করিতে কঠোর সম্ম্যাসব্রত গ্রহণ বাসনা করিলেন এবং ১৪৩১ শক (১৫১৯ খ্রষ্টাব্দে) উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পতীর নিশায় গোপনে গৃহত্যাগ করতঃ মাষের দারুণ শীত উপেক্ষা করিয়া সমুদ্রগে গঙ্গা পার হইয়া শ্রীগৌরাজ্য কাঞ্চন নগরে (কাটোয়ার) উপস্থিত হইয়া শ্রীকেশব ভারতীর সহিত মিলিত হইলেন। ভারতী কিছুদিন পূর্বে একবার নবদ্বীপে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীনিমাই তাঁহার নিকট সম্ম্যাস গ্রহণের প্রস্তাব করেন, সুতরাং তাঁহাকে দেখিষামাত্র তিনি তাঁহার সংকল্প বুঝিতে পারিলেন। এই সময়ে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুহূন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, ও ব্রহ্মানন্দ ঠাকুর প্রভুর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া কাটোয়ার প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহারা এবং সমবেত অসংখ্য জনশ্রেষ্ঠী কাতর কর্তে তাঁহাকে এই দারুণ সঙ্কল্প পরিত্যাগের জন্ত কত অনুরোধ উপরোধ করিলেন, কিন্তু গৌরের দার্ঢ্য দেখিয়া অবশেষে তাঁহারা সকলেই নিরস্ত হইলেন। তখন শ্রীগৌরাজ্য, চন্দ্রশেখর আচার্য্যের প্রতি বিধিযোগ্য সমস্ত আয়োজনের ভারার্ণণ করিলেন। সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে শুভ সংক্রান্তিতে যখন গৌরাজ্যের মস্তক মৃণালের অস্ত্র কোরকারকে আচ্ছাদন করা হইল, তখন সেই মরহন্দের প্রভুর অলৌকিক রূপ গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মস্তক স্পর্শে

সাহসী হইল না। পরে প্রভুর নিকটে আশ্রয় হইয়া ও বর পাইয়া সেই শোকাবহ কার্যে হস্তক্ষেপ করিল। এইরূপে প্রভু কৌরকার্য্য সমাধা করতঃ গঙ্গানান পূর্ব্বক ভারতীর নিকট সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রভুর আর এক জগদ্বল নাম হইল “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”। দীক্ষার পর প্রভু প্রেমাবেশে আবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন ও বাহু জ্ঞান শূন্য হইয়া যদৃচ্ছা গমন করিতে লাগিলেন। পরে কিয়দ্বিবস পথে পথে হরি নাম নিধি বিলাইয়া প্রথমে ফুলিয়ায় হরিদাসের আশ্রমে, পরে শান্তিপুরের অশ্বত আচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তত্ত্ববুদ্ধ এমনকি তাঁহার পূর্ব্ব নিম্নকগণও প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া অতি নিকটেই আনিয়াছেন শুনিয়া, প্রভুকে দেখিতে ফুলিয়া ও শান্তিপুরে আসিয়া মিলিতে লাগিলেন। তখন সমস্ত শান্তিপুরে এক হরিক্ষনি ব্যতীত আর কিছুই শুনা যাইতেছিল না। সেই সংখ্যাতীত ভক্তকণ্ঠের হরিক্ষনিতে তখন শান্তিপুৰ মুখরিত। কবির কথায়, তখন প্রেমের বজ্রায় “শান্তিপুৰ ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।”

এই আনন্দ নৃত্যে কএক দিবস অতিবাহিত করিয়া প্রভু, মাতা ও তত্ত্ববুদ্ধের নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ নীলাচল অভিযুগে যাত্রা করিলেন। নীলাচল চন্দ্রের ইন্দু বদন দর্শনের জন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া, পথে সর্ব্ব বাধাবিপাক্ত উপেক্ষা করিয়া প্রভু পুরীর পথে অগ্রসর হইলেন। বহু পথ অতিবাহন করিয়া তিনি তাঁহার সমভিব্যাহারী শ্রীপাদ্ নিত্যানন্দ, পণ্ডিত জগদানন্দ, দমোদর পাণ্ডিত, ও মুকুন্দ দত্ত এই চারি জনকে লইয়া স্বচ্ছন্দে রেমুণায় উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রেমানন্দে যামিনী যাপন করিয়া তাঁহারা রেমুনা ও কটকের মধ্যবর্তী স্থান যাজপুরে আসিলেন। তথা হইতে শ্রীসাক্ষীপোপাল দর্শনে গমন করিলেন। পরদিন কমলপুরে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু ভার্গব নদীতে স্নান দানাদি সমাধা পূর্ব্বক কপোতেশ্বর দর্শনে গমন করিলেন। নিত্যানন্দ এই স্থানে প্রভুর সন্ন্যাসের চিহ্ন ও সমস্ত দণ্ড ধানিকে ত্যাগ করিয়া নবী জলে ভাসাইয়া দিলেন, তদবধি সেই নদী “দণ্ডতাক্ষা” নামে খ্যাত হইল। কপোতেশ্বর দর্শন করিয়া মহাপ্রভু আবার চলিলেন। কমলপুর হইতে কিয়দূর যাইতেই, পুরীর শ্রীমন্দিরের চূড়া সকলের নয়নে উজ্জ্বলিত হইল, আর সেই এত দিনের অভীষ্ট বস্তু দর্শনে মহাপ্রভু প্রেমাবেশে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবাবেশে পুরী প্রবেশ করিয়া

প্রভু চকিতের মধ্যে শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং লক্ষ্য দিয়া যেমন শ্রীমূর্তি স্পর্শ করিলেন অমনি, প্রেমাবহ্নিলিত হইয়া ভাবাবেশে মুক্তি হইয়া পড়িলেন। দৈবযোগে সেই সময় ভুবন বিখ্যাত, নন্দীয়ার গোবরাবি, বাহুদেব সার্কর্ভৌম তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই নবীন সম্মাসীর অপূর্ণ প্রেমবিকাশ ও অলৌকিক ভাবাবেশ দেখিয়া অজ্ঞাতসারে প্রভুকে প্রাণ সমর্পণ করিলেন; তাই বহু পূর্বক জগন্নাথের পরিকরণদ্বারা বহন করাইয়া প্রভুকে নিজ বাস ভবনে লইয়া আসিলেন। সগোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য কিছু দিন সার্কর্ভৌমের বাটীতেই অবস্থান করিলেন। নিমাইয়ের মধুর সঙ্গে বেদান্তবাদী শত শত সম্মাসীর গুরু, নন্দীয়ার পণ্ডিত কুলরবি সার্কর্ভৌমের মন ভক্তিপথে ধাবিত হইল এবং শেষে শ্রীপ্রভুকে বেদান্তমতে শিক্ষা দিতে যাইয়া তিনি স্বয়ংই ভক্তিরূপে গলিয়া যান ও প্রভুর ষড়ভুজ মূর্তি দর্শনে স্তব করেন। সেই স্তবাবলী “চৈতন্য শতক” নামে আজিও ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছাস আনিয়া দিতেছে।

এইরূপে পণ্ডিতকুলেশ্বর সার্কর্ভৌম বিজ্ঞাত হইলে ক্রমে বহু সম্মাসী, দত্তী, মায়াবাদী পণ্ডিত ও অবিদ্বাসী অনেকেই নিষ্কিচারে শ্রীগৌরান্ন পাদে আশ্রয় সমর্পণ করেন। এমতে নীলাচলে দুই মাস প্রেমানন্দে আতিবহিত হইলে পর প্রভু এক দিন দক্ষিণকূল ভ্রমণে ইচ্ছা প্রকাশ করতঃ ভক্তগণের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং নীল প্রত্যাগমন করিবেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া একমাত্র কৃষ্ণদাস নামক ভট্ট নামক ভক্তিমান বিশ্রামে সঙ্গে লইয়া ১৪৩২ শকের (১৫১১ খ্রঃ অঃ) বৈশাখ মাসে দক্ষিণতা উদ্ভায় করিতে যাত্রা করিলেন* পথে অচিন্তনীয়, পরমাদৃত, অলৌকিক ঐশীশক্তি প্রকাশ করিয়া প্রভু দেহ চেষ্টাদি বিবহিত হইয়া নিত্য শুদ্ধ দীনবেশে দক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যখন তিনি কল্যাণীর্থে উপনীত হইলেন তখন, বাহুদেব নামে একজন মহাভাগ্য গ্রস্থ ভক্তিমান বাক্ষ্য আসিয়া প্রভুর শরণাগত হইলেন। দয়ালুতার তাঁহাকে নিত্য শুদ্ধ কাতর দেখিয়া সেই পুণীগন্ধময়, কীড়াসঙ্কুল ক্ষতবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে গা-

* মহাপ্রভুর দক্ষিণাত্য ভ্রমণের বিবরণ বিভিন্ন গ্রন্থে নানাক্রমে দেখা যায়, কিন্তু হু দক্ষিণাত্য ভ্রমণের পথ সম্বন্ধেই একরূপ নির্দেশ আছে। আমরা এখানে গোবিলের কথা অনুসরণ করিলাম।

নদীয়া-কাজিনী



শ্রী শ্রী জগদীশ্বরের মন্দির ।

এই মন্দির শ্রী স্বয়ং ১৫ তম্ভাংশে ইহার জীবনের বড় বড় মাপন করিয়াছিলেন ।

আলিঙ্গন প্রদানে ধন্য করিলেন । ব্রাহ্মণও দেবদুল্লভ শ্রীঅঙ্গের স্পর্শস্থল প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ দিব্য দেহ লাভ করতঃ প্রভুর চরণে আত্মবিক্রম করিলেন । এইরূপে আবিচারে, পতিত, অধম, দুর্জ্ঞান, কান্দাল সকলকে সমভাবে রূপাপূর্বক উদ্ধার করিয়া প্রভু জিয়ড নৃসিংহাদি তীর্থ দর্শন করিয়া ক্কাণসলীলা গোদাবরী তীরে উপনীত হইলেন । পরে গোদাবরী পার হইয়া রাজমাহেন্দ্রীনপুরে গমন করিলেন এবং তথায় রসিকশেখর রামানন্দের সহিত মিলিত হইলেন । রামানন্দের মুর সঙ্গে দশরাত্রি অতিবাহিত করিয়া এবং তহাকে আপনার ভুবনানন্দ মঙ্গলময় রূপ প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভু পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন । পূর্বের স্মার্য নাম কীতন করিতে করিতে প্রভু যে পথে চলিতে লাগিলেন তাহার চতুঃপার্শ্ব গ্রামে অমনি অননুভবনীয় ভাবে প্রেমের ঝটিকা বহিতে লাগিল । যে কেহ তাঁহার দর্শনলাভ করিলেন তিনিই প্রেমে মত্ত হইলেন ; আবার তাঁহাকে যিনি দর্শন বা স্পর্শ করিলেন তাঁহারও ঐরূপ অবস্থা হইল । এইরূপে সবত্র দাক্ষিণাত্যে অল্প কালের মধ্যে হরিনাম প্রচারিত হইল । প্রভু রামানন্দের নিকট বিদায় লইয়া প্রথমে ত্রিমল্লনগরে আগমন করেন ; তথা হইতে সিদ্ধবটেশ্বরে উপস্থিত হইলে তীর্থরাম নামক জনৈক ধনী, সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই নামক বৈশ্যদ্বয় দ্বারা তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রভুর শরচ্ছত্র মরিচাবৎ শুভ্র চরিত্রের প্রভাবে আপনাই পবিত্র হইয়া সম্মান গ্রহণ করেন । সিদ্ধবটেশ্বর হইতে মুন্নানগর, তথা হইতে বৈটকগিরী পরে বণ্ডলাবনে ভীলপঞ্চ দ্বন্দ্বকে উদ্ধার করিয়া গিরীশ্বরে গমন করেন । গিরীশ্বর হইতে ত্রিপদী নগর তথা হইতে পাণা নরসিংহ দর্শন করিয়া বিষ্ণু কাকিণ্ডে, ক্রমে কালতীর্থ, সঙ্কিতীর্থ, চাইপন্নী নগর, নাগরনগর, তাঞ্জোর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া চতালু পর্বত পার হইয়া পল্লকোট, তথা হইতে ত্রিপাত্র নগরে তথা হইতে এক সুদীর্ঘ বন অতিক্রম পূর্বক রঙ্গধামে উপনীত হইলেন । তথা হইতে সমুদ্র উপকূলে রামনাথ নগরে, পরে তথা হইতে সেতুবন্ধরামেশ্বরে উপনীত হইলেন । সেতুবন্ধ হইতে বহির্গত হইয়া মাঞ্চীকবনে প্রবেশ করেন এবং তত্ত্রপর্বা পার হইয়া কন্ডাকুমারীতে উপস্থিত হইলেন । এখান হইতে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে পদার্পণ করেন ও তদানীন্তন রাজা রুদ্রপতিকেকে কৃতার্থ করিয়া, পরোষ্ঠী, মংস্ত্রতীর্থ, কাছাড়, তদ্বানন্দী, নাগপাতনদী প্রভৃতি পার হইয়া চিত্রলে গমন করেন । তথা হইতে চণ্ডপুর ও ওর্করী নগর

অতিক্রম করিয়া পূর্ণনগরে অর্থাৎ বর্তমান পূর্ণানগরে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে এই পূর্ণানগর বিদ্যাচর্চার জন্য অতি প্রসিদ্ধ ছিল। এখান হইতে জোজুরীনগর পরে চোরানদীবন অতিক্রম করিয়া নাসিকে প্রবেশ করেন। নাসিক হইতে বিদগ্ধিত হইয়া ত্রিষক, দমননগর, ভঁরোচ প্রভৃতি পশ্চাৎ করিয়া বরদারাজ্যে পদার্পণ করেন। তথা হইতে সম্যক্শিশালী আহমদাবাদ, ষোংগ, জাকরাবাদ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া সোমনাথে আগমন করেন। সোমনাথ হইতে গুণার পক্ষিত অতিক্রম করিয়া ১লা আশ্বিন দ্বারকা, তথা হইতে ১৬ আশ্বিন নর্মদাতীরে দোহাদনগর, ত্র্যমে কুল্লি, আমকোড়া, মন্সুর, দেওঘর, চণ্ডীপুর, রায়পুর অতিক্রম করিয়া রায় রামানন্দের বাসভূমি বিদ্যানগরে গমন করেন। তথায় কিয়দ্বিবস অতিবাহিত করিয়া মহানদী পার হইয়া স্বর্ণগড়ে প্রবেশ করেন। তথা হইতে সম্বলপুর, দাশপাল প্রভৃতি পশ্চাৎ করিয়া আলালনাথে প্রত্যাবর্তন করেন। এই আলালনাথ হইতে প্রভু সমভিব্যাহারী কৃষ্ণদাসকে নীলাচলে প্রেরণ করিলেন। নিত্যানন্দাদি তাহার আগমনবার্তা শ্রীশ্রু হইয়া মহাকুতূহলে তথায় আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভুও তাঁহাদের শ্রীশ্রু হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে কীর্তন রঙ্গে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শত শত যোজন পথ, অরণ্য প্রান্তর, গিরী, নদী অতিক্রম করিয়া এবং পৃথিব্যে শৈব, রামাং, বৌদ্ধ, এমন কি মুসলমান, পাঠান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ী ও ধর্ম্মাবলম্বী সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়া এক বৎসর আট মাস ষড়বিংশতি দিন পরে (১৫১১ খ্রঃ ১৫৩০ শকে) ৩রা মাঘ তারিখে পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনান্তে কাশীমিশ্রের ভবনে রহিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলবাসী অসংখ্য ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহাদের ভক্তিপূর্ণ পূজাদি গ্রহণ করতঃ তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। এখানেই চৈতন্যলীলার অর্দ্ধপাত্র শিখি মাইতি রামানন্দের পিতা ভবানন্দ ও তাঁহার আর চারি পুত্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র এবং হুই পূর্ণপাত্র স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দের সহিত প্রভুর মিলন হয়। শ্রীপাদ অষ্টৈতপ্রভু মহাপ্রভুর প্রত্যাগমনের কুশলবার্তা পাইয়া অহাদ্রাঘে মহোৎসবে রত হইলেন, পরে তিনি সমবেত ভক্তগণের ঐকান্তিক উৎসুক্যে বিচলিত হইয়া শচী ও বিষ্ণুপ্রসার আদেশ লইয়া, মুরারী, হরিদাস প্রভৃতি বহু স্ত্রীপুরুষ ভক্ত সমভিব্যাহারে রথযাত্রার অব্যবহিত পূর্বে শ্রীচৈতন্য

নয়ন পূর্বক প্রভু মিলনে নীলাচল উদ্দেশে যাত্রা করিলেন । নীলাচলে প্রাণাধিক প্রিয় প্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া ভক্তগণ সংকীর্ণনানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে রথ যাত্রার কাল আসিয়া উপস্থিত হইল । ঐ দিন প্রভু প্রত্যুষে স্নানাদি সমাপন করিয়া ভক্তবৃন্দ সঙ্গে রথযাত্রা দর্শনে গমন করিলেন । সেই সুসজ্জিত পতাকাদি শোভিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিরাজিত অপূর্ব রথশ্রী দর্শনে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । ক্রমে বাহুজ্ঞান বিরহিত হইয়া ভুলুপ্তি হইলেন । এই সময়ে উৎকলাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্র, যিনি বিঘ্নী বিধার বহু চেষ্টাতেও এতাবৎ প্রভুর কৃপালাভে সমর্থ হয়েন নাই, দীন বৈষ্ণব-বেশে তথায় গমন করিয়া বাহু জ্ঞান বিরহিত প্রভুর পাদ সন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবৎ হইতে সম্বোধিত এক শ্লোক পাঠ করিলে প্রেমের পাগল ঠাকুরটী, ভাগবৎ শ্রবণে বাহু পাইয়া ও উল্লসিত হইয়া রাজাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন । এইরূপ নানা মহোৎসবে রথযাত্রা সমাপ্ত হইলে গোড়ীয় ভক্তগণ কার্তিক মাহার উখান দ্বাদশী পর্য্যন্ত নীলাচলে বাস করিলেন পরে শ্রীপ্রভুর, আদেশ ক্রমে সকলে দেশে প্রত্যাবর্তন করিলে । কেবল মাত্র গঙ্গাধর দণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, পরমানন্দপুরী, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি দশজন প্রভুর নিকট রহিলেন । ক্রমে তিন বৎসর অতিবাহিত হইল । গোড়ীয় ভক্তগণও প্রতিবৎসর প্রভু দর্শনে নীলাচলে আসিতে লাগিলেন । এই তৃতীয় বৎসরে প্রভু যখন ভক্তগণকে বিদায় দিতে উদ্যত হইলেন তখন তিনি শ্রীপাদ নিত্য-নন্দের প্রতি আদেশ করিলেন যে প্রতি বৎসর নীলাচলে না আসিয়া তিনি গোড়ে রহিয়া আচণ্ডালে নাম বিলাইবেন । প্রভু এইরূপে আরও ২ বৎসর কাল নীলাচলে অবস্থিতি করিলেন । অনন্তর সার্কর্ভোমাদি ভক্তগণের সম্বৃতিক্রমে গোড় হইয়া বৃন্দাবন যাইবেন এইরূপ স্থির করিয়া বিজয়া দশমীর দিন প্রভাতে প্রভু নীলাচল চন্দ্রের ইন্দুবদন দর্শন করিয়া শুভযাত্রা করিলেন । পরে কটকে আসিয়া সপরিবার প্রতাপ রুদ্রকে কৃতার্থ করিয়া প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিয়া গোড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং কিছুদিনে শ্রীপাট খড়দহের নিকটবর্তী পাণিহাটী গ্রামে রাখব পণ্ডিতের আশ্রয়ে উপস্থিত হইলেন । এই রাখব, প্রভুর একজন অতি প্রিয়ভক্ত ছিলেন । এখান হইতে তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের কুমারহট্ট নৃতন ভবনে উপস্থিত হইলেন । কুমার হট্ট (বর্তমান হালিসহর গ্রাম) শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর

জন্মস্থান, তাই এখানে আসিয়া প্রভু চুল্লিত জ্ঞানে কুমার দট্টের শুল্লিগেণে উত্তরীয়
অঞ্চলে বাধিতে লাগিলেন। ভক্তপ্রধান ভাগ্যবান শ্রীবাসকে কৃতার্থ করিয়া
ভক্তগত প্রাণ প্রভু কাঞ্চনপল্লীর (বর্তমান কাঁচড়াপাড়া) শিবানন্দের ভবনে
গমন করিলেন। তথা হইতে উক্ত গ্রামবাসী বাসুদেবের বাটীগমন করিলেন।
এই যে প্রভু নীলাচল, হইতে শত শত ক্রোশ পথ অতিবাহন করিয়া দেশে
প্রত্যাবর্তন করিতেছেন সে একাকী আগিতেছেন না; যে অপূর্ণ শক্তি প্রকাশ
করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি হরিনাম প্রাবিত করিয়াছিলেন, এই সমগ্র পথও
সে শক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়া চলিতেছেন আর তাঁহার সঙ্গে সংখ্যাভীত জনপ্রবাহ
এক মহা আকর্ষণের বলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে। শ্রীপ্রভু কাঞ্চনপল্লী ত্যাগ
করিয়া নৌকাযোগে শান্তিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, আর অমনি অসংখ্য লোক
কূলে কূলে তাঁহার অনুসরণ করিল। এইরূপ অসংখ্য ভক্ত পরিবেষ্টিত
শ্রীশ্রীঅষ্টৈভের প্রাণনাথ শান্তিপুর্বে অষ্টৈভত মন্দিরে শুভাগমন করিলেন। বহুদিন
পরে চিরবাস্তিত হারানিধিকে পাইয়া অষ্টৈভদি ভক্তগণের যে মহানন্দ জন্মিল
তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। শান্তিপুর্ হইতে নবদ্বীপচন্দ্র, শচীচুল্লি,
শ্রীবিষ্ণু'প্রসারবহত, নদীয়ার সর্কস প্রভু নবদ্বীপের একংশ বিদ্যানগরে আসিয়া
উপনীত হইলেন। আর কিছুদিন এই চির প্রিয় ভূমিতে শান্তিতে থাকিবার
মানসে গোপনে সার্কসভোমের ভাতা বাচস্পতির গৃহে উপনীত হইলেন। বাচস্পতি
গৃহস্থের বৈষ্ণবনাথকে অতিথিপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দে দিশেহারা হইলেন, আর
পুলকপূরিত অন্ত্রে গোপনে প্রভুর সেবায় রত হইলেন। ক্রমে যখন প্রভুর
নবদ্বীপ আগমন বার্তা চতুর্দিকে প্রচারিত হইল তখন দলে দলে লোক সকল
আসিয়া বাচস্পতির গৃহপ্রাক্ষণ পূর্ণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রঙ্গণ
পূর্ণ হইয়া গেল, তখন সকলে নিকটবর্তী রাস্তাও মাঠ সমবেত হইতে লাগিল।
ক্রমে যখন তাহাতেও স্থান সংকুলান হইল না—তখন লোকে অপথ, বন, জঙ্গল,
বৃক্ষশাখা প্রভৃতিতে স্থান গ্রহণ করিল। এইরূপে বিদ্যানগরে যখন মহাজনতা
হইল, তখন লীলাময় প্রভু বাচস্পতির গৃহত্যাগ করিয়া গঙ্গার তটস্থ কুলিয়াগ্রামে
মাধবদাসের বাটী যাইয়া উপনীত হইলেন। এই কুলিয়াগ্রামেই পরম ভাগবত
দেবানন্দ ঠাকুরের অপরাধ ভঞ্জন হয়। তিনি পূর্বে মারাবাদী ছিলেন এবং
শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্বহীন ব্যাখ্যা করিতেন। প্রভুর নবদ্বীপ বাসকালে দেবানন্দকে

তিনি এ বিষয়ে উপদেশ দিলেও মহাশয় দেবানন্দ প্রভুকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার কথা অবহেলা করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভক্ত শিরোমণি বক্রেশ্বরের রূপায় দেবানন্দ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া প্রভুর চরণে শরণ লইলেন। দয়াময় প্রভুও তাঁহার সর্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে আপনার সুশীতল বক্ষে গ্রহণ করিলেন। দেবানন্দ তখন শুদ্ধমতি হইয়াছেন, সুতরাং আপনার সুধাপেক্ষা পরের সুখের প্রতি তখন তাঁহার দৃষ্টি সমাধিক তাই, প্রভুর এই কথায় সাহস পাইয়া বর প্রার্থনা করিলেন যে, “যে কেহ এই ক্ষেত্রে আসিয়া অপরাধ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিবে প্রভু যেন অবিচরে তাহার অপরাধ ভঞ্জন করেন।” প্রভুও ভক্তিমান দেবানন্দের প্রার্থনায় তাঁহার অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তদবধি কুলিয়া “অপরাধ ভঞ্নের পাট” বলিয়া খ্যাত হয়। কিন্তু কলির জীবের এমনি হুভাগ্য যে এই শ্রীপাটের নিদর্শন নবমীপের সন্নিহিতে কোথাও পাওয়া যায় না; বুদ্ধি গঙ্গাদেবী এই লোভময় পবিত্র তীর্থের মায়া ছাড়িতে না পারিয়া আপনার পবিত্র বক্ষে ইহাকে রক্ষা করিতেছেন। এই কুলিয়া গ্রামেই শ্রীপ্রভু আত্মজনের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করেন। এইখানেই শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং ত্রিলোক পূজ্য স্বামীর স্নেহের শেষ নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার শ্রীপদের কাষ্ঠপাছুকা যোড়াটী প্রাপ্ত হইলেন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীপ্রভুর আদেশ ক্রমে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ মূর্তি স্থাপনা করেন। বিষ্ণুপ্রিয়া স্থাপিত এই মূর্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন।

কুলিয়া হইতে মহাপ্রভু গঙ্গার তীরে তীরে রামকেলীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই রামকেলী গ্রাম তদানীন্তন বঙ্গের রাজধানী গোঁড়ের এক অংশ বিশেষ। পাঠান বংশীয় সৈয়দ হুসেন সাহা তখন এখানে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই হুসেন সাহা রাজকীয় সভায় রূপ ও সনাতন নামে দুই ভ্রাতা “দরির খাস ও সাকার মল্লিক” পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দুই ভ্রাতার রাজ সংসারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ইহারা সতত মুসলমান সহবাসে বাবনিক ভাব প্রাপ্ত হইলেও পূর্ব সংস্কারবশতঃ বিলক্ষণ ভক্তিমান ছিলেন। প্রভু ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া গোড় হইতে শান্তিপুরে অবৈতভবনে গমন করিলেন। তথায় ক্রিয়দ্বিস অতি-বাহিত করিয়া পরিশেষে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এখানে বর্ষার চারিমাস অতিবাহিত করিয়া তিনি একদা বলভদ্র নামক অনেক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া

রাত্রিশেষে গোপনে শ্রীকৃষ্ণাবন যাত্রা করিলেন । ইচ্ছাময় প্রভু লোকচক্ষু হইতে অন্তরালে থাকিবার মানসে বিশেষে স্বাপন সঙ্কল হুর্গম অরণ্য মধ্য দিয়া গমন করতঃ অবশেষে কালীধামে উপনীত হইলেন এবং তদীয় পুরাতন ভক্ত তপন মিশ্রের ভবনে কয়েক দিবস অতিবাহিত করিলেন । পরে তদানীন্তন কালীয়ার জগৎগুরু, মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত, দত্তী সম্রাসীয়া রাজা, দ্বিতীয় বিবেকবরের ছায় মহামায়া প্রকাশনন্দ সরস্বতীর সহিত সে যাত্রা সাক্ষ্যাৎ না করিয়াই, শ্রীকৃষ্ণাবন দর্শনে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া মথুরাভিমুখে ছুটিলেন এবং শীঘ্রই এয়াগে আসিয়া উপনীত হইলেন । এই কৃষ্ণাবন যাত্রার পথে প্রভু বাহাকে পাইতেছেন তাহাকেই অকাতরে প্রেম বিলাইয়া চলিতেছেন ; অর্থাৎ দক্ষিণাত্য ভ্রমণে যে অপূর্ব শক্তির বিকাশ করিয়াছিলেন এখানেও সেইরূপ করিলেন । এইরূপে পথে প্রেম বিলাইয়া ও স্বয়ং ভাবাতিশয্যে বাহু বিরহিত হইয়া প্রভু চলিতে চলিতে কৃষ্ণাবন উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন ; এক্ষণে সম্মুখে চিত্রাভিলষিত, চিত্রাকাঙ্ক্ষিত শ্রীযমুনাদর্শনে প্রভু প্রেম বিহ্বল হইয়া যমুনার কল্মষপ্রদান করিলেন । এইরূপে যেখানে যেখানে যমুনা দর্শন পাইলেন সেইখানেই মহাকৃত্তহলে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন । এইরূপ প্রেমে অচেতন হইয়া প্রভু মথুরায় আসিয়া উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যে কৃষ্ণাবনের নামমাত্র শ্রবণে প্রভুর স্বর্ছা হয়, যাহার বুলীয়েণু পাইলে জলন্ত জ্ঞানে মহানন্দে প্রভু কালতিপাত করেন, বহুদিন হইতে যেখানে আসিবার জন্য তিনি উন্নত আঙ্গ সেই মধুর শ্রীকৃষ্ণাবনে আসিয়া যে প্রেমের কটিকা প্রবাহিত করিলেন তাহা বর্ণনাতীত । মুক্তি হার পরমারাধ্য পরম ভাগবত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তগণ সে ভাবের কথকিং আভাষ দিয়াছেন মাত্র । ক্রমে কৃষ্ণ প্রেমে তন্ময় হইয়া প্রভু চৌরাস্তী ক্রোশ পরিমিত কৃষ্ণাবন পরিক্রমায় রত হইলেন এবং লুপ্তপ্রায় মহাতীর্থগুলি এক একটা করিয়া প্রকাশ করিলেন । আজ যে বিশাল পুরীকে আমরা শ্রীকৃষ্ণাবন বলিয়া পূজা করিয়া থাকি তাহা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রকাশিত ।

কৃষ্ণাবনে কিছুদিন বাস করিয়া ইচ্ছাময় প্রভু পুনরায় এয়াগে প্রত্যাবর্তন করিলেন । পথিমধ্যে কতকগুলি পাঠানকে কৃষ্ণনাম দিয়া উদ্ধার করিলেন । এই ভাগ্যবান পাঠানগণ প্রভুর কৃপায় মহাতাপবত হইয়া সর্বত্র কৃষ্ণনাম প্রচার করিতে লাগিলেন এক ইছারা পাঠান নৌসাই নামে খ্যাত হইলেন । এইরূপে

পথে হরিনাম নির্দিষ্ট বিলাইয়া শ্রীশ্রী প্রয়াগে প্রত্যাবর্তন করিলে শ্রীকৃষ্ণ গোবামা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন ; রূপ সনাতন শ্রীপ্রভুর চরণে গুণ লাভ পর্যন্ত রাজকর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন । রূপ শ্রীপ্রভুর বৃন্দাবন যাত্রার সংবাদ পাইয়া আপনার সমস্ত সম্পদাদি বৈষ্ণবগণকে বণ্টন পূর্বক প্রভু মিলনে যাত্রা করেন এবং বহুপথ পর্যটন করতঃ প্রয়াগে আসিলে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় । প্রভু, রূপকে সঙ্গে লইয়া এখান হইতে কাশীধামে উপনীত হইলেন । কাশীধাম তখন মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও দণ্ডাগণের রাজ্য এবং প্রকাশানন্দ স্বামী সেই রাজ্যের রাজা, তাঁহার শিষ্য সংখ্যা তখন দশসহস্র, আবার এই দশসহস্র শিষ্যের প্রত্যেকের দুই, চারি, দশটা করিয়া চেলা ; সুতরাং প্রকাশানন্দকে তৎকালীন সন্ন্যাসী শিরোমণি বলিলে অত্যুক্তি হয় না । এই সন্ন্যাসী প্রধান কাশীধামে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত পুনরাগমন করিয়াছেন এই সংবাদে, কাশীবাসী, মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ নানামতে সর্বত্র তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । প্রভুর ভক্তগণ এই নিন্দাবাদে যৎপরোনাস্তি কষ্ট অনুভব করিলেন এবং পরিশেষে সকলে যুক্তি করিয়া একদিন তাঁহাদেরই একজনের বাটীতে কাশীর সমস্ত সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করিলেন । সে সভায় তাঁহারা প্রভুকে অস্বস্তান করিলেন কেননা তাঁহাদের মনে দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে একবার মাত্র শ্রীপ্রভুর চন্দ্রবদন দর্শন করিলে ও তাঁহার সঙ্গিত মিলিত হইলে তাহাদের আর সে ভাব কিছুতেই থাকিবে না । ক্রমে সকল সন্ন্যাসী সমবেত হইলে প্রকাশানন্দ স্বামী আসিয়া সভারোহণ করিলেন এবং শ্রীচৈতন্ত্যর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । এ দিকে প্রভু যখন শুনিগেন সভায় দশসহস্রের উপরও সন্ন্যাসী সমবেত হইয়াছেন এবং সকলে তাঁহার জন্য উদ্‌যমী হইয়াছেন, তখন, অতি দীনবেশে সনাতনাদি চারিজন মাত্র সঙ্গী সমভিষ্যাহারে সভায় উপস্থিত হইলেন । সন্ন্যাসীগণ এতাবৎ প্রভুর নিন্দা করিয়া বেড়াইলেও কখন তাঁহাকে দর্শন করেন নাই এবং মনে করিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত ভারতী বৃষ্টি তাঁহাদেরই মত একজন দাস্তিক, পুরুষ—হয়ত তাঁহাদের অপেক্ষাও দাস্তিক ; কিন্তু যখন তাঁহারা প্রভুর দীনাত্মক মুক্তি ও সঙ্কল্প বৈষ্ণববেশ দেখিলেন এবং তাঁহার বিনয় নম্র বচন শ্রবণ পান করিলেন তখন তাহাদের মনে হইতে লাগিল যে এই নিরাকার দেব হুল্ললিত মুখমণ্ডলিক অনবধিক হিংসা করিয়া ভাল কাব্য করেন নাই । আবার যখন দর্শন পাইলেন প্রভু শান্তমুখি অনুদারে তাঁহাদের

সমস্ত কুতর্ক জাল ধ্বংস করিয়া, মায়াবাদের অসারত্ব প্রতিপাদন পূর্বক, বিতর্কমত এবং ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিলেন তখন, তাঁহার অপূর্ণ বিচার শক্তি, অলৌকিক ভূয়োদর্শন এবং অসামান্য পাণ্ডিত্য দেখিয়া সকলে নিস্কাক হইয়া রহিলেন। পাণ্ডিত্যগগন্য, সুকোমল চরিত্র প্রকাশনকণ্ড প্রভূর প্রেম-ভক্তিপূর্ণ শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং ভাবাতিশয্যে প্রভুর চরণে শয়ন লইলেন। এই প্রকাশনকণ্ড, প্রভুর কৃপাকণা লাভ করতঃ উত্তর কালে বৈষ্ণব জগতে তন্ত্র শিরোমণি প্রবোধানন্দ নামে খ্যাত হইলেন। এই মহাপণ্ডিত শ্রীপ্রভুর গুণাবলী স্মরণ করিয়া যে সুমধুর স্তবাবলী রচনা করিয়াছেন তাহাই “চৈতন্ত চন্দ্রামৃত” নামে খ্যাত। ইনি এক স্থানে হুঃখ করিয়া বলিতেছেন—

“বকিতে হস্মি বকিতে হস্মি বকিতে হস্মি ন সংশয়।

বিধং গৌরবসে মধ্যং স্পর্শোপি মম নাভবং ॥

দন্তে নিবায় কৃৎকং পদয়োর্ণিপত্য—

—কৃচ্ছচ কাকুশতমেতদহং ব্রবামি।

হে মাধব সকল যেন বিহায় দূরাদৃ—

—গৌরান্দ্রচন্দ্র চরণে কুরুতমুগাণং ॥”

এইরূপে কানীতে হরিনামের ধ্বজা উত্তোলন করিয়া এবং প্রবোধানন্দ, সনাতনাদিকে শিক্ষা প্রদান পূর্বক শ্রীকৃষ্ণাবনে ধর্ম্য প্রচারার্থ প্রেরণ করিয়া শ্রীপ্রভু পুনরায় নীলাচলে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইলে স্বরূপ দামোদর এ সংবাদ গোঁড়ে প্রেরণ করিলেন। গোড়ীর ভক্তগণও পূর্বের ছায় শচীমাতার অনুষ্ঠি গ্রহণ করিয়া প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্বে নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিতে লাগিলেন। নীলাচলে প্রত্যাবহনের পর হইতেই ক্রমেক্রমে প্রভু নিশিদিন বাহ্য বিরহিত হইয়া মহাভাবসাগরের অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে যতই দিন গত হইতে লাগিল শ্রীপ্রভুর প্রেমবৈকল্যও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এ অবস্থাও অধিক দিন স্থায়ী হইল না। প্রেমোন্মাদ অবস্থা ক্রমেই অধিক বদ্ধিত হওয়ায় শ্রীপ্রভু আর প্রায় কংসারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। এই সময়ে তাঁহার প্রেমবিকার জনিত নানা প্রকার অদৃত ও অপূর্ণ শাস্ত্রিকভাষ প্রকাশিত হইতে লাগিল। স্বরূপ দামোদরাদি ভক্তগণ একদিন শ্রদ্ধে গৃহে বেধিতে না পাইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে ভগ্নদ্বারের নিঃসার

সমীপে উপস্থিত হইলে দেখিলেন, শ্রীপ্রভু বাহুবিরহিত অবস্থায় ধরাশায়ী রহিয়াছেন। শরীর নিষ্পন্দ—নাসিকার বাস প্রবাসের লক্ষণ মাত্রও অনুভূত হইতেছে না,—হস্তপদাদির সমুদয় গ্রন্থি শিথিল হওয়ায় শরীর অত্যন্ত দীঘল হইয়াছে—কেবল চর্ম্মাচ্ছাদিত রহিয়াছে মাত্র। প্রভুর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ মহাশোকে হাহাকার করিয়া উঠিলেন—

“স্বরূপ গোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া।

প্রভুর কানে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা।

বহুকণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিল।

হরিবোল বলি প্রভু গর্জিয়া উঠিল” ॥

অপর এক দিবস আচম্বিতে কৃষ্ণবেণু গান শ্রবণ করিয়া ভাবাবেশে শ্রীপ্রভু দক্ষিণ সিংহদ্বারে বাইয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ বাইয়া দেখিলেন যে, প্রভুর সেই শুদীর্ঘ শ্রীঅঙ্গ কুম্ভাণ্ডাকার ধারণ করিয়াছে। হস্তপদাদি যাবৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে; তখন সকলে মিলিয়া সেই বরবণু বহন করতঃ গৃহে আনিলেন। আর—

“উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সংকীর্তন।

অনেককণে মহাপ্রভু পাইল চেতন ॥”

অপর এক নিশিতে প্রভুর প্রেমোন্মাদ সাতিশয় বর্দ্ধিত হওয়ায়, চন্দ্রকান্ধী বিভাসিত, চাকচিক্যময়, তরঙ্গায়িত, সুনীল পরোধীবক্ক দর্শনে হৃদয়ে রাধাকৃষ্ণের জলকলৌ ক্ষুতি হওয়ায় যমুনাভ্রমে তিনি সমুদ্রবক্ষে ঝম্পপ্রদান করেন। এ দিন ভক্তগণ বহু অনুসন্ধানেনও যখন প্রভুর কোন সংবাদ পাইলেন না, তখন প্রভু বুঝি অন্তর্ধান করিলেন এই মনে করিয়া সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। এই সময়ে স্বরূপ দামোদর একজন ধীবরকে হরিষ্বনি করিয়া উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে দেখিয়া, সন্ধিহান হইয়া ঐ ধীবরকে শ্রীপ্রভুর বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। যথা চৈতন্য চরিতামৃত—

“কহ জালিয়া ঐ দিকে দেখিলে একজন।

তোমার এই দশা কেন কহত কারণ ॥

“জালিয়া কহে ইহা এক মনুষ্য না দেখিল।
 জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল ॥
 বড় মন্ত বলি আমি উঠাইল বতনে।
 মৃতকে দেখিতে মোর ভয় হইল মনে ॥
 জাল ধসাইতে তার অঙ্গস্পর্শ হইল।
 স্পর্শ মাত্র সেই ভূত জন্মে পশিল ॥
 ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল।
 গদ গদ বাণী মোর উঠিল সকল ॥
 কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
 দর্শন মাত্রে মনুষ্যের পশে সেই কায় ॥”

ভাগ্যবান জালিয়া যখন এইরূপে প্রভুর স্রুপ বর্ণন করিলেন, তখন ভক্তগণ
 আনন্দে হরিনাম করিয়া উঠিলেন এবং সকলে ক্রুত সমুদ্রতটে যাইয়া দেখিলেন
 সেই কমলামেবিত “পুরট-সুন্দর-হাতি কদম্ব সন্দীপিত” ঐ অঙ্গ—

“ভূমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ শব কায়।
 জলে খেত তমু বালু লাগিয়াছে গায় ॥
 অতি দীর্ঘ শিখিল তমু চর্ম্ম লটকায়।
 দূর পথ উঠাইয়া আননে না যায় ॥”

তখন সকলে মিলিয়া প্রভুর সেবার রত হইলেন। কেহ আদ্র কোপীন দূর
 করিয়া শুষ্ক বস্ত্র দিলেন, কেহ ঐ অঙ্গের বালুকাকণা ছাড়াইতে লাগিলেন;
 কেহ কেহ বহির্কাস পাতিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া প্রভুকে সেই শয্যায় শায়িত
 করিলেন। এবং সকলে মিলিয়া তখন উচ্চ হরি সংকীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন—

“কতক্ষেপে প্রভুক্ষেপে শব পরশিল।
 হৃদয় করিয়া প্রভু তবহি উঠিল ॥”

উপর্যুপরি প্রভুর এইরূপ প্রেমবিকার ও মহাতাব সমাধি অবলোকন করিয়া
 ভক্তগণ চিন্তিত হইলেন। সকলের মনে কেমন একটা আশঙ্কা জন্মিল যে, আর
 বুঝি তাঁহারা তাঁহাদের প্রেমশৃঙ্খলে প্রভুকে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না; কিন্তু
 এই মর্শ্বপ্রসূ হিরকারী নিদারুণ কথা মনে হইলেও কেহ যুখে আনিতে পারিলেন

না। তাই সকলেই আপনি আপনি মনে বুঝিয়া সতর্কে প্রহুকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই প্রেমপূর্ণ সযত্ন অহুকে কোন ফল হইল না, কেননা ইচ্ছাময়, লীলাময় প্রভু যে মহৎকার্য সাধন করিতে গোলক ত্যাগ করিয়া মর্তের আবির্ভূত ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই মহানকার্য, অর্থাৎ “জীবে দয়া, নামে রুচি” আশ্রয় চরিত্রে আচরণ করিয়া লোক শিক্ষা দেওয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। সুতরাং সেই ভক্তাবতার প্রভুর এই অপূর্ণ প্রেমময় লীলার অবসান কাল নিকট হইয়া আসিতেছিল।

একদিন ভক্তগণকে লইয়া হৃন্দাবনলীলারস আশ্বাসন করিতে করিতে প্রভু ভাববিষ্ট হইয়া নীরব হইলেন এবং উঠিয়া ক্ষুণ্ণদেহে জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরাভিমুখে ছুটিলেন। ভক্তগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। প্রভু ক্ষুণ্ণমনে শ্রীমন্দিরাত্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে মন্দিরদ্বার আপনা হইতে রুদ্ধ হইয়া গেল। বাটীর অভ্যন্তরে ভোগমন্দির প্রভৃতি স্থানে দুই একজন জগন্নাথের সেবক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা, প্রভুকে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া জগন্নাথ দেবকে আলিঙ্গন করিতে দেখিলেন এবং পরক্ষণেই বাহিরে ভক্তগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া ক্ষুণ্ণ আসিয়া দ্বারমোচন করিলেন। ভক্তগণ পথ পাইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন কিন্তু কেহই আর প্রভুর সাক্ষ্যাৎ পাইলেন না, তখন সকলে প্রভুর অন্তর্ধান বুঝিতে পারিয়া আত্মনাদ করিয়া উঠিলেন এবং মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই মহাশোকের বার্তা চতুর্দিকে প্রচারিত হইল, এবং দেখিতে দেখিতে শ্রীমন্দির শোকাকুল ভক্তবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ক্রমে এ নিম্নাক্রম সংবাদ ভারতবর্ষীয় যাবতীয় ভক্তগণের নিকট প্রচারিত হইলে সমগ্র ভারতবর্ষে যে মহাশোকানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল তাহা বর্ণনা করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।

এইরূপে ১৪৫৫ শকে এই অপূর্ণ দেবলীলার অবসান হয়। এই অমিয়ময় চরিত, কণকপুতী, প্রেমের মুক্তি দেবশিশুটী ১৪০৭ শকে নবদ্বীপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, চতুর্দশশত বৎসর বয়ঃকালে শ্রীকেশব ভারতীর নিকট কাকন নদীর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, ক্রমিক ছয় বৎসরকাল ভারতের সর্বভৌর্য পর্ষটন পূর্বক, জীবনের শেষ অন্তঃকাল বৎসর নীলাচলে বাস করেন ও ১৪৫৫ শকে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে অগ্রকট করেন। এই অলৌকিক, অপূর্ণ জীবনে যে হৃদয়-

শ্রেয়, অনন্ত-ভাব-সমাবেশ ও অপূৰ্ণ ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা সুবিস্তারে বর্ণনা করিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া পড়ে । আমরা এই স্বল্প কয়েক পৃষ্ঠায় সেই পুণ্যলোক মহান চরিত্রের আভাষ মাত্র দিতে চেষ্টা পাইয়াছি । যে মধুর হইতে সুমধুর পবিত্র কাহিনী বহুদিন ধরিয়া বর্ণনা করিলেও কিছুই বলা হয় না, ষাঁহ'র এক এক দিনের জীবনী কথা লইয়া বিচার ও ভাবনা করিলে এক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে, সেই মহাপুরুষের মহান চরিত্র গাঁথা এই স্বল্প কয়েক পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র । তবে এই মহাপুরুষকে লইয়াই নদীয়া, এবং নদীয়া-কাহিনী বলিতে সৰ্ব্বাঙ্গে তাঁহারই প্রেমময় কাহিনী মনে আসে বলিয়া আমার এই হাস্কর উদ্যম ।

নদীয়ার বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় ।

বর্তমান নদীয়ার জনসংখ্যা ১,৬৬৭,৪২১ জন। ইহার মধ্যে ৬৭৬,৩২১ সংখ্যক নরনারী নানা শ্রেণীভুক্ত হিন্দু ; ৯৮২, ৯৮৭ জন মুসলমান, ৮০২১ জন খৃষ্টান এবং অবশিষ্ট সংখ্যক নানা ধর্মাবলম্বী।

পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলিতে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, নদীয়া, হিন্দু প্রধান স্থান হইলেও জনসংখ্যা হিসাবে এখানে মুসলমানেরই প্রাধান্ত অধিক। ইহার কারণ নিম্ন লিখিতরূপ অনুমান করা যায়। ১ম,—মুসলমানাধিকারে সময়ে সময়ে মুসলমানগণ বল প্রকাশ দ্বারা গ্রামকে গ্রাম মুসলমান করিয়াছিল। ২য়,—হিন্দুর মধ্যে যে সকল হীন জাতীয় ব্যক্তিগণ সমাজের চক্ষে অতি ঘৃণিত ভাবে দৃষ্ট হইত, তাহারা তৎকালিক দেশের রাজার সহিত সমধর্মী হইয়া কথঞ্চিৎ উন্নত হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। এখনও যে এতদ্দেশে ভদ্র অপেক্ষা নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণ অধিক পরিমাণে ষষ্ঠধর্মামুবর্তন করিয়া থাকে তাহার কারণও এই। ৩য়,—ঢাকা ও মুরসিদাবাদের মুসলমান প্রভাব নদীয়া প্রভৃতি স্থানে প্রবল ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

মুসলমান ।

নদীয়া জেলার মুসলমানগণের অধিকাংশই দরিদ্র কৃষিজীবী মাত্র। কচিং কোথাও দুই একজন বান্ধিত লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল মুসলমানগণের আচার ব্যবহার অনেক বিষয়ে হিন্দুর জায়। এমন কি হিন্দুর কোন কোনও দেব দেবীও ইহাদের অনেকের নিকট বিশেষভাবে পূজা পাইয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে বিদ্যাচর্চা অথবা অন্য কোনরূপ উন্নতি কিছুই পরিলক্ষিত হইতেছে না। ইহাদের মধ্যে সিয়া ও হুন্নি উভয় শ্রেণীর লোকই বিদ্যমান এবং অধিকাংশমতেই ধর্ম সম্বন্ধে ইহারা একেবারে অন্ধ। বাহা বংশনত প্রথা চলিয়া আসিতেছে, মাত্র তাহাই উদ্‌যাপন করিয়াই ইহারা ধর্মোচরণ সম্পন্ন হইল মনে করে। ইদানীং

পারশু ভাষার চর্চা আলো না থাকায় ইহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ধর্মপুস্তক সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানই হুঁট হয় না। মুসলমান মোদ্দাগণের অচিরাত্ এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত, অন্তথা আর কিছু দিনে এই সকল নিরক্ষর মুসলমানের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাড়াইবে ; কারণ, দেখা যায় যখন যে জাতির ধর্ম নষ্ট হইয়াছে তখনই সে জাতির আত্যন্তরূপ অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছে। এই জেলায় সিয়া অপেক্ষা হুন্নীর সংখ্যা অধিক। এই সমগ্র মুসলমান সমষ্টি প্রধানতঃ সিয়া ও হুন্নি দুইভাগে বিভক্ত হইলেও, ইহাদের প্রত্যেকের আবার কতকগুলি করিয়া শাখা বিভাগ হুঁট হয় যথা—সাবেক হুন্নী, ফরাজী, টায়ানী, হাসাকিজ, সাকারিজ, মালিকি ইত্যাদি। এই শাখা সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে ফরাজী সাম্প্রদায়ীর সংখ্যা অত্যধিক।

সিয়াগণ মহম্মদের কন্যা ফতিমার স্বামী আলির অনুচর, তাহারা আলিকেই যথার্থ বলিফা অর্থাৎ মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী স্বীকার করেন, যাহা হুন্নীরা করেন না ; তাঁহাদের মতে আবুবকর যথার্থ বলিফা। এই মতদ্বৈধতা হেতু উভয় সাম্প্রদায় পরস্পরকে বিবেচন করিয়া থাকেন এবং হুন্নীগণ সিয়াদিগকে “রাফেজী” অর্থাৎ সত্যভ্রষ্ট বলিয়া আখ্যাত করেন। মহরমের সময়ে এই দুই সাম্প্রদায়ের মতদ্বৈধতার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিয়াগণ যখন তাঁহাদের পুজনীয় আলির বিত্তীয় পুত্র তসেনের পৌরবকর মৃত্যু দিনের স্মৃতি রক্ষা করিতে প্রতিবৎসর মহরম মাসের প্রথম দশদিন তাজিয়া নির্মাণ পূর্বক উৎসবে মত হইয়া উঠেন, তখন হুন্নীগণ আলিকে বলিফা স্বীকার না করায় তাঁহার পুত্রের মৃত্যু দিনেরও পৌরব রক্ষা করেন না, তবে ঐ মহরম মাসের দশমদিনকে তাঁহারা কোরানোক্ত মতে পৃথিবী সৃষ্টির দিন বলিয়া ঐ দিনকে পবিত্র জ্ঞানে মান্ত করিয়া থাকেন। জ্ঞানবান হুন্নীগণ পূর্বোক্ত মতানুসারে চলিলেও নিরক্ষর হুন্নীগণ প্রায়শঃ সিয়াগণের সহিত একযোগে এই শোকের উৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকে ; বিগত কয়েক বৎসর হইতে রাণাঘাট সর্ভভিত্তিসান, সদর, ও নদীয়া জেলার অগ্রাশ্র যহ স্থানে হুশিক্ষিত হুন্নী মোদ্দাগণ আসিয়া তাঁহাদের নিরক্ষর ভ্রাতাগণকে এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে, তাহারা এই উপলক্ষে তাজিয়া নির্মাণাদি উৎসবের বাবতীয় কার্য পরিচাল্য করিয়াছে। এতদকলমে সিয়াগণ এই মহরম ব্যাপারে হুসেন ও হাসেন উভয় ভ্রাতার নিমিত্তই শোক প্রকাশ করিয়া থাকে ; কিন্তু

পারসিয়া এবং ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সমূহে একমাত্র হুসেনের স্মৃতিই জাগরুক করা হয়, তাহারা দেখিলে এই প্রথাই বর্ধার অহমতি হয় কারণ হুসেন বখশ ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মহরম তারিখে কারবাণার নিহত হইয়াছিলেন হাশেম তাহার ১০বৎসর পূর্বে ২৮ কাক্কে মেদিনার শত্রুর বিধাত্ত পরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন ।

এই মহরম ব্যতীত মুসলমানগণের অপর যে সমস্ত পর্ক আছে তন্মধ্যে রমজান শেষে ইদলফেত্তর এবং বক্রীদ, শিয়া ও সুন্নি উভয় সম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণই সমভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকেন ।

রমজান—মুসলমান বৎসরের নবম মাস ; নিষ্ঠাবান মুসলমান যাজেই এই সমগ্র মাসটিকে পবিত্র জানে প্রত্যহ সূর্যের উদয় হইতে অস্তকাল পর্যন্ত কঠোর উপবাস দ্বারা উদ্ভাপন করিয়া থাকেন । এই রমজানের উপবাস কাল মধ্যে যদি কেহ মিথ্যা কথা বোঝাইলে হ'ক কহিয়া কেলেদ তবে তাঁহার সমস্ত পুণ্য ক্ষয় পায় । এই মাস ব্যাপী পর্ক ১লা সওয়াল ইদলফেত্তর পর্কে উদ্ভাপিত হয় । এই দিন সকলে নব বস্ত্র পরিধান করিয়া সাধামত নান ধ্যানাদিতে রত হইলে এবং উপাসনার পর আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, আদি পরস্পর আলিঙ্গন, অভিবাদন, প্রত্যাভিবাদন ইত্যাদি করিয়া থাকেন ।

এই পর্ক কয়েকটি ব্যতীত আরও কতিপয় পর্ক মুসলমান শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে । সেগুলি এ জেলার সর্বত্র সমভাবে উদ্ভাপিত না হইলেও, নদীয়ার সজ্ঞাত মুসলমানগণ * এগুলির অহুষ্ঠান করিয়া থাকেন ।—

জুবি বরাত—মাহ “সাবান” এর পঞ্চদশ দিবসের রাজিকাল ; মুসলমানগণের মতে এই দিন আল্লাহ মহাব্যোম সৎসংসরের পাপ পুণ্যের হিসাব জমা খরচ করেন ।

* অধের বিষয় বিগত কয়েক বৎসর হইতে নদীয়ার সজ্ঞাত শিক্ষিত মুসলমান মহাপণ্ডেরা তাঁহাদের নিরক্ষর সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের উন্নতির অত নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন এবং এতদ্ব্যতীত বহু স্থানে সভা মকতব মজলিস, গোর্ডিং আদি স্থাপিত হইতেছে । ইহাদের মধ্যে কুমারখালির সৈয়দ-বৌলবী আবদুলকাদুর প্রমুখ সুদীর্ঘকালের বহু স্থাপিত আত্মমান এত্যাচার এন্সলামিয়া, ককনগরে নদীয়ার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট ইমাকাইলে বাহাদুরের নামীয় মাজলিস, শান্তিপুর মাজলিস প্রভৃতি উল্লিখ যোগ্য । সংখ্যার দ্বানত বিধায় যেমন সম্প্রদায় বিশেষের সমাজে প্রতিপত্তি কম হয় তেমনি সংখ্যাধিক্য সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয়, এই কারণে নদীয়ার হিন্দু ক্রুর মুসলমানের সামাজিক প্রতিপত্তিও বেশ আছে । এখানকার মুসলমানগণ নরক বতাব, সামাজিক, বিনয়ী ও ভয়ঙ্কর ।

ইছজুহা—মাহ “জেলহিজ্জার” দশম তারিখে অনুষ্ঠিত হয়, ইহা বক্রীদ নামেও খ্যাত, এই উপলক্ষে নানাবিধ পণ্ড হত্যা করা হয়।

আশুরা—মাহ “মহররমের” দশম দিবসে শ্রমীপণ কর্তৃক পালিত হয়। তাঁহাদের মতে এই দিন আরা কর্তৃক জগৎ, জগৎ, মৃত্যু, বর্গনরক প্রভৃতি বাবতীর সৃষ্টি প্রথম সৃজিত হয়।

আখির-ই-চাহার সুন্না—মাহ সাফরের শেষ বুধবার। কথিত আছে এই দিন মহম্মদ তাঁহার শেষ পীড়া হইতে কথঙ্কিত নিরাময় হইয়া গান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে বাহারা এই দিনের গৌরব করেন তাঁহার একখানি কাগজে কোরান হইতে নির্দিষ্ট সাতটী শ্লোক লিখিয়া, ঐ শ্লোকগুলি জলে দৌত করিয়া পরম পবিত্র জ্ঞানে ঐ জল পান করেন।

পূর্বোক্ত পর্বগুলি বাতীত আরও কত্ৰ বৃহৎ হু একটী পর্ব বিস্ত্রমান আছে এবং এই জেলার মুসলমানগণকে এই সকল পর্ব বাতীত আরও এক প্রকাবের পূজা অর্চনার অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়, সেগুলি সাধারণতঃ ভগবৎ জানিত পীর, কতীর বা গাজীগণের পূজা। প্রায়শঃ কোনও একটী বৃক্ষের মূলে এই সকল বনাম ধন্ত পীর মহাপরগণের আত্মনা দেখিতে পাওয়া যায়, নদীয়া জেলার প্রায় প্রতি গ্রামেই এইরূপ হু একটী আত্মনা বর্তমান আছে, কোনও কোনও স্থানে ইষ্টক বা বৃত্তিকা নির্মিত কুত্র দরগাও এতদর্থে দেখা যায়। সাধারণতঃ পীর সরিয়ৎ পীর তরিকৎ, পীর হরিকৎ, এবং পীর মরিকৎ এই চারি প্রকাবের পীর এইরূপে পূজা পাইয়া থাকেন। হিন্দুগণও নবপ্রহৃত পাতীর ছুদ্র ও বাতাসা প্রভৃতি দ্বারা ইহাদের স্তুতি সাধন করিয়া থাকেন। নদীয়া জেলার মুসলমানগণ সাতপীর, পাঁচপীর, পীর বদর প্রভৃতি মহাপুরুষগণেরও পূজা করিয়া থাকেন, এবং নদীয়ার উতকুতঃ বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন আত্মনার মধ্যে রাণাখাটের অদূরবর্তিত পাটুলী গ্রামের বড় পীতের আত্মনা, মাটীয়ারীর মল্লিকগণের দরগা এবং পলাশীর অদূরবর্তিত মাল্লনপাড়া কবীরতলা গ্রামের কবীর কবীর না সতরগজ এর দরগার সম্মান করিয়া থাকেন। এই দরগার মধ্যেই নিরাজ-উদৌলার বিশ্বস্ত সেনাপতি মীর মদন সমাহিত আছেন।

খুটান।

এই জেলার খুটান অধিবাসীদিগের মধ্যে Roman Catholic & Protestant উভয়বিধ খুটানই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের প্রধান আড্ডা কুফনগর,

কাপাসডাঙ্গা, রাণাঘাট, মেহেরপুর প্রভৃতি স্থানে। ইহাদের অবস্থাও বিশেষ
 স্বচ্ছল নহে, অধিকাংশ কৃষিকার্যের উপরই জীবিকা নির্ভর করে।
 কৃষ্ণনগরস্থ ৩৪১১ দ্বারিকা নাথ দে বাহাদুরের বংশাবলীর দ্বারা সুসভ্য
 উল্লেখযোগ্য হু দশ বয়স খৃষ্টান বংশও দেখা যায় তবে তাঁহাদের সংখ্যা অতি কম।
 কেহ কেহ বা আবার সামান্ত বেতনের কনেষ্টবলী প্রভৃতি কার্যও করিয়া থাকেন।
 সমাজে ইহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি নাই। খৃষ্টান মিসনারিগণ অত্র
 জেলায় বহু স্থানে স্বধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপন
 করিয়াছেন। এই সকল প্রচার দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিজ্ঞান প্রভৃতির
 মধ্যে বিখ্যাত সিন্টিলিয়ান জে. মনরো (J. Monro Esq. C. B.) প্রতিষ্ঠিত রাণাঘাটের
 অদূরস্থিত দয়াবাড়ী নামক দাতব্য চিকিৎসালয়, কৃষ্ণনগরের মিসনারি স্কুল
 প্রভৃতি লোক হিতকর কার্যগুলি সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য*। এই সকল মিসনারি
 সাহেবদের মধ্যে অনেক সময়ে অনেক উদারচেতা মহাত্মা আগমন করিয়াছেন।
 বিগত ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের নীলহাজার সময় যে সকল মহাত্মত্ব ইংরাজ, ধর্ম ও
 জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যেতা বিজ্ঞতার ভারতম্য ভুলিয়া নীলকর-পীড়িত-
 প্রজাকুলের সাহায্যার্থে নির্ভীক হৃদয়ে স্বজাতীর অত্যাচারী নীলকরগণের বিপক্ষে
 বন্ধ পরিকর হইরাছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শান্তিপুরের মিসনারী সোসাইটির
 Rev. C. Bomwelsch, কৃষ্ণনগর সমিতির Rev. C. H. Blumhardt
 Rev. F. Schurr প্রভৃতি দেব প্রকৃতি সাহেবগণের নাম; এবং বিগত ১৮৬৬
 খৃষ্টাব্দের নদীয়া হুর্ভিক্ষে Rev. T. C. Lincke; কাপাস ডাঙ্গার Rev.
 F. Schuar প্রমুখ যে সমস্ত পরহুঃখকাতর সাহেবগণ প্রকার পক্ষ গ্রহণ করিয়া

* Christians number 8,091, of whom 7,912 are natives. The church of England possesses 5,836 adherents and the Roman Catholic Church 2,172. The church missionary society commenced work in 1831 and had 13 centres presided over by native clergy or catechists and Superintended by 6 or 7 Europeans. The Roman catholic mission was established in 1855 & Krishnagar is now the head quarters of the diocese of central Bengal. In 1877 there was a schism among the adherents of the church Missionary Society and a member of them went over to the church of Rome. The church of England Zenana Mission works at Krishnagar and at Ratanpur and a Medical Mission at Ranaghat.—Imp Gazeteer. (New Edition) vol. xviii page 276.

হুর্ভিক্ষের কঠোরতার প্রতি গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন নদীয়ার ইতিহাসে সেই সব মহাপুরুষের নাম চিরদিন স্মরণীয়রূপে লিখিত থাকিবে ।

হিন্দু ।

নদীয়ার হিন্দু অধিবাসীগণ নানা মূলধর্ম ও শাখাধর্ম বিতর্ক, বধা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব এবং কর্তাতজা, বলরামতজা ইত্যাদি । এতদ্ব্যতীত দেব প্রার্থিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং কর্তাতজা, বলরামতজা সম্প্রদায় প্রভৃতি কতিপয় সম্প্রদায়ের উৎপত্তিস্থান এই নদীয়া জেলা । এখানে শাক্ত বা শৈব অপেক্ষা বৈষ্ণবের সংখ্যাই অধিক । ব্রাহ্মণগণ প্রায়শঃ শাক্ত অথবা শৈব । এক সময়ে নদীয়ার এই দুই ধর্মের মধ্যে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল কিন্তু বর্তমান কালে ক্রিয়াশীল তান্ত্রিক বা শৈব ছলিত ।

সাধারণ হিন্দু গৃহস্থগণ ক্রিয়া কর্ত্তে নদীয়ার পৌরব রবি মার্গ রঘুনন্দনের মতামুসারী কার্য্য করিয়া থাকেন । বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীমদ্ভগোপাল তত্ত্ব কৃত “শ্রীহরিতত্ত্ব বিলাসের” মতেই প্রচলন দেখা যায় । ভেঙ্কডারী এবং খাঁচী বৈষ্ণব মতামুসারী ব্যক্তিগণ ব্যতীত নদীয়ার সাধারণ লোক সম্প্রদায়িক মতভেদ হইতে দূরে রহিয়া নিরলিখিত পূর্বগুলি অবতরণ করণীয় মনে করেন । নানা কারণে অধিবাসীগণের অবস্থা হীন হওয়ার ইচ্ছা থাকিলেও সকলে এখন সচরাচর ক্রিয়া, কর্ম, ব্রত, পার্শ্বগাথি করিতে পারেন না, তবে কোনও কোনও ক্রিয়াবান ভাগ্যমত্ত বংশে এই সমস্ত পূর্বগুলি অনুষ্ঠীত হয়,—নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া পার্শ্বগাথি এবং ব্রত নিয়মাদি কার্য্য, শালগ্রাম শীলা-সেবা, পূজা, ভোগ, শিবপূজা ইত্যাদি, সন্ধ্যা-আহিক-কৃত্য (নিজনিজ, ইষ্টদেবতার আরাধনা, ভগ্নপূজা ইত্যাদি) অতিথিসেবা, ব্রাহ্মণভোজন । গঙ্গাস্নান, তর্পণ, বোঁগাদি উল্লঙ্ঘন গঙ্গাস্নান ও পুরোচারণ, শান্তি-বস্ত্রাধন, তুলসী নিবেদন প্রভৃতি ; জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ কর্ণবেধ ইত্যাদি দশবিধ সংস্কার ও তদোপলক্ষে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ইত্যাদি ভোজন । ঔর্দ্ধদৌহিক ক্রিয়া ও আত্মপ্রাণাদি ক্রিয়া ; পার্শ্বগাথি, একোড়িষ্ট প্রাণাদি, দোলঘাড়া, দশাহরা, স্নানঘাড়া, রথঘাড়া, সুলনঘাড়া, হুর্গোৎসব, লক্ষীপূজা, ত্রায়াপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, কার্ত্তিক পূজা, রাসঘাড়া, সরস্বতীপূজা, দোলঘাড়া,

শিবের গাজন । এতদ্ব্যতীত ব্রতাদি বধা অক্ষয়তৃতীয়া, সংক্রান্তি, সাবিত্রীব্রত, জন্মাষ্টমী, দুর্গাষ্টমী, অনন্ত চতুর্দশীব্রত, অরুণ্যবধীব্রত, একাদশীব্রত, কাভ্যারনী ব্রত, চাতুর্থাঙ্গ ব্রত, তাল নবমীব্রত, দুর্গানবমী, নৃসিংহ চতুর্দশী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কৃত্য, ললিতা সপ্তমী, শিবরাত্রিব্রত, রামনবমীব্রত, সীতা নবমীব্রত, বটপঞ্চমী ব্রত, জলদান ব্রত । বালিকাদিগের আচরণীয় ব্রত পুষ্পপুঙ্কর, বসুপুঙ্কর, শাকুতি, তুঘলী, ইতু বা ষড়পূজা প্রভৃতি ।

পূণ্যমাসে শ্রীমত্তাগবতাদি পুরাণ পাঠ, কথকতা ও ভজনভূত ক্রিয়াদি । শ্রীহরিবাসর, শ্রীশ্রীনগর সংকীর্তন এতদ্ব্যতীত বৈকবদিগের পূর্বাদি এবং “গোবলা” ইত্যাদি গ্রাম্য পূর্বাদিতে সাধারণে উৎসবাদি করিয়া থাকেন ।

বৈকব ধর্ম্ম ।

এই গোড় মণ্ডলে রামকুজ, বিষ্ণুদামী, মাধবাচার্য্য ও নিম্বাদিত্য এই চারি সম্প্রদায়ই বৈকবের মধ্যে একমাত্র মাধবাচার্য্য সম্প্রদায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার কারণ শ্রীগৌরানন্দেব মাধবাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান কালে যে বৈকব ধর্ম্ম এতদকালে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা শ্রীচৈতন্য দেবেরই মতানুসারী । এই বৈকব সম্প্রদায়কে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ।

১ম,—ঈহারা বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন, শ্রীগৌরানন্দের কোন মতামত গ্রহণ করে না ।

২য়,—ঈহারা গৌরানন্দ নিরুক্তমতে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন ।

৩য়,—ঈহারা শ্রীগৌরানন্দ দেবকেই উপাস্ত জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন ।

৪র্থ,—ঈহারা নামে বৈকব হইলেও আচার ব্যবহারে একেবারে ভিন্ন পথাবলম্বী ।

এতদ্ব্যতীত প্রথম শ্রেণীর বৈকবের সংখ্যা নদীয়ার নগণ্য । দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের সংখ্যা প্রায় সমপরিমাণ এবং চতুর্থ শ্রেণীর সংখ্যা অত্যধিক । প্রথম শ্রেণীর সম্বন্ধে ব্যক্ত্য কিছুই নাই ; তাহারা চিরপ্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বিষ্ণুর আর্চনা করিয়া থাকেন । দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বৈকবগণ মহাপ্রভুর আচরিত ধর্ম্ম বথাবথ আচরণ করিয়া থাকেন । এই দুয়ের বাজন বাজন, আচার, ব্যবহার, প্রায় সমস্তই একরূপ ; কেবল প্রভেদ এই কেহ শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া থাকেন, কেহ বা

শ্রীগৌরান্নকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ জানে উপাসনা করেন। এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বৈকুণ্ঠগণের ভরতিষ্ঠি “শ্রোম”। শ্রীমদ মহাপ্রভু আশ্রয় চরিত্রে আচরণ করিয়া এই ধর্ম লোককে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং কোনও পুস্তকাদি লিখিয়া এই ধর্মের পথ নির্দিষ্ট করিয়া দেন নাই; তবে, সময়ে সময়ে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে সকল অমৃতময় উপদেশমালা বহির্গত হইত তাহাই পার্শ্ব ভক্ত বৈকুণ্ঠগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেইগুলি হইতে এই ধর্মোচরণ সম্বন্ধে তাঁহার আদেশ ও অভিশ্রব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গুলির মধ্যে আবার যে আটটি শ্লোক বৈকুণ্ঠ ভগতে শিকাটক বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই অষ্ট শ্লোকই এই ধর্মাবলম্বীগণের যথাসম্বন্ধ। তিনি এতদ্বারা বিত্তহীন বৈকুণ্ঠের লক্ষণ ও কর্তব্যাদি নির্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুধর্মে যে সকল গ্রন্থ বা মত গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-দেবও সেই সকল গ্রন্থ ও মতানুবর্তন করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি উপনিষদ শ্রুতি ও আর্ষাষ্মি প্রণীত ধর্মশাস্ত্র সমুদয়ের গৌণার্থ ত্যাগ করিয়া মুখ্যার্থ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। যথা—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—

“প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।

শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই ত প্রমাণ ॥

স্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য সেই কয়।

লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রামাণ্য নাহি হয় ॥”

এইরূপে শাস্ত্র সমুদয়ের ভক্ত্যাস্বাদক মুখ্যার্থ করায় কোনও কোনও স্থলে তাঁহার মত কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যাহা দেখিতেন, যাহা করিতেন, যাহা বলিতেন সমস্তই ভক্তির দিক হইতে, সুতরাং তাঁহার মত কেবলি ভক্তি মাথা, অন্যথা তিনি স্বয়ং কোনও নতন মত উদ্ভাবন করিয়া যান নাই। ইনি প্রমাণ স্বরূপ সর্বদাই শ্রীমদ্ভাগবদগীতা, অষ্টাদশপুরাণ, ব্রহ্ম সংহিতা প্রভৃতির আবৃত্তি করিতেন। এতদ্ব্যতীত উপনিষদ, শ্রুতি প্রভৃতিরও যথেষ্ট আদর করিতেন। তিনি ঈশ্বরকে সর্বব্যাপক, সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ, সর্বশক্তিমান ও সাকার বলিয়া জানিতেন এবং নন্দহলাল, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই স্বয়ং পূর্ণভগবান বলিয়া স্বীকার করিতেন। এই শ্রীকৃষ্ণ উপাসনাকেই তিনি জীবনের সর্বপ্রার্থ এবং একমাত্র কর্তব্য বলিয়া উপদেশ করিতেন এবং তাঁহার নাম কীর্তনকেই বলির জীবের একমাত্র পতি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

রামানন্দ রায় যে প্রণালীক্রমে অধিকারীভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধ্য নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই শ্রীচৈতন্যের অনুমোদিত । জ্ঞানশূন্য ভক্তি প্রেমভক্তি, দাস্ত্রপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম, কান্তভাব, এই কয়টি সাধনার ক্রমোন্নত উপায়, আবার শ্রীরাধিকার যে প্রেম অর্থাৎ মহাভাব সমাপ্তি তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ । সখীভাবে আপনাকে তবৎজ্ঞানে যে উপাসনা ও সেবা তাহাই তৎপ্রাপ্তি পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় । পরচর্চা, পরহিংসা, পরস্মী সম্ভাষণ প্রভৃতি একান্ত পরিত্যজ্য । এ সকল অপরাধে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রের নিকট কাহারও মার্জনা ছিল না ; অন্তের কথা কি একদিন তাঁহার প্রিয় পার্শ্ব ছোট হরিদাস, শিখিমাইতির বৃদ্ধা ভগ্নী মাধবীর নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিলে প্রভু তাঁহার দ্বারবন্ধ করিয়াছিলেন । হরিদাস নবদ্বীপবাসী, বাল্যকাল হইতে প্রভুর অনুগত, এবং তিনি হৃৎকণ্ঠবিধায় প্রভু তাঁহাকে আপনার কীৰ্ত্তনোয়া নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; বিশেষতঃ, বর্তমান কালে প্রচলিত “খোল” বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার করায় তিনি বৈষ্ণব জনতে বিশেষ মান্ত্যবান হইয়াছিলেন ; কিন্তু, শ্রীপ্রভু, হরিদাসের সকল গুণ ভুলিয়া—

“বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ ।

দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥”

এই বলিয়া তাঁহ কে দণ্ড করিলেন । হরিদাসও প্রারম্ভিক স্বরূপ প্রয়াগের ত্রিবলীতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন । শ্রীপ্রভু মর্কট বৈরাগ্যের পরম বিদ্বেষী ছিলেন । এই দ্বিতীয় ভেলীর বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভু নিরুক্ত এই সমস্ত গম্ভীরই অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া থাকেন ।

চৈতন্য সম্প্রদায় ।

এই তৃতীয় ভেলীর বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল উপদেষ্টা নহেন পরম উপাস্ত দেবতা । এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সংখ্যা বর্তমান কালে অত্যধিক না হইলেও ইহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে । ইহাদের মতে শ্রীচৈতন্যদেবই স্বাণের অতেন শ্রীকৃষ্ণ হুত্তরাং পূর্ণবিভর । যিনি কৃষ্ণ অবতারে বলরাম তিনিই চৈতন্য অবতারে নিত্যানন্দ এবং অষ্টমত সাক্ষাৎ সমাধিব । তাঁহারা এইরূপে শ্রীচৈতন্য দেবের অন্তান্ত পার্শ্বদেবগণও

পূর্বজন্মের অর্থাৎ ষাপরাঙ্গি লীলাকালীন কে কি ছিলেন তাহা নির্ধারণ করিয়া থাকেন।

কাটড়াপাড়া নিবাসী কবিকর্ণপুর পরমানন্দ দাস তাঁহার বিরচিত “গৌরগণোদ্দেশ্য দীপিকায় মথুরা ও গোড়বাদী ভূঙ্গনের পূর্বোক্তরূপ পূর্ববিবরণ নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে নবদীপবাদী বৈষ্ণবগণ মহাস্থান, নীলাচল বাসীরা মহাস্থর এবং দক্ষিণাত্যবাদী চৈতন্য কৃপাশ্রয় জনগণ মহাস্থ (সংখ্যায় চৌষটি) এবং ঐচৈতন্য, মহাপ্রভু; অষ্টৈত ও নিত্যানন্দ এই দুই প্রভু, নিত্যানন্দের মধ্যী সম্মিলন (সংখ্যায় ষাদশ) — গোপাল এবং তাঁহাদের সম্পর্কে বাহারা এই সম্প্রদায় ভুক্ত তাঁহারা উপগোপাল (সংখ্যায় ষাদশ)। এখন যেমন গোস্বামী বংশে জন্ম নাইলেই তিনি গোস্বামী হইতে পারেন, তখন সেরূপ ছিল না। “গো” অর্থে ইন্দ্রিয়গণের যিনি স্বামী অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী তিনিই তখন গোস্বামীপদ বাচ্য হইতে পারিতেন, সেই তদানীন্তন অসংখ্য ভক্তিমান বৈষ্ণবের মধ্যেও তখন মাত্র ছয়টি গোস্বামী ছিলেন বধা, ঐসনাতন, ঐরূপ, ঐরঘুনাথভট্ট, ঐজীব, ঐগোপাল ভট্ট, ঐরঘুনাথদাস।

এই সম্প্রদায়গণের মতে দ্বিতীয় যুগলীধর পীতাম্বর ঐকৃষ্ণই ভগবানের কৃষ্ণরূপ। পূর্বে ঐযুগাবনে ঐকৃষ্ণ ও ঐমতী রাধিকা লীলাচ্ছুলে অনুপম সুখসম্ভোগ করিতেন, কিন্তু ঐকৃষ্ণের অতুল মাধুর্য্য রসানুভব করিয়া ঐরাধিকা যে স্থখ ভোগ করিতেন, ঐকৃষ্ণ সে রসাবশাবে বঞ্চিত হইতেন; তাই তিনি আপনার মাধুর্য্য আপনি অনুভব করিতে একদেহে বাধাকৃষ্ণ উভয়ে মিলিত হইয়া গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন। * ইহা ব্যতীত প্রেমভক্তি বিকাশ ও হরিনাম প্রচারও অন্যতম উদ্দেশ্য। কলিকালে ঐভগবান ঐচৈতন্যরূপে নবদীপে জন্মগ্রহণ করিবেন এই মতের পোষকে তাঁহারা অসংখ্য শাস্ত্র হইতে অসংখ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের মত পুষ্ট করিয়া থাকেন। সে সকল অখণ্ডনীয় যুক্তির সম্মুখে বৃথা বাহুজাল ছিন্ন হইয়া যায়।

ভক্তি ও প্রেম এই সম্প্রদায়ের সর্বস্ব। তাঁহাদের মতে জীবমাত্রের ঐ প্রেম

* ঐরাধারা: প্রথমমহিমা কীদৃশো বানধৈবো বায়ো বেনাকুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীরঃ।

সৌখ্যঃ চান্তা বদনুভবতঃ কীদৃশং যেতি দোত্যক্তভাবাভ্যাঃ সমজনি পটীগর্ভসিকৌ হরীন্দঃ।

ইতি ঐচৈতন্যচরিতামৃতং।

ভক্তির অনুষ্ঠানের অধিকারী । এই সম্প্রদায় প্রেমের অন্তর্গত শান্ত, দান্ত, সখ্য, মাধুর্য ও বাৎসল্য এই পাঁচ প্রকার ভাব স্বীকার করেন । নামসংকীর্তন এই সম্প্রদায়ে প্রধান সাধন, এবং শ্রীকৃষ্ণশ্রীতিকামনার উপবাস, নৃত্য গীত ও রিপু-সংযমাদি চৌষটি প্রকার সাধনেরও ব্যবস্থা আছে । তবে সকল সাধনাতেই ইহারা গুরুর প্রয়োজন স্বীকার করেন এবং অস্ত্রাস্ত্র সম্প্রদায়ের ভায় ইহাদের নিকটেও গুরুর স্থান অতি উচ্চে ।

অবৈত, নিত্যানন্দ, আচার্য্য প্রভু প্রভৃতি ও পূর্বোক্ত ছয় গোস্বামীর পুত্র কলত্রাদি ইহাদের গুরু স্থানীয় এবং সকলেই ইহাদেরই কাহার না কাহারও পরিবার । তাঁহারা গৃহী বৈষ্ণবগণকে মন্ত্রদান করিয়া থাকেন কখনও বা শিষ্যদের কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করেন, আবার কখনও বা চৈতন্ত মন্ত্রও দান করিয়া থাকেন । এই সকল বৈষ্ণবগণ গৃহে থাকিয়া গৃহী শ্রীচৈতন্তদেবের আচারিত পছানুবর্তন করিয়া থাকেন । আবার ঘাহারা বৈরাগ্য অবলম্বনে জাতি, কুল, মান, পরিত্যাগ করিয়া এই ধর্মাবলম্বন করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে “ভেক” লইতে হয় । এক্ষেত্রে গোস্বামীগণ শিষ্যকে মস্তকমুগুন পূর্বক স্নান করাইয়া ডোরকোপিনি বহির্বাশ, তিলকমুদ্রা, করঙ্গ বা ঘটী এবং অপমালা ও ত্রিকটি গলমালা অর্পণ করিয়া মন্ত্রাদেশ করেন । এক্ষণে তাঁহারা ঐ কার্য্যভার বৈষ্ণবদিগের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন । ইহা ছাড়া পঞ্চতত্ত্বের * ভোগ, ও বৈষ্ণবগণকে মহোৎসব করিয়া ভোজন করাইতে হয় । কেহ কেহ বলেন নিত্যানন্দ প্রভু এই ভেকান্ত্রের স্রষ্টি করেন ।

বর্তমান কাল প্রচলিত রীতি অনুসারে এই ভেকান্ত্রী বৈষ্ণবগণ বিবাহে অধিকারী । এ বিবাহে ছড়িদার বর কস্তার উত্তরের কণ্ঠিবদল করাইয়া দেন এবং স্বয়ং কিঞ্চিৎ দক্ষিণা ও গোস্বামীর নিমিত্ত ন্যাসংখ্যা পাঁচসিকা গ্রহণ করেন । এক্ষেত্রেও চৈতন্ত প্রভৃতির ভোগ ও মহোৎসব হইয়া থাকে । এই সম্প্রদায়ী বৈরাগীদের মধ্যে বিধবা বিবাহের রীতি প্রচলিত আছে, তবে দ্বিতীয়বার বিবাহের পর ত্রীর সোমন্তে সিন্দূর দেওয়ার নিয়ম নাই । গৃহী বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই । এই সকল ভেকধারী বৈষ্ণবগণের মধ্যেই ব্যক্তিচার, কদাচার প্রভৃতি এত ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে যে ইহাদের অনেককে বৈষ্ণব বলিতেই কৃষ্ঠা জন্মে ।

* ১। শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু, ২। শ্রীনিত্যানন্দ, ৩। শ্রীঅবৈত, ৪। শ্রীগদাধর, ৫। শ্রীঈশ্বর

ধাধারা চৈতন্যদেবকে উপাস্তরূপে পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অস্ত্রাশ্রয় দেবতার জায় শ্রীনিমাইয়েরও ধ্যান, মন্ত্র, পূজাপ্রণালী ও গুণাদি শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন।

এই সকল সম্প্রদায় ব্যতিত নেড়ানেড়ী, বাউল প্রভৃতি কতিপয় কদাচারী বৈষ্ণব, সম্প্রদায় এতদঞ্চলে দেখা যায়। তাহাদের আচার ব্যবহার, কর্তৃকাণ্ড বৈষ্ণবগণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং মুখে “জয়চাঁদ গৌর, জয়চাঁদ নিত্যানন্দ বা বীর অবধূত” বলিলেও কখনও কার্যে তাঁহাদের উপদেশ মানিয়া চলিতে দেখা যায় না; পরন্তু, তাহার ব্যভিচার পদে পদে দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে ইঙ্গিয় চর্চুর স্রোত অতি প্রবল এবং সেই কুহকে মজিয়া বহু ইতর আতিয়লোক এই সকল সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া পড়ে।

হার! প্রেম ভক্তিমাধা হুনির্মল, জগৎজল ধর্ম্মের সেই উচ্চতম আদর্শ হইতে কি ভয়ঙ্কর অধঃপতন হইয়াছে। ইহা হইতেই দেশের লোকের প্রকৃতি অনেকটা অমুগ্ধিত হয়। কি পরিচাপের বিষয়! কিছুদিন পূর্বে বৈষ্ণব বলিলে যে আচারবান ধীরপ্রেমিক ভক্তের উজ্জ্বল ছবি মনস নয়নে উদ্ভাসিত হইত এক্ষণে ঠিক তবিপরীত। বৈষ্ণব এখন একটা স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। লম্পট, ব্যভিচারী, মজ্জাট বৈরাগ্যধারী নরনারী এখন অনায়াসে আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতেছে। হার! মহাপ্রভু! তোমার স্বহস্ত প্রোথিত মহাঙ্কুরের এ অকাল নাশ কেন ঘটাইলে প্রভু? দিলে ত আবার কাড়িয়া লইলে কেন? জানি, আমরা এতই কলুষিত যে তোমার বিমল দয়ার আশা করাও আমাদের হুঁততা; কিন্তু হে দয়িত, হে প্রিয়তম, হে ভুবনৈকনাথ, তোমারই চন্দ্র সূর্য্য কি পাপী ও পুণ্যাত্মাকে সমভাবে কিরণ দেন না? তুমি ত পতিতেরই নাথ, পুণ্যাত্মা ত নিজের পুণ্যে তোমাকে লাভ করে; কিন্তু তুমি ত পাপীতাপীর অনন্তশরণ, তবে নাথ! ইচ্ছাময় তুমি তোমার ইচ্ছা আমরা কি বুঝিব। ঐ দেব নাথ! তোমার অকলঙ্ক ধর্ম্মে কেমন কলঙ্কময়ী মাথাইতে বসিয়াছি। শীলোদর পরায়ণ ধর্ম্মধ্বজী এক একজন ব্যভিচারীকে হুই দশটা রমণী পরিবেষ্টিত হইয়া নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া বেড়াইতেছি। এস নাথ! আর এতবার এস—তোমার পবিত্র পদস্পর্শে এই কলুষিত ধরা আবার পবিত্র হউক।

কর্তৃত্বজ্ঞা ।

নদীয়া হইতে যে সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, তন্মধ্যে কর্তৃত্বজ্ঞার দল বৈকব সম্প্রদায়ের পরই উল্লেখযোগ্য ; কারণ, বত সংখ্যক নরনারী এই দলভুক্ত তত্তালোক এক বৈকব সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয় না। তবে এ দলে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই সংখ্যাধিক্য। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা তিন গুন অধিক এবং সেই কারণেই বোধ হয় ইহাদের মধ্যে ব্যুতিচারের প্রোত এত প্রবল। এতদিন যে ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল “মেয়ে হিজরে পুরুষ বোঝা, তবে হয় কর্তৃত্বজ্ঞা,” এখন সেই উক্ত আদর্শ কিরূপ দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। যদিও পরস্ত্রীগমন বা তচ্চিত্তা পর্য্যন্ত উক্ত ধর্ম প্রবর্তকের সম্পূর্ণ বিধি বিরুদ্ধ তথাপি বহু সংখ্যক নরনারী সর্বদা একত্র সহবাস করায় একপে নরসেবা ও নারী সেবাই এ ধর্মের সর্বনাশের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদিও বর্তমানকালে এই সম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণের মধ্যে এরূপ অধঃপতন দৃষ্ট হইতেছে বটে কিন্তু এই মত প্রবর্তনকালে ইহার প্রবর্তক আউলচাঁদের আদেশ অতি জ্ঞানবর্ধ ও সহৃদয় পূর্ব। তাঁহার আদেশ এই পরস্ত্রীগমন, পরজব্যানহরণ, এবং প্রাণীহত্যা সাধন এই ত্রিবিধ কার্যিক কর্ম ও ঐ ত্রিবিধ কার্যিক কর্মসাধনের ইচ্ছা, মিথ্যাকথন, কষ্ট ভাষণ, বৃথা-ভাব ও প্রলাপভাব এই চারিপ্রকার বাককর্ম, সর্ব সমেত এই দশবিধ কর্ম সর্বদা পরিত্যজ্য। এই সম্প্রদায়ের বীজমন্ত্রের মূল মন্ত্র “গুরুসত্য”। কেহ উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে চাহিলে প্রথমতঃ সে ঐ মূলমন্ত্র প্রাপ্ত হর পরে ইহার অতি ভাষার বিশ্বাস স্থিরতর হইলে তখন সে “কর্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার হুখে চলি কিরি, যা বলাও তাই বলি, যা খাওয়াও তাই খাই, তোমা ছাড়া ভিলার্গ নই.. গুরুসত্য বিপদ মিথ্যা” * ইত্যাকার মন্ত্র প্রাপ্ত হয়। এই সম্পূর্ণ মন্ত্রের নাম বোলআনা। দ্বাধারা মন্ত্র দেন তাঁহাদের আখ্যা “মহাশয়,” এবং শিষ্যের আখ্যা

* এই মন্ত্রের পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। বলা—কর্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার কুহি আবার তোমার হুখে চলি কিরি ভিলার্গ তোমা ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি মোহাই মহাপ্রভু ।”

Mr. Ward, Asiatic Research এর vol. II এ এই মন্ত্রের এইরূপ ইংরেজি ভাষ্য প্রদান করিয়াছেন :—“Oh sinless Lord ! Oh great Lord, at thy pleasure I go and return, not a moment am I without Thee, I am even with Thee, save Oh great Lord !

“বরাতি,” সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি মাতের নাম “ভগবত্জন” এবং সম্প্রদায় বহিভূত লোক মাত্রকেই তাঁহারা ঐহিক লোক বলেন । এই সম্প্রদায়ের কাঁচা অবস্থার নাম প্রবর্তক তার পর সাধক, তার পর সিদ্ধ, সর্বশেষ সিদ্ধের সিদ্ধ । এই সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে সাধারণতঃ কতকগুলি সাংকেতিক বাক্য আছে, যাহাযারা তাঁহারা তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করেন । ইহারা মৃত্যুকে “দেহরক্ষা” বলেন এবং আপনার বাটীকে “বাসা” বলেন অর্থাৎ ঘোষপাড়া সকলের একমাত্র প্রকৃত বাটী এবং তদ্ব্যতিত অশ্রু আশ্রয় কেবল বাসা মাত্র । ইহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাবে জাতিভেদ প্রথার আঁটাখাঁটি কিছুমাত্র নাই এবং ইহাদের পরস্পরের অগ্রবিচারও কিছুমাত্র নাই তবে বাহিরে সমাজের নিকট ইহাদিগকে সাধারণ হিন্দুর ভ্রায় বর্ণাচার ও কুলাচার মানিয়া চলিতে দেখা যায় । যিনি যে বর্ণে জন্মলাভ করিয়াছেন তিনি সেই বর্ণের সমস্ত ব্যবহারই মানিয়া চলেন এমন কি ঘোষপাড়ার পালবাসুরা যাহারা এই ধর্মের ধুরন্ধর, তাঁহাদেরই সাধারণ সঙ্গোপের ভ্রায় সমস্ত হিন্দু আচার মানিয়া চলিতে হয় এবং বিবাহাদি সমস্ত কার্যই সাধারণ হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী স্ববর্ণে ইহারা থাকে, কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না । তাঁহাদের এই প্রকার আটপোবে ও পোষাকীভাববস্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে ব্যবহার ও পরমার্থ দুইই সত্য, সুতরাং দুইই সমভাবে পালনীয় ; ইহার পোষকে ইহাদের মধ্যে একটি বচনও দেখা যায় । “লোকের মধ্যে লোকাচার সদৃশ্যের মধ্যে একাকার” এই ধর্ম সাধারণতঃ সমাজের হীন জাতিয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক আচরিত হইলেও স্থানে স্থানে দুদশজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেও এই মতানুবর্তী দেখা যায় । *

* Few respectable Hindoos have joined the Karthabhajas, yet they are spreading, but chiefly among the lower orders, one of their pretences is to substitute an actual vision of the Goddess of every individual instead of a material image, each one is allowed to retain the duty he has been most accustomed to honour ; a secret and darkened apartment is chosen and the initiated are made to see their own God, i.e. they are turned first to a strong light and then to a darkness, where fancy conjures up the image. Their chief principle is “that by devotion, God will give them eyes and then of Him, and through that sight Salvation.” * * *

* * * *

Ishar Chandra Pal “the present head of the sect, lives in the style of

এই দলের উৎপত্তি সম্বন্ধে এতদঞ্চলে বহুবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে ।
উহাদের মধ্যে কোন আখ্যানটী প্রকৃত, কোনটী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য এ সকল
অবধারণ করা অতীব হ্রস্ব ; হুতরাং, যে মতটী বহুজন মাত্র তাহাই এখানে
বর্ণিত হইতেছে ।

এই সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ আউল চাঁদ । তাঁহার সম্প্রদায়ী লোকেরা
তাঁহাকে স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার বলিয়া থাকেন । তাঁহাদের মতে শতাব্দীমান
খ্রীষ্টোত্তরদেব, টোটা গোপীনাথের অঙ্গে অপ্রকট হইয়া অলঙ্কে সম্রাসীর বেশে
আলোরপুর পরগণার খোলাহুলী উৎপলি গ্রামে বতকাল বাপন করিয়া পরিশেষে
১৬১৬ শকের ফাস্তন মাসের প্রথম শুক্রবারে নদীয়াস্থ উলাগ্রামে মহাদেব বাকুই-
য়ের পানের বরোজে এক অষ্টমবর্ষীয় বালকবেশে দর্শন দেন । মহাদেবের কোন
সন্তানাদি না থাকায় তিনি মায়াবশে এই অজ্ঞাতকুলশীল বালকটীকে গৃহে
লইয়া পালন করিতে থাকেন । তিনি ঐ বালকের নামকরণ করেন পূর্ণচন্দ্র ।
পূর্ণচন্দ্র প্রায় ২২ বৎসর কাল ঐ মহাদেবের গৃহে থাকিয়া পরে ছলক্রমে তথা
হইতে যাইয়া এক গন্ধবনিকের গৃহে দুই বৎসর বাস করেন, পরে সেখান হইতে
এক জমিদারের গৃহে কিছুকাল থাকিয়া পরিশেষে পূর্ব বাঙ্গলা ও অস্ত্রান্ত বহুস্থান
ভ্রমণ করিয়া ২৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে “বেজরা” গ্রামে উপনীত হইলেন । এই
গ্রামে থাকিয়াই তিনি সর্বপ্রথম জাহির হইলেন এবং হটবোষ তাঁহার সর্বপ্রথম
শিষ্য গ্রহণ করে, পরে একে একে আরও ২১ জন ব্যক্তি সর্বসম্মত ২২ জন
তাঁহার প্রধান শিষ্য ও অনুচর হইয়া উঠেন । * এই ২২ জন শিষ্য সম্বন্ধে এই

Rajah, his grandfather was a Guala or Keeper of cows. Drs. Marshman and Carry visited Ramdulal his father in 1802, they found a Ratha near his house which was handsome, stately, exceeding that of many Rajahs” he was “no less plump than Bacchus and about 20 years of age,” he argued with them, defending the doctrine of panthism. Some of their secret rites are of the most disgustingly licentious description. Vide Foot note page 407. Cal. Review Vol. VI. 1846.

১। হটবোষ ২। লক্ষ্মীকান্ত, ৩। নরন, ৪। বেচুবোষ, ৫। নিত্যামল দাস, ৬। কুলদাস,
৭। নিধিরাম দাস, ৮। শিবরাম, ৯। হরীবোষ, ১০। দেবারাম দাস, ১১। জাম কাঁসারি,
১২। শঙ্কর, ১৩। কাঁসাই বোষ, ১৪। রামধরণ পাল ১৫। আনন্দ পাল, ১৬। নিজাই বোষ,
১৭। মনোহর দাস, ১৮। জীব রত্নপুত্র, ১৯। কিশু, ২০। বিজ্ঞান, ২১। গোবিন্দ, ২২। পাঁচুর্নইদাস

সম্রাটের মধ্যে নানারূপ বচন প্রচলিত আছে, যথা “আউলে চাঁদ দোরা গরু, সঙ্গে বাইশ থাকির বাছুর তার” আবার :—

“এ ভবের মানুষ কোথা হ’তে এল ।

এর নাইকো রোষ, সদাই তেঁব, মুখে বলে সত্য বল ॥

এর সঙ্গে বাইশজন, সবাব একটা মন, জয় কর্তা বলে,

বাহুতুলে কপ্পে প্রেমে ঢলাঢল ।

এ যে হারা দেওয়ার মরা বাঁচার

এর হকুমে গঙ্গা শুকাল ॥

এই সময়ে যেমন দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল তেমন আউলেচাঁদের অকৃত ধ্যান্তিও বিস্তার হইতে লাগিল এবং তাঁহার ভক্তগণও তাঁহাকে নানারূপে সম্বোধন করিয়া তাঁহার নামের অভিধান বাড়াইতে লাগিলেন । আউলচাঁদের অসংখ্য নামের মধ্যে এই কর্তা প্রধান, যথা, আউলে মহাপ্রভু, ঠাকুর, প্রভু, আউলে ব্রহ্মচারী, কাকালী প্রভু, গোসাই ও কর্তা । এতদ্ব্যতীত আবার কর্তা নামটাই বিশেষ প্রসিদ্ধ । “কর্তা” অর্থে ঈশ্বর, যিনি এই জগতের স্রষ্টা, পোষ্টা ও হস্তা হুতরাং কর্তা এবং তাঁহাকে বাচারা ভজনা করে তাহার কর্তাভজা । এইরূপে বহুদিন বহুলোকের ভক্তিভাজ্য গ্রহণ করিয়া এবং চাকদহের নিকটবর্তী “পরারী” নামক স্থানে বহুদিন বাস করিয়া ১৬১১ শকে বোয়ালে নামক গ্রামে তিনি দেহত্যাগ করিলেন । তাঁহার দেহ রক্ষার পর তাঁহার অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে “রামশরণ পাল, হট্টঘোষ, হরিঘোষ, জামবৈরাগী, কানাইঘোষ, সহস্ররাম ঘোষ, ভীম রজপুত, এবং বেচুঘোষ প্রভৃতি ৮ জন প্রধান শিষ্য বোয়ালে গ্রামে তাঁহার কবর সমাধি দেন পরে চাকদহের তিনক্লেপ পূর্ববর্তী পরারী গ্রামে তাঁহার দেহের সমাধি করেন ।

আউলচাঁদের ২২ জন প্রধান শিষ্যের মধ্যে এক রামশরণ পাল ব্যতিরেকে অল্প কোনও শিষ্যের নাম বা ধ্যান্তি উক্ত অধিক নাই । ইহাদের মধ্যে ২।১ জন শিষ্যের বংশ নদীয়ার এখানে ওখানে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় তবে এক রামশরণ পালের বংশীয়েরাই সাধারণতঃ কর্তাভজা বলিয়া ধ্যাত ।

এই রামশরণ পাল চাকদহের নিকটবর্তী জগদীশপুরগ্রামে সঙ্গোপ বংশীয় এক গৃহস্থ ছিলেন । ইহার পিতার নাম নন্দরাম পাল এই নন্দরামের এক ভ্রাতা

ছিলেন তাঁহার নাম সত্তারাম । উইারা একায়বর্তী ছিলেন । সত্তারামের বংশাবলী
অদ্যাপি জগদীশপুরে বাস করিতেছেন । কিন্তু তাঁহাদের সহিত এই কর্তৃত্বজ্ঞা
সম্প্রদায়ের কোনরূপ সংশ্রব নাই । রামশরণের অল্প বয়সে জগদীশ গ্রামের
শিশুস্বাধেব কন্যা পৌরীর সহিত বিবাহ হয় । ইহার গর্ভে রামশরণের দুইটী কন্যা
সন্তান হয় কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার কন্যা দুইটীর সহিত তাঁহার স্ত্রীর
মৃত্যু হইলে তিনি গোবিন্দপুরবাসী গোবিন্দ স্বাধেবের সরস্বতী নাম্নী কন্যাকে
বিবাহ করেন । এই সরস্বতীই দেহান্তে “সতীমা, শচীমা” বা “কর্তীমা” নামে
খ্যাত্যাপন্ন হইয়া উঠেন ।

রামশরণের বংশ পরিচয় ও আউলটানের শিষ্যত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে যে নানারূপ প্রবাদ
প্রচলিত আছে তদ্বধ্যে এতদূর পর্য্যন্ত সকল গুলিতেই একরূপ বর্ণিত হয় কিন্তু ইহার
পরে আউলটানের সহিত রামশরণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় বিবরণী গুলি বিভিন্ন মতানুযায়ী ।
কেহ কেহ বলেন, রামশরণ দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের পর বিধব কার্য্যে অল্পসম্মানে
নদীয়া জেলার মুরতীপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন পরে তথাকার জমীদার বেন-
পুরের ষাঁ'রাজাদিগের বংশোদ্ভব রায়রায়ান দেওয়ান পঞ্চলোচন বাহাদুরের অমিদারীতে
নায়েবের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এবং এইখানেই তাঁহার সহিত আউলটানের সাক্ষাৎ
হয় । আউলটান স্বভাব বিনীত রামশরণের আতিথেয় কর্তৃত্ব হইয়া তাঁহার কন্যাপু-
ত্রিত্ব জলে মৃত্যুশয্যাগায়িনী রামশরণের স্ত্রীকে ব্যাধি মুক্ত করিলে, রামশরণ তাঁহার
চরণে শরণ লইলেন । আবার কেহ বলেন ছেরাস্তরের মনস্করের সমর রামশরণ পাল
সুখসাগরের বাজারে চাউল ধরিয়া করিতে বাইরা সেখানে আউলটানের সাক্ষাৎ
লাভ করেন এবং পরে তিনি তাঁহাকে আপন বাটীতে আনয়ন করেন । আবার
কেহ বলেন, একদিন কুবী রামশরণ মোচারণে যাইলে একজন তেজস্বী সরাসী
তাঁহার নিকট হুত্ব যাচঞা করেন । রামশরণ ভক্তি পদ পদ চিন্তে এই সরাসীর
পরিচর্যা পূর্ব্বক হুত্বপান করিতে বেন । সরাসী বধন হুত্বপান পূর্ব্বক পরিতপ্ত
হইয়াছেন এমন সময় একজন উর্দ্ধবাসে আসিয়া রামশরণকে তাঁহার পাঁড়ি জোর
মুখের সংবাদ জ্ঞাপন করে । দরবান সরাসী রামশরণের পরিচর্য্যার পূর্ব্বকই
বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন এক্ষণে তাহার এই শোকসংবাদে হৃৎবিদ্র হইয়া তাহার
জীর প্রাণরক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, এবং, রামশরণকে নিকটস্থ পুকুরে হইতে
তথায় একমোটা জল আনয়ন করিতে বলেন । রামশরণ জল আনিলে সরাসী ঐ

জল মস্তপূত করিয়া যমুর্ধ্ব সর্বাঙ্গে লেপন করিতে অনুজ্ঞা করেন। রামশরণের মনের আবেগে ও অতীত উৎকর্ষ্য তাহার হস্ত হইতে ঐ পাত্র স্থলিত হইয়া এক দাড়িহর বৃক্ষের মূলে পতিত হয়। সম্রাসী তদর্শনে কন্দম হস্তে যাইয়া রোগীণীর সর্বাঙ্গে উহাই মাখাইয়া দেন; তাহাতেই রামশরণের স্ত্রী একেবারে নিরাময় হইয়া উঠেন। রামশরণ সম্রাসীর ঐ রূপ অলৌকিক, অমাত্যবী ক্ষমতা দৃষ্টে তাঁহার শরণাগত হইলেন এবং পরে ঐ মহাপুরুষের কৃপায় স্বয়ং ঐরূপ ক্ষমতালালী হইয়া কর্তৃত্বা সম্প্রদায়ের স্বজন করেন এই সময় হইতেই নদীয়ার মুরতীপুর গ্রামের ঘোষপট্টী বা ঘোষপাড়া বজ্রের মধ্যে সুবিখ্যাত হইয়া উঠে।

এই সময়ে রামশরণের সরস্বতী গর্ভে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে, ঐ অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষ দয়াপরবশ হইয়া স্বয়ং রামশরণের স্ত্রীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ পুত্রের নাম রামহুলাল। রামহুলালের কর্তৃত্বে কর্তৃত্বা সম্প্রদায় বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিল। তিনি স্বয়ং সংস্কৃত, পারস্য প্রভৃতি নানা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং তাঁহার বুদ্ধিও অতি প্রখর ছিল, তিনি সাম্প্রদায়িক সাম্রাজ্য ব্যক্তিবর্গের বোধহীনতার্ঘ্য সরল বাঙ্গলায় বহুশত গীত ও শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। এই সংল গীতের ভাব ও ভাষা আপাতঃ দৃষ্টে সরল বোধ হইলেও বহু গীতের অনেকাংশের অর্থ ছদ্মবাক্য হয় না। ঐ গীত গুলি হইতে সাম্প্রদায়িক আচার ব্যবহার অনেক পরিমাণে জানা যায়। ইহাদের মধ্যে কোন কোনও গীত হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী, আবার, কতকগুলি মুসলমানদিগের সুকী সম্প্রদায় সিদ্ধ। ঐ অসংখ্য গীতের মধ্যে অধিকাংশই এবং অগ্রান্ত সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিবর্গ রচিত গীতাবলী সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়াছে।

রামহুলালের চারি পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে ষোল্ল পুত্র সন্তান হয়। ১ম স্ত্রীর গর্ভে কুঞ্জবিহারি, ইনি নিঃসন্তান। মধ্যমার গর্ভে রাধামোহন ও মথুরামোহন এই দুই ভ্রাতাও নিঃসন্তান। তৃতীয়ার গর্ভে ঈশ্বরচন্দ্র পাল এবং ঐশ্বর্য গর্ভে ইন্দ্রচন্দ্র পাল জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে রামহুলাল বর্তমানেই প্রথম ও দ্বিতীয়ের ৩প্রাণি হয়। রামহুলাল ৪৮ বৎসর বয়স্কমে বাঙ্গলা ১২৩১ সালের চৈত্র মাসের কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণীর দিবস শরীর রক্ষা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, সরস্বতী ঠাকুরাণী জীবিত বিধায় তিনিই সাম্প্রদায়িক “কর্ত্তামা” বা

“শচীম” (সতীমা) নামে আখ্যাত হইয়া সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব করিতে থাকেন। তিনি ত্রীলোক হইলেও তাঁহার সময়ে সাম্প্রদায়িক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পরে ১২৪৭ সালের আশ্বিন মাহায় দেবী পক্ষে প্রতিপদের দিন তাঁহার ৮প্রাপ্তি বটিলে তাঁহার চতুর্থ পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র পাল গদীর মালিক হইয়া সম্প্রদায়ের কর্তা হইয়া উঠেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিত্যজ্ঞ উচ্ছ্রাণ প্রকৃতির লোক ছিলেন; তাহার ফলে এমন কি তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য ইংরাজের কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে হয়; কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে তৎকাল তাঁহাকে তাঁহার সম্প্রদায়ী লোকের চক্ষে কিছুমাত্র হীন হইতে হয় নাই। তাহারাই ইহাকে কর্তার লীলারূপে গ্রহণ করিয়া সেই জেলখানাতেই দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্নাদি প্রস্তুতি ভারে ভারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই কর্তার অমুকরণে নানাবিধ দোষ সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রবর্তিত হয় এবং কর্তাভজা দলের নৈতিক অধোগতি আরম্ভ হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহারাই সংসার ভুক্ত ছিলেন কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের দ্বারা এই সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন কার্যই হইত না তবে তাঁহাকে সমচক্ষেই দেখিত। ঈশ্বর চন্দ্রের দুই পুত্র। ধরনীধর পাল ও বীরচাঁদ পাল। ঈশ্বরচন্দ্রের তিন পুত্র। পূর্ণচন্দ্র, রসিকলাল ও সত্যচরণ। ঈশ্বর পাল লোকান্তরিত হইলে ঈশ্বর চন্দ্রের অসম্মতিতে রসিক ও সত্যচরণ পৃথক গদী স্থাপনা করেন। যাত্রীগণের মধ্যে কেহ ঈশ্বর পালের গদীতে, কেহবা নূতন গদীতে খাজনা করিত। ঈশ্বর পালের জীবদ্দশায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধরনী, তাঁহার বর্তমান হরিদাস পাল নামক পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হইলেন। কনিষ্ঠ পুত্র বীরচাঁদ বিকৃত মস্তিষ্ক বিধায় স্বতন্ত্র বাটীতে বাস করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র, দুই পৌত্রকে লইয়াই গদীতে বসিতেন। তাঁহার লোকান্তরে এই দুই পৌত্রই গদীর অধিকারী হইলেন। এক্ষণে উপস্থিত বীর চাঁদের পুত্র শৈলেশ্বর পালের মৃত্যুর পর হইতে একা হরিদাসই গদীতে বসিয়া থাকেন।

রসিকলাল পাল তাঁহার একমাত্র পুত্র হুরেন্দ্র নামকে রাখিয়া লোকান্তরিত হইলে সত্যচরণ তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র হুরেন্দ্রনাথের সহিত একত্রে গদীতে বসিতেন করেকবৎসর হইতে সত্যচরণ তাঁহার পুত্র ক্রীণোপালক ও জ্যেষ্ঠপুত্র হুরেন্দ্রনাথকে সাবেক গদী দিয়া স্বয়ং স্বাধীনভাবে আর একটী গদী স্থাপনা করিয়াছেন। হায়! কালের ক্রীড়ায় গদীর সংখ্যা এবং সাম্প্রদায়িক লোকের সংখ্যা এবং

অস্ত্রাশ্রয়, বাহিক, বহুবিধের উন্নতি হইলেও সেই পূর্বের সাম্বিক ভাব, সেই ভক্তি ও শ্রম, সেই সত্যনিষ্ঠা ও সেই শ্রী ও সৌষ্টব্য এবং প্রতি শুভ্রবারের সেই পবিত্র মঙ্গলিষ আর নাই—আছে কেবল অর্থের অস্ত্র বা অস্ত্রধর—ধর্মের কুহক, রোগমুক্ত করিবার ক্রমতঃ বুধা ভান ; আর আছে সেই নিষ্ঠুর সমাজ ধর—যেখানে সতীমা সমাহিত এবং প্রাণহীন ঠাকুর ধর—যথায়, রামশরণের খড়ম, আউলিয়া চাঁদের আশাষাড়া ও কথা এবং রামজুলালের কয়েকখানি পবিত্র অস্থি বিদ্যমান এবং শ্রীযুক্তের স্থান । তত্বে, আলিও ঐ ছিন্নকথা ও প্রাণহীন ঠাকুর বাড়ীতে কতই আনন্দে তাহার অতীত দেবকে প্রত্যক্ষ করে কিন্তু কালবশে সেরূপ তত্বে আর করজ্ঞান দৃষ্ট হয় !

ষোড়শ পাড়ার এক্ষণে নিম্ন লিখিত কয়টি কার্য বিশেষ সমুদ্রি সহকারে সমাহিত হইয়া থাকে—

১। দোলযাত্রা—প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হইয়া থাকে । ঐ দিনে এখানে রাসযাত্রাও অনুষ্ঠিত হয় । ঐ দোল মঞ্চটিতে ও রাসের কাঠরায় যদিও রাখাযন্ত্রত জীউর * মূর্তি স্থাপিত হয় এবং সেই সঙ্গে রামশরণ পালের ব্যবহার্য বালিশ ও খড়মও উঠান হয় । এই পর্বতই এখানে সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং এই সময়েই এখানে বহু ব্যক্তি সমাগম হইয়া থাকে । এই উপলক্ষে পালবাবুদের বড় অর্বাগম হইয়া থাকে সম্বৎসরের মধ্যে আর কোনও পর্বত এত হয় না ।

২। রথযাত্রা—উহা প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় হইয়া থাকে । রথের উপরেও উক্ত বালিসটা স্থান পাইয়া থাকে ।

৩। রামশরণ পালের মহোৎসব—উহা আষাঢ় মাসের রথযাত্রার পর চতুর্থী তিথিতে সমাহিত হইয়া থাকে । ইহাতে গৌড় বৈষ্ণবগণের প্রথামুখ্যী অধিবাস মহোৎসব ও পূর্ণ মহোৎসব এই তিন প্রকার মহোৎসব তিন দিন হইয়া থাকে ; ইহাতেও বহু লোক সমাগম হইয়া থাকে ।

৪। শচীমায় মহোৎসব—ইহা প্রতিবৎসর মহালয়ার পরদিন প্রতিপদে সমাহিত হয় । পূর্বোক্ত প্রকারে মহোৎসবাসি হইয়া থাকে ।

৫। কোজাগর লক্ষ্মী পূজা—এ দিনেও ষোড়শ পাড়ার বহুজন সমাগম হইয়া থাকে ।

* এই বিগ্রহ পাল বাবুদের অতিষ্ঠিত নহে । সোপাখালি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর ইহাকে আনা হইয়া থাকে ।

৬। রামতুলসী পালের মহোৎসব—উহার নাম কেহ ধরিত না বলিয়া সকলে তাঁহাকে ত্রীযুৎ বলিয়া ডাকিত ; একারণে ইহার মহোৎসবের নামও “ত্রীযুতের মহোৎসব,” ইহা প্রতিবৎসর চৈত্র মাহার বারুণী তিথিতে সমাহিত হয় ।

এই সকল পরীক্ষাদিতে পালবাবুদের ত্রিবিধ প্রকায়ে আর হইয়া থাকে, ১। খাজনা, ২। ভোগ ৩। মানসিক অর্থাৎ উহাদের মতে প্রত্যেকের দেহেব মালিক কর্তা, সুতরাং তোমার আত্মা যে উহাতে বাস করিতেছে, তজ্জন কর্তাকে তোমার খাজনা দিতে হয়। শচীমা কি ঠাকুর ঘরে যাহা ভক্তি পূর্বক দেও তাহা ভোগ আর রোগমুক্তি বা দায় উদ্ধারের নিমিত্ত যে মানসায় পূজা তাহাই মানসিক। এতদ্ব্যতীত সাম্প্রদায়িক লোক যাহারা যাইয়া থাকেন তাঁহারাও দর্শনী স্বরূপ বহু অর্থ দিয়া থাকেন ।

ভূগতঃ ইহাই কর্তাভজা সাম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের মধ্যে যে সকল গৃহ সাধন প্রথাদি প্রচলিত আছে সেগুলি প্রকাশ করা সাম্প্রদায়িক ক্রতির কারণ বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল ।

সাহেবধনী ।

নদীয়া জেলার দোগাছিয়া গ্রামের হুঃখীরাম পাল ও বাগাড়ে নিবাসী রঘুনাথ দাস প্রভৃতি কয়েক জন হিন্দু ও একজন মুসলমান, সাহেবধনী নামে এক উদাসীনের নিকট মস্ত্রোপদেশ পাইয়া এই ধর্মমত প্রবর্তন করে। ইহা কর্তা ভজারই শাখা বিশেষ। ইহাদের উপাসনার স্থানের নাম আসন। ঐ আসন একখানি চৌকি বিশেষ। প্রতি বৃহস্পতি-বারে এই আসন সন্নিধানে সকলে সমবেত হইয়া সাধনা করে। উহাদের দলে হিন্দু ও মুসলমান সকল জাতিয়েই প্রবেশ অধিকার আছে। হুঃখীরাম পালের পুত্র চরণ পাল এ সাম্প্রদায়ের অনেক উন্নতি সাধন করিয়া যান, ঐ স্থানেও ঘোষপাড়ার স্থায় বহু রোগী তাপীর, নিরাময় হইবার আশায় সমাগম হইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষে বহু অর্থ সংগৃহীত হয় এবং ঐ অর্থে প্রতি বৎসর চৈত্র-মাসে অগ্রদীপে ইহাদের একটি মহোৎসব হইয়া থাকে। ধর্মের জন্ত না হউক ব্যাধি বিদূরিত করিতে নীচ জাতীয়গণের মধ্যে এ সাম্প্রদায়ের প্রচার বেশ আছে, কিন্তু ইহাদের সাম্প্রদায়িক লোক সংখ্যা দিন দিন যেরূপ হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে আর কিছু দিনে ইহাদের নিদর্শন থাকিবে কি না সন্দেহ হয় ।

আউল সম্প্রদায় ।

আউল সম্প্রদায় কর্তাভজারই একটি শাখা মাত্র । ইহাদের অপর নাম সহজ কর্তাভজা । প্রকৃতি লইয়া সাধন করা ইহাদের উপাসনার একটি অঙ্গ । এক একজন আউলের সহিত অনেকগুলি করিয়া প্রকৃতি থাকে ইহাদের কেহ বা কুলবতী কেহ কুলপাংশুলা । ইহাদের মধ্যে জাতি ভেদ প্রথা আরো নাই । সকল জাতিরই প্রকৃতি পুরুষ এক সঙ্গে পানভোজন করে তাহাতে জাতি বিচার করে না । ইহাদের মন নিতান্ত উদার এমন কি একজনের প্রকৃতি অস্ত্রের নিকট বাইলেও ইহারা কখন দীর্ঘ করে না । ইহাদের মধ্যে নানা প্রকার গৃহ সাধনা প্রচলিত আছে । সাধারণের পক্ষে সে গুলি নিতান্ত রুচিবিরুদ্ধ । এ সম্প্রদায়ী লোকের সংখ্যাও দিন দিন হ্রাস চাইতেছে ।

বাউল সম্প্রদায় ।

এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি স্থান নদীয়া জেলা । হরিগুরু, বনচারি সেবা কমলিনী ও অখিলচাঁদ এই চারিজন ককিরকে ইহারা আপনাদের মত প্রবর্তক বলিয়া থাকেন । ইহারা শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায় হইতেই মত গ্রহণ করিয়া আপনাদের সম্প্রদায় গঠন করেন । ইহাদের মতে এই নরদেহে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের বাবতীর পদার্থই বিস্তারিত আছে । চন্দ্র, সূর্য, ব্রহ্মা, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, গোলক, বৈকুণ্ঠ ও বৃন্দাবন সমস্তই এই দেহ মধ্যে । এক কথায় তাঁহাদের মত “বাহা নাই তাতেও অর্ধাং দেহাভ্যন্তরে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে” । এই কারণে তাঁহাদের মত দেহতত্ত্ব বলিয়া খ্যাত । তাঁহাদের মতে স্রীরাধাকৃষ্ণ একাত্মাভাবে মানবহৃদয়ে বিস্তারিত আছে, সুতরাং নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের তত্ত্ব পাইবার নিমিত্ত অস্ত্র গমনের প্রয়োজন নাই । স্ব স্ব দেহস্থিত এই পরম দেবতার প্রতি প্রেমা-মুগ্ধানই এই সম্প্রদায়ের মুখ্য সাধন । তাঁহারা বলেন যে প্রকৃতি পুরুষের পরস্পরের প্রেমেতেই ঐ প্রেম পরিপুষ্ট হইয়া থাকে সুতরাং প্রকৃতি সাধনাই ইহাদের সাধনার প্রধান অঙ্গ । ঐ সাধন প্রকারণ অতীব গৃহ এবং সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ব্যতীত অস্ত্রের আনিবার উপায় নাই, কারণ, এবিষয়ে ইহারা নিতান্ত সাবধান । ইহারা আপনাদের সাধন প্রণালী কাহাকেও প্রকাশ করে না এবং এবিষয়ে কারণ দিচ্ছান্ত হইলে বলিয়া থাকেন,—

“আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা ।

আপনাকে হইবে আপনি সাবধান ॥”

তবে এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে যতটুকু জানা গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে কাম রিপূর চরিতার্থতা সাধনপূর্ব্বক চরমে পরম পবিত্র প্রেম মাত্র অবলম্বন করা এই সাধনার উদ্দেশ্য । ইহাদের মতে যখন ঐ প্রেম পরিপুষ্ট হয় তখন জী পুরুষ উভয়ে আত্ম বিম্বত হইরা উভয়ের লীলাতে কেবল রাধাকৃষ্ণের লীলামাত্র অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন । ঐ সাধনার একাদ্বীভূত চারি চন্দ্র ভেদ নামে একটি প্রক্রিয়া আছে । উহা প্রকাশ করা সাধারণের রুচি বিরুদ্ধ হইবে মনে করিয়া এবং সাম্প্রদায়িক ক্ষতির কারণ বিবেচনা করিয়া সে সম্বন্ধে কিছু লিখিত হইল না ।

ইহাদের অন্তরের ভাব বাহাই হউক, বাহ্যিক বেশভূষা ও আচারাদি বিশেষ লোকাচার বিরুদ্ধ নহে । ইহাদের বেশ, পরিধানে ডোর কোপিন ও বহির্কাস, গাত্রে থেকা পিরাণ বা আলখাল্লা, বাহা সাধারণতঃ নানারূপ বস্ত্রে প্রস্তুত । কক্ষে বুলি, হস্তে বক্র বটী ও কিস্তী বাহা দরবার নারিকেল নামে প্রসিদ্ধ । ইহাদের নাসাগ্রে তিলক ও গলদেশে মালা, বাহা কাঁচ, প্রবাল, পদ্মবীজ প্রভৃতি দ্বারা গঠিত । ইহারা ক্ষৌর কর্ম করে না ; এবং কেশ ও শব্দ ও ওষ্ঠ লোম যত্নে রক্ষা করে এবং মস্তকের কেশ উন্নত করিয়া একটী ঝুঁটি কাঁধিয়া রাখে । অনেকে আবার পায়ে ঝাঁক্ ও হস্তে গোপীঘন্ত্র লইয়া দেহ-তত্ত্ব ও নায়িকা সাধন প্রভৃতি বিষয়ক গীত গাহিয়া বেড়ান । এই সকল গীতের ভাব ও ভাষা সাদাসিধা হইলেও বহুতর সাম্প্রদায়িক সাংকেতিক কথা সন্নিবেশিত থাকার সাধারণের পক্ষে ইহাদের বখাৰ্খ অৰ্ধ পরিগ্রহ করা শ্রুতিনি ।

নারিকা সিদ্ধি, রামময়ীকণা, ব্রজ উপাসনাতত্ত্ব, প্রভৃতি বঙ্গভার্য্য লিখিত কয়েকখানি সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রগ্রন্থে ইহাদের সাধন প্রণালী প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচিত আছে । ঐতহ্যাতীত, কর্তৃত্বজ্ঞানের ন্যায় ইহাদেরও বহু গীত, কবিতা ও বচন প্রচলিত আছে ।

সম্বন্ধে সম্প্রদায় ।

সম্বন্ধে সম্প্রদায় বাউলগণ ই সম্প্রদায় ভেদ নাই ; তবে, ইহাদের আচার

অল্পঠানের সহিত বাউলদিগের আচার ব্যবহার কোনও কোনও স্থলে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন প্রকারের। এই সহজে সম্প্রদায়ের উৎপত্তি স্থল নদীয়া, আজিও নব্বীপে সহজে পাড়া বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পল্লী বিদ্যমান রহিয়াছে। কিঞ্চিৎ বোণাবলঘনের সহিত ইহারা প্রকৃতি সাধন করিয়া থাকে। গুরু শ্রীকৃষ্ণ বা জগৎপতি এবং শিষ্যা রাধিকা এই ভাবের তন্ময়তা আনিয়া সাধনা করাই সহজ সাধন। এক গুরুর অনেক শিষ্যা ও এক শিষ্যার অনেক গুরু হইতে পারে ; যথা—

“গুরু করব শত শত মন্ত্র করব সার

মনের আঁধার যে ঘুচাবে দার দিব তার।”

ইহাদের সাধনের পঞ্চ অঙ্গ যথা—নাম, মন্ত্র, ভাব, প্রেম ও রস। ইহার মধ্যে প্রেমাত্মক ও রসাত্মকই সর্বপ্রধান।

বলরাম ভজা।

নদীয়া, পাবনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে যে একদল হীনজাতীয় লোক অধুনা আপনাদিগকে বলরাম ভজা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে তাহাদেরও উৎপত্তি স্থান এই নদীয়া জেলার মেহেরপুর গ্রাম। ইহারা অধিকাংশই বৈষ্ণবদিগের শ্রায় ভিক্ষোপজীবী। ইহাদের মধ্যে গৃহী ও উদাসীন উভয়বিধ লোকই দৃষ্ট হয়। উদাসীনেরা বিবাহ করে না, গৃহস্থেরা আপনাশন কুলাচার-চুয়ারী বিবহাদি করিয়া থাকে তবে জাতিভেদের বাধাবাধি ইহাদের মধ্যেও অতি শিথিল। ইহাদের সাম্প্রদায়িক কোনও গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না এবং গুরুও কোনও বাধাবাধি নাই। এই মত প্রবর্তক বলরামের কতিপয় আদেশ মাত্র মাত্র করিয়া ইহারা চলিয়া থাকে।

প্রবর্তক বলরাম হাড়ী কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পূর্বে মেহেরপুর গ্রামের মালোপাড়ার এক হাড়ীর গৃহে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। বলরাম বালাবধি সত্যনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় ছিল। যৌবনের প্রারম্ভে সে স্থানীয় জমিদার পদ্ম-লোচন মল্লিক বাবুর বাটীতে চৌকিদারি কর্ষে নিযুক্ত হয়। এই সময়ে মল্লিক বাবুরের গৃহ বিগ্রহ আনন্দবিহারী দেবের কতকগুলি অলঙ্কার অপহৃত হওয়ার বাবুরা বলরামকে চোর সন্দেহে কিছু শাসন করেন। এইরূপে লাঞ্চিত হইয়া মনের আবেগে বলরাম উদাসীন হইয়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বী যোগ সাধনার প্রবর্ত

হয় এবং স্বনাম প্রসিদ্ধ উপাসক সম্প্রদায় গঠন করেন। বলরামের শিষ্যগণ তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার বলিয়া মনে করিত এবং বলরামও তাহাদিগকে আভাবে হেঁহাই বুঝাইতেন। তিনি বলিতেন যে আমি আপন শরীর হইতে এই পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছি। লোকে আমাকে নীচ হাড়ী বলিয়া জানে, কিন্তু আমি সাধারণ হাড়ী নহি আমি হাড়ের সৃষ্টি করিয়াছি তাই আমি হাড়ী। বলরাম বিশেষ বাকচতুর ছিলেন। এ সম্বন্ধে নানারূপ বচন এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। আশ্বিন মাসের অপর পক্ষে একদিন বলরাম নদীতে স্নান করিতে যাইয়া দেখিলেন যে দলে দলে ব্রাহ্মণগণ পিতৃলোকের তর্পণ করিতেছেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশে জলদান করিতেছেন। বলরামও তাঁহাদের ভঙ্গীর অনুকরণে অঞ্জলিপূরিয়া জল লইয়া নদীকূলে সেচন করিতে বসিলেন। তাঁহার অবস্থি কার্য্যে কৌতূহলী হইয়া একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে তর্জণ করণের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, বলরাম উত্তর করিলেন, “যে, আমি ধান্যের ক্ষেত্রে জল দিতেছি,” তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণ বলিলেন যে “তুই কি পাগল হইয়াছিস ? এখানে ধান্যের ক্ষেত কোথা ?” তখন বলরাম উত্তর করিলেন, “আপনারা যে পিতৃ-পুরুষকে জল দিতেছেন তাঁহারাই বা এখানে কোথায় ? যদি নদীর জল নদীতে দিলে তাঁহাদের নিকট যাইয়া পৌঁছে তবে এখানে জল সেচন করিলে কেন তাহা ধান্যের ক্ষেতে না যাইবে ?”

দোলাদি উৎসবে বলরাম স্বয়ং বিগ্রহ সাজিয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ করিত। খ্রীঃ ৬৫ বৎসরকাল এইরূপ জীবনাতিবাহিত করিয়া ১২৫৭ সালের ৩০এ অগ্রহায়ণ তাঁহার বর্তমান আশ্রমের দক্ষিণে ৯১০ রশি ব্যবধানে ভৈরব তটে বলরাম ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক তাঁহার মৃত্যু স্থানে এক গৃহ নির্মাণ করিয়া তথায় বলরামের একখণ্ড অস্থি সম্বন্ধে রক্ষা করিয়া প্রত্যহ তথায় প্রীতিপাদি দ্বিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। সম্প্রতি বলরামের সাম্প্রদায়িক একটা শিষ্য নদীর অপর কূলে একটা মূর্তন আশ্রম স্থাপন করিয়াছে। প্রত্যেক রামনবমীতে এই সাম্প্রদায়িক শিষ্যবৃন্দ এই আশ্রমে সমাগত হইয়া ঐ অস্থি-খণ্ডের দোল উৎসব নির্বাহ করিয়া আনন্দলাভ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে আর কতকগুলি শিষ্য বলরামের একরূপ আদেশ নাই বলিয়া বলরামের মৃত্যুস্থানের

কোনও গৌরব করে না। এইরূপে বলরাম ভ্রম। সম্প্রদায় এই শাখার বিভক্ত হইয়াছে।

বলরামের শিষ্যকলৌর মধ্যে অনেকেরই বলরামের ভ্রম উদারভাবে গ্রাপ্ত হইয়াছে। তবে ইহাদের সকলেই অশিক্ষিত ও হীন জাতির; ইহারা জাতিভেদ প্রথার গৌরব করে না। সকলের অগ্নই সকলে খাইয়া থাকে। ইহারা পীড়িত হইলে প্রায়ই ঔষধাদি সেবন করে না, বিকাশ বলরামের নামেই পীড়া দূর হইবে। এ সম্প্রদায়ীগণের মধ্যে বাচারা জিকোপজীবী তাহারা গৃহস্থর বাটী উপস্থিত হইয়া তিকা না পাইলে এক কথাতেই চলিয়া যায়, বিরক্তি করে না। তিকার, ও কি দুঃখে কি সুখে তাহাদের একমাত্র উক্তি “জয় বলরাম”। কেহ বা আবার “হাড় হাড়ি বলরামও” বলিয়া থাকে।

পূর্বোক্ত ধর্মসম্প্রদায় শুদ্ধি ব্যতীত নদীয়ার হজরৎ, গোবরা, পাগল নাথ ও ধনী বিকাশ প্রভৃতি কতিপয় মুগলমান এক একটা ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গঠন করিয়া আপনাদের মত প্রবর্তন করিয়া গিয়াছে। আর শাস্তিপুত্রের দর্পনারায়ণ নামে একটা চর্যকারও আপনার এক মতন সম্প্রদায় গঠন করিয়া গিয়াছে। এই সকল সম্প্রদায় ভুক্ত লোক সংখ্যা অতি বিরল বলিয়া, তাহাদের সম্বন্ধে অধিক কিছু লেখা হইল না।

এতদ্ব্যতীত নদীয়ার নাগা, অবধূত, কিশোরীভজনী, গোবরাই, চূড়াধারী, তিককদানী, রাধাবল্লভী, গৌরবাদী, হরিবোল্ল, সমীতাবক, ন্যাড়া, দরবেশ প্রভৃতি কতিপয় বিভিন্ন সম্প্রদায়িক লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু আড়াংঘাটার এক নাগাদিগের মত ব্যতীত নদীয়ার মধ্যে এই সকল সম্প্রদায়ীগণের কোন আভা বা মঠ নাই, এবং ইহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প বিধায় বৈকল্য সমাজে তাহাদের প্রতিপত্তিও কিছুমান্য নাই।

নদীয়ার বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মেলা ।

ভারতবর্ষেরো জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অস্ত্র সকল জাতি অপেক্ষা ধর্ম-অনুপ্রাণিত। উর্দূদের প্রতি কাফ্য ধর্মস্বৃতি বিজড়িত। ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ীর মধ্যে হিন্দুগণ আবার সর্বাধিক ধর্মশীল। তাঁহাদের আহার, বিহার, আনন্দ, উৎসব সকলই ধর্মমাথা। তাই যেখানে এতটুকু ধর্মের সম্বন্ধ আছে বা ধার্মিকের স্মৃতিমাথা সেখানেই গুণগ্রাহী আধ্যাত্মান পুরুষানুক্রমে তজ্জিতে বিস্তার হইয়া সদা বাল বহু, তাই ভারতে এত তীর্থ, গ্রামে গ্রামে এত মেলার সৃষ্টি।

নদীয়া চিরদিনই পুতস্থান। কত মহাশ্মা, মহাপ্রাণ এখানে উদ্ধৃত হইয়া কালে এখানেই লয় পাইরাছেন, তাঁহাদের সকলের না হউক, অনেকের স্মৃতি আজিও মেলাকারে স্মরকিত। আজিও দলে দলে হিন্দুসন্তানগণ এই সকল স্থানে সমবেত হইয়া মহোৎসবে রত করেন এবং আপনাদি জন্ম সকল মনে করেন।

নদীয়ার প্রায় সকল গ্রামেই বৎসরের কোনও না কোনও সময়ে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। এ সকলে সাধারণতঃ স্থানীয় ব্যক্তিগণই আনন্দোৎসবে রত করেন; তবে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে বহুজন সমাবেশ হইয়া থাকে এবং বহু প্রাচীন কাল হইতে এই সকল মেলা চলিয়া আসিতেছে দেখা যায়। এই সকল মেলাগুলি একদিকে যেমন ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট তেমনি অপরদিকে ইহাদের সহিত দেশের অন্তর্বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব দেখা যায়।

ঐশ্ব্যম নববীপ ।—গঙ্গা জালাদীর পশ্চিম সঙ্গমস্থলে অবস্থিত, ইহা বৈষ্ণব-দিগের সর্বপ্রধান ঐশ্ব্যম্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের আবির্ভাবস্থান। কালুবশে শ্রীপ্রভুর জন্মভূমি গঙ্গাগর্ভে, যতান্তরে নববীপের পর পার “মারাপুরে”। প্রতি বৎসর কাছাকাছি পূর্ণিমার ঐশ্ব্যম্ নববীপে এবং শ্রী৮ মারাপুরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে উৎসব ও মেলা হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর বাবী শুক্লাকাদমী হইতে আরম্ভ করিয়া ষাট দিন ধরিয়া ধুলোট নামে আর একটা মহতী মেলা

নবদ্বীপে হইয়া থাকে, এতদুপলক্ষে নানা দিক দেশ হইতে প্রায় দশ সহস্র বৈষ্ণবের আগমন হয়, নৃত্যগীত ও মহোৎসবে নবদ্বীপ এই ষাট দিন আত্ম-হারা হইয়া যায়। এই সময়ে বঙ্গের প্রায় সমুদয় বিখ্যাত কীর্ত্তন সম্প্রদায় একত্রে মিলিত হয়েন। হুগলীর ৮মাধবচন্দ্র দত্ত (কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মাধব বাবু বাজার বাহার) মহাশয়ের উত্তোগে ও অর্থে প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে প্রথম এই উৎসবটী সৃষ্ট হয়।

পাঁচ পূর্ণিমা (কার্ত্তিকী পূর্ণিমা) নদীয়ার আর একটা উল্লেখযোগ্য মেলা। সুবৃহৎ এবং সু-উচ্চ অথচ সুগঠিত মুগ্ধায়ী দেবী কালীকার মূর্ত্তি ভীতি ও ভক্তির উদ্দীপক। এই উপলক্ষে দুই দিন মেলা হইয়া থাকে।

শ্রীনবদ্বীপ ধাম শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলা স্থান বলিয়া যেমন বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণাবন তুল্য মাছ, তেমনি আবার ইহা শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শ্বদগণের কাহারও কাহারও জন্মস্থান বা আবাস ভূমি বলিয়া বৈষ্ণবগণসকলে শ্রীপাট বলিয়াও খ্যাত। এই নবদ্বীপ ব্যতীত আধুনিক নদীয়া জেলার মধ্যে আরও কতিপয় গ্রাম ঐরূপ শ্রীপাট বলিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট মাছ। বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেমন শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার ভেদ তেমনি তাঁহার শ্রীচৈতন্য লীলার পার্শ্বদ গোপাল, উপগোপল এবং মোহান্তগণও শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব পূর্ব লীলারই অভেদ সঙ্গী। তাঁহাদের মতানুযায়ী নদীয়াবাসী মহাপুরুষগণের নাম ও শ্রীপাট স্থান এইরূপ নির্দিষ্ট হয়। *

পূর্ব লীলার

গৌর লীলার

পাট

মধুমঙ্গল

শ্রীধর (খোলা বেচা)

নবদ্বীপ

* নদীয়াবাসী সংখ্যাতীত চৈতন্য ভক্তগণের মধ্যে কতিপয় প্রধানের পাট মাছ এখানে লিপিবদ্ধ হইল। দ্বিতীয়াংশতঃ এই সকল শ্রীপাটের অধিকাংশই অতি হীন অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেবার বন্দবস্তও অধিকাংশ স্থলে অতি শোচনীয়। আবার কোনও কোনও পাট স্থান একেবারেই লোপ পাইয়াছে, আবার কোথাও নূতন পাট বসিয়াছে। যেমন স্বৰ্গনাগর ভাদ্রিয়া স্বৰ্গনাগরের পাট চাঁদুড় উঠিয়া আসিয়াছে, তেমনি নূতন কুলিয়ার পাট স্থাপিত হইয়াছে। পাটগুলির প্রতি বৈষ্ণব সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নতুবা আর কিছু দিনে এ গুলির লোপ অবশ্যজাবী।

পূর্বলীলায়	গৌরলীলায়	পাট
গজকর্ষ গোপাল	মুকুন্দানন্দ পণ্ডিত	নবদ্বীপ ।
নারদ	শ্রীবাস	নবদ্বীপ ।
হুমায়ুন	মুরারী গুপ্ত	নবদ্বীপ ।
অঙ্গদ	পুরন্দর পণ্ডিত	নবদ্বীপ ।
হুগ্রীব	গোবিন্দানন্দ	নবদ্বীপ
বশিষ্ঠ	গঙ্গাদাস পণ্ডিত	(বিদ্যানগর) ।
বিভীষণ	রামচন্দ্রপুরী	নবদ্বীপ ।
ব্রহ্মা	গোপীনাথচার্য্য	নবদ্বীপ ।
শঙ্খনিধি	আচার্য্যরত্ন	নবদ্বীপ ।
বিধামিত্র	বনমালী আচার্য্য	নবদ্বীপ ।
ভদ্রা	শঙ্কর পণ্ডিত	„ (পাহাড়পুর) ।
নিশাথা	স্বরূপ দামোদর	নবদ্বীপ ।
মধুরেক্ষণী	বলভদ্র ভট্টাচার্য্য	নবদ্বীপ ।
মধুরা	বিদ্যাচাম্পতি	„ (কাঁউগাছি)
কামমঞ্জরী	নন্দন ব্রহ্মচারী	নবদ্বীপ ।
কলভাবিনী	বাণীনাথ পণ্ডিত	„ (গাদিগাছা) ।
হুকেণী	মকরধ্বজ	„ (বড়গাছি) ।
কলাপিনী	জগদানন্দ পণ্ডিত ।	নবদ্বীপ ।
হুধীরা	মাধবাচার্য্য	নবদ্বীপ ।
নান্দীমুখী	সায়দ ঠাকুর	„ (মাউগাছি) ।
সদাশিব	অষ্টভৈরাব্য	শান্তিপুর ।
হরজিণী	শ্রীহর্ষ	শান্তিপুর ।
গোপালিকা	গোপালাচার্য্য	শান্তিপুর ।
বীরা	শিবানন্দ সেন	কাঁচড়াপাড়া ।
গোপালী	কর্ণপুর	কাঁচড়াপাড়া ।
চিত্রাঙ্গদী	শ্রীনাথ পণ্ডিত	কাঁচড়াপাড়া ।
গুণচূড়া	পরমানন্দ সেন	কাঁচড়াপাড়া ।
তোককুক •	ঠাকুর পুরুষোত্তম	হুধনাগর ।
চন্দ্রলতিকা	জগদীশ পণ্ডিত	বশোড়া ।
ভাঙড়ী	দেবানন্দ পণ্ডিত	কুজিয়া ।
	প্রভৃতি ।	

শান্তিপুর ।—রাণাঘাট কৃষ্ণনগর লাইট রেলের উপর । ইহা অশ্বত-
প্রভুর বংশধরগণের শ্রিয় আবাস ভূমি । এখানকার কার্তিকী পূর্ণিমায়
রাসমেলা সমগ্র ভারতে সুবিখ্যাত, এমন কি স্মৃদূর মণিপুর হইতেও এখানে
শত শত ভক্তের সমাবেশ হইয়া থাকে । মেলা তিন দিবস স্থায়ী, এই তিন
দিন নৃত্য-গীত-মহোৎসবে শান্তিপুর মুখরিত হইয়া উঠে । শেষ দিন গোয়ায়ী
প্রভুগণ বিগ্রহাদি সুবর্ণ খচিত রৌপ্যমণ্ডিত হাওদা সকলে সুসজ্জিত করিয়া
বাদ্যোদ্ধাম সমভিব্যাহারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হয়েন । এই উপলক্ষে
৩০ হইতে ৫০ সহস্র লোক সমাবেশ হয়, এবং বহু সহস্র মুদ্রার জব্যাদি খরির
বিক্রয় বইয়া থাকে ।

উলা বা বীরনগর ।—রাণাঘাট মূর্শিদাবাদ রেল লাইনের উপর ।
এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় মা চণ্ডীর পূজা উপলক্ষে তিন দিবস
স্থায়ী মেলা হইয়া থাকে, এবং এই কালে উলার উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ায়
বিশেষ সমৃদ্ধির সহিত ছুইখানি বারোয়ারী পূজা হয় । উত্তর পাড়ায় বিলু-
বাসিনী ও দক্ষিণ পাড়ায় মহিষমর্দিনী মূর্তির পূজা হয় । পূর্বকালের এমন
কি ১৮৪৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সাহিত্য সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে এই
মেলায় কয়দিন উলার গৃহস্থ মাত্রই সমাগত বিদেশীয়গণের সেবায় রত হইতেন
এবং যে কেহ এইরূপে অতিথী অভ্যাগতের সমাদর না করিত সেই গ্রামের
প্রধান কর্তৃক সমাজচ্যুত হইত । * পূর্বে উলার কোতুকী ব্রাহ্মণগণ সমগ্র
বাঙ্গলা হইতে ভিক্ষা সাধিয়া নায়েব পূজার সমারোহ ব্যাপার করিতেন ।

* The headman of the town (Ula) has passed a by-law that any
man who on this occasion refuses to entertain guests shall be considered
infamous and shall be excluded from society.

Article "The banks of Bhagirathi"
in Cal Review Vol VI 1846.

অনেকের মতে উলার এই দেবী বৌদ্ধ পূজার রূপান্তর মাত্র, তাঁহাদের অন্যান্য মূর্তির
মধ্যে হাড়ীঘারা দেবীর প্রথম পূজা ও শুকর বলীদান প্রভৃতি প্রবাদগুলি অন্ততম ।

বিয়হীগ্রামেও এক অতি প্রাচীন চণ্ডীদেবী আছেন তাঁহার নাম হইতে ডিহি চণ্ডীর নাম
হইয়াছে । ইনি কতদিনের প্রাচীন তাহা বলা যায় না, তবে দেখা যায় যে মহারাজা কৃষ্ণ
এই চণ্ডীদেবীর বহু জমী লইয়া বিয়হীর মদন গোপাল বিগ্রহের নামে ছাড়পত্র দেন । এই
মদন গোপাল সৰ্ব্বদা এতদকালে বহু অল্পত প্রবাদ প্রচলিত আছে ।

এই উপলক্ষে অনেক কৌতুক কাহিনী এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে । কথিত আছে উলার মায়ের সেবক কোনও ব্রাহ্মণ কোনও এক রূপ ধরীর নিকট মায়ের পূজার কারণ চান্দা ভিক্ষা করিতে গমন করেন । বাবুটি বয়সে প্রবীণ, স্কুল কলেবর, এক চক্ষু হীন, নিজের বুদ্ধিবলে বিপুল ধনের অধিকারী হইয়াও অসম্ভব রূপণ ছিলেন । বাবুটি ব্রাহ্মণের পৌনঃপুনিক কাতর প্রার্থনার উত্তেজিত হইয়া যখন বলিলেন “দেখ ঠাকুর বার বার কেন আর ও প্রসঙ্গ আনিতেছ; আমার নিকট কিছু প্রত্যাশা করিও না কারণ দেখিতেই তো পাইতেছ যে বাজে খরচ আমার আদৌ নাই ওটা আমার কুণ্ডিতেই লিখে না,” তখন ব্রাহ্মণ অননুগতি হইয়া সবিনয়ে উত্তর দিলেন “মহাশয় যাহা আদেশ করিতেছেন তাহা সত্য, কিন্তু বাজে খরচ যে আপনার আদৌ নাই তাহাতো বোধ হইতেছে না, দেখিতেছি আপনার একটা চক্ষু নাই, যেটা আছে সেটাও ক্ষীণশক্তি, সেইটীর জন্তই পরকলা ব্যবহার করিয়া থাকেন; বাজে খরচ যদি নাই তবে যে চক্ষুটা একেবারে দৃষ্টিশক্তিহীন সেটাতে পরকলা কেন?” বাবু নিরুত্তর, ব্রাহ্মণ সফল মনোরথ হইয়া বিলক্ষণ দক্ষিণার সহিত বিদায় পাইলেন ।

আর একবার হেষ্টিংসের দোদ্দিগু প্রতাপ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কার্য্যোপলক্ষে ভাগিরথী দিয়া গমনকালে শাস্তিপুরের ঘাটে কিয়দ্বিবসের জন্ত অবস্থান করেন । উলার ব্রাহ্মণ মায়ের-সেবকগণ এই সংবাদ পাইয়া কোশলে দেওয়ানের নিকট হইতে বিলক্ষণ কিছু মায়ের পূজার পার্কিনী আদায় করিবার মানসে সমলে শাস্তিপুরের ঘাটে দেওয়ানের বজরার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । তাঁহাদের সকলের তখন মল্লবেশ হস্তে এক এক গাছি রজ্জু, এই বেশে বজরার সম্মুখে আসিয়া তাঁহারা সমগরে “বেটা সিংহ কোথায়, বেটা সিংহ কোথায়” রবে এক মহা কোলাহল উখিত করিলেন । সিংহ মহাশয় ব্রাহ্মণগণের এইরূপ সদৃশ আহ্বানে সচকিতে বজরা হইতে বাহির হইলে, মায়ের প্রধান পাণ্ডা রজ্জু হস্তে অগ্রগর হইয়া বলিলেন “বেটা সিংহ, মহামায়ের সিংহের পায়ের ব্যথা হইয়াছে, কাল রাত্রিতে তাই দয়াময়ি আমাদের প্রত্যাশে করিয়াছেন যে মায়ের সিংহের স্থানে তোমার লইয়া যাইতে হইবে; এবার মায়ের ইচ্ছা তোমার ক্ষেপে চলিয়া আসেন, তাই আমরা রজ্জু হস্তে তোমাকে লইতে

আসিয়াছি, এখন মায়ের আসিবার তার তোমার উপর'' ; ভক্তি গলগল চিত্তে সিংহ মহাশয় ব্রাহ্মণগণের কোড়াকালীকান্দ মন্তকে লইলেন এবং সেবার মায়ের পূজার সমগ্র ব্যয়ভার স্বীয় স্বন্ধে গ্রহণ করিতে স্বীকার হইলেন ।

এখন দেশের লোকেরও ভক্তির আর সে প্রবল শক্তি নাই, উল্লয় মা চণ্ডীরও আর সে সমৃদ্ধিশালী পূজা নাই, মেলা হয় লোক বায়, তা'মাসা দেখে, কিন্তু হায় ! সভক্তি মায়ের পূজা করজনে করে ।

ঘোষপাড়া ।—ই, বি, এস, রেলের কাঁচড়াপাড়া* ষ্টেশনের নিকট । ইহা কৰ্ত্তাভাণ্ডা সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা । কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে নামিয়া অন্যান্য দুই ক্রোশ উত্তর পশ্চিমমুখে বাইতে হয় । সম্বৎসরে এখানে বতগুলি পৰ্ক অনুষ্ঠিত হয় তন্মধ্যে ফাস্তুনী পূর্ণিমার দোলপৰ্কই সবিশেষ প্রসিদ্ধ ও এই উপলক্ষে রেল, ষ্ট্রামার ও নৌকাযোগে বহু সহস্র নরনারীর সমাগম এবং বহু সহস্র মুদ্রার দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে ।

ত্রিহট্ট, (তেওট বা তেহাটা) ।—মেহেপুর সবডিভিসনের অধীন । পৌষ সংক্রান্তিতে তিন দিবস ব্যাপী মেলা বসিয়া থাকে, ইহা কৃষ্ণরায়ের মেলা নামে খ্যাত । এই কৃষ্ণরায়জী নদীয়ারাজের বিগ্রহ । কৃষ্ণরায়জী বিগ্রহের বাম পার্শ্বে শ্রীমতি রাধিকা মূর্তি নাই কৃষ্ণরায়জী একক । কথিত আছে কোনও সময়ে ঠাকুরাণীর গাত্র হইতে যবন জাতীয় চোরে অলঙ্কার অপহরণ করিলে পূজারিরা তাঁহাকে মন্দির সমিহিত দীর্ঘিকায় বিসর্জন দেন, তদবধি ঠাকুরের অন্তে আর দেবী মিলে নাই । এই মেলায় প্রায় ৩৪ সহস্র লোক সমাগম হইয়া থাকে । এই মেলার পর দিবস এতদঞ্চলের যাবতীয় গৃহস্থ তাঁহাদের গৃহজাত উৎকৃষ্ট সপরিষ ফল কৃষ্ণরায়জীকে উপহার দেয় । সেই সকল উৎকৃষ্ট ফল রাশি দেখিয়া ইহাকে কৃষী প্রদর্শনী বলিয়া মনে হয় ।

মাটিরারী ।—প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর সময় এখানে প্রায় পঞ্চকাল ব্যাপী এক মেলা বসিয়া থাকে । নদীয়া জেলার মুসলমানগণের বতগুলি দরগা বা পীরের আস্তানা আছে তন্মধ্যে এইটী সবিশেষ প্রসিদ্ধ । এখানকার পীর "মল্লিক গঙ্গ" নামে খ্যাত । "মল্লিকগঙ্গ" উপাধি বিশেষ, "মলি-অল গঙ্গ" হইতে ইহার উৎপত্তি । গঙ্গ শব্দে ককির বুঝায় মলি-অল

অৰ্ধে বাদসা অৰ্ধাংশ ককীরের বাদসা। এই আন্তানাটী কত দিনের প্রাচীন তাহা স্থির নিশ্চয়ে বলা যায় না, তবে কিম্বদন্তী এইরূপ যে যখন কুকনগর রাজবংশের পূৰ্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার এই মাটিয়ারীতে তাঁহাব রাজধানী স্থাপনা করেন তখন উক্ত পীর ও তদীয় ভ্রাতা করিম দুইটি শিষ্য (একজন রজক অপরা নাপিত) সমতিব্যাহারে এখানে আগমন করেন। স্থানীয় মুসলমানগণ করিমের বিবাহ প্রস্তাব করিলে করিম তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া এখান হইতে এক ক্রোশ দূরবর্তী গোবিন্দপুরে গমন করেন ও তথায় তিনি জাহির করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর এইখানেই তাঁহার কবর হয়। ইহা ভ্রাতাই সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, বাহাকে বাঁহা বলিতেন তাহাই সিদ্ধ হইত। মল্লিকগণের পাশ্বে তাঁহার শিশু ছটারও কবর হয়। এই পীরের কুকনগরের রাজাদের দত্ত অনেক পীরোত্তর ছিল কিন্তু এখন উহা কতক জমীদারের খাস দখলে কতক সেবাইতগণের নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। মেসার প্রথম তিন দিন ৮১০ সহস্র লোক সমবেত হয়। এই মেসার মুসলমানগণের হুপী, হাতা, বেড়ী, কড়া প্রভৃতি লোহার সামগ্রী, কাটকাটরা ও মনোহারী দ্রব্য ইত্যাদি বিক্রীত হয়।

সুন্দরপুর।—ইহা করিমপুর থানার অধীন। প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে পক্ষ ব্যাপী মেলা বসিয়া থাকে এতদুপলক্ষে প্রায় দশ সহস্র ব্যক্তির সমাবেশ হইয়া থাকে। এখানকার শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দজী তাঁহারি উদ্দেশে জুলসী বিহার মেলা হইয়া থাকে।

গোন্দামী দুর্গাপুর।—আজমতাদা রেল ষ্টেশন হইতে পূৰ্ব দক্ষিণ মুখে দুই ক্রোশ ব্যবধানে এই গ্রামটা সংস্থাপিত। প্রতি বৎসর কার্তিকী পূর্ণিমার পক্ষব্যাপী এক মেলা হইয়া থাকে এবং অল্পদূর দশ সহস্র লোকের সমাবেশ হয়। এখানকার শ্রীবিগ্রহ স্বাধারমণ জীউ। কথিত আছে যে নাকানী ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান গোন্দামী দুর্গাপুর যে স্থানে অবস্থিত তথায় নিবিড় বন ছিল। এক পরম রূপবান সিদ্ধ সন্ন্যাসী সেই বনে বাস করিতেন। সাধারণ লোকে তাঁহাকে গোন্দামী বলিত। একদিন কতকগুলি দস্যু কোমর হান লুণ্ঠন পূৰ্বক এই বন মধ্য দিয়া প্রত্যাগমন কালে পিপাসার্ত হইলে এই গোন্দামী বোম্বলে আগনার ক্ষুদ্র কমণ্ডলু হইতে তাহাদের সকলকে জলদানে

পরিভ্রষ্ট করিলে দম্ভাগণ কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে তাতাদের স্মৃতিত সামগ্রীর মধ্য হইতে এই রাধারমন জীউ বিগ্রহ তাঁহাকে অর্পণ করে। যোগীও তদবধি সাময়ে এই ত্রিবিগ্রহের সেবা চালাইয়া আসিতেছিলেন। কিছুদিন পরে এই গোস্বামী হুর্গাপুরের প্রায় ১৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত জয়দিরা বাসী রাজা রায় মুকুট স্বগুণার্থ এই বনে আগমন করেন এবং এই নবীন গোস্বামীর অপরূপ রূপ ও অলৌকিক যোগবল প্রত্যক্ষ করিয়া স্বীয় একমাত্র হৃদিতা হুর্গাবতী দেবীকে তদীয় কয়ে সমর্পণ করেন এবং বন কাটাইয়া নগর স্থাপনপূর্বক ইহার “গোস্বামী হুর্গাপুর” নামকরণ করেন। পরে রায় মুকুটের পুত্র রাজা ত্রীকক্ষ রায় ১৫৯৬ শকে রাধারমন দেবের নিমিত্ত ইষ্টক নিৰ্ম্মিত একটা শ্রীমন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। শ্রীমন্দিরটির অনেকাংশ যদিও এক্ষণে মৃত্তিকাপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে ও উহা ক্রমেই ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হইতেছে তথাপি মনোযোগ সহকারে ইহার ইষ্টকের উপর খোদিত কারুকার্য দেখিলে যোগিত হইতে হয়। মন্দিরটি পূর্বদ্বারী এবং উহার দক্ষিণ পার্শ্বে এই সংস্কৃত কবিতাটি খোদিত আছে—

“কালান্ব বাণেন্দু মিতে শকাঙ্কে

জ্যৈষ্ঠে শুভে মাসি স্মনির্মাণমঃ।

ত্রীকক্ষ রায়ঃ শুভ সৌধ মন্দিরঃ।

ত্রীমুক্ত রাধারমনায় সন্দদৌ ॥”

আড়ংঘাটা।—ই, বি, এস, রেলের উপর। প্রতি বৎসর সমগ্র জ্যৈষ্ঠ মাস ব্যাপি এখানকার ত্রিবিগ্রহ যুগলকিশোর দেবের এক মেলা বসিয়া থাকে। এই যুগলকিশোর দেব বহুকাল হইতে এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ঠাকুরের গৃহশ্রাদ্ধস্থিত খাত্ত গোলা হইতে রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার “কৃষ্ণপাড়ার” প্রথম সৌভাগ্য স্মৃতিত হয়। পূর্বে এই স্থানে বহু নাগা সন্ন্যাসীরা বাস ছিল। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে এখানকার তদানীন্তন মোহান্ত কর্তৃক এই বর্তমান মেলাটি স্থাপিত হয়। এবাদ বে জ্যৈষ্ঠমাসে যুগলরূপ দর্শন করিলে জীলোকের আর বৈধব্য সম্বটিত হয় না, তাই এই এক মাস ধরিয়া অন্যান্য এক লক্ষ জীলোক এই স্থানে আসিয়া দেবদর্শন করিয়া থাকেন।

কুলিয়া—কাঁচড়াপাড়া রেল ষ্টেশন হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ পূর্বদিকে

অবস্থিত। এখানে প্রতি বৎসর পৌষী কৃষ্ণকাদশী হইতে তিন দিন ব্যাপী মেলা ও উৎসব হইয়া থাকে। প্রায় ৮।১০ সহস্র লোক এই উপলক্ষে সমবেত হয়। ইহা দেবানন্দের অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ বলিয়াও খ্যাত। কিন্তু মায়াবাদী পণ্ডিত দেবা-
ষে কোনও দিন এইস্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব গ্রন্থ সকল একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে তাহা কিছুতেই বোধ হয় না। শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্রহসি দাসের নবদ্বীপ পরিভ্রমণ পদ্ধতি, বৈষ্ণবচূড়ামণি প্রেমদাস প্রভৃতি বিখ্যাত পদকর্তাগণের বিরচিত পদসমূহ ও অন্যান্য বহু প্রামাণিক গ্রন্থরাশি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যে কুলিয়া গ্রামে পতিতপাবনাবতার শ্রীমদৌরাদ প্রভু অধ্যাপক চাপাল গোপালকে ‘শ্রীবাস-অপরাধ’ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন যে স্থানে শ্রীপ্রভু ভাগবতবেত্তা মায়াবাদী পণ্ডিত দেবানন্দের ভক্তাপরাধ মার্জনাপূর্বক বর দিয়াছিলেন এবং যে স্থানে কৃষ্ণানন্দ নামক তদ্বিকিং কোনও পণ্ডিত বৈষ্ণবা-
পরাধে মহারোগগ্রস্ত হইয়া শ্রীমদ্রহস্যপ্রভুর কৃপার রোগ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, সেই যোগীজন দুর্লভ মহাতীর্থ কুলীয়া তদানীন্তন নবদ্বীপের সন্নিহিত একটা পল্লী বিশেষ ছিল এবং উহা তৎকালীন গঙ্গার পশ্চিম কূলে (এখন যেখানে নবদ্বীপ অবস্থিত প্রায় সেই স্থানে) অবস্থিত ছিল, স্মৃত্তরাং বর্তমান কুলিয়ার সহিত শ্রীপাঠ কুলিয়া গ্রাম বা কোলদ্বীপের কোনওরূপ সম্বন্ধ ঘটান যায় না, তবে বর্তমান কুলিয়ার গৌরব রক্ষা করিতে, “পূরণম্ পঠণম্ বজ্র, যত্র পদ্ম বনানী চ তুলসী কাননম্ যত্র, তত্র সন্নিহিত হরি” ইত্যাদি বাক্য-
দ্বারা যদি ঐ স্থানের ভগবৎ সান্নিধ্য প্রমাণ করিতে চাহ তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। বরং বিশ্বস্তির অতল গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহারা ভক্তের মনে দেবনন্দাদির অপরাধ ভঞ্জনরূপ মহাঘটনার স্মৃতির আগুরুক রাখিয়াছেন তা সে যে স্থানেই হউক না কেন তাঁহাদের উদ্যম প্রশংসনীয়। নতুবা সেই পরম পরিজ্ঞাতা ভূমির সম্বন্ধে শ্রীমদ্রহসি দাস “নবদ্বীপ মণ্ডল” বর্ণনাকালে ইহাকে নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ দ্বীপরূপে উল্লেখ করিয়া ইহার এইরূপ ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন যথা,—

“কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম। পূর্বে কোলদ্বীপ পর্ত্তাখ্যানক ধাম
প্রভু প্রিয় ভক্ত কোলদ্বীপে। পর্ত্তেভের প্রায় দেখা দিলা কোল রূপে ॥

কোল বীণ নাম এইমতে । অন্ত্যস্ত মধুর কথা আছে ইহাতে ॥”

ঐচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে নবম অঙ্কে সুবিখ্যাত কবিকর্ণপুর মহাশয় কুলিয়া নবকে এইরূপ লিখিয়াছেন, উৎকলাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভু কুলিয়ার আছেন ওনিয়া কুলিয়া কোথায় তাহা সৰ্বভৌমকে পুছিলে, তিনি বলিলেন,—

“সার্বভৌম বলে রাজা নববীণ পারে ।

কুলিয়া নামেতে গ্রাম গঙ্গার ওপারে ॥”

পুনশ্চ ঐ,—“নববীণ পারে সে কুলিয়া নামে গ্রাম ।

ঐনাথব দাস তথা আছে ভাগ্যবান ॥”

পুনশ্চ ঐ,—“সপ্তদিন এইমতে কুলিয়া নগরে ।

তাহাইলা সৰ্বলোক আনন্দ সাগরে ॥

প্রাতঃকালে চলিলেন গঙ্গা তটে তটে

স্বর্গে মর্ত্যে হরিশ্রবণি কলরব উঠে ॥”

ঐচৈতন্য ভাগবতে মধ্যখণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে ঐশ্বনাথন দাস ঠাকুর কুলিয়ারে গঙ্গার উপর বলিয়া বর্ণনা কবিরাজে,—

“তবে নিত্যানন্দ সৰ্বপার্বদেয় সঙ্গে । প্রতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে কীর্তনের সঙ্গে ॥

বানী যোতা বড় গাছি আর দোঁগাছিয়া । গঙ্গার ওপারে কতু যায়েন কুলিয়া ॥”

পুনশ্চ ঐ অন্ত্য খণ্ড ৩য় অধ্যায়ে,—

“কুলিয়া নগরে আইলেন সানীমণি । সেইক্ষণে সৰ্বদিকে হইল মহাধ্বনি ॥

সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ার কুলিয়ার । শুনি মাত্র সৰ্ব লোক মহানন্দে ধার ॥

বাচস্পতি প্রাণেতে বসত গহন আছিল । তার কোটী কোটী গুণ সকল পুরিল ॥

“কর্ণেকে আইল” মহাশয় বাচস্পতি । তিনি নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি ।
কতক্ষণে মাত্র বাচস্পতি একেশ্বর । ডাকি আনিলেন প্রভু গৌরদাস স্মরণ ॥”

ঐচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য খণ্ডে ১ম অধ্যায়ে ঐকবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

“কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দে প্রসাদ ।

পান্ডী নিম্নক আসি পড়িল চরণে ।

গোপাল বিশেষে কথা শ্রবাস অপরাধ ।

অপরাধ কহি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে ॥”

এ বর্ণনা পাঠে কুলিয়ার অবস্থান সৰ্ব্বত্র কোঁক শীমাংসা হয় না, বিশেষতঃ কবিরাজ গোস্বামী বহুহলেই শ্রীকৃষ্ণাবনদাসের বিস্তারিতরূপে বর্ণিত বিষয়গুলি সংক্ষেপে লিখিয়া সারিয়াছেন বখা,—

“শান্তিপুর পুন কৈল দশ দিন বাস । বিস্তারি কহিয়াছেন কৃষ্ণাবন দাস ।
অতএব ইহা তার না কৈল বিস্তার । পুনরুজ্জ্বল হয় এই বাড়িরে বিস্তার ।”

এক্রেত্রে তাঁহার নিকট বিস্তারিত বর্ণনা আশা করা যায় না, তিনি চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে লিখিয়াছেন যে শ্রীপ্রভু পাণিহাটা হইতে কুমারহাটে শ্রীবালকে দর্শন দিয়া, কাকন পল্লীতে শিকনন্দ সেন ও বাসুদেব দত্তের গৃহে পদার্পণ করতঃ বাচস্পতি গৃহে উপনীত হইলেন ও তথা হইতে কুলিয়ার গেলেন । এই বাচস্পতির গৃহ কুলিয়ার নিত্য সন্নিহিত না হইলে চৈতন্য ভাগবতের পূর্বোক্ত অংশের অনুযায়ী তিনি কদাপি “কণেকের” মধ্যে কুলিয়ার শ্রীপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইতে পারিতেন না । এখন দেখিতে হইবে এই বাচস্পতির গৃহ কোথায় ছিল,

চৈতন্তভাগবতে—

“সার্কভৌম জাতা বিদ্যাবাচস্পতি নাম ।”

পুনশ্চ ঐ মধ্যখণ্ডে ২১ অধ্যায়ে—

“হেন মতে নবদীপে প্রভু বিশ্বম্ভর । বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গুণধর ।
একদিকল প্রভু করে জয়ন । চারিদিকে বসে আশু ভাগবতগণ ।
সার্কভৌম পিতা বিহারন মহেশ্বর । তাহার জাকালে গেল প্রভু বিশ্বম্ভর ।
সেইখানে দেবানন্দ পতিভের বাস । পরম হৃদয় বিপ্র বোক অভিসার ।”

উহা হইতে জানা যাইতেছে যে মহেশ্বর বিহারন, সার্কভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতির পিতা ছিলেন এবং তাঁহার নিবাস নবদীপেরই এক অংশে ছিল, আবার তাঁহার নিবাস নবদীপের যে অংশে ছিল কুলিয়া তাহারই সন্নিহিত ছিল, তাই সংবাদ প্রাপ্তিমান “কণেকের” মধ্যে বিহারন মহেশ্বর প্রভুর নিকট বাইতে পারিয়াছিলেন ।

আবার শ্রীচৈতন্তমঙ্গলে দেখা যায়,—

“গঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ়দেশে গিয়া । ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা নগর কুলিয়া ।
স্নানান্তে দেখিবেন সন্ন্যাসের ধর্ম । নবদীপ আইলা প্রভু এই তার মর্ম ।”

মারের বচনে পুনঃ গেল নবদ্বীপ । বারকোনা ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ ॥

উহা হইতে কুলিয়া যে তদানীন্তন নবদ্বীপেরই অংশ বিশেষ তাহাই প্রমাণ হইতেছে ।

একখানি প্রাচীন গ্রন্থে কুলিয়া যে নবদ্বীপের পর পারে অবস্থিত তাহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে,—

“ততঃ কুমারহটে শ্রীবাস পণ্ডিত বাট্যা মজাবর্যো । ততো অধৈবত বাটী-
মন্তোভ্য হরিদাসে নাভিবন্দিত তুধৈব তরণীবর্তনান নবদ্বীপস্ত পারে কুলিয়া
নাম গ্রামে মাদবদাস বাট্যা মুন্নির্ণবান ।”

বিখ্যাত পদবর্তী শ্রোমদাস বংশীবন্দন ঠাকুরের অন্তর্যন্ত লিখিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—

“নদীয়ার বাম্বাধানে সকল লোকেতে জানে, কুলিয়া পাহাড় নামে স্থান ।

তথায় আনন্দধাম শ্রীহরকৃষ্ণ নাম মহাতেজা কুলীন সন্তান ॥”

এই সত্য এবং অজ্ঞাত বহু প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে বলেন যে কাঁচড়াপাড়ার উত্তর পূর্বস্থিত কুলিয়া গ্রাম কোনও ক্রমেই দেবানন্দাদির অপরাধভক্তনের স্থান হইতে পারে না । সে কুলিয়া গ্রাম প্রাচীন নবদ্বীপের পরপারে বিদ্যমান ছিল এবং এই স্থানেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কর্তৃক দেবানন্দাদির অপরাধ মোচন হয় । শ্রীপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া উদার জ্বর ভাগ্যবান দেবানন্দ শুধু আপনায় অপরাধ মোচনে উল্লসিত না হইয়া, সমগ্র জীবের প্রতি কৃপা পরতন্ত্র হইয়া শ্রীপ্রভুর চরণে প্রার্থনা করেন যেন এই পবিত্রধামে যেখানে তিনি শ্রীপ্রভুর চরণোদ্রাব প্রাপ্ত হইলেন সেখানে অপরাধী যে কেহ তাঁহার কদা তিকা করিবে, সেই বেন নির্বিচারে তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হয় । শ্রীপ্রভুও দেবানন্দের এই পরম উদার প্রার্থনার বীজিত হইলে কুলিয়া গ্রাম দেবানন্দের পাট বা শ্রীপাট কুলিয়া নামে খ্যাত হয় । কিন্তু কলির জীবের হর্ভাগ্যবশতঃ এই পরম পরিভ্রাতা কুলির কোনও নিরর্থনই এখন পাওয়া যায় না । বর্তমান নবদ্বীপের দক্ষিণাংশে এই কুলিয়া সংস্থাপিত ছিল এইরূপ অনুমান করা যায় ।

বর্তমান কুলিয়ার পাটের ইতিবৃত্ত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে আমরা নিম্নলিখিত রূপ বিবরণ ভলি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি । “আর ৭৪ বৎসর পূর্বে এইখানে

এক উদাসীন বৈষ্ণব বাস করিতেন, তিনি এখানে নিতাই চৈতন্য ও অতীত
বিগ্রহমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া পরম ভক্তি সহকারে পূজাৰ্চনা করিতেন, এই
সময়ে খড়্গহের এক গোবামী এখানে শিষ্য গৃহে আসিয়া এই উদাসীনের
ক্রিয়াকৰ্ম দেখিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রীতির উদয় হইলে তিনিও তাঁহার
সহিত মিলিত হইয়া এখানে রচিয়া বজ্রন ব'জ্রন করিতে থাকেন এবং ঐ
উদাসীনের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া বিগ্রহাদির বধানিষম সেবা
চালাইতে থাকেন। পরে ভাঁহাব ও পরলোক প্রাপ্তি ঘটিলে তাঁহার দৌহিত্রেরা
আসিয়া তাঁহার তাক্স সম্পত্তি উত্তরাধিকার করেন। এই সময়ে নবদ্বীপাধিপতি
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের খুদাত বংশীর বামকুমার রায় মহাশয়: সুখসাগর, পলতা,
কুলিয়া প্রভৃতি গ্রাম সকলের জমীদার ছিলেন, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে তৃতীয়
মাধবচাঁদ রায় মহাশয় সুবিখ্যাত জৰ্জ ব্যারেটো সাহেবের সুখসাগর কনসারণ
নামক নৌগের কুস্তি জন্ লাগিটা সাহেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ দক্ষতার
সহিত চালাইতে ছিলেন সুতরাং এতদকালে তখন তাঁহার প্রতাপ অপ্রতিহত
ছিল। এই মাধবচাঁদের সহিত বলাগড়ের অচ্যুতানন্দ গোবামীর বিশেষ
সম্ভাব ছিল তাই অচ্যুতানন্দের অমুরোধ ক্রমে বজ্রতার ষাতিরে মাধবচাঁদ
তাঁহার লাঠিয়াল দিয়া উদীয়মান কুলিয়ার পাঠী খড়্গহের গোবামীগণের হস্ত
হঠাৎ বলপূৰ্ব্বক কাড়িয়া লইয়া অচ্যুতানন্দকে বেওয়ারী দিলেন। এই
অচ্যুতানন্দ ও ভবংশীরগণের বরে কুলিয়ার পাঠের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে
থাকে পরে কলিকাতা মলঙ্গা বৌবাজারের কিষণ দয়াল ধর মন্দিরাদি করিয়া
সেওয়ার এখন ইহা বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে।

নদীরার এই কয়েকটি সুবিখ্যাত মেলা ব্যতীত প্রতিবৎসর
মাঘীপূর্ণিমার চাকদহে, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে চাকদহের সন্নিকটবর্ত্তী
শলাকির বিলে; কার্তিক সংক্রান্তিতে আহুলিয়া কায়ের পাড়ায়, *

* এই মেলা ধর্ম্মজান নামে বিখ্যাত, ইহার মতাদি ও পূজাপ্রদানী দুটে ইহাকে বৌদ্ধ
পূজার রূপান্তরব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। ইহার পূজা অয্যাপী হাড়ীতেই করিয়া
থাকে।

আহুলিয়ার বর্ত্তমান বারমারি ভলার সন্নিকটে যে বহু প্রাচীন 'বানবেবেদ' মূর্ত্তি আছে
এক প্রস্তর মূর্ত্তির পূজা হইয়াও বৌদ্ধগণের শেখ নিদর্শন বলিয়াই অস্বীকৃত হয়। এখানকার

বুসিংহ দেপাড়া ও নবলার পাঁচুঠাকুরের নিত্য মেলা, ভীম একাদশীতে শিবনিবাসের হরিশক্তার মেলা, অগ্রহায়ণের শুক্ল চতুর্থাতে কৃষ্ণনগর দোপাহিয়ার মুলার মহোৎসব বাহাতে ত্রিপ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমন্তকের একটা পাগড়ী প্রদর্শিত হয়, পৌষী শুক্লভূতীয়ার বশোড়ার জগদীশ পণ্ডিতের মহোৎসব, মাঘীপূর্ণিমার পাটুলীর মেলা ; ভোমরার মেলা, মেহেরপুরের মধ্যে মুরটীয়ার জগন্নাথদেবের স্নান বাজার মেলা, ও শ্রীরামনবমীর মেলা, আমঝুপি গ্রামে রাসবাজার মেলা, রাণাঘাটে প্রতিবৎসর রাসপূর্ণিমার পরের অষ্টমীতে এবং মাঘীপূর্ণিমার পরের সপ্তমীতে দুইটা মেলা, চৈত্র শুক্ল একাদশী হইতে ৩ দিন কৃষ্ণনগর রাজবাটীর বারোদোল মেলা ও আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় মেলা নদীয়ার হইয়া থাকে ।

এই সকল মেলা বাতীত নদীয়ার প্রতিবৎসর গঙ্গাস্নানের নিমিত্ত নিম্নলিখিত কয়েকটি স্থানে বহু ভ্রমণ হইতে জনসমাগম হইয়া থাকে । গঙ্গা হিন্দুর অতি পবিত্র তীর্থ ; শাস্ত্রে বলে "সর্বতীর্থমগি গঙ্গা" গঙ্গাই একমাত্র তীর্থ যাহা প্রত্যেক হিন্দু তাহার সাম্প্রদায়িক বিবেক তুলিয়া একবাক্যে পবিত্রতম তীর্থ বলিয়া মান্ত করিয়া থাকে । নদীয়া সেই গঙ্গাময়ি মহাতীর্থ, পবিত্র গঙ্গা মুক্তিকা হইতে সমৃদ্ধ । এখানে বহু ভ্রমণ হইতে এমন কি স্মৃৎস গণিপুর হইতেও হিন্দুগণ কলুষনাশিনী গঙ্গাসলিলে নিজ নিজ পাপ খালনের নিমিত্ত সমবেত হন । প্রথমতঃ ত্রিপ্রীমহাপ্রভুর জগদ্ধামি গঙ্গাজানাকী সঙ্গমেই অধিক সংখ্যক লোক সমাবেশ হইয়া থাকে । তৎপরে শান্তিপুর, পূর্বে ষ্টিক শান্তিপুরের নিম্ন দিয়াই গঙ্গা প্রবাহিত ছিলেন এক্ষণে গঙ্গা ও শান্তিপুরের মধ্যে এক বিস্তীর্ণ চড়া পড়িয়াছে । এখানেও গঙ্গাস্নানে ও অষ্টমত বংশজ গোবামী প্রভৃৎগণের বাসভবন বলিয়া গুরু-পাঠ দর্শনে বহুলোক সমাবেশ হয় । তদ্বিষয়ে চাকদহ বা চক্রতীর্থে এখানেও বশোহর খুলনা প্রভৃতি স্থান হইতে গঙ্গাস্নানার্থ বহুরূপ সমাগম হইয়া থাকে, তবে গঙ্গা এখন চাকদহ হইতে সরিয়া বাইতেছেন বলিয়া বাজী সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে ।

প্রাচীন মুর্তিদি আর ২০২০ বৎসর পূর্বে বদ্ধ হইয়া বাতয়ার এই বর্তমান মুর্তিদি দে-র্গী হইতে লইয়া আসিয়া এখানে স্থাপিত করা হইয়াছে । পূর্বে যে মুর্তিদি ছিল সেটা বুদ্ধদেবের মুর্তি । বর্তমান মুর্তিদি ছিল দেবতার মুর্তি ।

নদীয়ার সামাজিক বিবরণ ।

মহারাজ অশোকের সময় হইতে বাঙ্গলার বৌদ্ধধর্মের প্রচার আরম্ভ হয় । পরবর্তীকালে নানাকারণে ইহা বিকৃত হইয়া “নষ্টজ্ঞান” আখ্যায় অভিহিত হয় । এই সময়ে দেশের সামাজিক বন্ধন শিথিল হইয়া যায় ; বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জাতি মধ্যে উচ্চ নীচভেদ একেবারে তিরোহিত হয় এবং বেদপুরাণোক্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমধিক অবনতি হুঃ হয় । হিন্দুরাজচক্রবর্তি গোড়েশ্বর মাহাত্ম্য আদিশূর, দেশকে এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে ৯৯৯ শকে অগ্রবর্তী হইলেন, এবং কান্তকূজ হইতে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় নামির পাঁচজন বেদজ্ঞব্রাহ্মণ আনিয়া এদেশের নষ্টপ্রার হিন্দুধর্মের ও সমাজের উন্নতিসাধনে চেষ্টা করেন । ইহাদের মধ্যে শ্রীহর্ষ-ভরদ্বাজগোত্রজ, ভট্টনারায়ণ-শাণ্ডিল্য, দক্ষ কাশ্মপ, বেদগর্ভ-শাবর্য এবং ছান্দড়-বাৎস গোত্রজ । এই পঞ্চব্রাহ্মণের বে কয়জন অনুচর আসিয়াছিলেন তাঁহারা ই বঙ্গদেশীয় কারুহগণের আদিপুরুষ । ইহাদেরই বংশাবলী পরে “রাত্রীর” ও “বারেজ” নামে অভিহিত হইলেন । মহারাজ আদিশূর ও পালবংশীয় নৃপতিবৃন্দ এই সকল ব্রাহ্মণগণকে বহু ভূসম্পত্তি দান করেন । আদিশূরবংশীয় রাজগণের পরাক্রম খর্ব্ব করিয়া পালবংশীয়েরা প্রবল হইয়া উঠেন, কিন্তু কিছুদিনের পরেই সেন রাজাগণ এদেশ পুনরাধিকার করেন । এই সেনবংশীয় নরপতি সুবিখ্যাত বল্লালসেন নবদ্বীপে রীতিমত রাজধানী স্থাপন করেন । এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে আদিশূর আনীত ব্রাহ্মণ ও কারুহগণের বংশাবলী বহুবিধভূত হইয়া পড়ায় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই আচার ব্যবহার কলুষিত হইয়া পড়ে, সুতরাং এই সময়ে বিশৃঙ্খল সমাজ পুনর্গঠনের প্রয়োজন হয়, সে কারণ বল্লালসেন পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে জানী ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ সম্মান বৃদ্ধির জন্য ‘কোলিত্ত মর্যাদা’ স্থাপন করেন, এবং আচার, বিনয়, বিজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, ভগ্ন, দান, এই নয়টি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে কুলীন আখ্যা প্রদান করেন । আদি পঞ্চব্রাহ্মণ ও কারুহগণের বর্তমান বংশাবলী এই সময়ে বাঙ্গলার বিভিন্নস্থানে বিতীর্ণ হওয়ার তাহাদের সবষ্ট গ্রহণ করিয়া

মোট ৫৬ গ্রামে বাস করিতে দেখা যায়। এই সকল গ্রামের নাম হইতে বিভিন্ন গাঁওয়ের (গ্রামীন) সৃষ্টি হয় এবং বঙ্গালের পুত্র লক্ষ্মণসেন কর্তৃক কায়স্থ সমাজে পর্যায় নির্দিষ্ট হইয়া সমপর্যায়ের বিবাহাদি নিয়ম প্রবর্তিত হয়।

মহারাজ আদিশূর, বঙ্গালসেন লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি খাঁটি বাঙ্গালী রাজার অধীনে দেশে, সংস্কৃত কাব্যাদি, দর্শন, স্মৃতি, জ্যোতিষ ইত্যাদি নানাশাস্ত্রের চর্চা আরম্ভ হয় এবং তৎসংক্রান্ত বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়। বঙ্গালের পূর্ব হইতেও নবদ্বীপ “সমাজ স্থান” বলিয়া বিখ্যাত থাকিলেও বঙ্গালের সময় হইতেই উহা হিন্দু-সমাজের উপর আধিপত্য করিয়া আসিতেছে।

বঙ্গালসেন, লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি হিন্দুনরপতিগণ যখন নবদ্বীপে থাকিয়া গৌড়রাজ্য শাসন করিতেছিলেন তখনকার শাসন প্রণালী কিরূপ ছিল তাহা আলোচনা করিতে হইলে জনশ্রুতি, তাত্ত্বশাসনোল্লিখিত রাজকর্মচারীগণের সংখ্যা ও পদবিজ্ঞাপক উপাধি এবং প্রাচীন গ্রন্থ প্রভৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়। এই সকল উপাদান হইতে যতদূর জানা যায় তাহাতে দেখা যায় যে দেশ সুশাসিত ছিল। অশেষ রাজরাজত্বক পদ হইতে দেশে তখন সামন্তপ্রথা প্রবর্তিত ছিল বলিয়া বোধ হয়, যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্যের অধ্যক্ষ ছিলেন “মহাসক্তি-বিগ্রহিক” তাঁহার উপর ছিলেন “মহাসেনাপতি”; যুদ্ধ ভাণ্ডারের অধ্যক্ষের নাম ছিল “রণভাণ্ডাগারাদিকরণ,” এতদ্ব্যতীত লক্ষ্মণসেন দেবেও তান্ত্র শাসনে যে সকল রাজকর্মচারীর নাম উল্লিখিত আছে তাহাতে জানা যায় যে সে সময়ে রাজ্যের প্রধান বিচারপতির নাম ছিল “মহাক্ষপটনিক” ও “মহাদর্শাদ্যক্ষ,” “কৌজদারী” বিভাগের কার্যপরিদর্শকের নাম ছিল “বৃহৎপরিদর্শক” ও “দণ্ডনায়ক”। করসংগ্রাহক কর্মচারীকে “মহাভোগিক” ও বন বিভাগের কর্মচারীকে “মহাপীলুপতি” বলিত, কেহ কেহ মহাভোগিক ও মহাপীলুপতি শব্দের পক্ষ রক্ষক ও অপর রক্ষক অর্থ করেন। এতদ্ব্যতীত অন্তপুর রক্ষীগণকে “অন্তরঙ্গ বৃহৎপরিদর্শক”। বৃহৎ মন্দির সমূহের অধ্যক্ষকে “মহাপ্রতিহার”। শাস্তি রক্ষাকর্ত্তাকে “দণ্ডপালিক” নগর রক্ষককে “বৈশাল্যবিধানিক” বলিত। এতদ্ব্যতীত “মহাগণক” “চৌরছরনিক” “দৌসাদিক” প্রভৃতি পদধারী বহুতর রাজকর্মচারী রাজ্য শাসনে সহায়তা করিতেন। রাজাও এই

সকল উপযুক্ত কর্মচারীর সহায়তায় প্রজাসাধারণের মনোজ্ঞি করিয়া সনাতন হিন্দু প্রথানুযায়ী রাজ্য শাসন করিতেন এবং যে কোনও কার্য করিতে হইলে ‘তত্ত্বপ্রতি সাধারণের সহানুভূতি ও অনুমোদন লাভাশায় লিখিতেন—“মতমম্ভবতাম্”।

রাজোচিত দানাদি কর্ণেও তাঁহাদের বিশেষ মতি ছিল। ব্রাহ্মণকে “ব্রহ্মোত্তর” দান করিতে হইলে তাম্রপটে উহা খোদিত হইত। এযাবৎ সেন নরপত্তিগণের অনেকগুলি এইরূপ “তাম্র শাসন লিপি” নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত লক্ষণসনদেবের চারি খানি, দুইখানি পূর্বাধিকৃত; দুইখানি নবাবিকৃত; ইহাদের একখানি পাবনার অন্তর্গত মাধাই নগরে পাওয়া যায় ও সর্বশেষ খানি এই নদীয়া জেলার রাণাঘাটের নিকটবর্তী অমুলিয়া গ্রামের সীতানাথ ষোড়শ কিছু দিন পূর্বে ভূমি বননোপলক্ষে প্রাপ্ত করেন,* ফলকখানি বঙ্গকাল ভূগর্ভে প্রোথিত থাকার নিত্য বিবর্ণ ও স্থানে স্থানে কালিমা-লিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহার আয়তন ১০½ × ১২½ ইঞ্চি, শিরোভাগে একটা দশভূজ সমন্বিত দেবমূর্তি বোলকযোগে ফলকের সহিত দৃঢ় বন্ধ। প্রথম পৃষ্ঠে ৮ পংক্তি দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ২৮ পংক্তি পরিমিত সংস্কৃত রচিত পদ্যগদ্যময় ভাষায় বল্লালসেনের পুত্র মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বর, পরমবৈকব, পরম ভট্টারক শ্রীলক্ষণসেনদেব কর্তৃক বিক্রমপুরের জয়স্বর্গাবর হইতে স্বকীয় রাজ্যের তৃতীয় বর্ষাব নবম ভাদ্র দিবসে হজুরেন্দ্রাভ্যগত কাণাশাখাধ্যায়ী কৌশিক গোত্রীয় বিখ্যাত বজ্রল কৌশিক প্রবরের রঘুদেব শর্মা নামক কোনও ব্রাহ্মণকে যে ভূমিদান করা হয় ইহাতে তদ্বিবরণ খোদিত আছে। এই তাম্রপটে কীলক যোগে যে অংশ মূল ফলকের সহিত সংযুক্ত তাহা সেন রাজবংশের প্রচলিত রাজমুদ্রা বলিয়াই অনুমিত হয় ইহা খোদিত নহে ছাঁচে ঢালাই করা বলিয়াই বোধ হয়।

১১৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে গোড়ে মুসলমান প্রভাব কালের আরম্ভ, এই সময় হইতে

* এই তাম্র ফলকখানি বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীলক্ষণসেনের বৈষ্ণব মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হয় তিনি পণ্ডিতবর রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের সাহায্যে উহার পাঠোদ্ধার করিয়া তাঁহার চূড়পুর্ন ঐতিহাসিক চিত্র নামীয় ত্রৈমাসিক পত্রের প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যায় উহা প্রকাশ ও উহার বিষয় আলোচনা করেন সম্রাতি এই তাম্র শাসন খানি কলিকাতা সাহিত্য পরিষদ পুণ্ডে রক্ষিত হইয়াছে।

বহাশ্রমের সময় পর্য্যন্ত মুসলমানগণের সংস্পর্শে ও অত্যাচারে হিন্দুর সমাজবন্ধন দিন দিন শিথিল হইয়া আইসে ও এই সময় হইতেই বহু হিন্দু নিদারুণ অত্যাচারে, অনিচ্ছায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। * কচিং কেহ রমণীর-রূপ-মোহে বা অর্বলোভে বইচ্ছায় উক্ত ধর্মগ্রহণ করিয়াছে। এই প্রকারে যে সমস্ত নীচ জাতিয় হিন্দু, মুসলমান হইয়াছে তাহাদের, পূর্ব সংস্কার বশতঃ রীতি নীতি, আচার ব্যবহার অধিকাংশ স্থলেই হিন্দুদের স্তায় পরিলক্ষিত হয়, এমন কি তাহারা কোন বিপদে পতিত হইলে হিন্দু দেবদেবীর পূজা মানত করিয়া থাকে। বটী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি “ফৌজদারী” দেবতা ও “খোদা তাম্বার” সহিত সমান সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এই সময়ের লিখিত কাব্যাদিতে তৎকাল প্রচলিত রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের অনেক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময়ে দেশের লোককে ডিঙ্গা সাজাইয়া বহুবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া বিদেশে বাইতে দেখা যায়। ব্যবসাদিতে বট, বুড়ি, কাহন প্রভৃতি সংখ্যক কড়ি ধারা বিনিময় প্রথার প্রচলন ছিল। “পুরুষ” নামে এক প্রকার ভূম্যাদি মাপিবার মাপ প্রচলিত ছিল।

এই সময়ে জ্যোতিষে লোকের অকৃত্রিম বিশ্বাস দেখা যায়। এমন কি হাঁচি, টিক্‌টিকী, কাক প্রভৃতির শঙ্কানুযায়ী শুভাশুভ নির্দিষ্ট হইত। লক্ষণসেনের জ্যোতিষের প্রতি এরূপ অন্ধ বিশ্বাসই বঙ্গদেশের সর্বনাশের মূল বলিয়া কথিত।

তাৎকালিক উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদির মধ্যে পাটের পাছরা * প্রভৃতি পটবস্ত্রের সবিশেষ উল্লেখ দেখা যায়।

তখন শ্রীলোকদিগের অলঙ্কার অধিকাংশ স্থলেই রৌপ্য নির্মিত হইত এবং “মদনকড়ি,” “শীলমণিকাচ,” “মহাতাড়ল,” “বর্কি” এবং পদে পিতলের “ধার”

* এই অত্যাচার সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতের প্রকার এইরূপ বর্ণন করিছেন :—

“বহুবৃত্তি রামচন্দ্রের রাজার না ঘের কর। ক্রুদ্ধ হইয়া গেছে উজীর আইল তার ঘর।

আসি সেই দুর্গা মণ্ডপে বাসা কৈল। অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রাখিল।”

অপর— অন্ত্যলীলা ওয় পরিচ্ছেদ

“ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কোড়ুকে। কার পৈতা ছিড়ে কেলে খুঁধু দেয় মুখে।”

বিজয় শুভ

* “রাজা গোঁড়ঘর দিল পাটের পাছরা।” কীর্তিবাস

প্রভৃতি অলঙ্কারই রূপসৌন্দর্যের বিশেষ আদরের ছিল; পুরুষেও কণ্ঠে ছিল এবং প্রকোষ্ঠে বলয় ব্যবহার করিত ।

রাজা ও ধনশালী ব্যক্তিগণ বিদ্যার সম্মান করিতেন এবং অবসর পাইলে গীত বাদ্যে আমোদ করিতেন ।

ক্রমশঃ যত দিন যাইতে লাগিল, মুসলমানগণের সংস্পর্শে ও শিক্ষার দেশে ততই বিলাসিতার প্রাবনে মগ্ন হইতে লাগিল । বহু বিবাহ এই সময়ে দেশ মধ্যে বাহ্যরূপে প্রচারিত হয়, দেশে খাদ্যাখাদ্যের বিচারে লোকের আস্থা কমিয়া যায় এমন কি কোন কোন নীতিব্রত ব্রাহ্মণ মদ্যপান ও গোমাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে থাকে । * এই বিলাসিতা স্রোতে দেশ হইতে নিত্য সত্য প্রেমভক্তি অন্তর্হিত হইয়া যায় । চৈতন্য ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণাবনাদাস এই সময়ের নদীয়ার একটী প্রাজ্ঞল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

“কৃষ্ণনাম ভক্তিবৃক্ষ সকল সংসার ।

ধর্ম কৰ্ম লোক সব এইমাত্র জানে ।

দত্ত করি বিবহরি পুজি কোন জন ।

ধন নষ্ট করে পুত্র কন্তার বিবাহে ।

যে বা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র সব ।

শাস্ত্র পড়াইয়া সব এই কৰ্ম করে ।

না বাথানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন ।

যে বা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী ।

অতি বড় মুকুতি বে শ্রানের সময় ।

গীতা ভাগবত যে অন্যতে পড়ায় ।

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে ।

বাসিলি পুজয়ে কেহ নানা উপহারে ।

যখন নদীয়ার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা, তখন যুগাবত্তর শ্রীচৈতন্যদেব জন-পরিগ্রহ করেন । তাঁহার প্রচারিত স্মরণ্য বৈষ্ণব ধর্মের প্রেমভক্তির প্রাবনে জাতীয় জীবনের সজ্জিত কলুষরাশি বহুল পরিমাণে ধৌত হইয়া যায় ।

এই সময়ে ত্রীলোকগণ পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্ণালঙ্কার ব্যবহার

অথবা কলিতে হইল ভবিষ্য আচার ।

বঙ্গল চতীর গীত করে লাপরণে ।

পুস্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন ।

এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায় ।

তাহার্য্যও না জানয়ে গ্রহ অনুভব ।

জোতার সহিত বস পাশে বাকি মরে ।

দোষ বহি কার গুণ না করে বাধন ।

তাঁ সবার মুখেও নাহি হরিকনি ।

গোবিন্দ পুওরিকাক নাম উচ্চারয় ।

ভক্তির বাহান নাই তাহার জিহ্বায় ।

কৃষ্ণ পূজা কৃষ্ণভক্তি নাহি কারবাসে ।

মদ্য মাংস দিয়া কেহ বন্ধ পূজা করে ।”

* “ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য, পোমাংস ভক্ষণ ।

ভাকাহুরি পরগৃহ বাহ সর্বকণ ।”

চৈতন্য ভাগবত । মধ্য খণ্ড ।

করিতে আরম্ভ করেন । কর্ণপুট, কুণ্ডল, বলয়, শঙ্খ, কঙ্কণ প্রভৃতি সে কালের সৌখিন অলঙ্কার । তাঁহারা এই সকল অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া “লোটন থেপায়” কেশ বিভ্রাস করিয়া “মেঘদুগর কাপড়” ও চারু কারুকার্যবচিত কাচুল পরিধান করিয়া পুষ্পমালা কর্ণে দিয়া হস্তে তাম্বুল গ্রহণ করিয়া রাত্রিতে স্বামী সম্ভাষণে প্রবৃত্ত করিতেন । নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ উৎসবকালে “সু-এ” নামক বস্ত্র আভরের সহিত পরিধান করিত ।

তখন গৃহে গৃহে নবপঞ্জিকা বিরাজ করিত না । লম্বাচার্য্যগণ পঞ্জিকা শুনাই-
তেন এবং শুভ কার্য্যের দিননির্নয় করিতেন । অগ্রদানীগণ নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধাদি
কার্য্যের উদ্ভাবধান করিতেন । তখন বিবাহে পণগ্রহণ প্রথা ছিল না, অথবা
সৰ্ব্বস্বান্ত হইয়া লোক লৌকিকতা করিতে হইত না । পাঁচটি হরিণকী দিয়া
কন্যা সম্প্রদান করিলেই চলিত ।

সে সময়ে দেশের লোকের ঘরে খাদ্যের অভাব ছিল না । তাঁহারা আহার-
কালীন চৰ্কা, চোবা, লেহু, পেয়াদি সমস্ত রসগুলি আনন্দ করিতেন । নিম্নের
ভালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে তদানীন্তন মধ্যাহ্নিক আহার্য্যের একটা আভাস পাওয়া
যাইবে । বধা চরিতঃস্মৃতে :—

“দশ প্রকার শাক নিষ তিত্ত শুভ কোল ।	মরিচের গাল, ছানা, বড়া বোল ।
দুগ্ধ ভুখী দুগ্ধ কুম্ভাও, বেগারি লাকরা ।	মোচাঘট, মোচাভাজা, বিবিধ শাকরা ।
বৃদ্ধ কুম্ভাও বড়ির বাস্তন অপার ।	কুল বড়ী কলমুলে বিবিধ প্রকার ।
নবনিষ পত্রসহ ঐষ্ট বার্তাকি ।	কুল বড়ী পটলভাজা কুম্ভাও মানচাকি ।
ঐষ্টবান মুগ্ধ গুণ অমৃত নিলয় ।	মধুরা বড়ারাদি অন্ন পাঁচ ছয় ।
মুগ্ধবড়া মানবড়া কলাবড়া মিষ্ট ।	কিরপুলি নারিকেল আর বত পিষ্ট ।
কাজি বড়া দুগ্ধচিতা দুগ্ধ লকলকি ।	আর বত পিঠা কৈল কহিতে না শকি ।
দুগ্ধ সিল্প পরবার দুগ্ধভুক্তিকা ভরি ।	চাপাকলা বনদুগ্ধ আশ্র তাহা ধরি ।
সরলা মণিত দধি সলেশ অপার ।	গৌড় প্রদেশে বত তরুর প্রকার ।

এই সময়েই স্মার্ত্ত রত্নচন্দন মানব ধৰ্ম্ম শাস্ত্র সমূহের আমূল পরিবর্তন পরিবর্তন
সংশোধন দ্বারা তাহাদের কঠোরতা কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল করিয়া দেন । কেবল
বিধবাগণের পালনীয় নিয়ম সম্বন্ধে, সমাজে ব্যাভিচারাদি দমনের জন্ত কঠোর
ব্যবস্থা প্রচলন করেন । স্মার্ত্ত, বিধবা রমণীর সহমৃত্যু হইবার প্রথার উচ্চ মহিমা
কীৰ্ত্তন করিলে লুপ্তপ্রায় এই রীতি দেশমধ্যে পুনঃ প্রচলিত হয় ।

এই সময়ে নদীয়ার বিদ্যা চর্চার একটা স্রোত বহিতে থাকে । কেবলমাত্র যে উচ্চ বর্ণের মধ্যে এইরূপ বিদ্যার প্রসার ছিল তাহা নহে, নিম্ন শ্রেণীর শূদ্রাদির মধ্যেও উহার সম্যক আলোচনা হইতে ছিল । এমন কি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও হুই একজন বিহুই রমণীর নাম পাওয়া যায় ।

এই সময়ে নদীয়ার ভাস্কর বিদ্যার সম্যক উন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । দেবদেবীর স্তম্ভের মূর্তি গঠনে সুনিপুণ কারিকরের অভাব ছিল না এবং বস্ত্রবয়ন শিল্পে নদীয়া ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিতেছিল । পরবর্ত্তীকালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে এই সকল চাকু-কলা সম্যক পুষ্ট হইয়াছিল ।

এই সময়ে নদীয়ার যেরূপ সমৃদ্ধি ছিল এবং সমসাময়িক কবিগণ যেরূপে নবদ্বীপের সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে তখনকার নবদ্বীপ এখনকার কলিকাতার অপেক্ষা শোভা সমৃদ্ধিতে ন্যূন ছিল বলিয়া বোধ হয় না । কবি জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে তদানীন্তন নদীয়ার বাটী, বর, হাট, বাজার প্রভৃতির এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ;—

নানা চিত্রে খাতু বিচিত্র নগরী নানা জাতি বৈসে তথা ।

চূর্ণে বিলেপিত দেউল দেহারী নানা বর্ণে বুদ্ধলতা ।

জয় জয় ধন্ত নদীয়া নগরী অলকানন্দার কূলে ।

কমলা ভবানী ক্রীড়া করে তথি বিরাজিত বকুল শাখে ।

প্রতি ঘরের উপর বিচিত্র কলস চকল পতাকা উড়ে ।

পূর্বে যেন ছিল অযোধ্যা নগরী বিজুরী ছটাক পড়ে ।

নাট পাঠশালা দীঘি সরোবর কূপ তড়াপ সোপান ।

মাঠ মণ্ডপ স্থব্রিত চন্দ্র কুন্দ তুলসী আরোপন ।

প্রতি ঘরে শোভে প্রতি বিচিত্র কপাট ।

প্রতি গলি নৃত্যঙ্গীত—আনন্দিত প্রতি ঘরে বেদ পাঠ ।

পুনশ্চ:—গোধূলী সময়ে মুদ্রক করতাল শব্দধ্বনি প্রতি ঘরে ।

যেত চান্দর ময়ূর পাখা হাতে চন্দ্রাতপ শোভা করে ।

ইটক রচিত প্রাচীর প্রাঙ্গন স্থব্রিত গৃহ ঘারে ।

হিজুল হরিতাল কাঁচা ঢাল জৌখতী জৌকট সালে ।

সালে রসাল বিশালক শুভ হাজি চন্দ্রার্ক ডিলকে ।

ময়ূর শুক সারস পারাবন্ত সিংহ হংস চক্রবাক ।

ষটি পাট সিংহাসন আসন জৌখড়ি ময়ূর পাখা ।

বিচিত্র চামর চন্দ্রাতপ প্রতি ঘরে হৃদয় পাখা ॥

পুনশ্চ:—নদীয়ার হাটে কি কি দ্রব্য বিকাইত তাহার তালিকা এইরূপ,—

ডাবর বাটা শু কিস্তি দর্পন রস বাটিকা ।

তাম্রহাতি রস পিতল কলস বারানসীর ত্রিপদিকা ॥

লম্ব বাটা বাটা সর্কাস খাল রসময় রসধুরী ।

তিরোহত গাড়ু তাম্র মুখার মণ্ডল শীতল পিতল করি ॥

পাখাণ তাজন অতি সুগঠন খড়িকা রজি কাপড় ।

উড়িয়া গৌড়িয়া চিরুণী বিচিত্র সাপুড়া ॥

টাড় পাঠা কড়ি হিরণ্য মাদলী কেবুর ককন রত্ন সুপ্তরে ॥

হেমকিরা পাতা বিক্রম মুকুতা কান্ধীর দেশের গুরে ॥

তনক হর পানবাটা কাকিদেশের বিচিত্র বেলি ।

পাচিনেত তোট সকলতে কঞ্চল শ্রীরাম খানি জমকা ।

ভোটি দেশের ইজরীলবণি লক্ষ্মীবিলাস তারকা ॥

লেনিচে না পারি যত দাসদাসী প্রেমের মন্দিরে খাটে ।

যে যে দ্রব্য সব ভুবন চুল্লভ বিকায় নদীয়া হাটে ॥

পূর্বোক্ত তালিকার দৃষ্টিপাত করিলে নদীয়ার বাটা, ঘর, ঘার, দেউল দেহার হাট বাজার সম্বন্ধে অনেক তথ্যই জানা জানা যায়, সে তথ্য আমাদের গৌরবের তথ্য কেননা চূর্ণে বিলিপিত সেই সব “দেউল দেহার” “প্রতি ঘরের উপর বিচিত্র কলস ভাসতে “চকল পতাকা” সেই “নৃত্যগীত—আনন্দিত” “প্রতিঘর” “ইষ্টক রচিত প্রাচীর প্রাঙ্গন সুসজ্জিত গৃহঘর” প্রভৃতি আমাদের পূর্ব পুরুষের গৌরবব্যঞ্জক । নদীয়ার হাটে যে সকল “ভুবনচুল্লভ” দ্রব্য বিকাইত তাহাও ত্রিহট, উৎকল, কান্ধী, কাকি কান্ধীর, ভেট দেশ প্রভৃতি বহুদূর দূরান্তর হইতে আনীত । ইহাও সেই তদানাত্তন পথ বাট রেল স্ট্রীমার বিহীন কালের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে । বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও ক্রোতার আধিক্য না থাকিলে আর এ সকল দ্রব্য সংগৃহীত হয় নাই ।

এই কালেই দেবীঘর ঘটক স্নাত্তীয় কুলীনগণের মধ্যে নৃতন করিয়া মেল বন্ধন করিয়াছিলেন । দেবীঘরের পূর্বেই কুলীনগণের মধ্যে দোষ সংস্পর্শ হইয়াছিল । তিনি এক এক প্রকার দোষাজিত কুলীনকে এক এক দলে রাখিলেন এইরূপে দোষ বিলাইয়া প্রেমীভিত্তক করা হইল বলিয়া ইহা “দোষ—মেলন” বা “মেল” নামে

খ্যাত হইল। এই মেলের সমষ্টি হইয়াছিল ৩৬ ছত্রিশ ইহাকে ছত্রিশের দাগও বলে * (১) ফুলিয়া (২) খড়দহ (৩) বরভী (৪) সর্কানন্দ (৫) সুরাই (৬) আচার্য্য শেখরী (৭) পণ্ডিত রত্নী (৮) বাঙ্গাল পাশ, (৯) গোপালঘটকী, (১০) ছায়া নরেন্দ্রী, (১১) বিজয় পণ্ডিতী, (১২) চান্দাই, (১৩) মাধাই, (১৪) বিদ্যাধরী, (১৫) পারিয়াল, (১৬) শ্রীরঙ্গভট্ট, (১৭) মালাধর খান, (১৮) কাকুন্দী, (১৯) হরি মজুমদারী, (২০) শ্রীমন্তখানী (২১), প্রমোদিনী, (২২) দশরথ ঘটকী, (২৩) ভক্তরাজখানী, (২৪) নড়িয়া (২৫) রায়, (২৬) চট্টরাখরী, (২৭) দোহাট্যা (২৮) ছরী, (২৯) তৈরব ঘটকী, (৩০) আচাঙ্গতা (৩১) ধরাধরী, (৩২) রাঘব ঘোষালী, (৩৩) শুভ সর্কানন্দী, (৩৪) শতানন্দ-খানী, (৩৫) চন্দ্রপতী, (৩৬) বালী। এই সকল গুলির মধ্যে ফুলিয়া ও আচাঙ্গিতা মেল বর্তমান নদীয়া জেলার মধ্যে পড়ে। ফুলিয়া শান্তিপুয়ের নিকট এবং “আচাঙ্গিতা” চাকদহের পূর্বকালীন সজ্জান্তর বিশেষ। কবি কৃষ্টি-বাসের পূর্ব পুরুষ মুখুটি বংশোদ্ভব গঙ্গানন্দ হইতে ফুলিয়া মেল হষ্ট হয়। যথা “মেল প্রকাশে—

“ফুলিয়া সরস কুল মেলের প্রধান।

গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য পুর্য্যের সমান ॥

হিরণ্য উদয় মধ্যে নাধাই নন্দন।

গঙ্গানন্দ কুলে কৃতী যোবে সর্বজন ॥

“ফুলিয়া”র সরস কুল বলিয়া খ্যাতি থাকিলেও এই কালে তাহাতে দোষাখ্যাত হয় এবং ঐ দোষ ক্রমে নানা প্রেীতে প্রবৃষ্ট হয় যথা “দোষ চন্দ্র প্রকাশে”

কাশীধর-হত হরিহর ফুলিয়ার মুখুটি।

ভাল বিতাইল তার জুনি খাঁর বেটা ॥

* ফুলী গঙ্গানন্দের কারিকার দেবীধর ঘটককে চৈতন্য দেবের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণনা করা আছে এবং তাঁহার দ্বারা ছত্রিশ ভাগে কুল ভাগের কথাও লিখিত আছে ;—

“চৈরে ছোঁড়া ছুটু বড় নিমে তার নাম।

রবো বেটা মোটা বুদ্ধি কটে করে ধাম ॥

কাণা ছোঁড়া বুকে দড় নাম রঘুনাথ।

মিথিলার পক্ষধরে বে করেছে মাথ ॥

তিনজনে তিন পথে কাঁটা দিল শেষ।

জ্ঞায়, স্মৃতি, ব্রহ্মচর্য্য হইল নিশেষ ॥

কানার সিদ্ধান্তে জ্ঞায় পৌতমাদি হত।

প্রাচীন স্মৃতির মত নন্দা হতে গত ॥

শটী ছেলে নিমে বেটা নষ্টমতি বড়।

মাতা পত্নী দুই তানী সন্ন্যাসেতে বড় ॥

এই কালে রাঢ় বলে পড়ে গেল ধুম।

বড় বড় ধর বত হইল নিধুম ॥

এই কালে সেকতের বংশ এক ছেলে।

নায়ে খ্যাত দেবীধর লোকের বারে বলে ॥

সেই ছোঁড়া মনে করে কুলে করে জাপ।

সেই হতে কুল আছে ছত্রিশের নাম ॥”

বিধির বিধান ছিল পক্ষা মরে রঙে । ধরিল ছাড়িল ধরা আনচানের পিণ্ডে ॥
 চতুর্ভুজ ভাজে আর্তি শ্রীগোপালে । নীলকণ্ঠ ধোঁদা বাদ লেগে গেল গলে ॥
 এই দোবে দুই করে পড়ি করেজয় । তদবধি কুলিয়া মেল হইল নিশ্চয় ॥
 কাজীর বেটা জাকর আলী নবাই বান্ধারে । নান্দা বন্দা হুতা ঘরে আফিস বিহরে ॥
 পান দোবে নারায়ণ দাসে এতেক কুলিয়া বাঘ । বীরভূমের বসন্ত ফুটিল কাবাগার ॥

আচরিতা মেলের দোষ সম্বন্ধে “দোবাবলীতে” এইরূপ লিখিত আছে ;—

আচরিতা হইল মেল নান। দোষ পাইয়া । গোবিন্দ হুত বিদ্যাধর গুড়ে করে বিয়া ॥
 চক্রপাণি মুখে মেল হ'ল আচরিত । গৌতম ঘটক পালটা নাহি হিতাহিত ॥

এইরূপে হিন্দুর শীর্ষ সমাজে নানা দোষ প্রবলিত হওয়ায় সমাজে ক্রমেই বিশৃঙ্খলতা প্রবেশ করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ক পর্ষদ্য বাক্সালা দেশ যদিও মুসলমানগণের অধীন ছিল তথাপি বহু ভূস্বামী স্বাধীন ভাবে নিষাধিকার শাসন করিতেন। এই সকল ভূস্বামীগণ ভূঞা নামেও খ্যাত হইতেন। ইংগারা দেবধিজে ভক্তিমান ছিলেন ও সর্কদা দাননিরত ও শাস্ত্রচর্চায় নিযুক্ত থাকিতেন। দেশে, এই সময়ে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং সপত্নীগণের মধ্যে সর্কদাই কোন্দল হইত। মুসলমানীভাব ও ভাষা তখন নদীয়ার বহুস্থল হইয়াছে এবং সংস্কৃত বিদ্যার পূর্কগৌরব অপেক্ষাকৃত মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। লোকে গ্রাম অপেক্ষা সহরে তখন আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং দেবভাষা অপেক্ষা পারশীতে “জবান হুরস্ত” করিতে শিখিয়াছে। এই সময়ে চাউল ও অন্যান্য দ্রব্যাদির দর অত্যন্ত হুলত ছিল। মুসলমান অধিকারে সমাজ ক্রমে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পুনরায় তাহার পুনঃ সংসার করিতে চেষ্টা পান। তিনি বরং, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ ও কুশদ্বীপ এই চারি সমাজের সমাজপতি ছিলেন এবং লোকের জাতিদান ও জাতি গ্রহণ করিতে তুল্যরূপে শক্তি সম্পন্ন ছিলেন।

মুসলমান অধিকারের কালে সমাজে, তোহামোদজীবিতা, আত্মগোপন ও প্রবন্ধনাপন্নতা প্রবেশ করিয়াছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৌশলে তাঁহার পিতৃব্যের অধিকার নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণও এ বিষয়ে অপটু ছিলেন না—তাঁহার পুত্র শম্ভুচন্দ্র একবার তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার মৃত্যু রটনা করিতে পল্লভুৎ হয়েন নাই। এই সময়েই রাজা রাজবল্লভ তাঁহার বিধবা কন্যার

পুনরার বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন কিন্তু নদীয়াধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কোণে উহা ব্যর্থ করেন ।

রাজসভায় তখন ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকোপেক্ষা বিদ্যানুশ্লের অদর অধিক ছিল এবং সাধারণ লোকেরও রামায়ণ বা চণ্ডীর গান অপেক্ষা “খেঁউড়ে” অশ্রুজ্বল দেখা যাইত ।

এই সময়ে দেশে স্থপতিবিদ্যার সবিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয় । রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নির্মিত বহু অট্টালিকা ও কারুকার্যে খচিত দেবমন্দির সে সকলের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । জনসাধারণ তখন অট্টালিকায় বাস করিত না, ইট গাড়িতে হইলে তখন রাজদ্বারে অনুমতি লইতে হইত ।

নদীয়ার কুস্তকারগণ মৃতিকার পুস্তালিকা গঠনে এই সময়ে সবিশেষ উন্নতি লাভ করে এবং শাস্তিপুত্রের প্রসিদ্ধ ধৃতি এই সময়ে অগ্নিবিখ্যাত হয় । অপর দিকে উৎকৃষ্ট ঢাল তরোয়ালদি, উৎকৃষ্ট খাড়া এমন কি কামানাদি প্রস্তুত করিতেও নদীয়ার কুস্তকারগণ মৃদঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল । এইরূপে নদীয়ার প্রস্তুত একটা কামান মুরসিদাবাদ নবাবের প্রাসাদ প্রাক্ষণে থাকিয়া অন্যান্য এই বাক্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । *

কামান গাত্রে, যে কুস্তকার ইহা প্রস্তুত করিয়াছে, যিনি কুঁদিয়া হরণ লিখিয়াছেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইহার আদেশে ইহা নির্মিত হইয়াছে এই তিন জনের নামই ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে । কি স্মৃত্তে এই কামানটী মুরসিদাবাদের নবাব গৃহে

* Vide note by Pandit Haraprasad Sastri in the proceedings of the Asiatic Society of Bengal 1893. Page 24-26, :—

“Mr. Beveridge found in the armoury of the Nawab of Murshidabad a brass gun of native manufacture. It is mounted on a carriage and stands in armoury on the ground floor of the palace. It is some 3 feet in length and is of small bore 4 or 6 pounds. It has floral decoration. The head and the mouth are in the shape of a demon or a monster's head with long pointed ears a human face and a crocodile's jaws. There is an inscription on it in raised Bengali letters in a shield on the upper part of the gun and about the middle.

The inscription runs as follows :—

খান পাইয়াছিল তাহা নিশ্চয়রূপে বলা না যাইলেও, ইহা নবাব আলিবর্দীকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উপহার বা এমন কিছু একটা অনুমান করা যাইতে পারে।

এই সময়ে পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই পরিচ্ছদে মুসলমানী ভাব প্রবেশ করিয়াছিল। পুরুষে বাটীতে সর্ফদা ধুতী ও গামোছা (দোস্তী) ব্যবহার করিলেও, কোনও উৎসবে বা রাজদরবারে যাইতে হইলেই “আবা” “কাবা” “চোপা” “জোঙ্গা” প্রভৃতিতে দেহবস্ত্রী আবৃত করিতেন। “চাপকান” “মচকান” “চুড়ীদার পায়েজামা” পায়ে “লকাদার জুতা” সৌখীনতার পরিচয় দিত। এই সময়ে হিন্দুমাত্রেরই কর্ণবেধ করিতেন হুঁতরং কানে একটা আভরণ অস্ত্রতঃ ‘চুটী সোনার শুজি সকলেই ব্যবহার করিতেন। ধনীলোকে অঙ্গুলে অষ্টটি গলায় হার, কোমরে পোট, বহুতে নবরত্ন বাজু, পায়েরোতে শিরপেচ কলসী এবং কেহ কেহ মণিবন্ধে বালাও ব্যবহার করিতেন। অলঙ্কার হীন দেহ কেহই রাখিতেন না অস্ত্রতঃ কোমরে একটা ঘুনসী তাহাতে একটা চাবী সবাই পরিতেন। আটপোরে ব্যবুরানা পোষাকে গায়ে মেরজাই, মাথায় কামরাজা টুপী, পরিধানে ধুতী ও ক্লে উত্তরীর পদে পাছুক ব্যবসৃত হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে ধুতী উত্তরীর বা শীতকালে ঐ উত্তরীর উপর কন্বল বনাং বা শাল ও পদে খড়ম ব্যবহার করিতেন।

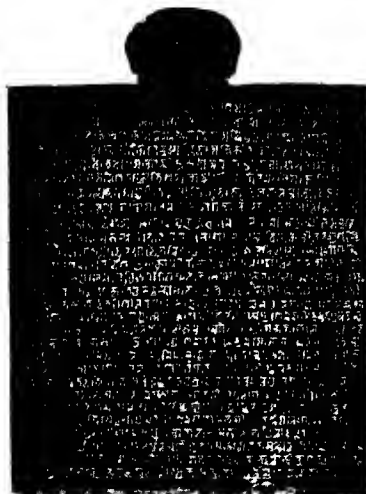
দেহের পরিপাটে বিশেষ বস্ত্র সকলের দেখা যাইত। শরীর সুস্থ থাকিবে বলিয়া “কুতু-হরিড কীর” ব্যবহার ভিন্ন সমাধে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, তাহাতে শরীরও থাকিত ভাল। আয়ের অধিকাংশ এখনকার মতন ডাকারের ঘরে উঠিত না। অরাজিকারে সাধারণতঃ লজ্জনই ব্যবস্থা ছিল তাহাতে উপসম না হইলে টোটকা বা মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা হইত সর্বশেষে উপায়ানন্তর না দেখিয়া বৈদ্য ডাকা হইত। এ সময়ে মুসলমান অনুকরণে কেহ বা “হাকিমীর” আশ্রয়ও লইতেন।

কর্ম

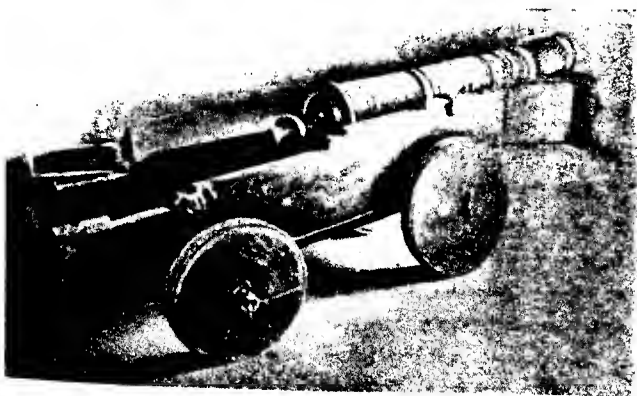
কালিকা

য ও তং সৎ

শ্রীমত কৃষ্ণ	শ্রীমত
চন্দ্র রায়	কপরাধ
মহারাজা	চট্টোপাধ্যায়
মহাপর	মুন্সিফিক
বীরাজ	
কিশোরদাস কর্মকার	



লক্ষণ দেন দেবের আত্মশিখার আবিষ্কৃত তান শাসন ।



নদীয়ায় ঢালাই কামান ।

নদীয়া-কাহিনী ।

সৌধীনের সম্প্রদায়ের ভিতর আতর, গোলাপ ও কুলেব এর ব্যবহার খুবই চলিয়াছিল। তবে সাধারণতঃ “কুমুম, কস্তুরী জাকরানই বিশেষ প্রচলিত ছিল দরিদ্রে শুধু চন্দন মাখিত। কেহ কেহ চন্দনের সহিত মৃগনাভী, বা মৃচুকুল কি চম্পক কি কোয়ার রেণু মিশাইয়া, তাহাই কাঁচা হলুদ, কাবাব চিনি ঝাঁকি মসুরী বা কেলেক্সিরে সর বা নবনীতের সহিত বাটিয়া দেহের পরিমার্জনা করিতেন। মোট কথা দেহের পারিপাট্য এই সময়ে পূর্য্যাপেক্ষা বর্ধিত হইয়াছিল এবং তাহাতে মুসলমানী প্রথা আসিয়া যোগ দিয়াছিল।

পুরুষের জ্ঞান জ্ঞানলোকে ও মুসলমানগণের অহু করণে নানাপ্রকার রৌপ্য ও সুবর্ণ নির্মিত অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে আরম্ভ করে। অলঙ্কারে হীরা মুক্তা ব্যবহারের প্রথা এই সময়ে প্রবর্তিত হয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তপুরবাসিনীরা সৰু করিয়া পেশোয়ারাজ ইত্যাদি পরিতেন। নদীয়ার কোনও কোনও স্থানের জ্ঞানলোকগণের ধোপার পারিপাট্যও এসময় প্রচলিত হয় এ সময়ে একটী সুন্দর প্রবাদ বচন প্রচলিত আছে যথা,—

“উলার মেয়ে কুল কুহুটী।

নদের মেয়ের ধোপা।

শান্তিপুুরে নথ নাড়া দেয়।

শুশ্টিপাড়ার চোপা।”

অর্থাৎ উলার মেয়ে কুলের বড়াই করে, নদের মেয়ে বড় বাবু, শান্তিপুুরের মেয়ে কলহ পটু ও শুশ্টিপাড়ার মেয়ে বাচাল।

উল নিবাসী “গঙ্গাতত্ত্ব তরঙ্গিনী” প্রণেতা প্রায় সমসাময়িক কবি গঙ্গাদাস তদানীন্তন জ্ঞানলোকগণের ব্যবহার্য্য অলঙ্কারের এইরূপ তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

“চেড়ি, চাপি, মাকড়ি, কর্ণেতে। কর্ণফুল।

কেহ পড়ে হীরার কমল নহে তুল।

নাসিকাতে নথ করে মুক্তা চুণী ভাল।

লবঙ্গ বেশেরে কার মুখ করে আল।

কিবা গজ মুক্তা কারও নাসিকার ঝোলে।

বোলে সে অপূর্ণভাবে হাসির হিল্লোলে।

কুল কলিকার মত কার দস্তপাতি।

মাড়িখের বীচ মুক্তা কার দস্ত ভাতি।

মুখ শোভা করে কার মল্ল মল্ল হাঁসি।

হৃদয় সাংগরে চেটে ছেন যবে বাসি।

পড়িল গলায় কেহ তেনরী সোনার।

মুক্তার মালা কঠমালা চন্দ্রহার।

ধুকধুকী জড়াও পদক পরে হুখে।

সোনার ককন কার শব্দের সমুখে।

পতির আয়ত চিত্র সোহাগ বাহাতে।

পরান বীধান লোছা সকলের হাতে।

পাতামল পাহলি আঙট বিছা পার।

জঙ্গরীপকম আর শোভা কিবা তার।”

উৎসবকালে বা রাজদরবারে কি কোনও সম্রাট ব্যক্তির সম্মুখে যাইতে হইলে মস্তকে একটা বে কোনও রকমের উকীষ সকলেই ব্যবহার করিতেন এ প্রকার অবশেষ এখনও ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রাদ্ধাদি বৈদিক কৰ্মে উকীষের স্থলে মাথায় একখানা “গামোছা” বন্ধন এবং ব্রাহ্মণেতর জাতীয়গণের মধ্যে কচিৎ হু একজন ক্ষৌরকার পরামণিকের মধ্যে মাথায় পাগড়ি বন্ধন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। পরমাণিকগণের তখন সমাজের উচ্চ নীচ সকলেরই সহিত বিশেষ মেশামিশি থাকায় তাহাদের মধ্যে এই প্রথা বহুস্থল হইয়া গিয়াছিল। তাহার তখন প্রকৃতই নরহুল্লর নামের অধিকারী ছিল, তাহাদের কার্যও যথেষ্ট ছিল। লোমশ স্থান কামাইরা লোমনাশ করিতে আবার লোমহীন স্থানে লোমোৎপাদনে তাহাদের বহু সময় ব্যয়িত হইত। মাথার চুলের তথ্য ব্রাহ্মণেতর জাতীয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণগণ প্রায়শঃ মাথায় বুটী রাখিতেন, সে বুটীর বড় বড় কৃষ্ণ কেশদাম নানা চঙ্গে পৃষ্ঠের অর্দ্ধেক পর্যন্ত লতাইয়া পড়িত প্রতি একাদশীতে সে বুটীর কেয়ারী হইত, সাজিসাঙ্গী আমলাও তেঁতুল দিয়া তাহার পরিষ্কার সাধন করা হইত। অধ্যাপকমণ্ডলী ও পুরোহিত মহাশয়েরাও বৈদ্যগণ ক্রুর উপর হইতে এক বিষয় পরিমাণ স্থান কামাইরা কেলিতেন। ইহাদের মধ্যে গুঠলোম বা গুফ রাখাও নিম্ননীর ছিল তবে তাত্ত্বিক বামাচারী ব্রাহ্মণে দাড়ী রাখিতেন। ‘টিকির’ প্রচলন হিন্দুগণের মধ্যে বিশিষ্টরূপেই ছিল। ব্রাহ্মণ মাঝেই শিখা রাখিতেন এবং বৈদ্য, কারু, নবশাক প্রভৃতি জল-চলু সকল জাতিতেই শিখা রাখার প্রথা ছিল। শূদ্রের মাথার শিখা ও গলায় মালা (কর্ভি) না থাকিলে ব্রাহ্মণে তাহার জলগ্রহণ করিতেন না। ব্রাহ্মণেতর জাতীয়ের মধ্যে শিখা রাখার প্রচলন এত অধিক থাকিলেও তাহাদের কেশের, গৌকের ও ক্রুর বাহার খুব ছিল। বাবরী কাটা চুল আর সকলেই রাখিত এখন যেমন মস্তকের সম্মুখের চুল বড় রাখিয়া পশ্চাৎদিকের চুল ছোট করিয়া কাটা ঢং হইয়াছে তখন এমন ছিল না বরং তথিপরিত প্রথা ছিল অর্থাৎ তখন মাথার সম্মুখের কেশ ছোট করিয়া পিছনে ক্রমশঃ বড় রাখা হইত কেহ কেহ আবার ব্রহ্মরজের উপর বানিকটা কামাইরা রাখিতেন ও স্নানাদির পর তাহাতে চন্দন তিলবাটা ও গোলাপ দিতেন। দাড়ি ও গৌকের তোষাজ তথিও কম হইত না মুখের

হুই পার্শ্বে গালপাড়া বা বড় জুলকী শোভা পাইত তবে বুড়েরা সকলেই প্রায় কেশশূন্য হইয়া মুখ করিতেন। টানা ক্র তখনকার সখের চং ছিল, ছাট্টিয়া, কট্টিয়া বা ক্রহীন হানে ক্রব দিয়া কামাইরা ক্র গজাইরা তুলিয়া টানা ক্র গড়া হইত ।

এই সময়ে ডন, কুস্তি, লাঠিখেলা, সড়কী, বল্লম, রায়বাশ, তলোয়ারখেলা প্রভৃতির উদ্ভাবন সকলের মধ্যেই অত্যন্ত প্রচলিত ছিল, দেশের দম্ভাতীতিই এ সকলের সমধিক প্রচলনের কারণ । দস্যুর ভয়ে লোকের সংস্থান থাকিলেও কেহ বহুদূরে চলিতে পারিত না, পাকাবাটী প্রায়ই ছিল না বাহাদের ছিল তাঁহারও দম্ভাতীতির জন্য বড় দস্যুর জানালা রাখিতেন না, দ্বিতলে বাহাদের বাসের ঘর থাকিত তাঁহার সিঁড়ির মুখে চাপা দ্যুর রাখিতেন আর সে দ্যুরের তক্তাও ডুমুরের কাঠে নির্মিত হইত, কেন না ডুমুরের কাঠে সহজে কুঠারের দাগ বসে না। গৃহস্থে কলসীর মধ্যে টাকা ও অলঙ্কার রাখিয়া মুক্তিকার পুত্তিয়া রাখিতেন বা চৌকীতে বাস্ন নির্মাণ করিয়া তাহার উপর রাখিতে শয্যা পাতিয়া শয়ন করিতেন । এইরূপ তক্তাপোষের বাক্সের নাম ছিল “ইন্-কাতর” ও ঐ তক্তাপোষের নাম ছিল “মাইপোষ” । বড় বড় জমীদারের ঘরে জমীদারী সংক্রান্ত কার্যাদি বেশীর ভাগ রাত্রিকালেই সমাহিত হইত, কেন না তাহা হইলে লোকজন সকলেই সজাগ থাকিত সুতরাং দস্যুভয়ও অল্প থাকিত । যেমন দস্যুভয় ছিল তেমনি দেশের লোকেও শক্তিশালী ও শস্ত্রপাণি ছিল সুতরাং লোকে বিশেষ অক্ষম বা ভীক ছিল না । একদিকে ডন কুস্তীগীরিতে সকলে যেমন পটু ছিলেন অপরদিকে পথ চলিতে, দৌড়াইতে, সম্ভরণে গঙ্গাপার হইতেও সকলে বিশেষ মজবুত ছিলেন । এখনকার মত পদে পদে রেলগাড়ী ট্রামগাড়ী মোটরগাড়ী বা বোড়ারগাড়ী কি বাইসিকেলের অস্তিত্বও ছিল না আবার ম্যালেরিয়া পীড়িত হইয়া এমন অক্ষম ও তখনকার কেহ ছিলেন না সুতরাং একদমে ১০১২০ ক্রোশ পথ অতিবাহিত করাও তখন আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না । তখন বানের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল গো-বান ও অর এবং জমীদারগণ হাতীও পুষিতেন । পাকীর চলনও বেশ ছিল । তদ্রূপের জীলোকেরা সাধারণতঃ পাকীতে বা ডুলিতে চড়িতেন । বাণিজ্যাদি নদীবক্ষে নৌকাযোগেই সম্পন্ন হইত ; অন্নশস্য জব্যাদি বলদের পৃষ্ঠে ছালা বোঝাই দিয়া লইয়া যাওয়া হইত ।

শ্রীহরিশাস (ববন) ঠাকুরের প্রবর্তিত হরিরলুটের প্রসার এই সময়ে নদীয়ার খুব অধিক হইয়াছিল। ববনের অনুকরণে সত্যনারায়ণের সত্যপীর আখ্যায় সিরনীর প্রচলনও এই কালের মধ্যে হয়। জাঁকজমকের সহিত বারইয়ারী পূজার সৃষ্টিও এই কৃকচন্দ্রীয় যুগে কৃকনগরের স্বনাম'খ্যাত' যন্ত্রিকগণ কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত হয়। মহারাজা স্বয়ং এই পূজার প্রধান পাতা ছিলেন। বারইয়ারী তলার উৎসব যত্নপ দেবদাক্ষ পাতার কদলী যুদ্ধে পূর্ণকুন্ডে ও "রচনা" কলে সুসজ্জিত হইত, কীদি সমেত রক্তা, কীদি সমেত ডাব, শাখা সহিত বাতাবীলোবু ও অস্ত্র ফল পূজাগৃহে বুলাইয়া দেওয়া হইত উহারই নাম "রচনা" চণ্ডীমণ্ডপ নানারূপে বিচিত্রিত "আলিপনার" চিত্রিত করা হইত। রায়ে সর্বণ ও রেড়ীর তৈলের তরবেতর আলোক দেওয়া হইত।

এইকালে মেয়েরা বালিকা বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া নানারূপ ব্রতাদি গ্রহণ করিতেন। স্ত্রীর পল্লীতে এখনও ইহার আভিহ দেখা যায়। তীর্থযাত্রা এখনকার মত সুলভ ছিল না স্ত্রীরাং সাধারণ গৃহস্থ ঘরের স্ত্রীলোকদের প্রায়ই তীর্থদর্শনাদি ঘটিত না। পুরুষেও পদব্রজে বা নৌকাবানে বহু কষ্টে ও বহু শ্রমে উহা সমাধা করিতেন, কিন্তু তাহাই করজমের ভাগ্যে ঘটিত বা একজনে করটী তীর্থই বা দেখিতেন। একাধিক পরিবার প্রথাই তখন সমাজে প্রচলিত ছিল, এখনকার মতন "ভাই, ভাই, ঠাই, ঠাই" তখন ছিল না। বংশে একজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি জন্মিলে তাহার বোজগারে ২০ জন বসিয়া থাকিত।

বাহার যেমন উপার্জন তিনি তেমনই ক্রিয়া কর্মাদিতে ব্যয় করিতেন। বাহা হউক কিছু কীর্তি রাখিয়া মরিতে পারিলেই তখন সকলে সার্থক জন্ম মনে করিতেন। শালগ্রাম শিলা বা কোনও বিগ্রহ মূর্তি প্রায় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাড়ীতেই গৃহে স্থাপনা করিতেন। অতিথি অভ্যাগতের সন্মান ও আদর যত্ন সকলেই করিতেন।

লোকে সাধারণতঃ অল্পে সন্তুষ্ট ছিল স্ত্রীরাং অধিক উপার্জনের জন্য বিদেশ গমন প্রায় কেহই করিতেন না। ঘোটা ভাত ঘোটা কাপড়ের সংস্থান থাকিলেই ভাবা পেটে সকলে হাসি ভাষায়া করিয়া বেড়াইতেন। বিকালে বসিয়া ভাগ, দাঁড়া পাসা সকলেই খেলিতেন। ছেলেরাও কপাটী, ছাঁই, ছুই, ডাঙাগুলি

বাতাবন্দী, চাকরুটী খেলিত। জলে পানকোড়ী খুবই আমোদের ছিল সে সব খেলা এখনকার ছেলেরা খেলিতে পারেও না, জানেও না।

ব্রাহ্মণ ও নিষ্ঠাবান গৃহী ঋত্রেই অরুণোদয়ের পূর্বে উঠিতেন। বৃদ্ধ বৃদ্ধা অনেকের মধ্যে প্রাতঃস্নানের প্রথা এসময় প্রচলিত ছিল। বাটীর মেয়েদের রাজি থাকিতেই উঠিতে হইত। নিতান্ত বড় মানুষের বাটী না হইলে শৌচাগার আর কোন বাটীতে ছিল না, সুতরাং গাত্রোত্থান করিয়াই ঝারি, গাড়ু বা অল্প কোন জলপাত্র হাতে লইয়া ময়দানের দিকে বা পুকুরিণীর পাড়ে বাইতে হইত। পরে নিমের বা কচার দাঁতনের সাহায্যে দস্তখাবন করিয়া স্নানের আরোজন হইত, স্নানের পর সন্ধ্যা তর্পণ শেষ করিয়া সকলে বাটী ফিরিতেন, বাটীতে গৃহ দেবতা থাকিলে এইবার তাঁহার পূজা করিতে হইত; পূজা সারিয়া এক কাঠা ছোলা চাউল ভাজা চিবাইয়া যে বাহার বিবর কর্ণে রত হইতেন, প্রায়শঃ লোকে চাষবাসের তখিরে মন দিতেন, মাঠ হইতে দেড় প্রহরের সময় গৃহে ফিরিয়া সরবৎ পান করিতেন পরে গৃহ কর্ণে মন দিতেন। বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া পরে আহার হইত; সে আহার এখনকার হিসাবে “রান্ধের আহার”। আহারের পর আড়াই দণ্ড নিদ্রা, অপরাহ্নে আবার সেই কৃষিকার্য্যের বা অল্প কার্য্যের আলোচনা সারিয়া সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন করিয়া আমোদ উৎসবে সকলে রত হইতেন। তখন সকল পন্নীতেই সকল জাতীর মধ্যে কতকগুলি করিয়া একত্র সমবেত হইবার স্থান বা আড্ডা থাকিত এই আড্ডাই তখনকার সমাজ শাসন করিত। গ্রামস্থ বিভিন্ন আড্ডার মধ্যে কলহ ও দলাদলী খুবই চলিত সুতরাং সমাজেও দলাদলী খুব ছিল। সন্ধ্যার সময় সকলেই নিজ নিজ নির্দিষ্ট আড্ডায় মিলিত হইয়া নানাবিধ বিস্তৃত আমোদ আফ্লাদ করিতেন কচিং কোথাও নেশা ভাদ ও চলিত মদের চলন খুবই কম ছিল, তামাক সিঁড়ি ও গাঁজারই তখন রাজ্য ছিল। সন্ধ্যোত্তের চর্চ্চা তখন খুবই হইত। বীণা তবুয়া, বেহালা ও সেতারের আশ্রয় খুব ছিল। ভদ্রলোকদিগের মধ্যে খেরাল টপ্পা কোর্ডন, পাঁচালী কবি ইত্যাদির আলোচনা চলিত এবং ইতর জাতীয়-দিগের মধ্যে মনসার ভাবান ও বেহুলার গানের চলন ছিল। রাজি বেড় প্রহরের পর প্রায়ই সকলে নিজ নিজ গৃহে ফিরিতেন এবং কিছু জলযোগ

করিয়া শয়ন করিতেন। সেকালে লোকে প্রায়ই একাহারী ছিল, সেই একাহার এখনকার দশজননের আহার। এই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে লোকে যথার্থই ভোজন বিলাসী ছিল। অলঙ্কার, ভাব ও ভাবার যেমন মুসলমানী ভাব প্রবেশ করিতেছিল, তেমনি আহাৰ্য্য তালিকার দৃষ্টিপাত করিলেও বাবনিক আহাৰ্য্যের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই কথিত আছে বরং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভোজন-বিলাসীগণের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার নিমিত্ত প্রত্যহ নানাবিধ সুস্বাদু চর্য্য, চোবা, লেহ, পেয়াদি প্রস্তুত হইত; তিনি তাহা হইতে যথেষ্ট গ্রহণ করিতেন। “হৈয়জবীন” অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণের গাভী প্রত্যয়ে দোহন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নবনীভাগ গ্রহণ করিয়া সন্ধ্যা বে যুত প্রস্তুত হয় তিনি প্রত্যহ তাহাই ব্যবহার করিতেন। অন্নদামঙ্গল হইতে আমরা এই সময়ের একটা লোভনীর রসনা আকরকর আহাৰ্য্য তালিকা সংগ্রহ করিতেছি।

“হাতমুখী পদ্মমুখী আরতিলি পাক ।
ডালি রাঁধে ঘনতর ছোলা অড়হরে ।
বড়াবড়ি কলা মূলা নারিকেল ভাজা ।
কাঁটালের বীজ রাখে চিনিরসে বুড়া ।
নিরামিষ তেইশ রাঙিলা অনারাসে ।
কাঁতলা ভেটুট কই ঝাল ভাজা ঝোল ।
ফাল ঝোল ভাজা রাখে চিতল মলই ।
মায়া সোনা বড়কীর ঝোল ভাজা সায় ।
কর্ভ রাঁধি রাঁধে কই কাঁতলার মুড়া ।
আঁরে দিরা শোল বাছ ঝোল চড়চড়ী ।
কই কাঁতলার তৈলে রাখে তেল শাক ।
বাচার করিলা ঝোল বরবার ভাজা ।
সুসাহ বাহের বাহ আর সাহ বত ।
বড়া কিছু কিছু কাহিমের ডিম ।
কচি ছাপ মূল মাংসে ফাল ফোল রসা ।
অন্ন মাংস শীক ভাজা কাঁবাধ করিয়া ।
মৎস্ত মাংস সাজ করি অখল রাঙিলা ।
আঁর আঁরমুখ আর আঁরনী আচার ।
। রাঁধিয়া বাবা আরতিলি পিঠা ।

শড় শড়ি বট ভাজা নানামত শাক ।
মুগ মাংস বরবটি বাটুলা মটরে ।
ছুখোড় ডালনা শুকানি বট ভাজা ।
তিল পিটালিতে লাউ বার্তাকু কুমড়া ।
আরতিলি বিবিধ রন্ধন মৎস্ত মাংস ।
শীকপোড়া ‘বুড়া কাঁটালের বীজে ঝোল ।
কই মাগুরের ঝোল ভিত্ত ভাজে কই ।
চিলড়ীর ফাল বাগা অমৃতের তার ।
ভিত্তি দিগা পচা মাছে রাঁধিলেক শুঁড়া ।
আড়ি বাছে আঁরারসে দিরা ফুলবড়ী ।
মাছের ডিমের বড়া মূতে দেয় ডাক ।
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা ।
ফাল ফোল চড়চড়ী ভাজা কৈল কত ।
সজাকল তার মাংস অমৃত অসীম ।
কালিয়া কোলমা বাগা সেকটা সমসা ।
রাঙিলেন বুড়া আগে মশলা পুরিমা ।
মৎস্ত মূলা বড়াবড়ী চিনি আদি মিলা ।
চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মাধার ।
সুখা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা ।

বড়া এলো আদিয়া পিযুখী পুরী পুলী ।

চুখী কটী রামরোট মুগের সামুলী ।

কলা বড়া বিয়ড় পাপড় ভালা পুলী ।

মুখারটী মুচুটী লুচী কতগুলি ।

পিঠা হইল পরে পরমায় আরতিল ।

চালু চিলা ভুয়া রানবড়া চালু দিলা ।

পরমায় পরে খেচরায় হাঙে আর ।

বিকুতোগ রাখিলা রীধুনী লক্ষী বার ।

ভূত, শিশাচ, ডাইন প্রভৃতির উপদ্রব ও ওঝা বা রোকা দ্বারা তাহার নিরাময় প্রথা, শৃগাল কুকুর ও সর্প প্রভৃতির বিষ চিকিৎসার মন্ত্রোষধির ব্যবস্থা, নানাবিধ তুচ্ছতাক দ্বারা ব্যাধি সারান ও অনাবৃত্তি ও অতিবৃত্তি নিবারণে মন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিবার প্রথা এই সময়ে সমধিক প্রচলিত হয় ।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরেই ইংরাজরাজ এদেশ অধিকার করেন । ইংহানের শাসনে নদীয়ার পশ্চাত্য-শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশের লোকের কুপমণ্ডু কথ অপবাদ খুঁচিয়া গিয়াছে, বিদেশে অর্থার্জনে সকলেরই স্পৃহা বাড়িয়াছে, চৌর ডাকাতের উপদ্রব রহিত হইয়া দেশের শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইয়াছে, রাজদ্বারে বিচার সহজলভ্য হওয়ার অত্যাচারীর অত্যাচার লোপ পাইয়াছে, দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, শিল্প, ভাষা প্রভৃতির উন্নতির দিকে লোকের মন আকৃষ্ট হইয়াছে । পশ্চাত্য জাতিগণের সভ্যতার অল্প অল্প করণ করিতে বাইরা সমাজ না প্রাচ্য না প্রতীচ্য এক নবরূপ ধারণ করিতেছে । প্রাচীন সমাজ-বিহিত যে বার জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সকলেই আত্মোন্নতির উপায় দেখিতেছে ।

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের জীপুরুষের দৈনন্দিন জীবন ধাপন প্রথার সহিত আধুনিক নর নারীর জীবনী তুলনা করিলে পুরুষের আচার, ব্যবহার, মীতি নীতির যেমন সম্যক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, স্ত্রীলোকের জীবনে তত অধিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না; অতঃপূর্বে কেবল অবরোধ প্রথার কঠোরতা রেল-ওয়ের প্রচলন, বিদেশ গমন, ইত্যাদি নানা কারণে কথঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে । কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ৪০ বৎসর পূর্বে তন্নমহিলাগণকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া ট্রেণে তুলিতে ও ট্রেণ হইতে নামাইতে প্রতিষ্টেঘনে পর্দা ও পাড়ীর প্রাচুর্য দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হইত । আর এখন মধ্যবিত্ত ঘরের স্ত্রীলোকেরা বিমা পর্দা বা পাড়ী অনায়াসে বহুতর গমনাগমন করিতেছেন । স্ত্রী শিক্ষার প্রচারও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে, এখন সমগ্র

নদীয়ার বালিকা বিদ্যালয়ে বৎসরে বহু সংখ্যক বালিকা লেখাপড়া শিখিতেছে কিন্তু এই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে এমন কি বর্তমানকাল হইতে ৪০ বৎসর পূর্বেও জীলোকের লেখাপড়া শিখা করা সমাজের চক্ষুতে নিতান্ত দূষনীয় ছিল। কচিং কোন বিধবা রামারণ মহাভারত পড়িতে পারিতেন। অধুনা বালিকা শিক্ষার বিস্তারের সহিত শৈশব বিবাহ একেবারে উঠিয়া না যাইলেও বিলক্ষণ কমিয়া গিয়াছে। পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা একরূপ লুপ্ত প্রায়। এই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে জীলোকের মধ্যে মৃতপতির সহমরণ বা স্বামীর বিদেশে মৃত্যু হইলে তাঁহার অসহমরণ প্রথার প্রসার বিলক্ষণ ছিল। এমন কি দেশে ইংরাজশাসন প্রবর্তিত হইলেও প্রথম প্রথমে বন্ধের প্রতি প্রাণেই প্রতি মাসে দু চারিজন রমনী এই নৃশংস প্রথার সম্মুখে বলীপ্রস্তুত হইতেন, বাঁহারা মৃতপতির সহ বা অসহমরণ না করিতেন তাঁহারা আশ্রয় কঠোর ব্রহ্মচর্য্যেরত অবলম্বন করিয়া সংসারে একরূপ জীবনযুক্ত হইয়া রহিতেন। সমু প্রবর্তিত এই নির্দম প্রণার প্রসার কমিয়া আসিলে বর্তমান যুগের যত্ন স্বার্থ বহু-একজন পুত্রীয় পক্ষপাত শতাব্দীতে সমাজের বকে যে ভাঙন চিতা-বহ্নি আনিয়া দিয়াছিলেন তাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাকে প্রাস করিয়া পরে পুত্রীয় ১৮২৯ অব্দে ইংরাজ শাসনকর্তা মহাশয় লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর কর্তৃক নির্দাপিত হইয়াছিল। * এই সকল নির্দম কাহিনীর অনেকগুলি, ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে নদীয়ার মধ্যে শান্তিপুর, চাকদহ, নবদ্বীপ প্রভৃতি পলাতীরস্থ স্থান গুলিতেই ইহার শোচনীয় অভিনয় বেশী হইত।

* In short two women on an average calculation were to be destroyed every day in the year.

Speaking roundly more than 500 women were allowed to imolate themselves every year between 1814 & 1829, while the British government patronized the show. vide W. H. Carrey's The good old age of Honble John Company.

Lord William Bentinck carried a regulation in council on December 4,—1829, by which all who abetted Suttee were declared guilty of "culpable homicide."

Vide Imperial Gazetteer of India (New Edition) The Indian Empire Vol II. Page 498.

বে দিন কোথাও সতী নাহ হইত সে দিন দিকদিগন্তর হইতে দলে দলে নারী পুরুষ আসিয়া সেই শোচনীয় ঘটনা স্থলকে যেন এক পবিত্র তীর্থে পরিণত করিত। জীলোকেরা একবার সেই "সতীমা"র পদধূলী লইতে পাইলে, সেই সতী হস্ত দত্ত সিন্দূর একটুকু পাইলে, বা সেই সতীর পরিহিত বস্ত্রের একটুকু ছিন্নাংশ পাইলে নিজেদের মৌত্তাগ্যাশালিনী মনে করিতেন। সতী প্রাণে এই জন সমুদ্র মধ্য হইতে বাহির হইয়া জাহুবীর পুতলিলে নিজে স্নান করিয়া পুত্রাদির সাহায্যে মৃত স্বামীকে স্নান করাইয়া সজ্জিত চিতায় স্বামীকে তুলিয়া দিয়া মৃত্যু বস্ত্র পরিধান করিয়া সিন্দূরে আরক্ত সীমন্ত হইয়া যথা সাধ্য দান ধ্যান করিয়া উচ্চ হরিশ্বনি ও গভীর বাজোকমের মধ্যে স্তব্ধা দিয়া চিতা প্রদক্ষিণান্তর চিতারোহণ করিতেন পরে ইহজীবনের প্রত্যক্ষ দেবতা স্বামীর পদারবিন্দ হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্বামী-নারায়ণের ধ্যানে তন্ময় হইতেন, প্রায়শঃ হাসিতে হাসিতে স্বামীর পদ হৃদয়ে ধরিয়া তাঁহার পুড়িয়া মরিতেন, কচিং কোথাও ইহার ব্যতিক্রম হইত, চিতা ত্যাগ করিয়া কেহ কেহ বা অন্ত্র পলাইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের সে চেষ্টা বিফল হইত। * এই মর্মান্বন ভয়ানক প্রাণ রহিত করিয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট প্রকৃতই ধন্য হইয়াছেন সমগ্র নদীয়ার এ যাবৎ কত সহস্র সহস্র সতীদাহ সমাহিত হইয়াছে তাহার ধারাবাহিক বিবরণ পাইবার কোনও উপায় নাই। তবে ব্রিটিশ শাসনাধিকার কালের মধ্যে খৃঃ ১৮১৬ হইতে খৃঃ ১৮২৯ পর্য্যন্ত অনেকগুলি ঘটনা ইংরাজ নথিতে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে দেখা যায় যে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ৫৬ জন ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ৮৮ জন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৮০ জন ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ৪৭ জন ও ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ৫৯ জন জীলোক এবং নদীয়া

* কোট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত রামনাথ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে উলা নিবাসী মুক্তারাম নামক জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী হইলে তাঁহার তের জন সাক্ষী জী তাঁহার সহস্রতা করেন। বহুল চিতাগ্নি প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল তখন তথায় তাঁহার আর ছুইটি স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের একজন সহস্রতা হইবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু বখন স্তব্ধা দিবার বস্ত্র পাঠ হইতেছে তখন তাঁহার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল, স্তত্রায় তিনি তথা হইতে পলাইতে উদ্যত হইলে, মুক্তারামের এক পুত্র ঐ বিমাতাকে ধরিয়া প্রজ্বলিত পিতৃচিত্তানলে নিক্ষেপ করিলেন অপর স্ত্রী তথায় দাঁড়াইয়া ব্যাণার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন উক্ত পুত্রী তাঁহাকেও চিত্রায় আণ্ডনে ঠেলিয়া দিলেন।

জেলাতে প্রকাশভাবে “সতীদাহ” ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ৫৬ জনের মধ্যে এক শান্তিপুত্রের সংখ্যাই ছিল ২০ জন। এই সকল সতীর বিবরণ ইংরাজী বহুপুস্তকে দেখা যায় * এই সকল স্থানে এই সময়ে যে কেবল মাত্র সতীদাহের জন্ত প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল এমন নহে। নির্ধন ভাবে গঙ্গাসাগর সঙ্গমেত এবং গঙ্গাবক্ষে পুত্র কন্যা বিসর্জন ; † এবং বৃদ্ধ জরাতুর ব্যক্তিকে তীরস্থ করিবার জন্তও ইহাদের খ্যাতি কম ছিল না ; পূর্ব ও উত্তর অঞ্চলের বহু দূর দেশ হইতেও এই সকল স্থানে মৃত অথবা মৃতকর ব্যক্তি-গনকে গঙ্গা সমর্পনের নিমিত্ত আনয়ন করা হইত। ‡ দ্বিতীয়া আসিয়া প্রারম্ভঃ

* জানাভাবে দু একটী মাত্র এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে,—

A Kulin Cuandra Bandopadhyya was killed here 30 years ago, he was married to 100 wives and was murdered by the brother of one of them on account of his profligate conduct towards his sister. 8 of his wives performed Sutte on his funeral pyre.

In 1799 at Bagnapara 37 widows were burnt with their husbands, the fire was burning 3 days ; on the first day 3 were burnt, on the second 15, and on the third day 19 ; the deceased had over 100 wives.

Vide Calcutta Review Vol VI nor XI & XII
Page 398—448.

† In 1813 two women cast their children into the river, but the fathers took them out again and paid a certain sum of money to the Bramhins for their ransom. People from Decca and Jessore used to throw their children to the Ganges here (Nadiya).

Calcutta Review Vol VI Page 421—29.

Chogdah as well as Bansberia and Gangasagar were formerly noted for human sacrifices by drowning the aged, and children were thrown into the river ; In November 1801 some pilots saw 11 persons at sagar throw themselves to sharks and that month. 29 persons were devoured by them. It is still a famous place (A. D. 1846) for burning the dead and for bathing. Corpses are brought there from all parts of the country, often from great distances when they become putrid ere they reach Chogdah, the persons carrying the corpse are not allowed to enter a house, must pay double ferry fare, and must take fire with them as no one will give it. বৃত্তের সংস্কারীগণের পক্ষে এ নিয়ম নদীয়ার এখনও প্রচলিত আছে। Travaniar mentions seeing corpses brought to Chogdah from a place 20 days distance all ratton and smelling dreadfully.

‡ Chogdah has been notorious for ghat murders, there are various

এই সকল অন্তিম শয্যাশায়ী নর নারীর ভব বহননা দূর করিয়া দিত ; কিন্তু এত কষ্ট সাহস ও ঘাঘাদের প্রান বাঁচিষ্ঠা হারাও আর দেশে ফিরিতেন না এই চাকদাহ শাস্তিপুর প্রভৃতি স্থানে ভাগীরথী তীরে বাস করিয়া সদা শমনের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিতেন ; শুনা যায় শাস্তিপুরের লোক সংখ্যার বৃদ্ধি নাকি এইরূপ আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পরিত্যক্ত নর নারী গইয়া হইয়াছিল * সুখের বিষয় এই নির্দম প্রথাও অধুনা লুপ্ত প্রায়। এই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগেই ইংরাজগন এ দেশ অধিকার করেন, কোম্পানির রাজত্ব হইলেও দেশ হইতে তখনও পূর্ষকার নরবলি প্রথা প্রভৃতি একেবারে লুপ্ত হয় নাই তখনও এমনকি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গোপনে ও প্রকাশে নরবলি চলিতেছিল দেখা যায় † ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে

persons now living there, who have been taken to the river to die, but have recovered & are outcasts.

Vide Calcutta Review vol VI page 411.

* When a patient, thus situated, happens to recover, he considers that he has, as it was, acquired a new life, and thenceforth all his former relations and friends are treated as strangers; he never returns to the dwelling in which he had formerly resided, but wanders down the Ganges, until he arrives at Santipore near Calcutta, where he settles himself; and it is a curious fact, that the whole population of Santipore is composed of such persons.—Honigberger.

(বিশ্বকোষ Part I, page 315).

† Human sacrifices were also frequent even as late as 1832, a Hindu at Kalighat (near Santipore) sent for a Musalman barber to shave him, he asked him afterwards to hold a goat while he cut off its head as an offering to Kali, the barber did so, but the Hindu cut off the barber's head and offered it to Kali, he was sentenced by the Nizamut to be hung. A few years ago a number of Bramhins assembled at Santipore and began to drink and carouse after it, one proposed a sacrifice to Kali, they assented, but having nothing to sacrifice one cried out where is the goat, on which another more drunken than the rest exclaimed, I will be the goat and at once placed himself on his knees, one of the company then cut off his head with the sacrificial knife, when they woke the next morning from their drunken fit they found the man with his head off, they had the corpse taken to the Ghat burned and reported the man died of Cholera.

Vide the Banks of the Bhagirathi.

Vol. VI. Calcutta Review No. XI and XII.

ও “তপ্তমুক্তি” বা অত্যাধু যুত প্রয়োগ দ্বারা দোষী বা নির্দোষী অবধারণ করার প্রথা দৃষ্ট হয় । * এই সময়ে সামাজিক শাসন পূর্বাগেচ্ছা কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল হইলেও দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই । হিন্দুর পক্ষে যাহা ধর্ম বিক্রম তাহার বা বাহা সামাজিক নিয়ম বিক্রম বলিয়া অস্বীকৃত হইত তাহার যথোচিত শাস্তি বিধান এ কালেও চলিত, এই কালে কৃষ্ণনগরে কোনও ব্রাহ্মণ সন্তানকে কোনও হুরাচার বলপূর্ব্বক গোমাংস ভক্ষন করাইলে তদানীন্তন ব্রাহ্মণের সর্ব্বময় কর্ত্তা পলাশী বিজয়ী লড্‌ক্লাইব সাহেবের আন্তরিক যত্নেও কোনও ব্রাহ্মণ উহাকে প্রায়শ্চিত্ত বিধান না দেওয়ার উক্ত হতভাগ্য ব্রাহ্মণ শোক হৃৎখে হতাশে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন † এই কালের সামাজিক শাসনের আরও প্রকৃষ্ট উদাহরণ ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের প্রবর্ত্তিত নদীয়ার দশষ্ঠাকুরী প্রথা । প্রামের দশজন প্রধান একত্রিত হইয়া যাবতীয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী সামাজিক ‡ ও পারিবারিক বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন ইংরাজ বিচার কর্ত্তারও তখন প্রায় ইহাদের রায়ই বাহাল রাখিতেন । অত্যাধু শাস্তির মধ্যে সমাজে হুঁকা বন্ধ, ধোপা নাপিত বন্ধ স্মৃতিকাগারে ধাত্রী নিষেধ ইত্যাদি কঠোর নিয়ম প্রচলিত ছিল ।

* In 1807 the Tapta Mukti or ordeal by hot clarified butter was tried before 7000 spectators on a young woman accused by her husband of adultery.

Vol. VI. Calcutta Review No. XI and XII.

† A meeting of Bramhans was held in 1760 at Krishnagar before Clive and Verelst, who wished to have a Bramhan restored to his caste, which he had lost by being compelled to swallow a drop of Cow's soup, the Bramhans declared it was impossible to restore him. * ** and the man died soon after of broken heart.

Vide Cal Review Vol VI Page 421—27.

‡ In 1835 a Dharmashova was established called that of the Ten Thakurs, they punished offenders by excluding them from caste, by sending them when they transgressed the Regulations to the Magistrate of Krishnagar, or by prohibiting midwives attending their wives in confinement.

Cal Review Vol VI Page 421—27.

সমাজ হইতে এই সকল সামাজিক কঠোর শাস্তি একগুণে উঠিয়া গিয়াছে।

আহার, বিহার, লোক-লৌকিকতাদি সামাজিক সৰ্ব্ববিষয়ে যেক্ষণ পরিবর্তন
অবস্থ হইয়াছে, পুরাতন ছাড়িয়া নূতনের প্রতি লোকের যেক্ষণ মন আকৃষ্ট
হইয়াছে, তাহাতে আর কিছুদিনে সামাজিক কোনও বিষয়েই প্রাচীনভাবের
লেশ মাত্র রহিবে না বলিয়া অনুমান হয়, খনৌ দরিদ্র, ইতর, ভদ্র নির্বিশেষে
উন্নত শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় সকলেরই আচার ব্যবহার বাতি নীতি পূর্বের সহিত
সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার আকার ধারণ করিতেছে। শুধু এ দেশ বলিয়া নহে অধুনা
পৃথিবীর সমগ্র জাতির সকল সমাজেই এই বিঘট সামাজিক পরিবর্তনের স্রোত
বহিয়াছে সমাজের জ্ঞান ধর্মো নবভাব দেখা দিয়াছে।

অসন বসনেও রুচি পরিবর্তিত হইয়াছে, পূর্বে এমন কি সেদিনও যেখানে “ফলাহারে” চিড়া, দধি, ছন্ধা, বাতাসা, চিনি, রস্তু ও সন্দেশ সাদরে চলিত। অথবা সর্বোৎকৃষ্ট করিতে হইলে—

‘শিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি,
হুচার আদার কুচী,
কচুরি তাহাতে থান দুই।

ছকা আর শাক ভাজা, মতিচূর বঁদে খাজা
ফলারের ষোণাড় বড়ই ॥

নিখুতি জিলাপী গজা, ছানাবড়া বড় মজা

শুনে মক্ মক্ করে নে'ল।।

হরেক বকম মোক্ষা, যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা

যত খাট ততই হৃদ ভোলা ॥

খুঁজি পুরি কোর তায়, চাহিলে আরও পায়,

কাহারি কাটিয়ে শুকো দই ।

অনন্তর বাম হাতে, দক্ষিণা পানের সাথে

উত্তম ফলাব তারে কহ ॥”

হ্রিণ বাজান ও ছাপান প্রকার মিষ্টান্ন ও শত প্রকার “রকম” না হইলে
ভদ্রোপযোগী কলাহারই হয় না। *

একটু বিশিষ্টরূপে আয়োজন করিতে হইলে এখানে একটা ভোজে নিম্নরূপ আহাৰ্য্য ভালিকা হওয়া উচিত, ইহা পক্ষা উৎকৃষ্টতর করিতে হইলে আরও বিস্তৃত আয়োজন হইয়া থাকে, তবে সাধারণতঃ এই রূপই সমাজে চলিয়া থাকে।

* জিলাপী, ছানার জিলাপী, কলা বরফা, বালুসাই, অমৃতি সিতেভোগ, ছানারমড়কী
লুচি, মতিচূর, হালুয়া, ছানাবড়া, আবাবখাবো বাধাবল্লভী মিহিদানা, মালাপোরা নেডিক্যানি
চপ্ সন্দেখ, পরোটা পানতুয়া, অমৃতরসাবলী, পাপর, রসকরষ, সিঙ্গেড়া, এস্ট্রেসগজা
রসগোল্লা, রস সরোবরের মাধুরি, কচুরি, লালমোহন, লবঙ্গ লতিকা, বরফী, বাদামতরু
নিমাকি, দরবেশ, মুগেরলাড়, আমগন্ধেশ, ছানার পাহেল, গজা, বঁদে, পেরাগি, আতা,
সরভাজা, মিটেগজা, নিকুতি, বিওর, চমচম, খৈচুর, মোয়া, মনহরা, রসকরা, সরেরলাড়:

পূর্বে যেখানে সামান্য মূল্যের কাপড়ে ও মিষ্টানে “ভবু” করা চলিত, এখন উৎকৃষ্টতর দ্রব্যাদি সহজ প্রাপ্য হওয়ার সেখানে তদনুযায়ী দশগুণ অধিক “ভবু” করিলেও বেন মনের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। এই বিলাসিতার ভাব হইতে দরিদ্রের ও পরিভ্রাণ নাই। এবিধ ব্যসনাসক্তি দেশের লোকেরা আর্থিক স্বচ্ছলতাই প্রকাশ করে।

পূর্বে যে বিবাহে সমগ্র ব্যাপারে মোট একশত মুদ্রা ব্যয় হইত, এখন সেই টাকার স্থান বিশেষে হয়তো একটা গায়ে হরিদ্রার “তবুই” হইয়া উঠে না। বিবাহে পণ গ্রহণ প্রথার প্রসারত বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দেশে ইতর-ভদ্র নির্কিংশেবে শিকার বিস্তার হইতেছে, তাহার ফলে তৃত, পিশাচ, ডাইন সংক্রান্ত ব্যাপারে লোকের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার কমিয়া আসিতেছে; বাস্য বিবাহ, বহু বিবাহ; প্রভৃতিও কমিয়া গিয়াছে। রাজার নিকট জাতি ধর্ম নির্কিংশেবে গুণীর আদর থাকার উচ্চতর শিক্ষার দিকে সকলেরই মন আকৃষ্ট হইয়াছে।

লৌহবর্ষ ও সংবাদ পত্রাদির সমাধিক প্রচলন হওয়ার লোকের আলস্য ও সর্ববিষয়ে ঔনাসীন্য ভাব কমিয়া গিয়াছে; বিভিন্ন স্থানের ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিচয় ও সৌন্দর্য স্থাপিত হইয়াছে, তীর্থাদি দর্শন সহজ সাধ্য হওয়ার লোকের ধর্মোজ্জনের পথ সুগম হইয়াছে। নবদ্বীপের গট পূর্ণিমা, শান্তিপুত্রের রাস, ঘোষ পাড়ার মেলা বা মাটিয়ারীর মহামেলা সকলই সহজগম্য হইয়াছে।

লোকের আত্মোন্নতির দিকে দৃষ্টি হওয়ার সমাজে স্বাভাবিক প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছে স্বতরাং একজনের উপার্জনে দশজন বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া যাইতেছে। সমাজে কর্মী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কলহ ও দলাদলীভাব কমিয়া গিয়াছে, বিশেষ ম্যালেরিয়াদিতে লোকের স্বাস্থ্যহানী হওয়ার কথা কলহে বড় কাহারও প্রেরণা দেখা যায় না। নীতি ও রুচির প্রতি লোকের মন আকৃষ্ট হইয়াছে, ভাবাও তদনুযায়ী উৎকৃষ্টতর ভাব ধারণ করিয়াছে।

মূলতঃ ইহাই আজ পর্যন্ত নদীয়ার সামাজিক বিবরণ নদীয়ার শাসন বিভাগের বাৎসরিক বিবরণীতে দৃষ্টিপাত করিলে স্বতই মনে হইবে যে নদীয়াবাসী-গণ অজ্ঞান জেলার লোকের তুলনায় অতি নিরীহ স্বভাবের ব্যক্তি; নির্দম খুন ভীষণ ডাকাতি, বিষম দাগাবাজী বা জাল প্রভারণা প্রভৃতি নিম্ন নদীয়াবাসী-গণ কর্তৃক অতি অল্পমাত্রায় সমাহিত হয়। গবর্ণমেন্ট কর্তৃক পরিগণ ইহাকে ‘শাস্ত-জেলা’ নামে অভিহিত করেন। এখানকার অধিবাসীগণের প্রকৃতি সাধারণতঃ মধুর ইংলান্ড বা বিনয়ী, নম্র স্বভাব, বচনপটু, সুরসিক, অতিমানী, ‘অলস, অল্পে সন্তুষ্ট, শান্তিপ্রিয় ও রোগপ্রবণ।

কালাকন্দ, গুজিয়া, ফিরের রকম, নানারূপ আচার, ও মোরব্বা, ফল ১৫ফা—ফির, দধি, রাবড়ী।

নদীয়ার কতিপয় প্রাচীন ও আধুনিক স্থান ।

বর্তমান নদীয়া জেলা ৫টি মহকুমায় বিভক্ত ; যথা, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া । এতন্মধ্যে কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাট, এই দুই মহকুমার অধীনেই নদীয়ার বাবতীয় উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ও আধুনিক স্থানগুলি বিস্তৃত । বিশেষ, রাণাঘাট মহকুমার এলেকার বত সংখ্যক উল্লেখযোগ্য স্থান আছে, নদীয়ার আর কোন মহকুমায় তাহা নাই । রাণাঘাট, আড়ংঘাট, শান্তিপুর, বাবলা বা বাউগাছী, উলা (বীরনগর) মামজোরান, চাকদহ, জশড়া, হরধাম, আনন্দধাম, লুখসাগর, জাগুলী, শ্রীনগর, আতুলিয়া, দে-গাঁ, কুলিয়া, বয়রা, ব্রহ্মশাসন, হরিপুর, বাগআঁচড়া, কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর, (অধুনা ২৪ পরগণা জেলাভুক্ত) মুরতীপুর-বোষণাড়া, আড়ংঘাট প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রামগুলি রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত । কৃষ্ণনগর সদরের অধীনে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য গ্রাম বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে অগ্রদ্বীপ ও পূর্বস্থলী, চুপী, বাগোয়ান, মীরা, নবদ্বীপ, বেলপুকুর, ধর্মদা, দেবগ্রাম, হাঁসখালি, শিবনিবাস, ভাঙ্গনঘাট, পলাশী, মুড়াগাছা, শ্রীবন, মাটিরারী, বালিগঞ্জ, মহৎপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, দোগাছিয়া প্রভৃতি গ্রাম প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য । মেহেরপুর গ্রামখানি নিজে প্রাচীন হইলেও ইহার এলাকাধীনে প্রাচীন উল্লেখযোগ্য স্থান বিরল । রামনগর, জগবন্ধুপুর, আমঝুপি, তেহাটা, কেশবনগর, করমদী, কাজীপুর, শিকারপুর, পিয়ারপুর বা ছোলেমার অন্তরকোটা, বামনদী, তেতুলবেড়ে নন্দনপুর নারায়ণপুর কৃষ্ণনপুর মোদ্রাখালী শ্রামনগর পিপুলকোলা সন্দুলপুর প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম নীলের হাক্কামা কালে প্রসিদ্ধি লাভকরে । চুয়াডাঙ্গা আধুনিক স্থান এবং ইহার : অধিনেও উল্লেখযোগ্য স্থানোসংখ্যা অতি কম তবে ইহারই মধ্যে নাটুদা, মুন্সীগঞ্জ, জহরপুর, কুতুবপুর, সিন্দিরিয়া, খাঁড়াগেদা, বেগমপুর, জীবননগর, আমুলবেড়ে, ফতেপুর লোকনাথপুর, কুড়ুলগাছি, খামবেড়ো, দোকী, বাগাদী, ওসমানপুর কুয়ুরী আলমডাঙ্গা, কাপালডাঙ্গা, দামুরছদা, জয়রামপুর, ডুমুরদিয়া, প্রভৃতি গ্রামের নাম উল্লেখ করা যায় মাত্র । কুষ্টিয়া সমগ্র জেলার মধ্যে লোকসংখ্যা ও বিস্তৃতি হিসাবে সর্বাপেক্ষা প্রধান ও বৃহৎ মহকুমা হইলেও ইহার অধীনে উল্লেখ-

যোগ্য প্রাচীন গ্রাম নাই বলিলেই হয় তবে গৌসাইদুর্গপুর, পাটকাবারী, ধরমপুর, হালসা, জুনাদ, পোড়াদ, মথুরাপুর, ভালুকা, চাপড়া, হাজিপুর, জগতী কুমারখালি প্রভৃতি কতিপয় গ্রামের নাম উল্লেখ করা যার মাত্র। উল্লিখিত স্থানগুলির মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে লিখিত হইল।

কৃষ্ণনগরের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বাবতীর বিষয়ই ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে, এক্ষণে কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিবৃত্ত দিয়া আমরা কৃষ্ণনগরের ইতিহাস সম্পন্ন করিতেছি।

নদীয়া রাজবংশ ।

নদীয়ার রাজাগণ আদিশুর আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের নেতা অন্ততম ভট্টনারায়ণের বংশজ। ভট্টনারায়ণ কাজকুজ প্রদেশের ক্ষীতীশ নামক রাজার পুত্র। তিনি এদেশে আসিবার সময় বহু অর্থ সঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন একারণে বঙ্গাধিপতি মহারাজ আদিশুর তাঁহাকে কতিপয় গ্রাম দান করিতে চাহিলে তিনি তাঁহার দান লইতে অস্বীকার করিয়া মূল্যপ্রদান পূর্বক প্রস্তাবিত কয়েকখানি গ্রাম গ্রহণ করিলেন এবং অপর লোকের নিকট হইতে আরও কতিপয় নিকর গ্রাম ক্রয় করিয়া বিরূপপুর প্রদেশে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করেন। তিনি তাঁহার জীবনের চতুর্কিংশতি বৎসর এই সকল গ্রাম নিকররূপ ভোগ করেন।*

ভট্টনারায়ণের পুত্র নিগু হইতে অধঃস্তন একাদশ পুরুষে মহাত্মা কামদেব জন্মগ্রহণ করেন। সর্লগুহক ইহঁদের বিষয় ভোগকাল ৩২২ বৎসর। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। ইহঁারা সকলেই ধর্মভীরু, নিষ্ঠাবান ও বিদ্বান্ ছিলেন। কামদেবের চারি পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথ পিতৃগদী প্রাপ্ত হইয়া ১৪শ খৃষ্টাব্দে দিল্লীযাত্রা করেন এবং স্বকীয় অসাধারণ বিজ্ঞাবসঙ্গুণে মহামাত্র দিল্লীদরবার হইতে রাজ্যোপাধি এবং পৈত্রিক অধিকার ব্যতীত নির্দিষ্ট কর ধার্য্যে আরও অনেকগুলি গ্রাম খেলায়ে পান। বিশ্বনাথ সর্লবিষয়ে নিজের বিস্তীর্ণ সম্পত্তির উন্নতি করিয়া যান। তিনি বৃদ্ধ বয়সে পরগণা কাঁকদি ও অজ্ঞাত ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন।

তাঁহার পরেই উল্লেখযোগ্য রাজা কানীনাথ। ইনি অসাধারণ বীর ও সাতিশয় বুদ্ধিমান হইলেও চক্রান্তে পড়িয়া অতিশয় কষ্ট প্রাপ্ত হইলেন এবং পরিশেষে ঘাতকের হস্তে প্রাণদান করেন।

* দ্বিতীয়াংশবন্দী চরিত্র।

এই বিপত্তিকালে তাঁহার অনাথিনী পূর্ববর্তী স্ত্রী একজন ব্রাহ্মণ, একজন দাস ও একটী দাসী এবং দুইশত হুবর্ণমুদ্রা সহিত বাগোয়ান পরগণার জমিদার হরেকৃষ্ণ সমারারের বাটীতে যাইয়া লুকাইত থাকেন। শীঘ্রই তাঁহার একটী শূকুমার ভূমিষ্ঠ হইল। এই পুত্রের নাম রামচন্দ্র। হরেকৃষ্ণ সমাদ্বার নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং মৃত্যুকালে তিনি রামচন্দ্রকেই আপনার ক্ষুদ্র জমিদারি পাটকাবারি ও বাগোয়ান প্রভৃতির অধিকারী করিয়া যান। সুবিদ্বান রামচন্দ্রও পরমোপকারী মিত্র হরেকৃষ্ণ সমাদ্বারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ রাম সমাদ্বার নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার দুর্গাদাস, জগদীশ, হরিবল্লভ এবং সুবুদ্ধি নামে চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

এই দুর্গাদাসই পরে “মহারাজ ভবানন্দ মজুমদার” নামে অভিহিত হইলেন। দুর্গাদাস বাল্যকাল হইতেই চতুর ছিলেন এবং আপনার বুদ্ধিকৌশলে, হুগলীর কোজদারের সাহায্যে ঢাকার নবাবকে সন্তুষ্ট করিয়া হুগলীর কাননও পদ লাভ করেন। উত্তরকালে কিরূপে ভবানন্দ, বঙ্গের শেষ স্বাধীন বাঙ্গালী ভূপতি প্রতাপের খুল্লতাত পুত্র কচু রায় ও চাঁচরা রাজবংশের পুর্নপুরুষ মহাতাপ রাম রায়ের সাহায্যে প্রতাপের রাজধানী প্রবেশের গুপ্ত পথ দেখাইয়া, ও রসদাদি দিয়া তদানীন্তন দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মানসিংহকে নদীয়া সমুদ্রগড়ে সৈন্য পার হইবার সহায়তা করিয়া প্রতাপেরা এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, বঙ্গের ইতিহাস পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

মানসিংহের সহায়তারূপ সংকার্যের জন্য তদানীন্তন সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৬ খ্রষ্টাব্দে কচু রায়কে বিগত শ্রী যশোহর রাজ্য, ও মহাতাপ রাম রায়কে সৈয়দপুর মাণিকপুর, আহামদপুর ও মুড়াগাছা এই চারি পরগণার জমিদারী স্বত্ব ও এক ফারমান দ্বারা ভবানন্দকে তাঁহার পিতামহ কাশীনাথের সুবিশিষ্ট জমিদারী ও নদীয়া, মহুপপুর, লেপা, জুলতানপুর, প্রভৃতি চতুর্দশ পরগণার স্বামীত্ব প্রদান করেন। মজুমদার এই সময়ে তাঁহার বিশিষ্ট জমিদারীর সুচারুরূপে শাসন করিবার জন্য বাগোয়ান ব্যতীত মাটিয়ারীতে আর একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। কালের প্রভাবে এই মাটিয়ারী এখন বনাকীর্ণ। প্রাসাদের ষাংশাবশিষ্ট ইষ্টক গুলিও ই. বি. রেলের ধোয়ান পরিণত হইয়াছে। কেবলমাত্র একটি মন্দির স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়া অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সময়ে

১০২২ হিজরিতে (বা ১৬১৩ খ্রষ্টাব্দে) তিনি বাদসাহের অনুগ্রহে উখড়া, ভালুকা, এসবাইলপুর ও এসলামপুর প্রভৃতি আর কয়েকখানি পরগণা প্রাপ্ত হইলেন। এই বিস্তীর্ণ জমিদারী জাহাঙ্গীরার তদানীন্তন হুবদারের চক্ষুঃ শূল হইয়া উঠে। এবং তিনি কৌশলে মজুমদারকে বন্দী করেন। সে যাত্রা মজুমদার তাঁহার পৌত্র গোপীরমণ কর্তৃক মুক্ত হইলেন।

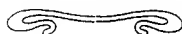
ভবানন্দের তিন পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গে.বিন্দ। এই তিন জনের মধ্যে মধ্যম গোপাল নিতান্ত পিতৃ অমুগত, বিচক্ষণ ও কৰ্ম্মদক্ষ বিধায় ভবানন্দ অপর পুত্রবর্ষের মামহার্য বন্দোবস্ত করিয়া গোপালকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী করিয়া যান। এ কারণে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ, পিতার সহিত কলহ করিয়া মাটিয়ারীর শ্রীনারায়ণ মদ্রিক নামক এক বিধ্বস্ত কার্যদক্ষ বহুভাষ্যবিৎ মন্ত্রী সমভিব্যাহারে দিল্লী গমন করেন। তথায় আপনার বুদ্ধিবলে ও উক্ত কৰ্ম্মচারীর লিপি কুশলতায় বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিয়া পরগণা উখড়া ও কুশদহের উপর চিরস্থায়ী দখলের ফারমান এবং বাদসাহ-দত্ত সম্মান প্রাপ্তে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি দারুণ বসন্ত রোগে-আক্রান্ত হইয়া নিঃসম্মান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি তাঁহার কনিষ্ঠ গোপাল প্রাপ্ত হইলেন। রাজা গোপালও বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিয়া শান্তিপুর, সাহাপুর, ভালুকাদি কয়েক পরগণার জমিদারি প্রাপ্ত হন। তিনি নরেন্দ্র, রামেশ্বর, ও রাঘব নামে তিন পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই তিন জনের মধ্যে কনিষ্ঠ রাঘব সর্বাপেক্ষা কৰ্ম্মদক্ষ বিধায় পিতৃ নিদেশানুযায়ী পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি অতি স্থূল ও ধার্মিক নরপতি বলিয়া খ্যাত। তিন তাঁহার পিতামহ স্থাপিত মাটিয়ারী প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া রেউই নামক স্থানে রাজধানী স্থাপনা করিয়া উহার চতুর্দিক পরিখা বেষ্টিত করেন। ঐ পরিখা সাধারণতঃ “সহর পানার গড়” নামে খ্যাত। সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ মানসে শান্তিপুর ও কুশনগরের মধ্যস্থলে বিংশতি সহস্র মুক্তাব্যয়ে এক সুদীর্ঘ দৌর্ধিকা খনন করাইয়া তদুপরিস্থিত গ্রামের দৌর্ধিকা নগর বা “দৌগনগর” নাম করণ করেন। এই দৌর্ধিকা দৈর্ঘ্যে ১৪৫২ হস্ত ও প্রস্থে ৪২০ হস্ত পরিমিত। দিন দিন নিকটস্থ প্রান্তর ধৌত হইয়া রাশি রাশি মৃত্তিকা ও আবর্জনা দি পড়িয়া ইহা ক্রমেই অপরিহার্য হইয়া পড়িতেছে। রাজা রাঘব এই জলাশয় খনন করিয়া ইহার পূর্বতটে এক



কলিয়ায় কৃতিবাসের দোলমঞ্চের ধংশাবশেষ।

১। দোলমঞ্চ।

২। ইন্দারা।



(চক)।

কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদের প্রথম প্রবেশদ্বার।

নদীয়া কাহিনী।

বৃহৎ ষাট ও তরুপরি এক রম্য অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং উহার অনতিদূরে দুইটি মন্দির নির্মাণ করিয়া রাঘবেশ্বর নামে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।* অট্টালিকা ও ষাট ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, মন্দির দুইটির মধ্যে একটি ভগ্ন ও আর একটি কোন রূপে বজায় আছে। রাজা রাঘব এই দীর্ঘ ও মন্দির অতি সমৃদ্ধির সহিত উৎসর্গ করেন। রাজা রাঘব “মর্দানা” নামক গ্রামে আর একটি আবাসবাটী নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং ইহার সম্মিহিত বিল, তড়াগাদিতে অচল ফুল্লারবৃন্দর শোভার আকৃষ্ট হইয়া ইহার শ্রীনগর নাম করণ করিয়াছিলেন। এই শ্রীনগর এখন বনাকীর্ণ; ম্যালেরিয়ার দারুণ প্রকোপে ইহা জনশূন্য এখানে প্রাণাদাঙ্গী ধ্বংসাবশেষ মাত্র বিদ্যমান আছে ও একটি মন্দির খায় লগাটে রাঘবের নাম বহন করিয়া কীৰ্ত্তিস্তম্ব স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে।

রাজা রাঘবের দুই পুত্র—রুদ্র ও প্রতাপ নারায়ণ। প্রতাপ পিতার অবাধ্য বিধায় রাঘব সম্রাটের অনুমতিক্রমে রুদ্রকে বিষয়ের অধিকাংশ অর্পণ করেন। ইনিও তাঁহার পিতার ছায় লোক হিতার্থে বহু জলাশয় খনন, রাশবস্ত্র প্রস্তুত প্রভৃতি অশেষ সংকার্যের অনুষ্ঠান করেন। দিল্লীর আলমগীর তাঁহার এই সকল সংকীর্তি গাথা শ্রবণ করিয়া ১৬৭৬ অব্দে (১০৮৭ হিজরতে) এক ফারমান দ্বারা গয়শপুর, হোসেনপুর, খাড়ি, জুড়ি প্রভৃতি কয়েকটি বিস্তীর্ণ পরগণার স্বামীত্ব প্রদান করেন এবং তাঁহার প্রাসাদের উপরিভাগে দিল্লীর প্রাসাদের অনুকরণে কাছরা নির্মাণের অধিকার দেন। ইনি নবদ্বীপে এক মন্দির নির্মাণ করিয়া একটি শিবলিঙ্গ স্থাপনা করেন এবং তাঁহার পিতার স্থাপিত রাজধানী রেউইয়ের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীত্যাগে কৃষ্ণনগর নামকরণ করেন।

* এই মন্দির গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটি খোদিত আছে :—

“শাক সোমনবেষু চন্দ্রগণিতে পুণ্যকরত্বা করে।

ধীর শ্রীযুত রাঘবোম্বিজমনি ভূমীভুজামগ্রণিঃ।

নির্মাণ করুহুর্গনির্গল জল প্রোদ্যোতিনী দীর্ঘিকাঃ

তন্তীরে কৃত রম্য বেঙ্গনি শিবং দেবং সমাহ্বায়ং ॥

অর্থ—১৫২১ শকে (১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে) ব্রাহ্মণ শিরোমণি রাজশ্রেষ্ঠ ধীরমতি রাজা রাঘব এই স্বচ্ছ জলসকুল উর্মীময় দীর্ঘিকা খনন করাইয়া ও তন্তীরে এই স্বরম্য মন্দির নির্মাণ পূর্ণক শিব স্থাপনা করিলেন।

ইহার সহিত জাহাঙ্গীরার তৎকালীক সুবেদারের প্রথমে তাদৃশ সম্ভাব ছিল না, পরে উভয়ের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হইলে রাজা রুদ্র রায় জাহাঙ্গীরা হইতে এক হুনিপুণ পূর্তকার্য্যক্রম স্থপতিকৈ আনয়ন করিয়া কৃষ্ণনগরে তাহার সহায়তায় নিজ কাছারি, কেল্লা, ও পূজার বাটী, নাচঘর, চক প্রভৃতি নির্মাণ করেন। ইহার নির্মিত নাচঘর এবং পিলখানা, চক ও নহবতখানা অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। বর্তমান মহারাজা সম্প্রতি ইহার সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুরের সুপ্রশস্ত রাজ বসুটিও রাজা রুদ্রের কীর্ত্তি বোষণা করিতেছে। কথিত আছে তাঁহার প্রাসাদ পাদচারিণী অঙ্কনা নদী তখন স্রোতশ্রুতী ছিল। এই নদীবিহারি কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া তিনি ইহার স্রোতঃবেগ রুদ্ধ করিয়াছিলেন।

রাজা রুদ্রের দুই রাণী—জেষ্ঠার গর্ভে রামচন্দ্র ও রামজীবন ও কনিষ্ঠার গর্ভে রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। রুদ্র তাঁহার কনিষ্ঠপুত্রকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনায় তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর জেষ্ঠ রামচন্দ্র ভগলার ফৌজদার ও ঢাকার নবাবের সহায়তায় পৈতৃক জমিদারী অধিকার করেন কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রামজীবন শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাঁহাকে অধিকার চ্যুত করেন কিন্তু তিনি শীঘ্রই আবার জেষ্ঠ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন। এই সময়ে রামচন্দ্রের মৃত্যু হইলে মধ্যম রাম জীবন আবার রাজ্য অধিকার করিয়া লন। কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণের কৌশলে তিনি ঢাকার নবাব কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। রাজা রুদ্র যেমন ক্রিষ্টমান ছিলেন তেমনই এতদঞ্চলে বিদ্যার উন্নতিসাধন মানসে অধ্যাপক মণ্ডলীকে বহু নিকর ভূমি দান করিয়া যান এবং নবদ্বীপের বিদেশী ছাত্রগণের ব্যয়ের নিমিত্ত বহু টাকার ভূসম্পত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দেন।

রাজা রামকৃষ্ণের সহিত তৎকালীক নবাব মুরসিদকুলী খাঁর সাতিশয়র অসম্ভাব দাঁড়াইয়াছিল তাই তিনি কৌশলে রামকৃষ্ণকে ঢাকার বৈকুণ্ঠে বন্দী করেন। কারাগারের দারুণ ক্লেশে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামজীবন কারারুদ্ধ হইয়া নদীয়া রাজ্য পুনরাধিকার করেন। তিনি কবি ছিলেন; তাঁহার শেষ জীবন নাটক রচনায় ও নাট্য জৌড়ায় অতিবাহিত হয়।

তাহার তিন রণী—প্রথমার গর্ভে রাজারাম ও কৃষ্ণরাম, দ্বিতীয়ার গর্ভে রঘুরাম ও তৃতীয়ার গর্ভে রামগোপাল জন্মগ্রহণ করেন। রঘুরাম সর্বাপেক্ষা কার্যদক্ষ ও প্রজারক্ষক ছিলেন এ কারণে রামজীবন মৃত্যুকালে তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী করিয়া যান। রঘুরাম হৃদয়বান ও বুদ্ধকূলী ছিলেন। তিনি বীর কাটির যুদ্ধে সুবেদর জাফর খাঁর সেনাপতি লহরৌমলকে বিশেষ সাহায্য করেন। রঘুরামের যৌবনের প্রারম্ভে ১৬৩২ শকে (১৭১০ খৃষ্টাব্দে) এক মহা তেজস্বী রূপবান কুমার জন্মগ্রহণ করেন। এই কুমারই নদীয়া রাজবংশের সুবিখ্যাত মহারাজা বাজপেয়ী কৃষ্ণচন্দ্র।

এই সময়ে রঘুরাম যথা নিয়মে রাজকর দিতে না পারায় সুবেদার জাফর খাঁ কর্তৃক তাহার নতুন রাজধানী মুরসিদাবাদে বন্দীকৃত হইলেন। তিনি বন্দী অবস্থাতেও শত শত দরিদ্রকে ধন দান করিতেন এবং পরিশেষে মুক্ত হইয়া ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথী নীরে তহুত্যাগ করেন।

রাজারঘুরামের মৃত্যুর পর তাহার উপযুক্ত পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক কালে পিতৃ গদীতে আরোহণ করেন। কথিত আছে রঘুরাম তাঁহাকে আপন উত্তরাধিকারী না করিয়া নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামগোপালকে তাহার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করিয়া যান। কিন্তু পিতার পরলোক হইলে কৌশলী কৃষ্ণচন্দ্র তাম্রকূট অমুরাগী দীর্ঘশ্রুতী পিতৃব্যকে কৌশলে পথিমধ্যে তাম্রকূট সেবনে নিরত রাখিয়া স্বয়ং যাইয়া তাম্রকূট নবাব দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং আপনার নামে জমিদারীর ফারমান লইয়া বাহিরে আসিলে রামগোপালের চৈতন্ত্যোদয় হয় তখন ব্যস্ত হইয়া নবাব সমীপে উপস্থিত হইলে নবাব তাঁহাকে অসার ও অপদার্থ জ্ঞানে বিদায় দেন।

কৃষ্ণচন্দ্র অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সর্বিশেষ বুৎপন্ন হন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাহার পদের উপযুক্ত নানা বিদ্যা ও নীতিশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কালীদাস সিদ্ধান্ত নামক এক পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র, কালোয়াং বিজ্ঞান খাঁর নিকট সঙ্গীত শাস্ত্র এবং মুজাফার হুসেনের নিকট অন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই মুজাফার হুসেন নবাব মুরসিদকুলী খাঁর ভাগিনেয়। কোন কারণে ক্রোধ করিয়া তিনি মুরসিদাবাদ ত্যাগ করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় আগমন

করেন। রাজা প্রচুর পরিমাণে মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিয়া পরম মাদরে তাঁহাকে নিকটে রাখেন।

রাজা স্বয়ং যেমন বিদ্বান ছিলেন তেমনি অতিশয় গুণের আদর করিতেন এ কারণে তাঁহার সভায় সর্বদা প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সমাগম হইত। তিনি সজ্জন সহবাসে ও বিজ্ঞ আশ্রমে প্রমোদে অবকাশকাল অতিবাহিত করিতেন। ইহার সভা প্রাচীন ভারতবর্ষাবিগতি বিক্রমাদিত্যের তুল্য ছিল। রাজা বিক্রমের সভায়, খপনক, ধ্বজরী, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, খটকর্ণ, কালীদাস, বরাহমিহির ও বরহচি প্রভৃতি নবরত্নের যেমন সমাবেশ ছিল ইহার সভাও তদ্রূপ নবদ্বীপের জ্ঞানবিৎ হরিরাম তর্কমিহ্রাজ্ঞ রামরুদ্র বিদ্যানিধি কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, বীরেশ্বর জ্ঞান পঞ্চানন, ষড়দর্শন বেত্তা শিবরাম বাচস্পতি, রম্যব্রত বিদ্যাবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার কান্ত বিদ্যালঙ্কার শঙ্কর তর্কবাগীশ, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শাস্ত্রপুরের রামমোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতগণ ও গুপ্তিপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও হালিসহরবাসী রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি সুপ্রবিন্দ এবং মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, গোপালভাঁড়, ও হস্তার্ণব প্রভৃতি অসাধারণ হস্ত রসিক ও উপস্থিত বক্তা প্রভৃতির অপূর্ণ জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল ছিল। ইহাদের মধ্যে বাণেশ্বর, ভারতচন্দ্র, গোপালভাঁড়, মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায় ও রামরুদ্র বিদ্যানিধি রাজার নিত্য সহচর ছিলেন।

বঙ্গ কবিকুলরবি ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভূঁইয়ট পরগণার পাণ্ডুরা বসন্তপুর গ্রামের সন্নিক্ত নরেন্দ্রপুরের বদান্ত জমিদার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের পুত্র। ইহাদের বংশের উপাধী মুখোপাধ্যায়। লক্ষ্মী স্ত্রী খাওয়্য রায় বা রাজা নামে অভিহিত হইতেন। ভারত বাল্যকাল হইতে অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। মাত্র চতুর্দশ বৎসর বয়সে ইনি সংক্ষিপ্তসার নামক অটল ব্যাকরণ গ্রন্থ আয়ত্ত করেন। মুসলমান ভাষাভাষা প্রাবৃত্ত তদানীন্তন বাঙ্গলায় সংস্কৃত অপেক্ষা ফারসীর তাদর অধিক ছিল সুতরাং ভারতের সংস্কৃতানুরাগ তাঁহার পিতা ও অন্ত আত্মীয়ের নিকট বিরাগের কারণ হইয়া উঠে সুতরাং বাধ্য হইয়া তিনি ফারসী অধ্যয়নে মন দেন এবং অল্পদিনেই উহাতে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের মাতা তাঁহার পিতার জমিদারী বর্দ্ধমান সরকারে

বাজেপ্ত করিয়া লওয়ায় তিনি গাজীপুর যাইয়া কষ্টে অধ্যয়ন করিতে থাকেন ; পরে ইনি তদানীন্তন চন্দ্রনগরের ফরাসী গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। ইন্দ্রনারায়ণই ১১৫৯ সালে তাঁহাকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত পরিচয় করিয়া দেন। ইনি অসাধারণ প্রতিভাবলে বঙ্গভাষার সর্বিশেষ উন্নতি করিয়া যান এবং কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমত্যানুসারে সুবিখ্যাত অনাদামঙ্গল ও বিদ্যানুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গুণগ্রাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইহাকে “রায় গুণাকর” এই সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করেন ও মূলাঘোড় গ্রামে বাৎসরিক ৬০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি ইজারা দিয়া তথায় তাঁহাকে বাস করাইয়াছিলেন। এই সময়ে বগাঁওর উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া বর্দ্ধমানাধিপতি তিলকচন্দ্রের মাতা সপুত্র মূলাঘোড়ের পূর্বদক্ষিণ কাউগাছি গ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং নবদ্বীপাধিপতির নিকট আপনার কর্মচারী কামদেব নাগের নামে মূলাঘোড় পত্তনী লয়েন। এই নাগ কর্তা হইয়া গ্রামবাসীদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। ভারত তাহাদের হৃদিশা দেখিয়া ও শয়ন নাগের দংশনে পীড়িত হইয়া অষ্ট শ্রোকাঙ্ক নাগাষ্টক নামে এক অপূর্ব কবিতা রচনা করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সমীপে প্রেরণ করেন। উহা পাঠে রাজা অনতিবিলম্বে নাগের বিষদস্তভঙ্গ করিয়া দেন। ভারত ১৬৩৪ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৬৮২ শকে বা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করেন।

গোপালভাঁড় —নরহুন্দর বংশীয় ছিলেন কেহ কেহ ইহাকে কায়স্থও বলিয়া থাকেন। তাঁহার নিবাস শান্তিপুরে ছিল। তাঁহার ছায় হস্ত রসিক আজ পর্যন্ত বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। গোপালের সরস বাকচাতুর্য্য বাঙ্গালায় কে না অধগত আছেন।

মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায়—নিবাস উলা। রসিক বিধায় রাজা তাঁহাকে বৈবাহিক সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেন। গোপালের ছায় ইহারও বহু সরস বাক্য এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যেমন বিদ্বানের আদর করিতেন তেমনি হুনিপুণ শিল্পী ও দক্ষকারিকরণের উৎসাহ দাতা ছিলেন। তাঁহার নিজেরও এ সকল বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা ছিল।

ঢাকার শাসনকর্তা রাজা রাজবল্লভ স্বীয় বালবিধবা কন্যার পুনর্নিবাহ দিবার পক্ষে বহুপণ্ডিতের মত শ্রাণ্ড হইয়া নদীয়া সমাজের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে

ব্যবস্থা সংগ্রহের নিমিত্ত কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করেন ও কতিপয় পণ্ডিতকে রাজসভায় প্রেরণ করান। হুশীকৌশলী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বহু বিষয়ে রাজবল্লভের সুখাপেক্ষী ছিলেন হুতরাং স্বয়ং প্রকাশ্যে পণ্ডিতগণকে মত দিতে অনুরোধ ও এমন কি শাসন বাক্য প্রয়োগ করিলেও গোপনে তাহাদের অমত প্রকাশে দাঢ্য দেখাইতে উপদেশ দিয়া রাজবল্লভকে হতাশ করিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে এতদঞ্চলে একটী কৌতুকাবহ প্রবাদ আছে। কথিত আছে যে রাজবল্লভের প্রেরিত পণ্ডিত-গণের নিকট রাজবাটী হইতে যে সিধা প্রেরিত হয় উহার সহিত একটী মহিষ শাবক প্রেরণ করা হয়। পণ্ডিতগণ উক্ত মহিষশাবক দর্শনে কুণিত হইয়া ইহার কারণ জানিতে চাহিলে রাজকর্মচারীরা নিবেদন করেন যে যখন কোন কোন শাস্ত্রে মহিষমাংস ভক্ষণের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তখন উহা গ্রহণে কি আপত্তা থাকিতে পারে? রাজবল্লভের পণ্ডিতগণ উত্তর করেন, “হঁ। যদিও কোন কোন শাস্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু এদেশে মহিষ মাংস ভোজনের ব্যবহার নাই হুতরাং ইহা অভক্ষ্য।” হুশিক্ষিত রাজকর্মচারীগণ তখন সাক্ষাৎ বলিলেন “যখন শাস্ত্রসম্মত স্বীকার করিয়াও ব্যবহার বিরুদ্ধ বলিয়া আপনারা ইহা ভোজনে আপত্তি করিতেছেন তখন চির অপ্রচলিত দেশাচার বিরুদ্ধ বিববা বিবাহে আপনারা কিরূপে মত প্রকাশ করিলেন।”

কথিত আছে রাজবল্লভের পণ্ডিতগণ এই বাক্যে নিরুত্তর হইয়া ও পরে রাজ সভায় পণ্ডিতগণের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া নিজেদের মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জীবনের অধিকাংশ সময় কৃষ্ণনগরে অতিবাহিত করিলেও তিনি শিবনিবাস, কৃষ্ণপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, চূর্ণিতীরবর্তী হরদাম, ও আনন্দদাম, নবদ্বীপের নিকটে গঙ্গাবাস ও যাত্রাপুর প্রভৃতি বহুতর স্থান স্থাপনা পূর্বক প্রাসাদাদি নির্মাণ করিয়া অনেক সময়ে সপরিবারে বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন মুরসিদাবাদের নবাবের উৎপীড়ন হইতে আশ্রয়লাভ করিতে তিনি এইরূপে নানা স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন। বাহা হউক তিনি স্বীয় পিতা ও পিতৃ মহের ও আপনার বাকী পড়া রাজস্ব ও নজরানার দায়ে নবাব আলিবর্দী কর্তৃক একবার মুরসিদাবাদে বন্দী হইয়াছিলেন।

শিবনিবাসের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র



নদীয়া কাহিনী ।

ৰাজেশ্বৰ ।

শিবনিবাসৰ মন্দিৰত্ৰয় ।

শ্ৰীৰাম চন্দ্ৰ ।

ৰাজেশ্বৰ ।

নসরত খাঁ নামক একজন দুর্দান্ত দস্যুকে তাঁহার রাজ্য মধ্যে উৎপাত করিতে দেখিয়া চুর্ণীনদীর পূর্বকূলে এক গভীর অরণ্যে তাহার অভ্যুত্থান পাইয়া তাহাকে শাসনার্থ উপযুক্ত সজ্জায় আসিয়া তথায় শিবির সম্মিলন করেন। দস্যু দমন করিয়া তিনি একরাত্রি তথায় বাস করেন। পরদিন প্রত্যঃকালে তিনি যখন নদীকূলে বসিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন তখন একটা রোহিংমৎস্য জল হইতে লাফাইয়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হয়। আবুলিয়া নিবাসী কৃপারাম রায় নামক জনৈক রাজজ্ঞাতি এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ এস্থান অতি রমণীয়, রাজভোগ্য সামগ্রী আপনা হইতে আসিয়া আপনার নজররূপে উপস্থিত হইল। এখানে বাস করিলে আপনি সুখী হইবেন।” রাজাও তখন বর্ণীর উৎপাত হইতে আত্মরক্ষার্থ এইরূপ একটা নিরাপদ স্থান অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এক্ষণে এই স্থানটী সকলে মনোনীত করিলে তিনি উক্ত স্থানটীকে কঙ্কণাকারে নদীবেষ্টিত করিয়া স্বয়ং দেওয়ান রঘুনন্দনের মতামতানুযায়ী এক হৃদয় পুরী নির্মাণ করিলেন ও আপনার বাসভবন ও দুইটা মূরুহং শিবমন্দির স্থাপনা করিয়া দুইটা দুর্জয় শিব-লিঙ্গ ও অপর মন্দিরে রামসীতা স্থাপনা করিলেন এবং শিবের নামে গ্রামের শিবনিবাস নামকরণ করিলেন। * এই কঙ্কণাবেষ্টিত শিবনিবাসেই তিনি মহা সমারোহে অগ্নিহোত্র বাজপেয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। একপ সমুদ্র যজ্ঞ কলিতে এই শেষ। এতদুপলক্ষে কান্দী, কাকী প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাকে অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী আখ্যা প্রদান করেন। কালের ক্রোড়ায় এই শিবনিবাস এখন বনাকীর্ণ হইয়া ব্যাভ্র শার্দূলদিগ নিবাসরূপে পরিণত হইয়াছে। প্রাসাদ ধ্বংস প্রাপ্ত এবং মন্দির কয়েকটাও সংস্কারাভাবে দিন দিন হতশ্রী হইতেছে † এখনও পর্যালোচনা করিলে এই মন্দির ত্রয়ের ভিত্তি গাত্রে নিম্ন লিখিত শ্লোক কয়টি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে,—

* এই শিবনিবাস তৎকালে কান্দীতলা স্থান বলিয়া খ্যাত হয় বলা প্রবাদ বাক্য—

“শিবনিবাসী তলা কান্দী যন্ত নদী কঙ্কণ। উপরে বাজে দেব ঘড়ি নীচে বাজে ঠাঁনা।

† এই মন্দির ৩টা ও রাজপ্রাসাদাদি মহারাজা শিবচন্দ্রের পর হইতেই তীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার লর্ড বিসপ হেবার সাহেব জলক্রমণ করিতে বাহির হইয়া যখন এই স্থানে উদীয়িত হইয়াছিলেন তখনও তিনি এই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন

প্রথম শিব মন্দিরে (১৬৭৬ শক বা ১৭১৪ খ্রষ্টাব্দে স্থাপিত,—

যো জাতঃ খলু ভারতে সুরতরুজৈষ্ঠাদিনৌ শাংশকে

সেনানীমুখ বাজিরাজ বিলসং সংখ্যাবতী দম্পুরে ।

কৃষ্ণা মন্দিরমিস্রচুদ্রিশিখরং ভূপাল চূড়ামণিঃ

পোত্র শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র নৃপতিঃ শঙ্কর সমস্থাপয়ং ॥

দ্বিতীয় শিবমন্দিরে (১৬৮৪ শক বা ১৭৬২ খ্রষ্টাব্দে স্থাপিত) ;—

যঃ সাক্ষ্যং কৃতশৈব মূর্তি বহুধে শাংসকে সম্ভবাং সংখ্যাতঃ

ক্ৰীতদেব রাজপদভাক্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রভুঃ ।

তস্ত্র ক্ষৌণিপতে দ্বিতীয় মহিষী মূর্তেব লক্ষ্মীদয়ম

প্রাসাদ প্রবরে প্রাসাদ সমুখং শঙ্কর সমস্থাপয়ং ॥

শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে (১৬৮৮ শক বা ১৭৬২ খ্রষ্টাব্দে স্থাপিত),—

দেব শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রঃ ক্রীতিপতি তিলকো ব্রহ্ম রাজর্ষি বংশে

যোঃসৌ ভূকলশাখী ক্রুতি বহুবহুধে শাংশকে তুল্য সংখ্যে ।

প্রশস্তাস্ত্রমহিষ্যঃ পরমকৃতিকৃতে জানকী লক্ষণাভ্যাং

প্রাসাদে প্রাতরাসীং ত্রিজগদধিপতি শ্রীযুত রামচন্দ্রঃ ॥

এবং এই স্থান সম্বন্ধে Hebbers Journal vol I. P. 120 তে বহু কোতুহলোদ্দীপক কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন ; তান প্রাসাদ ও মন্দির এর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

The first temple which we visited was evidently the most modern, being, as the officiating Brahmin told us, only fifty seven years old. In England we should have thought it at least 200; but in this climate a building soon assumes, without constant care, all the venerable tokens of antiquity. It was very clean, however, and of good architecture ; a square tower, surmounted by a pyramidal roof, with a high cloister of pointed arches surrounding it externally to within ten feet of the springing of the vault. The cloister was also vaulted, so that, as the Brahmin made me observe, with visible pride the whole roof was "pucka" or brick, and "belathee" or foreign. A very handsome Gothic arch, with an arabesque border opened on the south side, and shewed within the statue of Rama, seated on a lotus, with a gilt but tarnished umbrella, over his head, and his wife the earth born Seeta, beside him. A sort of dessert of rice, ghee, fruit, sugar candy, &c. was ranged before them on what had the appearance of silver dishes ;

এই শিবনিবাসের রাজবংশের যখন এইরূপ হৃদশা হইয়া আসিতেছিল, তখন এখানে তিলিকুলে রাণাঘাটের কৃষ্ণপাহার ভাগিনের স্বরূপ সরকার চৌধুরী মহাশয় (যাঁহার নাম হইতে নদীয়ার স্বরূপগঞ্জের নাম হইয়াছে) ব্যবসায় উন্নতি করিয়া বিপুল জমিদারী ক্রয় করিতেছিলেন। শিবনিবাস স্বরূপের পুত্র বৃন্দাবন সরকার

From hence we went to two of the other temples which were both octagonal, with domes not unlike those of glass houses. They were both dedicated to Siva, (who Abdullah, according to his Mussnlman notions, said was the same with Asan, and contained nothing but the symbol of the deity, of black marble.)

The villagers asked if I would see the Raja's palace. On my assent-ing, they led to a really noble Gothic gateway, overgrown with beautiful broad leaved ivy but in good preservation and decidedly handsomer though in pretty much the same style, with the "Holy Gate" of the Kremlin in Moscow. Within this, which had apparently been the entrance into the city, extended a broken but still stately avenue of tall trees, and on either side a wilderness of ruined buildings, over grown with trees and brushwood, which reminded Stowe of the baths of Caracalla, and me of the upper part of the city of Caffa. I asked who had destroyed the place, and was told Serajh Dowla, an answer which (as it was evidently a Hindu ruin) fortunately suggested to me the name of the Raja Kissen Chand. On asking whether this had been his residence, one of the peasants answered in the affirmative, adding that the Raja's grand children yet lived hard by. By this I supposed he meant some where in the neighbourhood, since nothing here promised shelter to any beings but wild beasts.

* * * * *

Our guide meantime turned short to the right, and led us into what were evidently the ruins of a very extensive palace. Some parts of it reminded me of Conway castle, and others of Bolton Abbey. It had towers like the former, though of less stately height, and had also long and striking cloisters of Gothic arches, but all overgrown with ivy and jungle, roofless and desolate. Here, however, in a court, whose gate way had still its old folding doors on their hinges and the two boys whom we had seen on the beach came forward to meet us, were announced to us as the great grand sons of Raja Kissen Chund, and invited us very courteously in Persian, to enter their fathers dwelling."

চৌধুরীর সময়ে আবার জমজমাট হইয়া উঠিছিল; বৃন্দাবন অতিশয় ক্রিয়া-
বান চতুর ও প্রাজ্ঞ ছিলেন, তিনি নীল বিদ্রোহের সময়ে প্রজার পক্ষ গ্রহণ
করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেই তাঁহার বংশের দৌভাগ্য অন্তর্নিহিত
হইয়াছে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের শেষ জীবনে বাঙ্গালার রাজনৈতিক গগন ঘোর তমসাক্ত
হয়; ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীক্ষেত্রে মুসলমানের দৌভাগ্যরবি অন্তর্নিহিত
হইলে মহামাণ্ড ইংরাজগণ এদেশ অধিকার করেন। ভারতে কল্যাণকর বৃটিশ-
রাজ্য স্থাপনে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরামর্শ ও সহায়তা কম কার্য্যকারী হয় নাই।
লর্ড ক্লাইব বাহাদুর তাঁহার কৃত উপকারের স্মৃতি নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহাকে রাজেন্দ্র
বাহাদুর উপাধি ও পলাশীক্ষেত্রে ব্যবহৃত স্বাদশটী কামান উপহার প্রদান করেন
অদ্যাপি ঐ গুলি রাজ বাটীর প্রাঙ্গনে রক্ষিত আছে। রাজার দুই রাজি ছিলেন।
প্রথমার সহিত পিতা বর্তমানে বিবাহ হয় এবং স্বয়ং রাজা হইয়া রূপলাবণ্যে
মোহিত হইয়া দ্বিতীয়ার পাণি গ্রহণ করেন। এই ছোট রাণীর বিবাহ সম্বন্ধে
একটি মনোরম আখ্যানিকা প্রচলিত আছে। রাণাবাটের এক মাইল উত্তর
পূর্বে নৌকাডা়ী বলিয়া একখানি বহু প্রাচীন গ্রাম বিদ্যমান আছে। উহার
দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া “বাচকোর খাল” নামে একটি চূর্ণী নদীর শাখা আছে। পূর্বে
ঐ খাল একটি বেগবতী নদী ছিল। একদা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঐ নদী দিয়া তাঁহার
তিনপয়হু প্রাসাদে গমনকালে নৌকাডা়ীর ঘাটে এক অনিন্দ সুল্লরী অনুচ্চা
ব্রাহ্মণ কন্যাকে জল ক্রীড়া করিতে দেখিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ঐ
কন্যার পিতাকে আহ্বান করিয়া কন্যাটীর পাণিগ্রার্থী হইলে ব্রাহ্মণ উত্তর
করিলেন, “আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু
কিশোরকুণীকে কন্যাদান করিলে সমাজে আমাকে হীন হইতে হইবে।” বাহা
হউক পরিশেষে ব্রাহ্মণের পে আপত্তি রহিল না। রাজা সেই কন্যাকে বিবাহ
করিয়া স্বীয় প্রাসাদে লইয়া বাইলেন এবং নিশিথে বাসরগৃহে নব প্রণয়গীকে
রজত পর্য্যাকে শয়ন করাইয়া রাজা করিলেন “দেখ, আমাকে বিবাহ করিয়া তুমি
রূপার খাটে শয়ন করিলে”। তেজস্বিনী রাজমহিষি উত্তর করিলেন “আর একটু
উত্তরে যাইলে, সোনার খাটে শয়ন করিতে পারিতাম।” ইহার তাৎপর্য্য এই
আমার পিতা পরম কুলীন হইয়া যখন কিশোরকুণী মহারাজাকে কন্যা দিলেন,
তখন আর আর একটু হীনতা স্বীকার করিয়া মুকন্দবাদে নবাবের সহিত বিবাহ

দিলে সুবর্ণপালকে শয়ন করিতে পাইতাম । মহারাজ জ্বর এই তেজগর্ভ স্পষ্ট উত্তর শ্রবণ করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ।

তাহার জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভে শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, হরচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র এবং তেজস্বিনী ছোট রাণীর গর্ভে শম্ভুচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন । এই পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শিবচন্দ্র রূপে গুণে ও চরিত্রবলে সাক্ষাৎ শিবতুল্যই ছিলেন এবং কনিষ্ঠ শম্ভুচন্দ্র মাতার জ্ঞায় তেজস্বী ছিলেন এবং তাহার স্বভাবও নিতান্ত উদ্ধত ছিল । যৎকালে তাহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবাব মৌরকাশিম কর্তৃক মুন্সেরে কারাবদ্ধ হইলেন সে সময়ে শম্ভুচন্দ্র তাহাদের নিধন নিশ্চয় জানিয়া পৈত্রিক জমিদারী ও ধনাগার অধিকার করেন এবং যখন মুন্সের কারাগারস্থ অপরাপর বন্দীগণের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয় তখন তিনি পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু ঘোষণা করিয়া দিয়া বিশেষ সমারোহের সহিত পিতৃগদৌতে অধিরূঢ় হইলেন । কিন্তু যখন সপুত্র মহারাজা সুস্থ শরীরে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং মুরসিদাবাদে থাকিয়া শম্ভুচন্দ্রের ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিলেন তখন শম্ভুচন্দ্র নিতান্ত লজ্জিত ও অস্থূল হইয়া কতরূপ ক্রটি স্বীকার করিয়া পিতা ও ভ্রাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এক লিপি প্রেরণ করিলেন । তদ্বতরে বৃদ্ধ মহারাজা তাহার মুস্বী লিখিত পত্রে সাক্ষরের নিম্নদেশে বহুন্তে এই কয়েক পংক্তি লিখিয়া দেন :—

“হস্তি শুণ্ডে লকড়ী দিলে ছাড়ান মকিল ।

ভূষার ভূমিতে বীজ কাড়ান মকিল ॥

মনঃশীলা ভাজিলে ষোড়া লাগান মকিল ।

জাঁহাদিদা থামিদেরে ভুলান মকিল ॥”

যাহা শুউক সে যাত্রা গোলযোগ মিটিয়া যাইলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দেখিলেন যে যখন তাহার জীবদশাতেই শম্ভুচন্দ্র একরূপ ব্যবহার করিতেছেন না জানি তাহার প্রাণান্তে তিনি ভ্রাতাদের সহিত আরও কি কুব্যবহার করিবেন । ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা ১৮৬ সালে তৎকালিক গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস বাহাদুরের নিকট আবেদন পূর্বক তাহার একজন সদস্ত ও একজন মুস্বীকে রাজবাটিতে লইয়া যাইয়া তাহাদের সমক্ষে বঙ্গভাষায় এক দানপত্র ও পারস্ত ভাষায় এক তফবীজ্ নামা লেখাইয়া তাহাতে ঐ সভাপদ সাহেবের ও মুস্বীর সাক্ষর ও মোহর করিয়া লইলেন । এতদ্বারা তাহার যাবতীয়

সম্পত্তি জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে দান করিয়া অত্যন্ত পুত্রগণের খরচাদির নিমিত্ত সালিয়ানা মোট ৪০০০০ টাকা মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া যান। এই দানপত্র লেখা হইলে শঙ্কুচন্দ্র স্বীয় স্বাভাবিক চতুরতার সাহায্যে হেট্টিংশের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দকে মহামান্য স্বীয় পক্ষভুক্ত করিয়া আপনায় নামে পূর্বেই বাহাদুরের কোম্পানির নিকট হইতে জমিদারীর সনন্দ বাহির করিতে চেষ্টা করেন। এই ব্যাপার অবগত হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দকে এই কয়েকটী কথা লিখিয়া পাঠান :—“পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য, তরঙ্গা গঙ্গাগোবিন্দ”। বাহা হউক মহারাজ সে যাত্রা তাঁহার স্বচতুর দেওয়ান কালাপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের দ্বারা মহামান্য হেট্টিংশের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণন পূর্বক শিবচন্দ্রের নামেই জমিদারীর সনন্দ ও মহারাজ্যধিরাজ উপাধীর এক ফারমান বাহির করিয়া লন। এই ঘটনার অব্যাবহিত পরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সত্ৰীক হুমায় শিবচন্দ্রকে মহাসমারোহে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। এইরূপ পুত্রের স্বন্ধে রাজ্যের দুর্ভেদ্য অর্পণ করিয়া বৃদ্ধ মহারাজা গঙ্গাবাসের নিমিত্ত নবদ্বীপের ক্রৌঞ্চিক পূর্বাশ্রিত অলকানন্দ তীরে এক সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া ঐ স্থানকে গঙ্গাবাস নাম দিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। এই গঙ্গাবাসের সমস্ত প্রাসাদ ও অট্টালিকা ভূমিসং হইয়াছে কেবল হরিহরের মন্দির অদ্যাপি বর্তমান আছে। * কালের স্রোতে খড়িয়া হইতে উদ্ভূত অলকানন্দের গর্ভ মৃত্যুকা পূর্ণ হইয়াছে। এই পবিত্র অলকানন্দা তীরে ১১৮৯ সনের ২২ শে আষাঢ় (১৭৮২ খৃষ্টাব্দে)

* এই ‘হরিহর’ মন্দির গাঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটি খোদিত আছে :—

“গঙ্গাবাসে বিধিক্ষত্যাভুগত স্নকৃত কৌণিপালঃ শকেশ্বিন্

ঐযুক্ত বাজপেয়ী ভূবি বিজিত মহারাজ রাজেন্দ্র দেবঃ ।

ভেষ্টুঃ আন্তিঃ সুরারি ত্রিপুরহরভিদাসজাতাঃ পামরানাং

অষ্টৈতং ব্রহ্মরূপং হরিহরমুম্মা স্থাপয়ন্নোনয়চ ।”

ভাবার্থ :—যে পামরসকল শিব ও বিষ্ণুকে পৃথক জ্ঞানে একের বিদ্বেষ করে সেই সকল নিরয়গামী ব্যক্তিগণের ভ্রান্তি বিনোদনার্থ, জীবন বিদিত বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক ১৬৯৮ শকে (১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে) গঙ্গাবাসে এই মন্দির ও তন্মধ্যে হরিহরের অষ্টৈত মূর্তি লম্বী ও উমার সহিত স্থাপিত হইল।

সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপী নানা বিপদ ধীরভাবে সহ করিয়া অধিহোতী বাজপেয়ী মহারাজা রাজেন্দ্র বাহাদুর রায় কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ ৭৩ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন ।

তাহার মৃত্যুর পর রাজা শিবচন্দ্র ইংরাজের নব প্রবর্তিত মেয়াদী বন্দোবস্তানুসারে জমিদারী অধিকার করেন । তাহার অস্ফাট ভ্রাতাগণ এইরূপে ভগ্ন মনোরথ হইয়া শিবনিবাস পরিত্যাগ পূর্বক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাইরা বাস করেন । মহারাজাধিরাজ শিবচন্দ্র অধিকাংশ সময় শিবনিবাসে এবং কখন কখন কৃষ্ণনগরেও বাস করিতে থাকেন । তিনি পিতা অপেক্ষাও শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং সোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তাহার সময়ে কেবল ষষ্ঠা সময়ে রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হওয়াতেই কুব্বেজপুর পরগণা নিলাম হইয়া যায় । কথিত আছে তিনি পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষণে আপনাকে অশক্ত বিবেচনা করিয়া আপনাকে পাপগ্রস্থ মনে করেন এবং ত্রিরাত্রী উপবাস করিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন । ১৭৮৮ খ্রষ্টাব্দে রোগাক্রান্ত হইয়া একদান পত্র দ্বারা স্বীয় সমস্ত সম্পত্তি তাহার একমাত্র পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে অর্পণ করিয়া ঐ অব্দে ৩০ বৎসর বয়সে লোকান্তর গমন করেন ।

পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র অতি বিলাসী ছিলেন । কৃষ্ণনগর হইতে দুই মাইল দক্ষিণ পূর্বে অঞ্জনা নামক নদীতীরে শ্রীবন নামে এক প্রমোদ ভবন নির্মাণ করিয়া আমোদ আফ্লাদে কালাতিপাত করিতে থাকেন । ইনি ১৮১৭ সন হইতে ১২০৬ সন পর্যন্ত ১০ বৎসর মেয়াদে নদীয়া জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লন । প্রথম বৎসরে ৮৪৬০২ টাকা ও পরবর্ষাবধি বৎসর বৎসর কিছু কিছু বৃদ্ধি হইয়া ১২০৬ অব্দ পর্যন্ত ৮৫১৫১২ টাকা জমা অবধারণে বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হন । ১৭৯৩ খ্রষ্টাব্দের ২২ শে মার্চ ঐ বন্দোবস্তই চিরস্থায়ীরূপে গণ্য হয় । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র মৃত্যুর পূর্বে উদানীন্তন ইংরাজ গবর্নর বাহাদুরের সদস্ত ও মুন্সীর সমক্ষে যে দানপত্র প্রস্তুত করেন তাহাতে তিনি স্বেচ্ছা পুত্রকে সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন এবং অস্ফাট পুত্রদের মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া যান ; রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সময় প্রথমে “দশমালা” পরে “চিরস্থায়ী” বন্দোবস্ত স্বষ্ট হইলে কৃষ্ণচন্দ্র যে সকল পুত্রের মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া যান তাহাদের মধ্যে ঈশানচন্দ্র পৈত্রিক জমিদারীর অংশ প্রাপ্ত হইবার জন্য উপযুক্ত ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ করেন । মকদ্দমার ঈশ্বরচন্দ্র জয়লাভ করিলেও মকদ্দমার

ধরচ কুলাইতে বহু অর্থ ব্যয় হওয়ার এবং ষাঠাকালে রাজস্ব দিতে না পারায় তাঁহার জামদারী সকল নিলামে বিক্রয় হইতে আরম্ভ করে। সুতরাং এই সময়ে নদীয়া রাজ বংশের সার্বভৌম আর্থিক অবনতি সংঘটিত হয় এবং পরক্রান্ত ইংরাজের শাসনে সর্ব বিষয়ে ক্ষমতারও হ্রাস হইয়া যায়।

মহারাজা ঈশ্বরচন্দ্র একপুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ৫৫ বৎসর বয়সে লোকান্তর হন। পুত্র গিরীশচন্দ্র ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিতৃরাজ্যের অধিকারী হন। নাবালক বিধায় তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হয়; পরে সার্বালক হইয়া তিনি পিতার ভ্রাতৃ অথবা ব্যয়ে ষণগ্রহ হন। তিনি কৃষ্ণনগরে দুইটি ছোট বড় মন্দির প্রস্তুত করাইয়া বড় মন্দিরে “আনন্দময়ী” নামে এক কালী প্রতিমা ও ছোট মন্দিরে আনন্দময় নামে এক শিব স্থাপনা করেন। তিনি নবদ্বীপের ভাগিরথী তীরস্থ ভূগর্ভে এক গোপাল মূর্তি অবস্থান করিতেছেন স্বপ্নে অবগত হইয়া সমারোহে ঐ বিগ্রহ উত্তোলন করিয়া নবদ্বীপনাথ নামে নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সময়ে গবর্ণমেন্টের রাজস্ব না দেওয়ার তাঁহার বিষয়ের অধিকাংশ বিক্রয় হইয়া যায়। হায়! কালের কি কুটিলগতি যে বিশাল রাজস্ব একদিন ৮৪ পরগণায় বিভক্ত ছিল এবং বিপুল বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল তাহা এখন মাত্র দেবঘর সম্পত্তির আয় একলক্ষ মুদ্রা ও ষণগ্রহ কতকগুলি জমিদারী মাত্রে পর্যাবসিত হয়। ইহাঁর সময়ে আক্ষয়গুপ্তের কুটিল ব্যবহারে নদীয়া রাজ্যের প্রধান সম্পত্তি উখুড়া পরগণা নিলাম হইয়, যাইলে তিনি দাক্ষণ মনকটে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

গিরীশ চন্দ্রের সভায় কৃষ্ণকান্ত ভাটুড়ি নামক একজন হস্ত রসিক কবি বিদ্যমান ছিলেন। রাজা তাঁহাকে আদর করিয়া রসসাগর বলিয়া ডাকিতেন। ১১৯৮ সালে নদীয়াস্তম্ভগত বাড়েবীক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণনগরে বিবাহ করিয়া ১২৫১ সালে ৫৩ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে জামাত ভবনে তত্ত্বাগ্রহণ করেন ইনি একজন অতি উচ্চদরের কবি ছিলেন। বিশেষতঃ উপস্থিত মতে পদ্য রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

গিরীশচন্দ্রের দুই স্ত্রী। কিন্তু একের গর্ভেও সন্তান হয় নাই। নদীয়ার প্রাচীন বংশ সাক্ষ্যাৎ শোণিত সম্বন্ধে নদীয়ার তত্ত্ব এই খানেই শেষ। ১২৫৮

সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে শারীরিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন বশতঃ ৫৫ বৎসর বয়সে রাজা গিরীশচন্দ্র মানবলীলা সংবরণ করেন । ইহাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তকপুত্র শ্রীশচন্দ্র ১৮৪২ খ্রঃ দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন । তিনি প্রথম হইতেই বিষয় বুদ্ধি করিবার জন্য যথেষ্ট শ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং বিষয়ের তার গ্রহণ করিয়া সুযোগ্য দেওয়ান স্বর্ণীয় কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের সুপরামর্শে অনেক বিষয়ে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ।

এই রাজা পাশ্চাত্য মতেই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এ কারণে নদীয়ার পণ্ডিতগণের মতের সহিত তাঁহার অনেক বিষয়ে মতানৈক্য ঘটিত । ইনি নিজ ব্যয়ে কৃষ্ণনগরে ইংরাজী বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপনের নিমিত্ত অনেক পরিমাণ ভূমি দান করিয়াছিলেন । সঙ্গীতে তাঁহার সাতিশর অনুরাগ দৃষ্ট হইত । তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া ৩৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন । রাজা শিবচন্দ্রের পর রাজা শ্রীশচন্দ্রই ইংরাজ গবর্ণমেন্টের নিকট মহারাজা উপাধীতে ভূষিত হন ।

ইহাঁর পুত্রের নাম সতীশচন্দ্র । ইনিও পিতার গ্রাম পাশ্চাত্য বিদ্যা পারদর্শী ছিলেন । বিষয়াধিকারী হইবার অব্যাবহিত পরেই ইনি গবর্ণমেন্ট হইতে পৈত্রিক উপাধী ও খেলায়েৎ প্রাপ্ত হন । ইনি ইহাঁর পিতামহ গিরীশচন্দ্রের গ্রাম আয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল ব্যয় করিতে ভাল বাসিতেন এবং অভিশয় ভ্রমণ প্রিয় ছিলেন । ইনি ১৮৭০ খ্রষ্টাব্দে মসৌরি পাহাড়ে ৩০ বৎসর বয়সে অপুত্রক অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করেন ।

মহারাজা লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার কনিষ্ঠা রাণী ভুবনেশ্বরী তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া ১৮৭১ খ্রষ্টাব্দে ৫ জানুয়ারি উহা কোর্ট অবওয়ার্ডে অর্পণ করেন এবং ১৮৭১ খ্রঃ ২৪ নবেম্বর বর্তমান মহারাজা ক্ষিতীশ চন্দ্রকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন । এই কুমার ১২৭৫ সনের ৩০ বৈশাখ জন্ম গ্রহণ করেন । ইনি রূপে শুণে প্রকৃতই নদীয়া সিংহাসনের সম্পূর্ণ উপযোগী । এমন সর্কদর্শী, সর্ক শাস্ত্র পারদর্শী, এবং সর্কগণালঙ্কৃত সুপুরুষ সাধারণতঃ দৃষ্টিপথে পতিত হয় না । ইহাঁর যত্নে নদীয়ার রাজশ্রী সর্ক বিষয়েই সমৃদ্ধ

হইয়াছে। * ইহার এক পুত্র তাঁহার নাম কুমার কৌণিশচন্দ্র রায় নদীয়ার রাজবংশ নদীয়ার ইতিহাসে প্রধান বর্ণনীয় ও উল্লেখযোগ্য সাম্রাজ্য। নদীয়ার বিদ্যা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব অতি বিশাল ও বিস্তারিত। নদীয়ার রাজবংশের ন্যায় ব্রাহ্মণের বা পৌরোহিত্যের বা মহত্ম্য প্রভৃতি অপরিমেয় দান অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। নদীয়ার যে ব্রাহ্মণের রাজদত্ত ব্রাহ্মণের নাই নদীয়ার তিনি ব্রাহ্মণের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েন না। নদীয়ার রাজবংশ ভারতে মুসলমান রাজত্ব ধ্বংসের ও ইংরাজ রাজত্বের স্বত্বপাতের মূল। এবং এই রাজবংশ লইয়াই নদীয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস গঠিত।

এই রাজ বংশ ব্যতীত কৃষ্ণনগরে রাজ দৌহিত্র ৩৩শ্রামাধব রায় মহাশয়ের বংশ, রাজ দেওয়ান ৩কার্ত্তিকেশ্বরচন্দ্র রায়ের বংশ, ৩রামতলু লাহিড়ীর বংশ, রায় বাহাদুর ৩যদুনাথ ও তদীয় ভ্রাতার বংশ, মল্লিক বংশ, বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ৩মনমোহন ঘোষের বংশ, ৩দুর্গাদাস চৌধুরীর বংশ, ৩চারিকানাথ দে বাহাদুরের বংশ, ৩রামগোপাল চেতলাঙ্গার বংশ প্রভৃতি বংশাবলী উল্লেখযোগ্য।

এখানকার দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রাজ প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন “চক”, স্বর্ণীয় মনমোহন ঘোষ মহাশয়ের প্রাসাদোপম অট্টালিকা, কৃষ্ণনগর কলেজ, আদালত গৃহাদি, দেবী আনন্দময়ীর মন্দির, লাইব্রেরি প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

* “This prince received his education from an Englishman Mr. George Deverex Oswell M. A. (Oxon) and is a thoroughly educated English scholar and a man of high scientific attainments. He is also well versed in the Sanskrit erudition and is a man of extraordinary intelligence and of strong common sense and is an original thinker. Being a learned man himself, he is a great lover and encourager of learning and spends large sums of money for the education and other helps of the poor and needy. His contribution to other good and charitable purposes i. e. Schools, hospitals, etc. are innumerable. He received his title “Moharaja Bahadur” from the Government on the 1st of January 1890.

He has made great improvements in the estate and vast improvements in the palace buildings. His greatness of mind, liberality and earnest desire to help the poor are truly commendable and are well worthy of a prince of this Raj.”

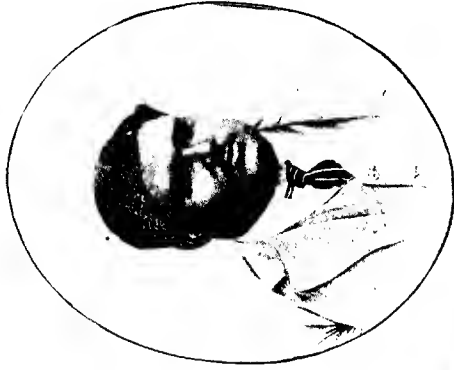
(पिता)



नदीश्राधिपति स्वर्गस्य किंतीय छत्त ।

नदीश्रा काहिनी ।

(पुत्र)



नवीन नदीश्राधिपति क्षेत्रीय छत्त ।

এখানকার উৎপন্ন উল্লেখ যোগ্য সামগ্রীর মধ্যে কৃষ্ণনগর ঘণ্টার স্বনামধন্যত “মাটির পুতুল” বাদ্য দ্রব্যের মধ্যে “সরপুরিয়া,” “সরভাজা,” প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ।

হরধাম ।

(নদীয়া-রাজবংশ—হরধাম শাখা)

বাজালার ইতিহাসে নদীয়া রাজবংশ সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে একটা প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ বলিয়া পরিচিত । এই মহামহিম বংশে যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ । মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে তাহার কয়েকটা রাজধানী স্থাপনা করিয়া গ্রামপত্তন করেন । হরধাম এইরূপে তাঁহারই স্থাপিত একটা গওগ্রাম । পূর্বে ইহা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী থাকিলেও এক্ষণে ইহার অবস্থা অতি শোচনীয় । রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সাক্ষাৎ শোণিত সম্পর্কীয় বংশাবলী একমাত্র এখানেই অতি হীন অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে ।

নদীয়া রাজবংশের ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দুই মহিষী ছিলেন । বড় রাণীর গর্ভে শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, হরচন্দ্র, মহেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র নামে পাঁচ পুত্র এবং অন্তর্পুরী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । প্রথমা রাজ্যের কন্যা অন্তর্পুরীর বংশীয় দিগের মধ্যে কেহ কেহ শিব-নিবাসে, কেহ কৃষ্ণনগরে বাস করিতেছেন । ছোট রাণীর গর্ভে কেবলমাত্র শম্ভুচন্দ্র নামে একপুত্র এবং বিশেষ্বরী, উমেশ্বরী, দুর্গেশ্বরী নামে তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই তিন জনের মধ্যে দুর্গেশ্বরীর সন্তানেরা হরধামে বাস করিতেছেন, সুপ্রসিদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের আদি স্থান ফুলিয়া গ্রাম নিবাসী কুলীন প্রধান শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সহিত রাজকুমারী দুর্গেশ্বরী দেবীর বিবাহ হয় । তাঁহার গর্ভে শশিভূষণ, চন্দ্রভূষণ ও বিধুভূষণ নামে শ্রীগোপালের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । মধ্যম পুত্র চন্দ্রভূষণের তারাবিলাস নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । তিনি স্বক্ষমতায় অনেক বিষয়সম্পত্তি করিয়াছিলেন । তারাবিলাসের বৈদ্যনাথ নামে এক পুত্র ও এক কন্যা ছিলেন । তারাবিলাসের পুত্র রায় মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রকন্যাগণসহ এক্ষণে হরধামে বাস করিতেছেন । উমেশ্বরী নিঃসন্তান এবং বিশেষ্বরীর বংশ ধ্বংস পাইয়াছে ।

রাজকুমার দিগের মধ্যে শিবচন্দ্র যেমন শাস্ত্রস্বভাব ও পিতৃভক্ত, শত্ৰুচন্দ্র তেমনই উদ্ধত ও পিতার অবাধ্য ছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পরলোক গমন করিলে শত্ৰুচন্দ্র প্রভৃতি পুত্রেরা পিতার অসদৃশ বটনে বিরক্ত হইয়া শিবনিবাস পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া বাস করেন। জলাঙ্গীর মোহানার কিঞ্চিৎ পূর্ব হইতে মাথাভাঙ্গা নদী, নদীয়া জেলার মধ্য দিয়া চূর্ণী নামে চূড়াডাঙ্গা, রামনগর, কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালি ও রাণাঘাট পূর্ব পারে রাখিয়া ভাগিরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। যে স্থানে উভয়ের মিলন হইয়াছে, সেই স্থানকে বর্তমানে “পেট কাটার মোহানা” কহে। পূর্বোক্ত রাণাঘাট মহকুমার দুইকোশ দক্ষিণ পূর্ব চূর্ণী নদীর উভয় পারে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দুইটী গ্রাম পত্তন করেন এইরূপ প্রবাদ। এ সম্বন্ধে দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—“যে অঞ্চল নদী যাত্রাপুরের নিকট দ্বিধারা হয় ও পরে উভয় ধরা মামজোয়ান গ্রামের নিকট সমবেত হইয়া দক্ষিণে যায়; ঐ নদী শেষে হরধামের উত্তর দিয়া গিয়া চাকদেবের সমীপবর্তী জগপুর ও শিবপুরের মধ্যস্থানে গঙ্গার সহিত মিলিত হয়। হরধাম হইতে শিবপুরের মধ্যস্থানে গঙ্গার সহিত মিলিত হয়। হরধাম হইতে শিবপুরের সমীপস্থ ভাগিরথী অধিক দূরবর্তী ছিল না। একারণ কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গান্নানের সুগমের জন্য হরধাম হইতে শিবপুর পর্য্যন্ত এক খাল কাটাইয়া দেন। তাহাতেই শিবপুরের নিকট ত্রিমোহানীর সৃষ্টি হয়। ইহাতে হরধামের রাজবাটীও চতুর্দিকে পরিধা বেষ্টিত একটি স্থরক্ষিত স্থান হইয়া উঠে। শিবনিবাস হইতে শিবপুর পর্য্যন্ত (বর্তমানে গৌরনগর পর্য্যন্ত) যে নদী আছে, তাহার “চূর্ণী” নামকৃষ্ণচন্দ্র দেন, কি এই নদীর যে অংশ পূর্বে ছিল, তাহারই এই নাম ছিল, তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় না। শিবপুরের অর্ধকোশ পূর্বে এই নদীর উভয় তটে দুইটী বাটা নির্মাণ করিয়া তাহার একটীর নাম ‘হরধাম’ ও অপরটীর নাম ‘আনন্দধাম’ রাখেন এবং এই দুই বাটীর নামানুসারে গ্রামের নামও ‘হরধাম’ ও ‘আনন্দধাম’ হয়। ইহার মধ্যে আনন্দধামের বাটা অতি সামান্য কিন্তু হরধামের বাটা যেমন বৃহৎ, তেমনই শোভনীয় ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে গঙ্গান্নান উপলক্ষে এই বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন।” স্বর্গীয় রায় মহাশয়ের মতানুসারে আনন্দধামের বাটা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নির্মিত। কিন্তু আনন্দধাম বাসী ঈশানচন্দ্রের বর্তমান বংশধর দিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়

যে, আনন্দধামের বাটী রাজকুমার ঈশানচন্দ্রের নির্মিত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর ছোটরাণী ও তদীয় পুত্র কুমার শম্ভুচন্দ্র হরধামের বাটীতে আসিয়া বাস করিলে, ঈশানচন্দ্রও আসিয়া হরধামের পশ্চিমদিকবর্তী চূর্ণীর অপর পার্শ্ব নিবিড় জঙ্গল কাটিয়া তথায় অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া বাস করেন এবং নিজ ক্ষমতায় সামান্য সম্পত্তি করিয়া পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন। এ কথা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, মহারাজের মৃত্যুর পর অপরাপর পুত্রদিগের মধ্যে শিব নিবাসে মহেশচন্দ্র বাস করিলেন এবং পুত্রহীনতা নিবন্ধন ভৈরবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে শিবচন্দ্রের নিকট রহিলেন। শিবচন্দ্রই সর্বশেষে, সুতরাং তিনিই পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইলেন। অত্যাশ্রয় পুত্রদিগের মাসোহারা বন্সাবস্ত হইল। এখনও পর্যন্ত আনন্দধামের রাজবংশীয়েরা কৃষ্ণনগর হইতে মাসোহারা পাইয়া থাকেন। ইহাদিগের মধ্যে শম্ভুচন্দ্র নিজক্ষমতায় বহুসংখ্যক নগদ টাকা ও অনেক টাকার ভূসম্পত্তি করিয়াছিলেন। কুমার শম্ভুচন্দ্র সাধারণতঃ ‘মধ্যম কুমার’ বা ‘মধ্যম ঠাকুর’ নামেই পরিচিত।

হরধামের বাটী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নির্মাণ করান এবং তাহার মৃত্যুর পর শম্ভুচন্দ্র আসিয়া এখানে বাস করেন। এই বাটী অতিশয় বৃহৎ ও পরমশুভ্র ছিল। এখনও তাহাব কতকাংশ এবং দেবালয়, মন্দির, পুজার বাটী, বড়িখানা প্রভৃতি কতক কতক অংশ বর্তমান, কিন্তু তাহাও সংস্কারাভাবে দিন দিন ধ্বংসস্থাপে পরিণত হইতেছে। রাজপ্রসাদের ধ্বংসাবশেষের উপর লতাগুল দেহবিস্তার করিতেছে। চতুস্তল পরিমিত প্রকাণ্ড প্রাসাদ, যাহা এক সময়ে রাজ পরিবারের আনন্দ কোলাহলে সর্বদা মুখরিত থাকিত, তাহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ জীর্ণ, পতনোদ্যত কয়েকটি গৃহ সৌভাগ্যের নীরব সাক্ষী স্বরূপ ধ্বংসাবশেষের ইষ্টক-স্তূপের মধ্যে দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে। হরধাম রাজবংশের সুখস্বর্ধ্য অন্ত-গমনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই অন্তর্মিত হইয়াছে।

প্রবাদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর যখন শম্ভুচন্দ্র হরধামে আসিয়া বাস করেন, সেই সময়ে হরধামে লোকসংখ্যা অতি অল্প ছিল। একারণ শম্ভুচন্দ্র হরধামের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে চেষ্টিত হন। তিনি নানা স্থান হইতে রাজ-কুটুম্বদিগকে আনাইয়া হরধামে বাস করান এবং রাজসংসারের আবশ্যকীয় কর্মচারিবর্গেরও প্রাসোচ্ছাদনের সুব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সময়ে রাজভ্যোতিষী ব্রাহ্মণর আচার্য্য

মহাশয়কে “মৃত্যুর গাছি” নামক স্থান হইতে (সন ১২০৭ সাল) আনাইয়া ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ নিকর ভূমি দান করাইয়া হরধামে বাস করান। জ্যোতিষী আচার্য্য মহাশয় যেমন জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনই অসাধারণ বলিষ্ঠ ও সাহসী বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। ইহার দর্পনারায়ণ, নিমটাদ ও প্রেমটাদ নামে তিন পুত্র ও কয়েকটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ দর্পনারায়ণ প্রায় পিতার অনুরূপ সুপণ্ডিত ছিলেন। অপর দুই ভ্রাতার মধ্যে মধ্যম নিমটাদ জ্যেষ্ঠের অনুরূপ সুপণ্ডিত না হইলেও জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল। বাঙ্গালা ১২৮৪ সালে সপ্ততিতমাব্দিক বর্ষ বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। একনে তাঁহার একমাত্র দৌহিত্র শ্রীরজনীকান্ত আচার্য্য হরধামে বাস করিতেছেন। ইনি নানা সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের লেখক এবং গ্রন্থকার।

রাজকুমার শত্ৰুচন্দ্রের ছয় পুত্র যথা—বিষ্ণুচন্দ্র, পৃথ্বীচন্দ্র, আনন্দচন্দ্র, বিজয়চন্দ্র, নীলচন্দ্র ও বৈকুণ্ঠচন্দ্র। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তন্মধ্যে বিষ্ণুচন্দ্র নিঃসন্তান, পৃথ্বীচন্দ্রের গহেশচন্দ্র নামে একপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তিনিও অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আনন্দচন্দ্রের মহামায়া নামে একমাত্র কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। রাজকুমারী মহামায়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সোমশেখর মুখোপাধ্যায় নামক ব্যক্তির সহিত বিবাহিতা হইয়া হরধামেই বাস করেন। মহামায়ার সন্তানেরা এখন হরধামেই বাস করিতেছেন। বিজয়চন্দ্রের অম্বৈতচন্দ্র, শ্রামচন্দ্র, দামোদরচন্দ্র, শ্রীধরচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র নামে পাঁচ পুত্র, এই পাঁচ জনের মধ্যে শ্রামচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র নিঃসন্তান। কেবল অম্বৈতচন্দ্রের দৌহিত্র বংশ এবং দামোদরচন্দ্র ও শ্রীধরচন্দ্রের পৌত্রেরা হরধামে বাস করিতেছেন। হরধামের রাজবাটীর সংলগ্ন মন্দিরে যে ‘চিৎরায়ী’ নামে কালিকামূর্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন, তাহা নীলচন্দ্রের পত্নী রাণী রাধামণি দেবীর প্রতিষ্ঠিত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মন্দিরে গোপাল প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁহার সবেকগণের শোচনীয় অবস্থা দর্শনেই বোধ হয় অন্তর্দীন করিয়াছেন। গ্রামাধিপত্যী চিৎরায়ী দেবীর নিত্য সেবার জন্য রাজস্ব ভূমি সম্পত্তি আছে, তাহার আয় হইতেই দেবসেবা চলিয়া থাকে। ভাগিরথী তীরবর্তী ‘মুখসাগর’ নামক স্থানে যে ‘উগ্রচণ্ডী’ নামী কালিকামূর্তি বিরাজিতা ছিলেন, তাহাও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত। মুখসাগর গঙ্গাগর্ভে নিপতিত হওয়ায়

বিগ্রহ মূর্তি হরধামে আনীত হইয়া চিগ্নরী দেবীর মন্দিরাভ্যন্তরেই রক্ষিত হইয়াছেন ।

মধ্যম ঠাকুর শম্ভুচন্দ্রের পঞ্চম পুত্র নীলচন্দ্রের, হরিশ্চন্দ্র নামে এক পুত্র জন্মে । হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান অবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হন, তাহার জননীই রাধামনি দেবী ‘চিগ্নরী’ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজসম্পত্তি দেবসেবায় অর্পণ করেন । বিজয়-চন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র অধৈতচন্দ্রের পুত্র গোপালচন্দ্র । ইহার শিবচন্দ্র নামে এক পুত্র ও দুইটি কন্যা হয় । পুত্রটী অল্প বয়সেই ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন । কন্যা দুইটি জীবিত আছে । গোপালচন্দ্র শ্রৌতাবস্থায় নগর দেহত্যাগ করেন । সুপ্রসিদ্ধ নাটককার ৮দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁহার “সুরধুনী কাব্যে” ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

“রাণাঘাট ছাড়ি আইলাম হরধাম,
যথায় বিরাজে একরাজা গুণগ্রাম,
রক্তগন্ধ ফোঁটা ভালে উজ্জ্বল শরীর,
তাঁর শিরে বহে কৃষ্ণচন্দ্রের রুধির ।”

বাস্তবিক যতদূর শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে গোপালচন্দ্রের রক্তচন্দ্র-চর্চিত প্রশস্ত ললাট সমাধিত সুবিশাল দেহ ও বীর সৌম্যমূর্তি দেখিলে দর্শকের মনে ভক্তির সঞ্চার হইত । এবং প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র হরধামেই মহারাজ কৃষ্ণ-চন্দ্রের প্রকৃত বংশধরগণ বিরাজ করিতেছেন, বাহাদের দেহে কৃষ্ণচন্দ্রের শোণিত প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া গौरব করিতে পারেন । নচেৎ জয়হরিচন্দ্রের * পুত্রের মৃত্যুতে আনন্দধামের † এবং গঙ্গেশচন্দ্র মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে শিব-নিবাসের ‡ রাজবংশ পুত্রাদিক্রমে লোপ পাইয়াছে, দোহিত্র বংশ চলিতেছে । কৃষ্ণনগরেও মহারাজ গিরীশচন্দ্রের পর হইতে পোষ্যপুত্র গৃহীত হইয়াছেন, কেবল একমাত্র হরধামেই প্রকৃত বংশধরগণ বর্তমান ।

* “জাল প্রতাপচাঁদ” লেখক ভ্রমক্রমে এঘে ইহাকে হরধামের রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।

† আনন্দধামের রাজবংশ—ঈশানচন্দ্র । তাঁহার তিন পুত্র—নরহরিচন্দ্র, ব্রীহরিচন্দ্র ও জয়-হরিচন্দ্র । নরহরি চন্দ্রের পুত্র—চন্দ্রধর । জয়হরি চন্দ্রের পুত্র—হরেন্দ্র চন্দ্র ও শিবেন্দ্র চন্দ্র । উভয়েই মৃত ।

‡ শিবনিবাসের রাজবংশ—মহেশচন্দ্র, তৎপুত্র উমেশচন্দ্র । উমেশচন্দ্রের পুত্র গঙ্গেশচন্দ্র ।

বিজয়চন্দ্রের তৃতীয় পুত্র দামোদরচন্দ্রের দুই পুত্র দেবেন্দ্রচন্দ্র ও নরেন্দ্রচন্দ্র । নরেন্দ্রচন্দ্র অল্প বয়সেই দেহ ত্যাগ করেন । দেবেন্দ্রচন্দ্র জীবনের অধিকাংশ সময় কাশীধামে অতিবাহিত করিয়া বাঙ্গালা ১০০২ সালে স্থপসাগরে জাহ্নবীতীরে নখর দেহ পরিত্যাগ পূর্বক বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিয়াছেন । এক্ষণে তাঁহার পুত্র বিশেষ্বরচন্দ্র বর্তমান, চতুর্থ শ্রীধরচন্দ্রের গিরিধরচন্দ্র ও গঙ্গাধরচন্দ্র নামে দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিলেন । তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ গিরিধরচন্দ্র ও কন্যাটী বহাদুর লোকান্তরিত হইয়াছিলেন । কনিষ্ঠ গঙ্গাধরচন্দ্র জীবনের শেষ বয়সে মস্তিষ্কের বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া ১০০৬ সালে গঙ্গালাভ করিয়াছেন এক্ষণে গিরিধর চন্দ্রের মধ্যম পুত্র মহেন্দ্রচন্দ্র ও গঙ্গাধরচন্দ্রের কেদারচন্দ্র ও জিতেন্দ্রচন্দ্র নামে দুই পুত্র হরধামে বিবাহ করিতেছেন ।

কালের ক্রৌড়ায় দোঁদীও প্রভাপ রাজবংশ এক্ষণে ধ্বংস প্রায় এবং নিভাস্ত হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে । গ্রামও ম্যালেরিয়াদি নানা কারণে ক্রমেই জনহীন হওয়ায় দিন দিন শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে । হরধামের বর্তমান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে হরধামের বাবুদিগের নাম উল্লেখ যোগ্য, ইঁহারা পশ্চিম দেশীয় আহিরী গোপ-সন্তান পূর্বে ইঁহাদের পূর্বপুরুষগণ রাজ সংসারে চাকরী করিতেন এবং তখন হইতেই ইঁহাদের প্রতি লক্ষ্যের কৃপাদৃষ্টি পতিত হয় । এই বংশের বর্তমান বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ রায় একজন বিনয়ী মহাশয় ব্যক্তি ।

শান্তিপুর ।

শান্তিপুর কতদিনের পুরাতন গ্রাম নিশ্চিতরূপে বলানা যাইলেও ইঁহা যে ন্যূনাবিক আটশত বৎসর হইতে অসিক্রিান্ত করিয়াছে তাহার বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

বর্তমান কালের কিঙ্কর্য্যন ৫৫০ পাঁচশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে শান্তিপুর জনপূর্ণ একটী গণনীয় স্থান ছিল । এই কালে শ্রীচৈতন্যের অগ্রতম প্রধান পার্শদ লনামাধ্যাত শ্রীমধৈভের প্রণিতামহ নরসিংহ মিত্র এই শান্তিপুর গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্মাণ করেন । বধা লঘুভারতে :—

“শুভ সপ্ত বেদ বেদ মিতেকে বিগতে কলেঃ ।

দোগাঘাতে কুলীনানাং বিবাদোহ ভবনহানি ।

তৎ প্রাক্ শান্তিপুরে স্বাসীন্নরসিংহ বিজ্ঞোত্তমঃ ।”



শান্তিপুরের শ্রামচাঁদেব শ্রীমন্দির ।

নদীয়া কাহিনী ।

অর্থাৎ যে সময়ে দোষাবাতে কুলীনদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার কিছুকাল পূর্বে বিজ্ঞাতম নরসিংহ শাস্তিপুরে আগমন করেন । ১২৯১ শকের কিছু পূর্বে । এই নরসিংহ কে ছিলেন তাহা লঘু ভাৱে এইরূপ লিখিত আছে যথা—

“নরসিংহোপি গোড়ন্ত কার্যকারক পালিতঃ ।”

নরসিংহ গোড় বাদসাহের কার্যকারক ছিলেন । টোগলকু বংশীয় গিরানুদ্দিনের পৌত্র তৎকালে গোড়ের বাদসাহ ছিলেন । ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি নিহত হইলেন, সুতরাং শাস্তিপুরের অন্তিম সার্কি পঞ্চশত বৎসরেরও উপর স্বীকার করিতে হয় । আর এক কথা, মহম্মদ বক্তিয়ার ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ অধিকার করেন । প্রবাদ আছে তিনি এই শাস্তিপুর বয়ড়ার মধ্যবর্তী স্থানে গঙ্গা পার হইয়া নবদ্বীপ-ভিমুখে গমন করেন । এই ষাট আজিও “বক্তারের ষাট” নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, সুতরাং তখনও অর্থাৎ কিকিঞ্চিক সাগ শত বৎসর পূর্বেও এই স্থান যে বর্তমান ছিল তাহা প্রমাণিত হইতেছে ।

ভদ্রা যায় বহুপূর্বে এই সকল স্থান গঙ্গার গর্ভবর্তী ছিল ; এখনও উহাদের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে গঙ্গাগর্ভ মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়া শাস্তিপুর, কুলিয়া, বেলগড়ে প্রভৃতি স্থান, অর্থাৎ উলা ও অম্বিকা কালনার মধ্যবর্তী স্থান সমুদয় উচ্চ হইয়াছে ; এখনও বস্তা বা বর্ষাদি কারণে গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইলেই এই সকল স্থানের অধিকাংশই জলমগ্ন হয়, বিশেষতঃ রূণাঘাট হইতে শাস্তিপুর গমনাগমনের বে “ফেরীফাও রোড” নামক রাস্তা আছে তাহার উপর দিয়া বাইবার সময় উভয় পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিলে স্বতঃই উপলব্ধি হইবে যে এই উভয় পার্শ্বস্থ স্থান সমুদয় একটী প্রাচীন বিশাল নদীর খাত বাতীত আর কিছুই নহে । প্রবল বন্যার সময়ে আজিও এই খাতে গঙ্গার প্রবাহ দেখা যায় ।

শাস্তিপুর গ্রাম যে বহুপূর্বকালে জলমগ্ন ভূখণ্ড ছিল তাহার বহু চিহ্ন ও নিদর্শন সময় সময় পাওয়া যায় । কুশাদি ধননকালে এখানে একবিংশতি হস্ত পরিমিত মৃত্তিকার নিয়মিত হইতে নৌকাদির ভগ্নাবশেষ বা হাইল এবং শালকাঠ ইত্যাদি নদী বকের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে । রামনগর পাড়ার একটী কূপের তলদেশের এক পার্শ্বে একখানি চৌকর কাঠ অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে ।

বহু পূর্বে শান্তিপুরের উত্তর, পূর্ব, ও দক্ষিণ এই তিনদিকে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। * উত্তরে বাবলা গ্রামের প্রান্তে ও পূর্বে খোড়ালিয়া হইতে বাবলা পর্যন্ত গঙ্গার খাত এখনও বর্তমান। বর্ষাকালে এই খাত গঙ্গার জলে পূর্ণ হয়। দক্ষিণে গঙ্গা এখনও বাহিত, তবে ইহার গতি ও অবস্থান বহু পরিবর্তিত হইয়াছে। জেমস্ রেনেল কর্তৃক শতাধিক বর্ষপূর্বে অঙ্কিত নদীয়ার মানচিত্রে গঙ্গা হইতে শান্তিপুৰ বহুদূরে দেখান আছে; মধ্যে কিছুকাল গঙ্গা গ্রামের অব্যবহিত দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া বাহিতা ছিল, এক্ষণে পুনরায় দূরে সরিয়া যাইতেছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে বর্তমান শান্তিপুরের হুইক্রোশ উত্তরে “নিব্বরের” সন্নিকটবর্তী বাবলা নামকস্থানে পূর্বে শান্ত নামে একজন বেদাচার্য্য বাস করিতেন। তাঁহার চলিত নাম শান্তমুনি; এই শান্তমুনির নাম হইতেই শান্তিপুৰ নামের উৎপত্তি; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে শান্তমুনি হইতে শান্তিপুৰ নামের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না, কেননা “শান্তিপুৰ” নামটী শান্তমুনির পুত্র হইতেও প্রচলিত দেখা যায়। শান্তমুনি শ্রীঅষ্টৈতচার্য্যের সমসাময়িক। শ্রীঅষ্টৈত তাঁহার নিকট যে সময়ে বেদান্ত ও শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তখন অষ্টৈতের বয়স অনধিক ষাট বৎসর বলিয়া কথিত, সুতরাং শান্তমুনির বয়স পঞ্চাশ বা ষাট বৎসর ভিন্ন আর কতই হইতে পারে? ষাট বৎসর হইলেও তিনি শ্রীঅষ্টৈত অপেক্ষা আটচালিশ বৎসরের বড়। শ্রীঅষ্টৈত তাঁহার পিতার আশীবৎসর বয়ঃক্রম কালে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহার পিতা শান্তমুনির জন্মগ্রহণের বত্রিশ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীঅষ্টৈতের প্রপিতামহ গৌড় বাহাদুরের কার্য্যোপলক্ষে “শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন, তিনি শান্তমুনির জন্মগ্রহণ করিবার কতবৎসর পূর্কের লোক হইবেন? প্রায় একশত বৎসরের; তখনও শান্তিপুৰ গননীয় স্থান, এবং “শান্তিপুৰ” নাম দূর দূরান্তর বিস্তৃত।

আবার কেহ বলেন যে পূর্বে এই স্থানে হিন্দুরা তাহাদের মৃতকল্প পিতামাতাকে সমাজানে তীর্থস্থ করিয়া লইয়া আসিত। বাহারা এখানে আসিয়া রোগমুক্ত হইত তাহারা পুনরায় সংসারে বাইলে পাছে সংসারে কোনরূপ অমঙ্গল প্রবেশ করে এই ভয়ে তাহারা আত্মীয় বন্ধনের মায়া কাটাইয়া, সংসারের সুখ দুঃখ হইতে নিরপেক্ষভাবে এখানে জীবনের অবশিষ্ট কাল শান্তিতে অতিবাহিত করিতেন

* “শান্তিপুরে প্রববরী বহে তিন দিকে।” অষ্টৈতবঙ্গল।

বলিয়া, এবং এইরূপ সংসারবিরাগী, শান্তিঅভিলাষী লোক লইয়া গ্রাম গঠিত হওয়ার এই স্থান শান্তিপুর নামে খ্যাত হয় ।

শান্তিপুরের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ মত ভেদ হইলেও ইহা সামান্ত পন্নী হইতে এক্ষণে নদীয়ার মধ্যে জনসংখ্যাও বিস্তৃতির পরিমাণে সর্বপ্রধান নগর হইয়া উঠিয়াছে । ইহা এক্ষণে ৩৮ মৌজায় বিভক্ত । এক এক মৌজার মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন পন্নী সন্নিবিষ্ট । পন্নীর সংখ্যা অনেক ; গোস্বামী পন্নীই তিনটী (বড় গোস্বামী পন্নী, মদনগোপাল গোস্বামী পন্নী ; ও হাটখোলা গোস্বামী পন্নী) । রামনগর প্রভৃতি কয়েকটী পন্নী অতি বিস্তৃত । বিস্তৃত বেড় পন্নীতে কেবল মুসলমানের বাস । তিলি পন্নীর মধ্যে অধিকাংশ লোকই তিলি । বেজ পন্নী নামক যে পন্নী আছে তথায় কতকগুলি বৈদ্যের বসতি । কাণ্ডপ পন্নীর মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণের বাস । দত্ত পন্নীর মধ্যে অনেক গুলি সমৃদ্ধিসম্পন্ন লোক বাস করেন । শান্তিপুরের কোন কোন পন্নীর নাম বড় অদ্বৈত রকমের, যেমন ডাবরে বা ডাবরিয়া পাড়া । এই পাড়াটী ক্ষুদ্র । পূর্বকালে এখানে ডাবরে উপাধি খ্যাত কতকগুলি অবস্থাপন্ন তত্ত্ববায়ের বসতি ছিল । তাহারা অত্যন্ত শক্তিশালী ও দুর্জয় ছিল । এক্ষণে এই পন্নীতে উক্ত উপাধিধারী কতিপয় হীনবস্থার তত্ত্ববায় বিদ্যমান ।

শ্রীচৈতন্যের সময়ে শ্রীঅদ্বৈতের বাসভূমি বলিয়া শান্তিপুরের খ্যাতি দেশময় পরিব্যাপ্ত হয় । এই কালে দেখা যায় একজন কাজী এখানে থাকিয়া গোড়ের হুসেন সাহের নামে এই স্থান শাসন করিতেন ; পরে মহামতি আকবর বাদসাহের সময় এই শান্তিপুর গ্রাম ইহার পশ্চিম সীমান্তবর্তী সূতরাগড় নিবাসী কোনও খন্দকার বাদশাহ প্রদত্ত এক ছাড় পত্র দ্বারা খেলায়ত্ত প্রাপ্ত হইলেন । বাদশাহ আকবর প্রদত্ত এই পাত্ৰা অদ্যাপি খন্দকার বংশধরগণের নিকট বর্তমান আছে ; তাহাতে দেখা যায় “দক্ষিণে পত্নানদী, উত্তরে নিঝাঁর, পূর্বে সূতরাগড় (বর্তমান সাড়াগড়) ও পশ্চিমে গোফেরা এই চতুঃসীমান্তবর্তী স্থান তোমাকে দেওয়া গেল ।” পরে কিরূপে এই স্থানটী খন্দকারগণের অধিকারচ্যুত হইয়া নদীয়াধিপতি গণের অধীন হয় তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না ।

নবাব সিরাজদ্দৌলার রাজত্ব কালে এই স্থান বিশিষ্ট বর্জিত গ্রাম বলিয়া পরিচিত ছিল । “কলিকাতা অঞ্চলের” প্রধান নায়ক হলওয়েল সাহেবকে “অঞ্চল”

হইতে মুক্ত করিয়া নবাবের সৈন্তগণ বধন তাঁহাকে মুরসিদাবাদে লইয়া যায়, তখন তাঁহাকে হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় দ্বিপ্রহরের দারুণ রৌদ্রে সশপদে ইটাইয়া এই শাস্তিপুত্রের কোন জমিদারের নিকট লইয়া যায়। এই অজ্ঞাতনামা জমিদার সেই অবস্থায় উক্ত সাহেবকে একখানি অনাবৃত জেলে ডিঙ্গিতে উঠাইয়া মুরসিদাবাদে প্রেরণ করেন। *

১৮২৮ খঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক কমারসিয়াল রেসিডেন্সী এই শাস্তিপুত্রে স্থাপিত ছিল। ১,৫০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের হস্তবস্ত্র প্রাতি বৎসর এখান হইতে বিলাতে রপ্তানা হইত। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এখানে পূর্ণিমেষ্ট অনুমোদিত এক সুবৃহৎ মন্দের ভাটী স্থাপিত হয়। লক্ষাধিক মূদ্রা ব্যয়ে এই রেসিডেন্সার নিমিত্ত এক মন্দির খচিত প্রাসাদ নির্মিত হয়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রেসিডেন্সীর এই প্রাসাদ মাত্র দুই হাজার টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। এই রেসিডেন্সিতে বাৎসরিক ৪২,০৫১ টাকা বেতনে একজন রেসিডেন্ট বাস করিতেন।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রায়গড়ের কারখানায় ৫০০০ লোকের অগ্নি সংস্থান হইত। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মাকুইস অব ওয়েলেসলী ২ দিন এই রেসিডেন্সীতে বাস করিয়া গিয়াছিলেন। এই রেসিডেন্সী হইতে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ১৪০০ টন চিনি বিলাতে রপ্তানী হইয়াছিল। মার্জরি বুক সাহেব এই রেসিডেন্সীর শেষ রেসিডেন্ট।

১৭১০ খৃষ্টাব্দে শাস্তিপুত্রের নিকটবর্তী পদ্মধরপুর, রাণীঘাট, নাদঘাট হৌড়ার ঝাল প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি সাহেবী নীলকুঠী ছিল। ইংরাজ

* "Here Holwell was landed as a prisoner on his way to Mursidabad ; after surviving the misery of the Blackhole" he was marched up to the Zemindar of Santipur "in a scorching sun near noon. For more than a mile and a half, his legs runing in a stream of blood from the irritations of the irons" From thence he was sent in an open fishery boat to Mursidabad, "exposed to a succession of heavy rain or intense sunshine." He was lodged in an open stable ; he experienced however every act of kindness from Messrs Law and Vernit, the French and Dutch chiefs of Kasimbazar as also from the Armenian merchants. He was led about the city in chains as a spectacle to the inhabitants to show the condition the English were reduced to."

রাজেশ্বর প্রথম আমলে “মে,” নামে এক সাহেব নদীয়া বিভাগের হুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি শান্তিপুরের নিয়বাহিনী গঙ্গা হইতে নবগঙ্গার উপরিস্থিত মগরা নামক স্থান পর্য্যন্ত একটী খাল কাটিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। তৎকালে শান্তিপুরের ও তন্নিকটবর্তী গঙ্গাবক্ষে অতিশয় দম্ভাতীতি ছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এখানে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলে এবং নদীবক্ষে জলপুলিশের বন্দোবস্ত হইলে এই উপদ্রব প্রশমিত হয়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে হিল, ওয়ায়ডেন, ও ট্রাইন নামে তিনজন লণ্ডন মিসনারি সোসাইটীর সাহেব এইখানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারার্থ আগমন করেন। তাঁহারা তদানীন্তন শান্তিপুরের অধিবাসীগণ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, “এখানকার অধিবাসীগণ সরলচিত্ত ও তাহারা সাধারণ বঙ্গবাসী অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহের সহিত এই সত্যধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল।” তাঁহারা তৎকালীন শান্তিপুরের জনসংখ্যা ৫০,০০০ ও গৃহের সংখ্যা ২০,০০০ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গৃহের অধিকাংশই প্রাচীন ও ইষ্টক নির্মিত বলিয়াও উল্লিখিত আছে।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার লর্ড বিশপ সাহেবও এখানকার ইষ্টক নির্মিত গৃহ শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাকে গোশ্বামী, দর্জী ও তাঁতীর জন্য বিখ্যাত বলিয়াছেন। তিনি শান্তিপুর হইতে দুই মাইল দূরে একটী বৃহৎ চিনির কারখানার উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই কারখানায় সেই সময়ে প্রত্যহ ৫০০ মণ চিনি পরিকৃত হইত এবং ৭০০ জন ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুর হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটার সংস্কারের নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট হইতে ২০,০০০ টাকা প্রদত্ত হয়।

পূর্বে এই স্থানে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চা খুবই ছিল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ সাহেব এখানে ৩০ ত্রিশখানি টোল দেখিয়াছিলেন। পূর্বে এখানে সুবার প্রচলন ও তন্ত্বের নামে ব্যাভিচারাদি খুবই ছিল ও সতী দাহও বৎসরে কম হইত না। সাহেব আরও লিখিয়াছেন যে “কিছুদিন পূর্বে এই স্থানে একজন ৪৫ বৎসর বয়স পুরুষ আসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পুড়িয়া মরিবার অজুহাতি চায়, তাহার অজুহাত এই যে, জীবন তাহার নিকট নিতান্তই ভারবহ হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে অর্থ দিতে চাহিলেও সে ইহা গ্রহণে অস্বীকার করে এবং সেই রকমীতেই পুড়িয়া মরে।”

বিশপ সাহেব ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুরে একটা ইংরাজী বিদ্যালয় দেখিয়া ছিলেন । কলিকাতার, বিশ্ব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে পর এই বিদ্যালয়টী উচ্চ-শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয় । এক্ষণে এখানে মিউনিসিপাল স্কুল, ওরিয়েণ্টাল একাডেমি ও নদীয়া মহারাজার হাইস্কুল, নামে তিনটা উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় আছে । ইহা ভিন্ন এখানে দুইটা মধ্য ইংরাজী, ষোলটা নিম্ন প্রাথমিক ও চারিটা নৈশ বিদ্যালয় ও পাঁচটা বালিকা বিদ্যালয় আছে । বালিকা বিদ্যালয় কয়েকটির মধ্যে স্বামনগর মধ্য বঙ্গালা বালিকা বিদ্যালয়টী প্রধান ।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু মতিলাল মৈত্রেয় শান্তিপুরে কাব্য প্রকাশ যন্ত্র নামে একটা মুদ্রা যন্ত্র স্থাপনা করেন । বাবু হরিশোহন প্রামাণিক মহাশয়ের কোকিলদূত কাব্য সেই যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল । ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রামাচরণ সামন্তাল মহাশয়ের যন্ত্র ও উৎসাহে আর একটা মুদ্রা যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাও অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই । কিছু দিনের ভ্রম ভারত ভূমি নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র, মূল্যের নামে হস্তরসাত্ত্বক মাসিক পত্র ও বহুভূমি নামক একখানি ব্যঙ্গকাব্য এই যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয় । শ্রামাচরণ বাবুই ঐ তিনখানির লেখক । ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজ হইতে রক্তভূমি নামে আর একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয় । ইহার কয়েক বৎসর পরে বিহারীলাল গোস্বামী মহাশয় একাদশখণ্ড সরোজিনী নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন । ১৩০৫ সালে শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর প্রামাণিক এবং তাহার সভ্য শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত যোগানন্দ প্রামাণিক কর্তৃক সেবা নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয় । উহা প্রায় এক বৎসর চলিয়া ছিল শ্রীযুক্ত যোগানন্দ প্রামাণিক নিগত ১ বৎসর হইতে যুবক নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতেছেন । শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর প্রামাণিক কর্তৃক উহা সম্পাদিত হয় ।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ জানুয়ারী শান্তিপুরে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয় । এই মিউনিসিপালিটীর মধ্যে ২০ মাইল পাকরাস্তা ও ৮০ মাইল কাঁচা রাস্তা আছে ইহার পরিমাণ বল চারিবর্গ ক্রোশ ।

শান্তিপুরে রাণী বারেন্দ্র ও বৈদিক এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করেন ।

বৈদিকের সংখ্যা অতি অল্প । ছয় জন আচার্য্য রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের আদি পুরুষ ; চারি জন রাঢ়ী আচার্য্য হইতে ব্রজভা, চৈতল সর্কানন্দী ও নপাঙ্কীগণ উৎপন্ন হইয়াছেন এবং দুইজন বারেন্দ্র আচার্য্য হইতে গোস্বামী ও কান্তপগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । অত্যন্ত বারেন্দ্রগণ ইহাদের দোহিত্র ।

এখানকার ব্রাহ্মণ সমূহের মধ্যে গোস্বামি বংশ * রায়বংশ, চট্টোপাধ্যায় বংশ, মুখোপাধ্যায় বংশ, ভট্টাচার্য্য বংশ, বহুদিন হইতে প্রধান । কিছু কাল হইতে মুখোপাধ্যায় মৈত্রেয় বংশও প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়াছেন ।

অষ্টম বংশীয় গোস্বামি বংশে কিছুদিন পূর্বে গোরাচাঁদ গোস্বামী, মদন গোপাল গোস্বামী ও নীলমনি গোস্বামী, মধুসূদন গোস্বামী ও অষ্টম চরণ গোস্বামী ও স্বনামধ্যাত বিজয় গোপাল গোস্বামী পণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন । বর্তমান সময়ে শ্রীলক্ষ্মীযুক্ত রাধিকানাথ গোস্বামী পণ্ডিত বলিয়া গণ্য । ইহার পিতা ৮শ্রীরাম গোস্বামী তাঁহার সময়ের ভাগবতের প্রধান পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন । বহু পূর্বে রাধামোহন গোস্বামী নামে “গোস্বামী ভট্টাচার্য্য” উপাধি ব্যত্যাজনৈক মহাপণ্ডিত এই মহাবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । উড়িয়া গোস্বামী বংশে প্রথম পণ্ডিত মাধব চন্দ্র গোস্বামী, শেষ পণ্ডিত হরিনারায়ণ গোস্বামী ও রামগোপাল গোস্বামী ইহার ষড়্ দর্শনের পণ্ডিত ; ইহাদের চতুষ্পাঠী ছিল । রায় বংশে উমেশ চন্দ্র রায় (মতি বাবু), চট্টোপাধ্যায় বংশে বর্তমান সময়ে অতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সিবিলিয়ান মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য ।

বহু পূর্বে ভট্টাচার্য্য বংশে চন্দ্র শেখর বাচস্পতি অধিভূমি পণ্ডিত ছিলেন । বর্তমান সময়ে রামনাথ তর্করত্ন এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিত । আশানন্দ মুখোপাধ্যায় একজন বীরপুরুষ ছিলেন । ইহার দেহে অহর লক্ষিত বল ছিল বলিয়া খ্যাত আছে । ইনি একদা অস্ত্রের অভাবে নিকটস্থ একটা ঢেঁকী লইয়া একদল দস্যুকে পরাস্ত করেন বলিয়া ইহার তদবধি ঢেঁকী উপাধি হয় । তদুত্তরকালে খাঁ চৌধুরী বংশে রামগোপাল খাঁ চৌধুরী প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ১৬৪৮ খৃস্টাব্দে এসিষ্ট্যান্ট জাজ হইয়া

* অষ্টম বংশীয় গোস্বামী এক উড়িয়া বোধানী । ইহার উড়িয়া হইতে আনীত ; রাঢ়ী ভেদে

মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এই মন্দির গায়ে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উৎকীর্ণ দেখা যায়—

* শ্রীমতঃ শ্রাম-চন্দ্র মন্দিরং পূর্ণ-ভাসরত ।

বহু বেদন্তু ভজ্ঞাত ।

সংখ্যয়া গণিতে শক্যে ॥*

এই উপলক্ষে তিনি বিপুল ব্যয়ে দেশ দেশান্তর হইতে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আহ্বান করিয়া অনিয়াছিলেন এবং লক্ষ মুদ্রা নজর দিয়া তদনুত্তম নদীয়াবিপণিতকেও সেই স্থাপিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে মাত্র দুইটী বিধবা এই বংশের শেষ চিহ্ন স্বরূপ বর্তমান আছেন। তত্ত্ববার কূলে প্রামাণিক বংশও উল্লেখ যোগ্য। তিনি কূলে দুইটী প্রামাণিক বংশ ও ভবানীবংশ প্রধান বলিয়া পরিগণিত।

এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানাদির মধ্যে জলেশ্বর মন্দির, শ্রামচন্দ্রের মন্দির, শ্রীঅষ্টমতের পাট, রিত্তার টমসন হল, বহুসভা, কুম্ভকারদের দাতব্য চিকিৎসালয়, গড়ের নব প্রতিষ্ঠিত মানিক দাসের দাতব্য চিকিৎসালয়, গোস্বামীদের নাট মন্দির, পকরত্ন মন্দির, নেকোরের খাদু, মিউনিসিপাল আপিস ও জুল গৃহাদি উল্লেখ যোগ্য। উৎপন্ন শিল্প সামগ্রীর মধ্যে, এখানকার জগদ্বিখ্যাত হস্ত বস্ত্র, পিতল কাঁসার সামগ্রী, এবং আহাৰ্য্য দ্রব্যাদির মধ্যে, খেচুর ও নিখুঁতি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

শান্তিপুরের সন্নিকটবর্তী উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির মধ্যে কূলে, বেলগড়ে, গড়, হরিনদী, ব্রহ্মশাসন, হরিনপুর, বাগআঁচড়া, মদদই-শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি উল্লেখযোগ্য।

হরিনদী—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে এই গ্রাম ধানির উল্লেখ আছে; হুতরাং ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তবে, প্রাচীন হরিনদী গঙ্গাগর্ভে যাওয়ার হরিনদীর অধিবাসীগণ হরিনদী ত্যাগ করতঃ হরিনপুর, বালিয়াডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে উঠিয়া গিয়াছেন। বর্তমান সময়ে যে গ্রামধানি হরিনদী বলিয়া পরিচিত তাহা প্রাচীন হরিনদীর ভাতশালা নামক এক ক্ষুদ্র অংশ। পক্ষার পার্শ্বের বিস্তৃত চরে যেখানে সাহেবডাঙ্গা, নৃসিংহপুর, বাগাবান প্রভৃতি গ্রাম বিদ্যমান তাহাই প্রাচীন হরিনদী।

বাগ আঁচড়া—শ্রীশ্রীবাগদেবী-মাতার স্থান বলিয়া বাগআঁচড়ার ধ্যতি ও পরিচয়। রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে জনৈক সাধক স্বষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর

মধ্যভাগে এই দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। সাধক রঘুনন্দন এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া লোকে এই স্থানটিকে সিদ্ধাপ্রম বলিয়া থাকে। কথিত আছে রঘুনন্দনের ভাগিনের মহাদেব মুখোপাধ্যায় এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধ মহাত্মার অভিশাপে এখানকার সুপ্রসিদ্ধ চাঁদরায় সবংশে নির্বংশ হইলেন। এই চাঁদরায়কে কেহ ক্রতুর দেওয়ান কেহবা বারভূঁইয়ার অন্যতম শ্রীপুরের চাঁদরায় মনে করেন, কিন্তু অল্পদাম্ভলে ইহাকে “শ্রিয় জ্ঞাতি ভগ্নরাধ রায় চাঁদ রায়”—বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

চাঁদরায় কীর্ত্তিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি রাজ্য ক্রতুর নির্দেশ ক্রমে নিজ গ্রামের সন্নিকটে ব্রহ্মশাসন গ্রামখানি স্থাপিত করেন। তিনি যে পূর্ণেশ্বর চূড়ি শিবর, অত্যাচা শিবমন্দির স্থাপনা করিয়াছিলেন তাহার ভগ্নাবশেষ এই গ্রামে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্ষুদ্র একটা চতুষ্কোণ প্রান্তরের চারিদিকে চারিটা ভগ্নপ্রায় মন্দির। উত্তর দিকের মন্দিরটা অপর তিনটা অপেক্ষা কিছু ভাল অবস্থায় আছে, কিন্তু চূড়া বা আবরণ কিছুই নাই; কেবল চতুর্দিকের ভিত্তি দণ্ডায়মান। সম্মুখের ভিত্তিতে ইষ্টকে খোদিত নানাবিধ প্রতিমূর্ত্তি; মন্দিরের নীৰ্ঘদেশে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ। মন্দিরের পূর্বদিকের বারের উপর ইষ্টকে খোদিত প্রাচীন বঙ্গাকরে নিম্নলিখিত শ্লোকটা খোদিত আছে :—

“শ্রীশিবঃ ।

শাক বারমতঙ্গবাণ হরিণাক্ষে নাক্ষিত্রে শকরং
সংস্থাপ্যাত্ত সুধা সুধাকর কর ক্ষীরোদনীরোপমং ।
তন্মৈ সৌধমিদমুদা সুজলদানিলীনলোলককং
তৎপাদেদ্রিত বীর বীরবিরতং শ্রীচাঁদরায়ো দদৌ ॥”

অর্থাৎ,—অবিরত নিশ্চল বুদ্ধি শ্রীচাঁদরায় ১৫৮৭ শকে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ণচতুরের কিরণ ও ক্ষীরোদ জলভূম্য এবং নিবিড় মেঘ সংলগ্ন চকল ধ্বজযুক্ত এই মন্দির সেই শিবপদে অর্পণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মশাসন—নবদ্বীপাধিপতি রুদ্র একখানি আদর্শ ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান স্থাপন মানসে একশত অটবর নিষ্ঠাবান ও সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ মনোনীত করিয়া তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্বাহোপযোগী ভূসম্পত্তি প্রদান পূর্বক চাঁদ রায়ের সাহায্যে এই

গ্রামখানি স্থাপনা করেন। ব্রাহ্মণের স্মৃতিতিষ্ঠা হেতু গ্রামখানি ব্রহ্মশাসন নামে অভিহিত হয়। মহারাজ। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরীশচন্দ্রের সময়ে চন্দ্রচূড় তর্কচূড়ামণি নামে একজন নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ ৮জগদ্ধাত্রী মাতার মূর্তি প্রচার ও তন্ত্র হইতে পূজাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেন। তৎপরে নদীয়ার রাজবংশের চেষ্ঠায় এই পূজাসাধারণে প্রচারিত হয়। বর্তমান সময়ে চন্দ্রচূড়ের বংশে, কয়েক বৎসর পূর্বে শিবদাস, তারাদাস ও যুগলদাস নামে তিন কৃতাবিদ্য প্রপৌত্র জীবিত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের বংশধরগণের কেহ ব্রহ্মশাসন, কেহবা কালনাথ বাস করিতেছেন। গম্প্রতি ব্রহ্মশাসনে ৮জগদ্ধাত্রী মাতার নামে চন্দ্রচূড়ের স্মৃতি রক্ষার্থ একটা আশ্রমবাটী নির্মাণের কল্পনা হইতেছে।

উলা বা বীরনগর।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত উখড়া পরগনার উলা একটা সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গণ্ড-গ্রাম। এই গ্রাম জেলার সদর ষ্টেশান্ নিম্ন কুঠনগর হইতে স্থানান্তরিত পাঁচ কোশ দক্ষিণপূর্বে এবং ইহা সর্বাভিভাসান রানাঘাট হইতে কিকিদিধিক দুই কোশ উত্তরে চুর্ণী নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত। সহর কলিকাতা হইতে এই স্থানের দূরত্ব একাত্ত মাইল, পূর্বে বঙ্গ রেলওয়ের মুরসিবাদ লাইনের রানাঘাট ষ্টেশনের অব্যবহিত পরেই বীরনগর বলিয়া যে ষ্টেশন সংস্থাপিত হইয়াছে উহাই উলার নামান্তর মাত্র। প্রবাদ আছে যে উলুবনা-কীর্ণ বিস্তীর্ণ চরের আবাদ হইয়া গ্রামের পত্তন হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম উলা হইয়াছিল। কেহ কেহ পারশী “আউল” অর্থাৎ জ্ঞানী শব্দ হইতে ইহার নাম উলা হইয়াছে বলিয়া থাকেন। এই উলা অতীত প্রাচীন স্থান। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদিতেও উলার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে ভাগিরথী নদী এই উলার পার্শ্ব দিয়াই প্রবাহিত হইয়াছিলেন। বর্তমান উলার পূর্ব ও দক্ষিণ দিগ দিয়া ডাকাতির খাল ও বারোমেসে খাল বলিয়া যে অতি প্রাচীন একগুত্তীর নদীর খাতরূপ নিম্ন জলাভূমি দেখিতে পাওয়া যায় অনেকে অনুমান করেন উহাই সেই বহুপূর্বে অন্তর্হিত গঙ্গার গর্ভখাত। কবিকঙ্কন মুকন্দরায় চক্রবর্তি ১৪৬৬ শকে বর্ণিত চণ্ডীগর্বে নির্দেশ করিয়াছেন যে যে সময়ে

শ্রীমন্ত সদাগর পিতৃ উদ্দেশ্যে সিংহল বাইতে ছিলেন তৎকালে তিনি এই উলার নাচে নিজ জাহাজ নঙ্গর করিয়া বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে প্রসিদ্ধ উলাইচণ্ডী-দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। যথা:—“বটমূলে ভগবতী, যথায় করেন স্থিতি, উপনিত সেই উলা ধামে” ইত্যাদি। এই উলাইচণ্ডীদেবী অদ্যাপিও প্রস্তর খণ্ডরূপে উলার দক্ষিন পূর্ব প্রান্তে স্থিত সেই বটমূলে বিরাজিতা রহিয়াছেন। কবিবর হুর্গপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বরচিত গঙ্গাতত্ত্ব তরঙ্গিনী নামক প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে, গঙ্গায় উল্লীর অবস্থান এবং তত্বেরে উলাইচণ্ডী দেবীর অবস্থিতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

“অম্বিকা পশ্চিম পারে, শান্তিপুর পূর্বধারে,

রাখিলা দক্ষিনে শুশুপার।।

উল্লাসে উলায় গতি, বট মূলে ভগবতী,

যথায় পাতকী নহে ছাড়া ॥

বৈশাখেতে যাত্রা হয়, লক্ষ লোক লক্ষ্য হয়,

পূর্ণিমা তিথির পুন্ড চয়।

নৃত্য গীত নানা নাট, দ্বিজকরে চণ্ডিপাঠ,

মনে যে মানসা সিক্তি হয়” ॥ ইত্যাদি।

যদিও কবিবর বর্ণিত লক্ষ লোকের সমাগম না হউক তথাপি আজ পর্য্যন্ত চণ্ডীমাতার যাত উপলক্ষে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে উলাতে যে লোক সমাগম এবং পূজা প্রদানের যে ধুমধাম হইয়া থাকে তাহা দেখিবার অযোগ্য নহে।

উলার অপর নাম বীরনগর; কথিত আছে খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে অত্রস্থ মুখোপাধ্যায় জমীদার বাবুদের বাটীতে সশস্ত্র এক দল দস্যু আসিয়া লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইলে বাবুদিগের তৎকালীন গ্রাম্য প্রতীবৈদীর্ঘ্য সমবেত হইয়া বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পূর্বক ঐ দস্যুদলের অধিকাংশ হতভাগিককে হত ও আহত করিয়া ডাকাইতদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া নদীয়া জেলার তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয় উলাকে “বীরনগর” এই আদ্য প্রদান করিয়া ছিলেন। তদবধি সরকারি ব্যবসায় ব্যাপারে এবং মিউনিসিপালিটি প্রভৃতিতে উলা, বীরনগর নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে। প্রবাদ এই কালেই শান্তিপুুরেও দস্যুত্ব হইলে ওত্রস্থ অধিবাসীগণ উক্ত সাহেবের

মিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে সাহেব তাঁহাদিগের কাপুরুষোচিত ভয় দেখিয়া শান্তিনুরের গাধানগর নাম প্রদান করেন । ইহার উত্তর দিকে বারাসাত, ধিসমা প্রভৃতি গ্রাম পূর্ব ও দক্ষিণে বহু পূর্বে প্রবর্তিত। ভাগীরথীর সেই অস্পষ্ট গর্ভধাত এবং পশ্চিম দিক দিয়া একনে রানাঘাট মুরসিদাবাদ নামক রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে । এই গ্রামের পরিমান ফল হুই বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা পূর্বকালে এই গ্রাম নদীয়া জেলার মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল, তৎকালে ইহাতে প্রায় ৫০ হাজার লোকের বসতি ছিল কিন্তু বর্তমান সময়ে ইহার লোক সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারের অধিক নহে । বহুদিন ব্যাপী মেলেরীয়া জরের প্রভাবেই ক্রমশঃ গ্রামের এই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে ।

পূর্বে এই গ্রাম স্বাস্থ্যকর ছিল, তখন ইহার শোভা সমুদ্রের সীমা ছিল না । গ্রামে ছোট বড় ৪ চারিটি বাজার, ছোটবড় পাঁচটি ইস্কুল, মুনসপী আদালত, পোষ্টাফিস প্রভৃতি সকলি ছিল । ব্যবসা বানিজ্য সম্বন্ধে এস্থান নিতান্ত হীন দশা সম্পন্ন ছিল না, এখানে বহুতর দোকান পসার ছিল । এই গ্রামে হালুইকর, কুস্তকার, কর্ণকার, স্বর্ণকার, সুত্রধর, চিত্রকর, গন্ধবনিক, স্বর্ণবনিক, কাংশবনিক, তিলি, মালি, তাঁতি, মোদক, নাপিত বারজীবী প্রভৃতি কোন সম্প্রদায়ক ব্যবসায়ী বা শিল্পী লোকের অপ্রভুল ছিল না ।

গ্রামে ৪৫টি অতি সুপ্রশস্ত সুগভীর বহুমন্ত্র পরিপূর্ণ দীর্ঘিকা এবং শতাধিক পুস্তক বিদ্যমান ছিল বর্তমানে ঐ ধানে জলাশয়ের অবস্থাও অতি মন্দ হইয়া গিয়াছে । নিম্ন ভ্রমণের লোকের মধ্যে গোয়াল, কৈবর্ত, ধোপা, কলু, জেলে, মালো, জলে, হাড়ি, বাগদৌ, তেঘর, ডোম, হাড়ি, মুচি, নিকারি, চুনরী, সানাই-দার, বদ্যকর, প্রভৃতি সৰল জাতীয় লোকেরই বিস্তর বসতী ছিল । মুসলমান মোগল পাঠান প্রভৃতি বংশীয়ও অনেক বসতি করিতেন, ফলতঃ তৎকালে উলার লোকদিগকে কোন বিষয়ে কোন প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত গ্রামান্তরের সুখাপেক্ষী হইতে হইত না । উক্তশ্রেনীস্থ হিন্দু সম্প্রদায়, কি সর্ববিদ্যাবিশারদ মহাতেজস্বী ঋষিকল্প ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কি সর্বজন পরিচিত কুলগৌরবান্বিত স্বধর্ম-পরায়ণ উন্নতচেতা উচ্চ ব্রাহ্মণ কুলীন বংশ কি আত্মকর্মেদাদি বৈদ্যশাস্ত্রবিশারদ লাড়ীতত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞ বহুদর্শী বৈদ্যচিকিৎসক কি সম্ভ্রান্ত কাংশমণ্ডলি কি গায়ক ও বাদক সম্প্রদায় ইত্যাদি কোন বিষয়েই উলার হীনতা ছিল না । প্রত্যুত এখানে

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ৮।১০ খানি টোল, উক্তশ্রেণীর ১২।১৪ বর কুলীন ব্রাহ্মণ, ৩০।৪০ বর বৈদ্যচিকিৎসক, ২০০।২৭৫ বর সন্তান্ত ও ভজ্ঞ কারুহু বাস করিতেন। ইহাদের কুলশীল, আচারব্যবহার, ধনদৌলত, খুশসমৃদ্ধির বিষয় অধিক আর কি বলিব। যে গ্রামে শতাধিক দেবমন্দির, সহস্রাধিক শিব-সালিগ্রাম প্রতিষ্ঠা; ৩।৪ শত ভূগোঁসব, হাজার বারশত শ্রামা পূজা প্রভৃতির অনুষ্ঠান, যে স্থানে সাধারণ ভোজনাদি ব্যাপারে এক পুংক্তিতে চুই আড়াই হাজার ব্রাহ্মণ একত্রে ভোজন করিতেন; যে স্থানের বিদ্যালয় সমূহে ৭।৮ শত ভদ্রবংশীয় ছাত্রের উপস্থিতি দেখা বাইত, যে স্থানের বারঘরী পূজা ব্যাপারে কম বেশী লক্ষ লোক সমাবেশ, সেস্থল যে কিরূপ উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহা বর্ণনা অপেক্ষা অনুমানাই সমাধিক পরিস্ফুট হওয়া সম্ভবপর তাহার সন্দেহ নাই।

কিন্তু কি কুঞ্জেই এ স্থানে প্রথম ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর আবির্ভাব হইল, কি কুলঞ্জেই সন ১৮৬২ সালের তাজ মাসে সেই ভীষণ নরঘাতিনী, করালবদনা, মহামারি সংহার মুক্তি পরিগ্রহ করিয়া তাণ্ডবতালে নৃত্য করিতে করিতে বিশাল মানবদান পূর্নক নরশোণিত পানে প্রবৃত্ত হইল যে সেই হইতে আজ প্রায় ৫০ বৎসর বাবৎ মেলেরিয়ার অবিভ্রান্ত আক্রমণে প্রপীড়িত হইয়া তাদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন বিস্তীর্ণ নগরবৎ সেই উলাগ্রাম এক্ষণে এক প্রকার জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইতে বসিয়াছে। কথিত আছে মহামারীর প্রারম্ভ হইতে প্রত্যহ গড়ে ১ শত লোকের মৃত্যু ঘটিয়া কিছু কাল এইরূপ সবেগে চলিয়া এই উলায় কমবেশী চমিশ হাজার লোক কালের করাল কবলে পতিত হইয়াছিল। আজ যাহার সহিত দেখা হইল কাল আর তাহার অন্তিত্ব নাই; বহু পরিবার পূর্ব মৃত্যুর গৃহস্থলী এক রাত্রেই শব পরিপূর্ণ সমরস্থলী হইয়া রহিয়াছে। রাত্রে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া পরিবারস্থ সকলে নিদ্রিত হইয়াছে প্রাতে আর দ্বার খুলিবার কেহ অবশিষ্ট নাই গৃহস্থ সকলেই রাত্রি মধ্যে নিশেব হইয়া গিয়াছে। প্রথম প্রথম যথারিতি সংস্কার হইবার পরে শবের আর বাহ হওয়া চুরে থাকুক বাটী হইতে বহির্গত হইবার উপায় রহিত হইল, অনেক শব গৃহাভ্যন্তরে পচিতে লাগিল বাহকের বাহন শক্তি রহিত হইল সেই স্থানেই বাহকের পরিসমাণি হইল। এই কোন ব্যক্তি পিতৃদেহ পক্ষায় সমাধার্ন করিয়া আসিল পরকণ্ঠেই উদীর দেহ

শব্দরূপে বাহিত হইয়া পদ্মাতীরে সমুপস্থিত হইল। গ্রামের এইরূপ অনী-
কস্চনীয় দুর্গতিদর্শনে ভীত হইয়া গ্রামবাসীগণ ললে দলে আপন আপন ভবন
বৈভব পরিত্যাগ করিয়া গ্রামান্তরে প্রস্থান করিতে লাগিল। সেই অবধি প্রায়
৫০। ৫৫ বৎসর হইতে চলিল কিন্তু উলার হতশ্রী আর সংশোধন হইল না
বরং ক্রমশই হীন হইতে হীনতর হইতেছে।

১৮৬৯ সালে এখানে মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম অধিবেশন হয় তখন ইহাতে
প্রায় ১৫ হাজার লোক ও ৫.৬ হাজার টাকা আর ছিল কিন্তু বর্তমানে জন
সংখ্যার ক্লাস হইবার পর করদাতৃগণের সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় উহার আয়
কমবেশী ৩ ডিন হাজার টাকা মাত্র হইয়া থাকে। ১৯১৫ বৎসর মধ্যে
মিউনিসিপ্যালিটির অস্তিত্ব নষ্ট হইবার অনুমান করা অসম্ভব বোধ হয় না।

পূর্বে এই গ্রামে একটা উচ্চশ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয় ৪টা বঙ্গ বিদ্যালয়
এবং ১০১২টি পদীপাঠাশালা ছিল তাহার স্থলে এখন সামান্য একটা ইন্স্কুল
আছে তাহার ৫০। ৬০ জনের অধিক ছাত্র দেখা যায় না।

পূর্বে এই গ্রামে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শীর্ষস্থানীয় বহু বিদ্বজ্জনের আবাস ছিল।
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগের মত লইয়াই এ প্রদেশের
ব্যবসায় হিন্দু ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান হইত কিন্তু তিনি উলার পণ্ডিত দিগেরও
স্বতন্ত্র ভাবে মত গ্রহণ করিয়া কার্যের অনুষ্ঠান করিতেন ফলতঃ তৎকালে
নবদ্বীপের ন্যায় উলার পণ্ডিত গণের একটা স্বতন্ত্র মত চলিত। এখানে টোল
ধারি বহুতর পশুপাশ পণ্ডিত ছিলেন তন্মধ্যে চতুর্ভূজ শ্রায়বহু, কৃষ্ণরাম শ্রায়
পকানন, সদাশিব তর্কালঙ্কার এবং শিবশিব তর্করত্ন প্রভৃতি অসাধারণ বিদ্যা
বুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ বহুশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়া
গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সব পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গেলে প্রত্যেকের জন্য
এক এক ষানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হয়। প্রথিত আছে একটা উলার
কৃষ্ণরাম শ্রায় পকানন মহাশয় বাটী হইতে স্থানান্তর গিয়াছিলেন ঐ সময়ে
এক ব্যক্তি পণ্ডিত ব্রাহ্মের ব্যবহার জ্ঞাত তাঁহার টোলে উপস্থিত হইলে তাঁহার
অনেক ছাত্র তাঁহাকে পরবর্তী একাদশীর দিনে ব্রাহ্ম করিবার জ্ঞাত ব্যবস্থা
পত্র দিয়া বিদায় করেন কিন্তু ঐ পরবর্তী একাদশী যে শুক্র গজে তাহা
তাঁহার উদ্বোধন হয় নাই পরন্তু ব্যবস্থা পত্রে ভট্টাচার্য মহাশয়ের নাম থাকর

করিতে গিয়া ভ্রম বশতঃ “শ্রীকৃষ্ণরাম শর্মা” এইরূপ দস্ত সন্ধানবুদ্ধ “শর্মা” পদের ব্যবহার করিয়া ফেলেন। ঘটনাক্রমে ব্যবস্থাপত্র খানি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দৃষ্টি গোচর হইলে তিনি নিতান্ত বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উলান্নকৃষ্ণ রামের নিকট উহার সংশোধন বা সমর্থনের জন্ত পুনরায় পাঠাইয়া দেন এবং ঐরূপ ব্যবস্থা ও লিখন বৈচিত্রের যথোচিত উত্তর প্রদানের নিমিত্ত তাঁহাকে রাজধানীতে স্বয়ং উপস্থিত হইবার জন্ত আহ্বান করিয়া পাঠান। তখন মহাতেজস্বী তार्কিক শ্রবর কৃষ্ণরাম স্বীয় ছাত্রকৃত তথ্যাবধি অসঙ্গত বর্ণাশুদ্ধি ও অন্তত ব্যবহার সমর্থনে কৃত সংকল্প হইয়া পত্র খানিতে “পুনঃ কৃষ্ণরাম শর্মা” এইরূপ দ্বিতীয় সাক্ষর করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন এবং স্বকীয় ব্যবস্থাদির পরিপোষনার্থ বিচার করিবার দিনস্থির করিয়া দিয়া মহারাজের গোচরার্থ নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন। মহারাজও পরম কৌতুকী হইয়া নির্দিষ্ট দিনে অন্তান্ত বহুতর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগকে রাজধানীতে উপস্থিত হইবার অনুমতি করিয়া পাঠাইলেন। শ্রবিত আছে পণ্ডিত শ্রবর কৃষ্ণরাম নির্দিষ্ট দিনে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সমাগত শূদ্রা মণ্ডলির সহিত একাদিক্রমে সপ্তাহ পর্য্যন্ত বিচার পূর্বক তাঁহাদিগের সকলকে কুট তর্কে পরাস্ত করিয়া তথা কথিত স্বকীয় ব্যবস্থা ও লিখনের সমর্থন করিয়াছিলেন। এবং মহারাজও তদীয় এই অদ্বুত বিচার ক্ষমতার পরিতুষ্ট হইয়া পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে একটী পতাকা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ পতাকায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নামাঙ্কিত নিম্নলিখিত কবিতাংশ লিখিত ছিল।

যথা,—“উলান্নকৃষ্ণরামস্ত পতাকেয়ং বিরাজতে” ইত্যাদি।

কৃষ্ণরাম স্বীয় বাটীতে অতি উচ্চ স্থানে ঐ পতাকা স্থাপন করিয়া স্বকীয় গৌরব চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্বিত্ত ভবানি চরণ জায় কুসুম, মুকুন্দ বোহন জায় রত্ন, গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী প্রণেতা কবির হর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগরের রাজ সভার হান্স রসিক সুবিখ্যাত মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই উল্লাসেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বলিতে নিতান্তই আক্ষেপ হয় যে তাদৃশ পণ্ডিতগৌরবে গৌরবাধিত সেই উল্লা গ্রাম আজ একেবারেই পণ্ডিত শূন্য হইয়াছে। পুরুষের তো কথাই নাই তখন এখানকার স্ত্রীলোকেরাও বিদ্বতী ছিলেন সারণ সিদ্ধান্তের দুইটী কল্পা বিশেষরূপে সংকুতাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন*

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে যে কয়েকটি প্রধান সমাজ ছিল এই উলা সমাজ তন্মধ্যে অন্যতম বলিয়া গণ্য। তৎকালে ফুলিয়া ও ঝড়দহ মেলের ন্যূনাদিক পঁচিশ শত ঘর রাঢ়ীর শ্রেণীর অতি সম্ভ্রান্ত কুলীন সম্ভ্রান্ত এই উলাতে বাস করিতেন। তাঁহাদের অধিকাংশই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট সর্বিশেষ সম্মানিত এবং সমাদৃত ছিলেন। কথিত আছে মহারাজ প্রায় প্রতি বর্ষেই এই স্থানে সমাগত হইয়া স্বীয় দীর্ঘিকাঙ্ক জলটুকিতে অবস্থান পূর্বক ভগবানকে পদ্ম পুষ্প প্রদান করিতেন এবং তত্পলক্ষে সমাজস্থ ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর আশ্বাসন করিয়া পরম সমাদর প্রদর্শন করিতেন। ফুলিয়া ও ঝড়দহ মেলের এত অধিক সংখ্যক স্বভাব ও ভঙ্গ কুলীন তৎকালে আর কুত্রাপি দেখা যাইত না। ইহাদের সকলেই সম্ভ্রান্ত এবং অধিকাংশই সর্বিশেষ অবস্থাপন্ন তন্মধ্যে গড়ের চটোপাধ্যায় বংশ, ফুলিয়ার মুখোপাধ্যায় পাড়ার কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়ের বংশ সমধিক বিখ্যাত ও কোলিন্য গৌরবে গরীয়ান ছিলেন। ব্রাহ্মণ বংশের হুগৈশ্বরের বর্নায় প্রবৃত্ত হইলে উলার ফুলিয়া কুলোদ্ভব হুপ্রসিদ্ধ বামন দাস বাবুর বিবয় সর্বাঙ্গে বর্ণনীয়। তদীয় পিতামহ মুখোদ্ভব কুলোদ্ভব মহাদেব মুখোপাধ্যায় এই উলা গ্রামের মাঝের পাড়ায় এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। কথিত আছে একদা সংসার বাত্যা নির্বাহ বিড়ম্বনায় একান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া একটী মাত্র আধুলি সম্বল লইয়া তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং বহু কষ্টে গৃহস্থের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে করিতে অনেক দিন পরে পরিশেষে রংপুরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কোন নীল কুঠিয়াল সাহেব তাঁহার দুঃখবতীর পরিচয়ে কৃপা পরবশ হইয়া তাঁহাকে আপন কুঠিতে জনৈক কর্মচারি নিযুক্ত করেন ক্রমে মহাদেব স্বীয় অদম্য উৎসাহ অপরিমিত অধ্যবসায় অক্লান্ত পরিশ্রমে বহু অর্থ উপার্জন করেন এবং স্বোপার্জিত অর্থে ক্রমে জমিদারী প্রভৃতি খরিদ করিয়া একজন গণ্য মাণ্য জমিদার হইয়া উঠেন। কথিত আছে রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ পাল চৌধুরি বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি কৃষ্ণপাণ্ডি মহোদয় তাঁহার জমিদারী ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিস্তর সহায়তা করিয়া ছিলেন। ক্রমে মহাদেব ফরিদপুর, ঢাকা, মৈমনসিংহ, রংপুর প্রভৃতি জেলার জমিদারী খরিদ করিয়া একজন প্রসিদ্ধ জমিদার হইয়া উঠেন। এই সময়ে তাঁহার জমিদারীর আয় প্রচুর হইয়া উঠিল। তিনি স্বয়ং অতি হুধার্মিক নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন সুতরাং ঐক্যপ ঐশ্বরের অধি-

পতি হইয়া দান ধ্যান ক্রিয়া কর্ত্ত্বের অনুরোধে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি তদনু-
সারে বাটীতে স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, দুর্গোৎসব, স্ত্রীমাপূজা, জগদ্ধাত্রী
পূজা প্রভৃতি ষাণ্ঠীয় বার্ষিক ক্রিয়া কলাপের সংস্থাপন করিলেন এবং সর্বোপরি
হিন্দুগৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য সদাস্ত্রের সংস্থাপন করিয়া স্বীয় সচ্ছন্দতা ও ধর্ম্ম
প্রবণতার পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন ।

রাধানাথ মুখোপাধ্যায় নামে মহাদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অপর এক সহোদর
ছিলেন কথিত আছে মহাদেব স্বেচ্ছাক্রমে ইঁহাকে স্থোপাঙ্গিত জমিদারীর কিয়-
দংশ পৃথক করিয়া দিয়া যান ; এই রাধানাথই উলার খ্যাতনামা জমিদার
শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতামহ । শম্ভুনাথ পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী
হইয়া যথারীতি হিন্দু আচার ব্যবহার ও ক্রিয়া কার্ধ্যের অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন ।
মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের দুর্গাপ্রসাদ ও কৃষ্ণপ্রসাদ নামে দুই পুত্র ও ত্রিপুরােশ্বরী
নামে এক কন্যা ছিলেন । তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ দুর্গাপ্রসাদের বামন দাস, গৌরীপ্রসাদ
এবং অন্নদা প্রসাদ নামে তিন পুত্র জন্মে আর কনিষ্ঠ কৃষ্ণ প্রসাদের চন্দ্র ভূষণ
নামে এক পুত্র হয় ।

পূর্বোন্নিখিত বামন দাস মুখোপাধ্যায়ই উলার মুখোপাধ্যায় জমিদার বংশের
কুল প্রদীপ ; তিনিই এই জমিদার বংশের পূর্ণ গৌরব ও চরমোন্নতি সাধন করিয়া
গিয়াছেন । তিনিই স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা বলে পিতামহ প্রদত্ত বিষয় বৈভবের
বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করেন এবং বিস্তর অর্থব্যয় পূর্বক তদীয় বৈভবানুরূপ হৃদয়
সুপ্রশস্ত দ্বিতল ত্রিতল প্রভৃতি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট বাটী নির্মাণ করিয়া
পিতামহ প্রতিষ্ঠিত পৈত্রিক ক্রিয়া কর্ধ্যগুলির সমধিক পুষ্টি সাধন পূর্বক দেশ
মধ্যে একজন সুবিখ্যাত গণ্য মান্য ক্রিয়াবান হিন্দু জমিদার বলিয়া বিখ্যাত হইলেন ।
তাঁহার সময়ে বাটীতে অসংখ্য ক্রিয়া কলাপ মধ্যে তিনটা ক্রিয়ায় সবিশেষ সমৃদ্ধি
হইত, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা ও জগদ্ধাত্রী পূজা ; স্নানযাত্রা উপলক্ষে তিনি
আটমৈথিল চট্টগ্রাম বঙ্গের ষাণ্ঠীয় প্রধান পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ করিতেন হুত্তরাং
ঐ ক্রিয়ার সময় মিথিলা, রাঢ়, নবদ্বীপ, পূর্ববঙ্গ, ভট্টপল্লী, কলিকাতা, বশোহর,
ঢাকা, মৈমনসিংহ, বাকলা, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের প্রথিত নামা পণ্ডিতগণ প্রতি
বৎসর তদীয় উলার বাটীতে সমিধ্য সমাগত হইতেন । বামন দাস সন ১২৮১
সালে একান্তর বৎসর বয়সে স্বর্গলাভ করিয়াছেন ।

তদীয় ভাতা গৌরি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় উলার রাস্তাঘাট সম্বন্ধে অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন ।

তদীয় কনিষ্ঠ ভাতা অম্বদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্থানীয় বিদ্যালয় সম্বন্ধে স্বীয় সহৃদয়তা ও বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন । ইনি সঙ্গীত শাস্ত্রের সাতিশয় সমাদর করিতেন ।

বামন দাসের কালিদাস, অরুণ দাস, মথুরা নাথ, উমানাথ, তারানাথ এবং শ্রীনাথ নামে ছয় পুত্র জন্মে, ইঁহারা সকলেই চরিত্রবান, কৃতী এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন, যথাসম্ভব পিতার প্রতিষ্ঠিত ক্রিয়া কলাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পুর্নপুরুষদিগের পদমর্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন । বর্তমান সময় ইঁহাদের কেহই জীবিত নাই । বামন দাসের পৌত্রগণের মধ্যে শ্রীযুত গিরীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় কথঞ্চিৎ পৈত্রিক প্রথানুযায়ী হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়া থাকেন । গিরীন্দ্র নাথের ভাতা শ্রীযুত হরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল, মহাশয় কলিকাতার হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া থাকেন ।

গৌরী প্রসাদের সারদা প্রসাদ (দম্বাবু) প্রভৃতি সাত পুত্র হয় কিন্তু তাঁহারা সকলেই নিঃসন্তানে পরলোক গত হইয়াছেন কেবল সারদা প্রসাদের একটী মাত্র পৌত্র বর্তমান থাকিয়া সেই সুবংশ বংশের চিহ্ন মাত্র রক্ষা করিতেছেন ।

অম্বদা প্রসাদের উপেন্দ্র নাথ (দম্বাবু) প্রভৃতি ছয় পুত্র হয় তন্মধ্যে বিজয় গোপাল, আভুতোষ (দাম্বাবু) নগেন্দ্র নাথ, নীলমণি প্রভৃতি চারিজন অদ্যাপী বর্তমান রহিয়াছেন এবং এই উল্লাতেই বসবাস করিতেছেন । শ্রীমণীন্দ্রনাথ বা শ্রীমান বাবু বর্তমান কালে এই বংশের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

এখানে প্রায় ৩০০০ বর বৈদ্যের বাস ছিল তাঁহাদের মধ্যে অনেকই স্বজাতীয় চিকিৎসা ব্যবসাতে লিপ্ত থাকিয়া সবিশেষ মান প্রতিপত্তি ও গৌরবের সহিত কাটাইয়া গিয়াছেন ।

এখানে বহু কায়স্থের বাস ছিল তাঁহাদের অধিকাংশই ঘোষ, বহু, মিত্র, দত্ত, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত কুলীন বংশ সম্ভূত এবং বিদ্যা, বিত্ত, বৈভব সম্পন্ন ভদ্র সন্তান । তাঁহাদের ক্রিয়া কর্ম্ম আচার ব্যবহার মন্দ ছিল না । মিত্র কুলোদ্ভব প্রাচীন প্রসিদ্ধ মুস্তফী মহাশয়েরই উলার আদি সমৃদ্ধিসম্পন্ন জমিদার । কথিত আছে এই বংশীয় কোন কৃতী পুরুষ প্রাচীন কালে মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে কোন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরুঢ় হইয়া “মুস্তফী” খেতাব

গ্রহণ পূর্বক বহু ধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া চাকরি পরিত্যাগ পূর্বক বাটতে প্রত্যাগমন করেন ক্রমে স্বদেশে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া পরিণামে প্রসিদ্ধ জমীদার রূপে পরিণত হন ।

নবশায়ক সম্প্রদায় মধ্যে উলার তিলি বংশোদ্ভব খাঁ বাবুর্সাই সমধিক প্রধান ও উল্লেখযোগ্য । কথিত আছে এই বংশের আদি পুরুষ মূর্শিদাবাদে মুদির দোকান করিতেন ক্রমে ব্যবসায় উন্নতি লাভ করিয়া বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় পূর্বক নবাব সরকারের মুদি হইয়া উঠেন এবং সুপারির কারবারে প্রবৃত্ত হইলেন এই সুপারির কারবারই ইহাদিগের অভ্যাসের হেতু । অদ্যাপিও কলিকাতার বড়বাজার এবং নিয় বঙ্গের আরও অনেকানেক স্থানে ইহাদিগের সুপারির আড়ত বিদ্যমান আছে এবং বর্ষে বর্ষে ঐ সকল আড়ত হইতে বিস্তর টাকা লাভ হইয়া থাকে । একদা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বার্ষিক খাজনার অনাদায় জন্ত নবাব সরকারে অবদ্বন্দ্ব হইলেন সেই সময়ে উক্ত মুদী মহারাজের সবিশেষ সেবা শ্রদ্ধা ও সাহায্য করায় মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া উহাকে কিছু দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন কিন্তু তিনি তৎকালে উহা না লইয়া আবশ্যক মতে লইবেন এই আবেদন করিলে মহারাজ তহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন পরে ঐ বংশীয় নীলাম্বর কুণ্ডু আপন মাতৃদায় উপস্থিত হইলে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে মহারাজের নিকট সেই প্রতিশ্রুত অঙ্গীকারের পালন জন্ত প্রার্থনা জানাইল এবং কহিল “মহারাজ আমি এই প্রার্থনা করি যে এখন হইতে আপনকার সমগ্র উলা সমাজ আমার বাটীতে পদার্পন করেন” তদনুসারে মহারাজ উহাদিগকে খাঁ এই উপাধি দান পূর্বক উলা সমাজ পাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন । তদবধি আজ পর্যন্ত উহার সেই রাজ প্রদত্ত খাঁ উপাধিতে সম্মানিত ও উলার সমাজের গ্রহণীয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছেন । বর্তমান সময়ে ইহাদিগের অবস্থা খুব ভাল । এই বংশীয় রাজকৃষ্ণ খাঁ ও সর্বচন্দ্র খাঁ বিশেষ ধন প্রতিপত্তির অধিপতি হইয়া অনেক সংকারণের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন । এই বংশের বর্তমান ব্যক্তিগণের মধ্যে বাবু জগন্নাথ খাঁ, আশুতোষ খাঁ, হরেন্দ্র নাথ খাঁ, সুজন খাঁ, যতীন্দ্র নাথ খাঁ প্রভৃতি বাবুদের নাম উল্লেখযোগ্য ।

অতীত বংশের মধ্যে মিত্র বংশও উল্লেখযোগ্য এই বংশের বর্তমান কালে ৮৮শ্রুত কুমার মিত্রের পুত্র বঙ্গভাষায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক, বীরাসনা পত্রোত্তর

কাব্য, নরসিংহ, কলিনা, পার্কী প্রভৃতি লেখক শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র বি, এল মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য ।

বহুভাষার অল্পতম প্রাচীন লেখক শ্রীচন্দ্রশেখর বসুও উলাবাসী ।

উলার লোক সাধারণতঃ হান্তরসিক, এবং খামখেয়ালী সে কারণে এতদঅঞ্চলে উলানিবাসীগণ “উলুই পাগল নামে খ্যাত, এসম্বন্ধে এ প্রদেশে একটা প্রবচনও প্রচলিত আছে যথা “উলার পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাদর ও হালিসহরের তেঁদর” * উলার লোক এক দিকে যেমন হান্তরসিক ছিলেন তেমনি অপর দিকে ভোজন বিলাসীও হুব ছিলেন ; মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, জৈশ পাগলা, মহেশ পাগলা প্রভৃতির নাম যেমন রসিক বলিয়া খ্যাতি তেমনি অনেকের “খোরাকী” বলিয়া খ্যাতি ছিল, এদলের প্রধান ছিলেন রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় ইনি প্রতাহ প্রচুর পরিমাণে আহার করিতেন এ কারণে তাঁহার খ্যাতি ছিল “মুনকে রোখো” । তিনি আপনার এই অসাধারণ গুণে বহু রাজা ও জমীদারের প্রিয় ছিলেন, এবং তাঁহাদের দত্ত মাস-হারাতেই তাঁহার সংসার চলিত ।

উলার মধ্য দিয়া যে প্রশস্ত রাজবস্তুটী কৃষ্ণনগর অভিমুখে গিয়াছে তাহা ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে উলার মুখোপাধ্যায় বাবুদিগের উদ্যোগে সাধারণের অর্থে নির্মিত হইয়াছিল । †

উলার প্রস্তুত সামগ্রীর মধ্যে উলার বাগনের পূর্বে প্রসিদ্ধি থাকিলেও এখন তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই, খাদ্যভ্রমের মধ্যে উলার মৃতি, মনোহরা, বীরখণ্ডী ও লুয়াতোলা সন্দেশ আজিও প্রসিদ্ধ । আজ যে কোনও দেবী প্রতিমা সাজাইতে দেশ দেশান্তরে যে “ডাকের-সাজের” প্রচলন হইয়াছে তাহার প্রথম আবিষ্কার এই উলা গ্রামেই হইয়াছিল । প্রায় দেড় শত বর্ষপূর্বে উলার সন্নিকটবর্তী পালিত পাড়া নামক স্থানে কানাই লাল আচার্য্য ও নীলমনি আচার্য্য নামে দুই ভ্রাতা বাস

* As Guptipara is noted for its monkey, Halishahar for its drunkards, so is Ulla for fools, as one man is said to become a fool every year at the Mela.

Cal Review. Art III Vol VI, 1846,

† In 1834 the Baboos of Ulla raised a large subscription and gave it to the authorities to make a Pukka road through the town.

Cal Review 1846. Vol-VI. Page 398-448.

করিতেন, তাঁহারাই সর্বপ্রথম এইরূপ মাজের সৃষ্টি করেন ; উলার মহামারীতে বিপর্যস্ত হইয়া তদীয় বংশধরগণ শান্তিপূরের সন্নিধ্য হরিপুরে উঠিয়া আসেন তাঁহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি এখানে থাকিয়া প্রাচীন রীত-ানুসারে কাশিমবাজার রাজবাটী প্রভৃতি বহুস্থানে ডাকের মাজ সরবরাহ করিয়া থাকেন ।

উলা কিছুকাল চৌকী হাঁসখালির অধীন হইয়া ছিল এবং হাঁসখালীর মুনহুফী আদালত এই উলাতেই হইত, মহামারীর সময়েই উহা উলা হইতে রাণাঘাটে স্থানান্তরিত হয়, কিছু দিন রাণাঘাটে ঐ আদালত থাকিয়া পরে শান্তিপূরে উঠিয়া যায় এবং ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে তথা হইতে পুনরায় রাণাঘাটে স্থায়ীভাবে উঠিয়া আসিয়াছে ।

উলার নিকটবর্তী গ্রামগুলির মধ্যে পাহাড়পুর, রঘুনাথপুর, খিসমা, মামজোয়ান, আড়বন্দী, বাদকুমা প্রভৃতি গ্রামগুলি উল্লেখযোগ্য । পাহাড়পুরের, মুখোপাধ্যায় বংশ প্রসিদ্ধ । ৬কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় এই বংশের উপায়ক্কম ক্রিয়াবন পুরুষ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তৎপুত্র ৬বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় M.A.B.L. এক জন সাহিত্যোৎসাহী বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন তৎপুত্র শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার একজন পিতার স্মার সদাশয় ও উদ্যোগী পুরুষ ।

রঘুনাথপুর,—বৈদ্য প্রধান গ্রাম এতদঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৬ চন্দ্ররায় ও তৎপুত্র ৬ তারিণী চরণ ও ৬ শ্রীচরণ দ্বন্দ্বভরী কল্প হুচিকিৎসক বলিয়া খ্যাত ৬তারিণীচরণের পুত্র ৬নীলমাধব রায়ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে কলিকাতায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ।

খিসমার সিংহবংশ বিখ্যাত, রায় বাহাদুর ৬গোকুলচন্দ্র সিংহ এই বংশের ।

মামজোয়ান,—নবাবী আমলে নদীয়ার একটা প্রসিদ্ধ পরগণা ছিল । সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমাচরণ সরকার এই স্থানে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন ।

আড়বন্দী,—গ্রামখানি নদীয়ার এক খানি প্রাচীন গ্রাম । বিলাত প্রত্যাপ্ত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত অধিনীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের নিবাস এই স্থানে ।

বাদকুমা,—পূর্বে বহুর উপজবের জন্ম অখ্যাতি লাভ করিয়াছিল ।

রাণাঘাট ।

রাণাঘাট নদীয়া জেলার একটি প্রাচীন গ্রাম না হইলেও, ইহা অনেকের নিকট সুপরিচিত। উত্তরে জিন্নানগর, মধ্যে রাণাঘাট ও দক্ষিণে নাসড়া এই তিন খানি গ্রাম লইয়া বর্তমান রাণাঘাট গঠিত। কোন প্রাচীন পুস্তকে বা মানচিত্রে এই স্থানের নাম দৃষ্ট হয় না। জেমস্ রেনলসের ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বাঙ্গালার মানচিত্রে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে এই স্থানের নাম দেওয়া আছে। সম্ভবতঃ ইহারি কিছু কাল পূর্বে, রাণাঘাট গ্রামে পরিণত হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সামান্যরূপ সমৃদ্ধিশালী হওয়ায় মানচিত্রে স্থান প্রাপ্ত হয়। যখন মানচিত্রে, রাণাঘাট এইরূপ ক্ষুদ্রাকারে মুদ্রিত তখন কুটনগর, পলাশী, অগ্রদ্বীপ, শিবনিবাস, নদীয়া, শান্তিপুর, শ্রীনগর প্রভৃতি স্থান সমূহ বৃহৎ অক্ষরে বিশদভাবে মুদ্রিত। এই মানচিত্রে কুফনগর ও শিবনিবাস উচ্চ মন্দির দ্বারা, ও পলাশী আত্মকুণ্ড দ্বারা চিহ্নিত এবং অগ্রদ্বীপ ও নদীয়া, কুফনগরের পারে অর্থাৎ গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত, দেখান হইয়াছে।

অনেকে বলেন ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কুটনগরাধিপতি রাজা রঘুরামের রাজত্বকালে এই স্থানে রণানামে একজন বিখ্যাত দস্যুর ঘাটী বা আড়ডা ছিল তাই রাণাঘাটী হইতে রাণাঘাট নামের উৎপত্তি হইয়াছে। রাণাঘাটের অবস্থান বিশেষরূপ পর্যালোচনা করিলে, ইহা পূর্বে যে একটি নদী বেষ্টিত, দস্যুवासोপযোগী স্থান ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীতি হয়, কারণ এই স্থানটী পূর্বে প্রায় চতুর্দিকে নদীবেষ্টিত ছিল। উত্তরে বাচকোর নদী ও দক্ষিণ ও পূর্বের কিয়দংশ হাজুর নামা নদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখন এই দুইটী নদী খাদ মাত্রে পর্যাবসিত হইলেও পূর্বে ইহায়া খরস্রোতা নদী ছিল; পশ্চিমে চূর্ণী আজিও বহত। শুনা যায়, রণার দস্যু কালী-প্রতিমা অরুনা রাণাঘাটের মধ্যস্থলবর্তিনী সিদ্ধেশ্বরী নামী গ্রাম্য প্রতিমা।

অনেকের মতে রাণাঘাটের নাম পূর্বে বাহাই থাকুক, 'ইহা রাজা' কুটনগরের সময়ই তাঁহার কনিষ্ঠা রাণীর নামেই রাণীঘাট নামে অভিহিত হয়। *

রাজা রঘুরামের রাজত্ব কালে রাণাঘাটের উৎপত্তি কল্পনা করিলেও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শেষ বয়সে ইহা রাণাঘাট বাদী কৃষ্ণপান্তির জন্য খ্যাতিপন্ন হয় ।

কৃষ্ণপান্তী ১১৫৬ সালে রাণাঘাটে এক দরিদ্র গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাঁহার পিতা সহস্ররাম পান্তী কায়ক্ৰেশে পালচৌধুরী বংশ সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেন । তাঁহার তিন পুত্র ; প্রথম কৃষ্ণ চন্দ্র, দ্বিতীয় শম্ভুচন্দ্র ও তৃতীয় নিধিরাম । কৃষ্ণ ও শম্ভু বাল্যকাল হইতে বিশেষ চতুর ছিলেন ও নিধিরাম মহাব্যাধিগ্রস্ত বিধায় সর্বকাৰ্য্যেই অপটু ছিলেন । কথিত আছে শূচতুর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে কেবলমাত্র একটী আধুলী সম্বল করিয়া ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং আপনার অধ্যবসায় বলে, লক্ষ্মীর কুপায় বহুবিধ উপাঞ্জন করতঃ বাদ্দের একজন শ্রেষ্ঠ ধনী পদ বাচ্য হইলেন । এই ব্যবসায়ের আয় হইতে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র এই সময়ে জমিদারী ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন এবং সর্বপ্রথমে যশোহরের অন্তর্গত সীতোর পরগণা ক্রয় করেন । ইহাই তাঁহাদের সর্বপ্রথম জমিদারী । এই সময়ে নদীয়া রাজ শিবচন্দ্র, কৃষ্ণ পান্তীকে চৌধুরী উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন এবং ইহার অব্যবহিত কালপরে যখন মারহুইস হেষ্টিংশ সাহেব মকঃমল পরিদর্শনে সফরে বাহির হইয়া রাণাঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কৃষ্ণ পান্তীর অগণিত অশ্ববাজী, প্রাসাদোপম সৌধশ্রেণী, বিরাট ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া এবং তাঁহার সাদর অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে রাজা উপাধি দিতে অগ্রসর হইলেন, তখন কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী তাঁহার স্বাভাবিক সরলতা শুণে, বিনয়ের সহিত উহা প্রত্যাক্ষান

রাণী রাজার কনিষ্ঠা রাণী বাঁহার পিত্রালয় ছিল রাণাঘাটের অধুস্থিত নোকাড়ী গ্রামে)
“is the abode of many rich Zamindars”,

Cal. Review, Vol VI. 1846.

ঐ গ্রন্থে আরও দেখা যায় যে রাজা কৃষ্ণ চন্দ্রের দেওয়ান রঘুনন্দনের নিবাস এই রাণাঘাট গ্রামেই ছিল, কিন্তু ইহা ঠিক নহে, উহার নিবাস শিবনিবাসের নিকট দেওয়ানের বেঞ্চে ছিল, এই পুস্তকে ঐ দেওয়ান সম্বন্ধে রাণাঘাটে প্রচলিত বলিয়া একটী প্রবাদ বাক্য দেওয়া আছে—

“Rajbari ghari baje tantana”
Dwi prahare Atit gele
Mukta mari chatkhana”

করেন এবং নদীয়াধিপতি দত্ত চৌধুরী উপাধী তিনি ইন্ডিয়া গবর্মেণ্টের অমুমোদিত করিয়া লয়েন। মাক্‌ইস হেষ্টিংস তাঁহার এইরূপ সরল ব্যবহারের পরম শ্রীত হইয়া তাঁহার সহিত আশাসোটা ব্যবহারে অমুমতি দেন।

কৃষ্ণচন্দ্র পালচৌধুরী মহাশয় তাঁহার জীবনে যে সমস্ত দানাদি ও সংকার্য্য করিয়াছেন তাহার মধ্যে মাজাঙ্গ হুভিক্কে লক্ষ মন চাউল দান, উলার (বীরনগর) মুখোপাধ্যায় বাবুদিগের জমিদারী ক্ষেত্রে সাহায্য, মহাপ্রভুর পুষ্করী প্রভৃতি কতিপয় সুবৃহৎ পুষ্করী খনন, রাণাঘাট হইতে জগপুরে গঙ্গান্নানে বাইবার সুদীর্ঘ পথ প্রভৃতি কার্য্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার প্ররোচনায়, মৃত্যুর পূর্বে, তাঁহার যাবতীয় বিষয় এইরূপ বণ্টন করিয়া যান;—তিনি ও তাঁহার মধ্যম শত্ৰুচন্দ্র সমগ্র বিষয় তুল্যরূপে, এবং মহাব্যাধিগ্রস্ত কার্য্যক্ষম কনিষ্ঠ নির্ধিরাম, মাত্র দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি, ও নগদ ৪ লক্ষ টাকা। এই অসদৃশ ভাগই, কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর, পালচৌধুরী এষ্টেটের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠে। নির্ধিরামের পুত্র বৈদ্যনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া প্রাণ্ডক্স অসদৃশ বণ্টন আইন বিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া সুপ্রীম কোর্টে যে সর্ব্বস্বংশী মকদ্দমা উপস্থাপিত করেন এবং যাহা ১৮২১ খ্রঃ হইতে ১৮৫০ খ্রঃ মধ্যে চারিবার বিপুল অর্থব্যয়ে বিলাতে প্রতিকউললে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরীত হয়, তাহাতেই পালচৌধুরী এষ্টেটের অবস্থা হীন হইয়া পড়ে, এবং মকদ্দমার খরচ কুলাইতে পালচৌধুরীদিগের সোনার জমিদারী সীতোর বিক্রয় হইয়া যায়।

এই হুর্দ্দিনে পালচৌধুরী এষ্টেট রক্ষা করিতে, শত্ৰুর বংশে পরম মেধাবী জয়গোপাল জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিষয়ের সুচাক্ষুবন্দ্যোবস্ত করিতে না করিতে নির্দারুণ কাল তাঁহাকে ক্ষোভে টানিয়া লয়। একটী মাত্র কন্যা রাখিয়া মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে ১২৭৬ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপযুক্ত সহোদর পালচৌধুরীগণের পরিত্রাতা শ্রীগোপাল তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া, পালচৌধুরীর এষ্টেট পুনঃসংস্থারে ও পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করেন। শ্রীগোপাল, স্বীয় আনৌকিক রূপে ও গুণে কি দেশীয় কি ইউরোপীয় সকলেরই নিকট বিশেষ সম্মানিত হইলেন। একদিকে তিনি যেমন নিজের বংশের

উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন, যেমনি আবার সাধারণের হিতকর কার্যেও তাঁহার সবিশেষ উৎসাহ দেখা বাইত। রাণাঘাটের মিউনিসিপালিটি, রাণাঘাটের ইংরাজী বিদ্যালয়, কৃষ্ণনগর কলেজ গৃহ নির্মাণে যুক্তহস্তে সাহায্য, তাঁহার উদ্যম ও মহৎ হৃদয়ের সাক্ষ্য দিতেছে। ১২৭৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার বংশের গৌরব, প্রীতিঃস্মরণীয় পুত্র সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন এবং আপনার মহৎ হৃদয় ও দেব চরিত্র গুণে জনসাধারণের প্রীতিভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইলেন। রাণাঘাট মহকুমাবাসী জনসাধারণ ও তাঁহার মর্যাদাপন্ন বহু বান্ধব তাঁহার লন ১৩০২ সালে মৃত্যুর পর একটি সুবৃহৎ গৃহ নির্মাণ করিয়া Surendra Nath Memorial Hall নামে উহা তাঁহার পবিত্র স্মৃতিতে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার প্রতি তাঁহাদের অপকট অমুয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সুরেন্দ্রনাথের সাধের জমিদারী পঞ্চায়ৎ গৃহে কলিকাতার এবং রাণাঘাট স্কুলে যথাক্রমে তাঁহার তৈলচিত্র ও মর্ম্মর স্মারকলিপি স্থাপিত হইয়াছে।

উপরোক্ত মহানুভব ব্যক্তিগণ ব্যতীত পালচৌধুরী বংশে যে সকল মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শঙ্কর পোড় বাবু অচ্যুত পালচৌধুরী মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। নীল কমিসনে ইঁহারি সাক্ষ্যের প্রজ্ঞা হিঁতৈবী বঙ্গেশ্বর প্রাপ্তি বাহাদুর বিশেষ প্রশংসা করেন। কথিত আছে ইঁহার ন্যায় উন্নতহৃদয় “বাবু” তদানীন্তন কালে সমগ্র বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় ছিল না। ইঁহার স্মৃতির সহিত পরম অত্যাচারী জমিদার বলিয়াও খুব অধ্যাত্তি ছিল।* তখন এতদঞ্চলে লোকে অপরকে গালি দিতে হইলে, “তোকে জয়চাঁদে পাক” বলিয়া গালি দিত।

এই বংশে কৃষ্ণ চন্দ্রের পুত্র বাবু জৈবর চন্দ্রের নামও উল্লেখযোগ্য। সুপ্রসিদ্ধ পালচৌধুরী মামলার ইনিই প্রধান উদ্যোগী। নিদিবাসের পুত্র বৈদ্য

* ইঁহাদের অত্যাচার লব্ধে একজন সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন :—

“Some of the Zemindars here have been very oppressive and were in the habit of rubbing a hot iron over a man's body and making him then sign stamped papers.

Vide Calcutta Review Vol VI No. XI and XII

নাথকে দিয়া ইনিই সর্ব্বদ্বন্দ্বী স্বর্গদ্বার প্রাপ্ত করিয়া বান ইহাই রাণাঘাটে “বৈদ্যনাথী হাঙ্গামা” বলিয়া খ্যাত। ইহার কীর্ত্তির মধ্যে কয়েক বৎসর ধরিয়া লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে বাৎসরিক রথযাত্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে এই উপলক্ষে ৮ পুরুষোত্তমের রথের লোক সমাগম হ্রাস হইয়া এই স্থানের রথে সেই মত লোক সমাবেশ চটাইছিল।

কৃষ্ণ চক্কের পৌর বিবেকের পাল চৌধুরীর নামও উল্লেখযোগ্য, তিনি এক জন তান্ত্রিকশক্তি সাধক বলিয়া বিখ্যাত।

এ বংশের বর্ত্তমান বংশধরগণের মধ্যে কৃষ্ণের বংশে বাবু ব্রজনাথ ও গোপেশ্বর পাল চৌধুরী এবং শম্ভুর বংশে বাবু নগেন্দ্রনাথ, যোগেশ্বর চন্দ্র, সতীশ চন্দ্র জ্ঞানেন্দ্র নাথ ও হরেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

নগেন্দ্র নাথ তাঁহার বংশের ও রাণাঘাটের বর্ত্তমান পরিচর স্থল। তিনি এক দিকে যেমন রাণাঘাটবাসীগণের নিকট মাজ তেমনি পবনেশ্রীও তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আসাধারণ সম্প্রতি ইনি রার বাহাহুর উপাধি পাইয়াছেন।

যোগেশ্বর চন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রমে নিত্য শত শত রোগীকে ঔষধ দিয়া রাণাঘাট সবভিভিনবাসী ব্যক্তিগণের নিকট পূজনীয় হইয়া উঠিয়াছেন। ইহারই কনিষ্ঠ সহোদর সতীশ চন্দ্র মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের একজন এটর্নী দেশের ব্যবহার সাধারণ কার্যে তাঁহার সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। হরেন্দ্রনাথ রাণাঘাটের একজন গ্রাম জমিদার।

এই সুপ্রসিদ্ধ পাল চৌধুরীগণের আশ্রয়ে থাকিরা কত বেগুনী ও জ্ঞানী ব্যক্তি প্রতিপালিত হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তবে উদাহরণের স্থলে কতিপয়ের নাম উল্লেখ করা বাইতে পারে। চতুশ্রীধারীগণের মধ্যে জয়রাম পকানন, দেব চূড়ামণি, রামকমল শিরোমণি, মধুহনন ন্যায়রত্ন, পরাগচন্দ্র তর্ক সিদ্ধান্ত, ঈশান চন্দ্র তর্ক রত্ন, তিলক তর্কালঙ্কার, প্রভৃতি; বৈদ্যগণের মধ্যে হরচন্দ্র সেন, দয়াল চন্দ্র সেন, ঈশ্বর চন্দ্র রায়, তারিণী চরণ রায়, গিরীশ চন্দ্র রায়, যোগীন্দ্র চন্দ্র সেন; গায়ক ও বাদক শ্রেণীর মধ্যে লালু কুম্ভন, বহুনাথ ভট্ট, জগদীশ গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ। গুরুপ্রসাদ বৃন্দোপাধ্যায় দেতারী বামাচরণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি; হাত্তরসিক ও কবি ছাত্তু রায়, শত্রুঘ্ন কুণ্ড ওরফে স্তম্ভাচরণ, কবি জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ও কবি কালীনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে কালী মাটার (যিনি বাবু জয়গোপাল পালচৌধুরী লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে বে



বাগাঘাটের জমিদার ও শ্রীগোপাল পাল চৌধুরী ।

নদীয়া কান্দি ।



বাগাঘাটের জমিদার ও বামলাল দে চৌধুরী ।

যাত্রাদল গঠন করিয়াছিলেন তাহার জন্ম “মালভী মাধব” নামে সুন্দর পালা রচনা করিয়াছিলেন) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য ।

একদিকে পালচৌধুরী বংশ লইয়াই যেমন রানাঘাট অপরদিকে তেমনি দে চৌধুরী বংশের নামোল্লেখ না করিলে রাণাঘাটের ইতিহাস দে চৌধুরী বংশ ।

অসমাপ্ত রহিয়া যায়, কেন না পাল চৌধুরী ও দে চৌধুরী লইয়াই রাণাঘাটের ইতিহাস গঠিত । যে সময়ে কৃষ্ণপান্তী ব্যবসা দ্বারা উন্নতি লাভ করেন, তাহারই সমকালে দে-চৌধুরীগণের পূর্বপুরুষ রামসুখ দে-চৌধুরী মহাশয়ও ব্যবসায় দ্বারা নিজের আর্থিক উন্নতিসাধন করেন । বর্তমান কালে রাণাঘাটের বড় বাজারে যেখানে ৮মদনমোহন বিগ্রহের শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত কথিত আছে সেই স্থানেই তাঁহার সর্বপ্রথম দোকান স্থাপিত ছিল, পরে ব্যবসায়ের উন্নতির সহিত মালদহ, হাটখোলা প্রভৃতি অঞ্চলে গদী বাটী নির্মাণ করিয়া বিস্তীর্ণভাবে ব্যবসা আরম্ভ করেন । এই মালদহের গদী হইতেই তাঁহাদের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয় এবং ক্রমে সেই আয় হইতে জমিদারী ক্রয় করেন । ইহাদের পূর্ব বসত বাটী নদীকূলে স্থাপিত ছিল, পরে নদীর ভাঙ্গনে বাটী ভগ্ন হইলে এবং আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইলে তাঁহারা ১১৯৮ সালে তাঁহাদের বর্তমান আবাস বাটী নির্মাণ করেন ।

এই বংশের স্থাপয়িতা রামসুখ যে কেবল মেধাবান শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন তাহা নহে ; তিনি সাতিশয় ধর্মশীলও ছিলেন । ধর্মই তাঁহার প্রাণভূত ছিল । তিনি যে “বার মাসে তের পার্করণ” ও অতিথি সেবা রূপ মহাজন্ম অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন তাঁহার বংশীয়গণ অদ্যাপি তাহা সাধ্যমত সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন । বৎসরে অন্যান্য ৬০০০ হাজার লোক আজিও তাঁহাদের দ্বারে অন্নের জন্ম উপস্থিত হয় এবং তাঁহাদের ভক্তি শ্রদ্ধাদস্ত উপহার গ্রহণ করিয়া প্রীত হয় ।

এই অতিথিসেবী বংশে রামসুখ ও যে সকল উপযুক্ত ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়া বংশের গৌরব উজ্জ্বলতর করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দাতারাম, লক্ষীকান্ত, বৈকুণ্ঠনাথ প্রমুখ রামসুখের ছয় পুত্র ব্যতীত শ্রীনাথ, রাধাময়, রামলাল দেচৌধুরী মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য । শ্রীনাথ, সত্যনিষ্ঠ ও ধার্মিক ছিলেন ; রাধাময়, ক্রিয়াশীল ও পণ্ডিতানুরাগী ছিলেন ; তাঁহার প্রপিত মুদ্রিত “নবোপাখ্যান” নামক সামাজিক নকসা তাঁহার নাম আগ্রহক রাখিয়াছে ।

বাবু রামলাল ক্রিয়াবান ও সাতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। তৎকালে “বাবু” বলিলে রাণাঘাটে তাঁহাকেই বুঝাইত। তিনি ১২৭৪ সালে মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে একমাত্র হুঁহিতা রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

বর্তমান কালে এই বংশের উল্লেখযোগ্য বংশধর বাবু পূর্ণ চন্দ্র দে চৌধুরী ইনি এবং ইঁহার ভ্রাতা শরচ্চন্দ্র, চারু চন্দ্র ও নিখিল চন্দ্র আপনাদের বিমল চরিত্র শুণে সকলের প্রিয়, বাবু পূর্ণচন্দ্র রাণাঘাটের যাবতীয় সাধারণ লোক হিতকর কার্যের একজন প্রধান উদ্যোগী। ইনি এক দিকে যেমন বিনয়ী, নম্র স্বভাব এবং বিজ্ঞ তেমনি অপর দিকে সাহিত্যানুরাগী, সজ্জনসেবী সুধী বলিয়াও খ্যাত।

এই বংশধর গণের আদি নিবাস মাটিয়ারী—যথায় নদীয়া রাজবংশের সংস্থাপক ভবানন্দ মজুমদার, বাদসাহ আকবর প্রদত্ত ফারমানে মল্লিক বংশ।

নদীয়া রাজত্ব খেলায়েৎ প্রাপ্ত হইয়া, বাগোয়ান হইতে আসিয়া, আপনায় রাজধানী স্থাপনা করেন। সর্ব্ববংশী কালের প্রভাবে এই মাটিয়ারী এখন বন্যাকীর্ণ। ভবানন্দ মজুমদার কর্তৃক এই মাটিয়ারীতে রাজধানী স্থাপনের পূর্বেও মল্লিকগণ এখানে বেশ মান সম্ভ্রমের সহিত বাস করিয়া আসিতে-ছিলেন এবং অর্থবল অপেক্ষা বিদ্যাবলে তাঁহারা জনসাধারণের প্রভাবভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। “মল্লিক”, এই বংশের বর্তমান উপাধি হইলেও, “পাল” ইঁহাদের আদি খ্যাতি। অদ্যাপি বিবাহাদি বৈদিক কার্য্য কালে নামের শেষে “পাল দাসস্ত” খ্যাতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই বংশের গৌরবশালী বংশধর শ্রীনারায়ণ, আপনায় বিদ্যা ও বুদ্ধি বলে মহামাছু দিল্লী দরবার হইতে মল্লিক এই সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, তদবধি এই বংশীয়েরা বাদশাহ দত্ত এই সম্মানকে গৌরবাস্তব মনে করিয়া আপনাদের উপাধি স্বরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ভবানন্দ মজুমদারের তিন পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দ। এই তিন জনের মধ্যে মধ্যম গোপাল নিভাস্ত পিতৃ অঙ্গুগত, বিচক্ষণ ও কর্ম্মদক্ষ-বিধায় ভবানন্দ অপর পুত্রদ্বয়ের মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া গোপালকেই খরী উত্তরাধিকারী করিয়া বান। একারণে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ পিতার সহিত বিবাদ করিয়া এক বিবস্ত্র, কার্য্যদক্ষ, বহু ভাবাবিৎ মন্ত্রী সমভিষ্যাহারে দিল্লী গমন করেন ও তথায় আপনায় বিদ্যা ও বুদ্ধি বলে ও উক্ত কর্ম্মচারীর লিপি কুশলতায় বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিয়া পরগণা উজ্জ্বল প্রভৃতির উপর চিরস্থায়ী

দখলের ফারমান লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। উক্ত রাজকর্মচারীর লিপি কুশলতার পুরস্কার স্বরূপ বাদসাহ তাঁহাকে “মল্লিক” বা “মুল্লেশক” আখ্যা প্রদান করেন। বাদসাহ দত্ত সম্মান ও ভূম্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করিলে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি কনিষ্ঠ গোপাল প্রাপ্ত হইলেন। গোপালের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাধব পিতৃ রাজ্যের অধিকারী হইয়া মাটীগারী হইতে রেউই নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন; এই রেউই বর্তমান কৃষ্ণনগর। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হইলেও কার্যদক্ষ বিধায় রাজা গোপাল নারায়ণকে রাজকার্য্য হইতে অবসর দেন নাই, এই সময় হইতেই নদীয়া রাজ বংশের সহিত মল্লিক বংশের একটা যেন স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পরবর্ত্তী কালে মাটীগারী হইতে কৃষ্ণনগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে রাজাগণের সহিত মল্লিকগণও তাঁহাদের বাসস্থান উঠাইয়া রেউইতে আসিয়া নূতন বসতবাটা নির্মাণ করেন। এই সময়ে মল্লিকগণের আত্মীয় স্বজন ও অমুগত জন এত অধিক ছিল যে রেউইয়ের যে পল্লোতে আসিয়া তাঁহারা শত শত রম্য সৌধ শ্রেণী নির্মাণে বসবাস করিতে লাগিলেন তাহা “মল্লিক পল্লী” বলিয়াই খ্যাত হইয়া উঠিল। রেউই কৃষ্ণনগর নামে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং প্রাচীন কৃষ্ণনগরের বহু কল্পনাতে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মল্লিক বংশীওগণও কালের ক্রোড়ায় কতক ধ্বংস কতক স্থানান্তরিত হইয়া কত দূর দেশে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাচীন্যবোধ আদি পুরুষগণের স্থাপিত মল্লিক পল্লী, তাঁহাদের পরিত্যক্ত সুবিস্তীর্ণ মল্লিক পুষ্করী প্রভৃতি কৃষ্ণনগরে আজিও তাঁহাদের স্মৃতি সম্যক জাগরুক রাখিয়াছে। মল্লিকগণ কৃষ্ণনগরে আসিয়া বাসস্থান নির্মাণ করিলে নদীয়াধিপতি রাজা রাধব, মল্লিকবংশের প্রতি তাঁহার বংশের স্বভাবগত ভালবাসা ও করুণা প্রদর্শন করিবার জন্ত বংশাঙ্ক-ক্রমিক এই বংশীয়গণকে তাঁহার প্রধান করদাত্তরূপে অঙ্গীকার করিয়া লইলেন এবং প্রতি বৎসর শুভ পুণ্যাহর দিনে এই বংশীয়গণের নিকটেই রাজ্যের মধ্যে সর্ব্ব অধম কর্ত্তব্যের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। এই বংশীয়গণ বংশপরম্পরায় তাঁহাদের ভূস্বামী দত্ত এই সম্মান বহদিন যাবৎ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি কিছুদিন হইতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম সাধিত হইয়াছে। মহারাজ কলচরোদয় সময় পর্যন্ত রাজ সংসারের সহিত এই বংশীয়গণের বিশিষ্ট সম্বন্ধে

পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত আছে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে কাহাকেও পরিচিত হইতে হইলে এই বংশীয়গণের শুভ দৃষ্টি ব্যতীত সে কার্য সম্পাদিত হইতে পারিত না। এই সময়ে কৃষ্ণনগরের আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনার সহিত মল্লিকবংশের নাম বিজড়িত দেখা যায়। সেটা মল্লিকদিগের বারোহিয়ারী পূজা। কথিত আছে একরূপ সমারোহে বারোহিয়ারী পূজা বঙ্গদেশে আর কখনও হয় নাই। স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই কার্যের অধ্যক্ষ হইতেন। এই বারোহিয়ারী মণ্ডপে মাতা দর্শভূজার সম্মুখে প্রতি বৎসর লক্ষ বলি প্রদান করা হইত।

এই সময়েই এই বংশীয় কতিপয় উদ্যমশীল যুবক ঢাকা, শান্তিপুর প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ স্থান হইতে বহু যুদ্ধার সূক্ষ্ম মসলিন সংগ্রহ করিয়া ইউরোপে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই ব্যবসারে উন্নতি হইলে, তাঁহারা ঢাকা, এনাতেগঞ্জ, কলিকাতা ও শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি কাপড়ের আড়ত খুলিয়া দেন এবং রাণাঘাটে একটা নীলকুঠী স্থাপনা করেন। এই সময়ে বস্ত্র ব্যবসারে তাঁহাদের এতই উন্নতি হইয়াছিল যে কথিত আছে তাঁহাদের বাটীর সামান্য দাসদাসী পর্যন্ত সর্বদা ঢাকাই সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিত। এই সকল আড়তের মধ্যে শান্তিপুর এবং কৃষ্ণনগরের সম্মিধ্য বলিয়া রাণাঘাটের আড়তেই তাঁহারা অধিক ভরাভর করেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের লোকান্তর হইলে এই বংশীয় পরম ভাগবত হরেকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় কৃষ্ণনগরের বাস পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে রাণাঘাটে আসিয়া বাসস্থান নির্মাণ করেন। রাণাঘাটের সিদ্ধেশ্বরী তলায় সুবৃহৎ বাসবাটা নির্মাণ করিয়া তাঁহারা যেরূপ সমৃদ্ধির সহিত বারোমাসে তের পার্বণের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন তাহা রাণাঘাটে আজিও প্রবাদের ভাষ্য হইয়া আছে। রাণাঘাটে পালচৌধুরীগণের প্রাকৃত্যবও এই সময়ে। কৃষ্ণপান্ডী আপনার অসাধারণ অধ্যবসায়, সরল হৃদয় ও উন্নত চরিত্র বলে যে কুলের তুল্য ঐশ্বর্য উপার্জন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তদীয় বংশের কেহ কেহ বিষয়মদে মত্ত হইয়া উহার অপব্যবহার আরম্ভ করেন। এবং ধনমদে মত্ত হইয়া দারুণ পরশ্রীকাতর হইয়া উঠেন এবং মল্লিকদের সহিত সর্বদা নানামতে কলহের সূত্রাঙ্গুসন্ধান করিতে থাকেন। একে তখন ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবনতির সূত্রপাত হওয়ায় মল্লিকবংশীয়গণ ব্যবসায় লইয়া ব্যতিব্যস্ত, তাহাতে পালচৌধুরীদিগের এই অমার্জিক বিবেকে উন্মত্ত ও বিরক্ত হইয়া

১২৫০ সালে তাঁহাদের বিপদাপদের সহায় শ্রীধরকে লইয়া তাঁহারা রাণাঘাট ত্যাগ করেন ।

রাণাঘাট হইতে পতিত পাবন মল্লিক মহাশয় ও তাঁহার ৭ ভাই সপরিবারে কলিকাতায় তাঁহাদের প্রিয় স্নেহ নবীন কৃষ্ণ সিংহের বাটীতে গমন করেন এবং তথায় তাঁহার সাহায্যে বংশবানীতে নীলের কুঠী চালাইয়া লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করেন । তাঁহার সমস্ত জীবন উদ্যোগী পুরুষোচিত গুণাবলীতে সমৃদ্ধ । ১২৫৩ সালে নীলের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া তিনি কলিকাতায় মহাসমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন । এতদুপলক্ষে কলিকাতায় ও রাণাঘাটের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও ভিলি সমাজ আহ্বান করিয়া তিনি তাঁহাদের যথোপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন । বিশেষতঃ এই উপলক্ষে তাঁহারই ভবনে সর্বপ্রথম কলিকাতার কায়স্থ বাবুদের হুই প্রধান সমাজের (সিংহদের ও শোভা-বাজার রাজাবাবুদের) সমন্বয় হয় ।* ১২৫৪ সালে তাঁহাদের নব সৌভাগ্যের উদয় হইলে, রাণাঘাটের পালচৌধুরীবাবুগণ আপনাদের ভ্রম বুঝিয়া ক্রটি স্বীকার পূর্বক বহু যত্নে তাঁহাদিগকে বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ করিয়া পুনরায় রাণাঘাটে আনয়ন করেন, তদবধি ইঁহারা রাণাঘাটে বাস করিয়া আসিতেছেন । এই বংশের বর্তমান বংশধরগণের মধ্যে স্নেহবান বাবু রাখাল দাস মল্লিক ও বাবু কালী কুমার মল্লিক মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য

বাবু কালীকুমার রাণাঘাটের যাবতীয় সাধারণ হিতকরী কার্যের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট । একমাত্র ইনিই রাণাঘাটে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়া যত দিন “Self Government” প্রবর্তিত হইয়াছে তত দিন হইতে একাদিক্রমে অদ্যাবধি অত্রস্থ অধিবাসীগণ কর্তৃক মিউনিসিপ্যাল কমিসানার নির্বাচিত হইয়া আসিতেছেন, ইহাই তাঁহার প্রতি সাধারণের প্রীতি নিদর্শনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মনে হয় । ইঁহার হুই পুত্র, শ্রীকুমদনাথ ও শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ মল্লিক । কুমদনাথের শ্রীশচীন্দ্রনাথ ও নৃপেন্দ্রের শ্রীবিজেন্দ্রনাথ নামে হুইটী নবকুমার জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । কালীকুমারের ভ্রাতৃপুত্র ভুজেন্দ্রনাথ ও তৎপুত্র রমেন্দ্র নাথ ।

ভিলি কুলে অস্পষ্ট প্রাচীন বংশের মধ্যে ৬জগন্নাথ প্রামাণিকের বংশাবলী

* এই সময়ের “প্রভাকর” ও ভাস্কর কান্ধন সংখ্যা দ্রষ্টব্য ।

উল্লেখযোগ্য। এই বংশের বর্তমান ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীমতিলাল প্রামাণিক ও ওড়ার উপযুক্ত গুণী পুত্র বাবু জ্যোতিচন্দ্র ও সতীচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীরের মধ্যে রাণাঘাট নাসড়ার আদিম অধিবাসী বোববংশ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান কালের মধ্যে দত্ত বংশের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাশ্মীর কুলের বিখ্যাত ব্যক্তিগণের মধ্যে ব্রাজিলের সৈন্যদল স্বনাম প্রসিদ্ধ কর্ণেল হুরেশ বিখ্যাসের নাম সর্বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৮৬১ খ্রষ্টাব্দে রাণাঘাটে মাতুলালকে জয়গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নিবাস নদীয়া কৃষ্ণগঞ্জের অনতিদূরে নাথপুর। হুরেশচন্দ্র ১৮৭৪ খ্রষ্টাব্দে স্বষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। এই ধর্মান্তর পরিভ্রমণের জন্য তিনি এই সময় পিতৃ পরিভ্রমণ হইয়া নিতান্ত অর্থ কষ্টে পতিত হইলেন, পরে ১৭ বৎসর বয়সে জাহাজের খালাসীরূপে বিলাতে গমন করেন। সেখানে বাইরা তিনি নানারূপ কষ্টসাধ্যকাধ্যে সামান্য অর্থ উপার্জন করিয়া একদল ভ্রমণকারী সার্কার্স দলের সাহিত নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া ব্রাজিলে উপনীত হইলেন। তথায় কোন এক ভীষণ দুহিতা তাঁহার প্রেমে পতিত হইয়া জাহাকে পতিত্রে বরণ করিলে তিনি তদবধি ব্রাজিলেই রহিয়া যান, এবং ঐর পত্নীর ইচ্ছানুযায়ী ১৮৮৭ খ্রষ্টাব্দে সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করেন। ১৮৯০ খ্রষ্টাব্দে নিজের কৃতিত্বে ও অসীমসাহসীকতায় সৈনিক বিভাগের নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লেফটেন্যান্ট পদে উন্নীত হইলেন। পরে ১৮৯৯ খ্রষ্টাব্দে ব্রাজিলের রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় হুরেশচন্দ্র সাধারণ তত্ত্ব দলে যোগদান করিলে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়। এই সময়ে দেশে পুনর্বিপ্লব উপস্থিত হইলে যে সকল সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় তাহাতেই অনন্ত সাধারণ সাহসীকতা ও বীর্যবত্ব প্রদর্শন করিয়া কর্ণেল পদে উন্নীত হইলেন এবং এইরূপে তিনি জগতের ইতিহাসে আপনার নাম চিরবিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৫ খ্রষ্টাব্দে ২২ সেপ্টেম্বর ৪৫ বৎসর বয়সে পুত্র কলজাদি রাখিয়া তিনি ব্রাজিলে পরলোক গমন করেন।*

রাণাঘাটের আধুনিক বৃন্দাবলী ও সভাসমিতির মধ্যে ৮সিঙেশ্বরী প্রতিমা ৮নিষ্কারিণী দেবীর মন্দির, পালচৌধুরী বাবুদিগের বৃহৎ প্রাসাদ, রেলওয়ে স্টেশন,

* এই উদ্যমশীল মহাপুরুষের সম্যক জীবনী জানিতে হইলে এইচ নত কৃত “জীবনী” ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রত্যয়।

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী মেমোরিয়াল হল ও পাবলিক লাইব্রেরী *, মিত্রসভা, দেচৌধুরী বাবুদের অতিথিসেবালয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষা সামগ্রীর মধ্যে পিতলের ছবিযুক্ত বৈঠকাদি, এবং এখানকার কুস্তকার-
গণের নিশ্চিত মাটির সামগ্রী ও খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে পানভুয়া ও সন্দেশ, কুশামন,
পাটী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চাকদহ ।

চাকদহ বর্তমান ই, বি, এম রেলের একটা ষ্টেশান। কলিকাতা হইতে ৩৯ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানটা বহু কালের প্রাচীন। প্রবাদ, ভদ্রীধ যখন স্বর্গ হইতে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করেন তখন এখানে তাঁহার রথের চক্র প্রোথিত হয়। যায় তাই এখানকার নাম হয় চক্রদহ, অপভ্রংশে এক্ষণে চাকদহ হইয়াছে। কেহ কেহ ইহার নিকটবর্তী গ্রাম মনসাপোতাকেও পৌরাণিক যুগের সময় উৎপন্ন বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে চাকদহ, মনসাপোতা, অশোড়া প্রভৃতি স্থানগুলির সম্মিলিত নাম প্রহ্মন্ন নগর। দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রহ্মন্ন, নিম্ববংশের তদানীন্তন অধিপতি সম্ভরাসুরকে বধ পূর্বক এখানে পাতিত করেন এবং নিজ নামে এই স্থানের নাম প্রহ্মন্ন নগর রক্ষা করেন। তৎপূর্বে ইহার নাম ছিল ঋক্ষবন্ত নগর। এই প্রবাদের কোনও ঐতিহাসিক মূল্য থাকুক আর নাই থাকুক এখনও এখানে একটা দীর্ঘিকা প্রহ্মন্ন হ্রদ নামে খ্যাত এবং জমিদারগণের প্রাচীন কাগজাদিতেও উহার প্রহ্মন্ননগর নামের পরিচয় পাওয়া যায়। চারি শত বৎসর পূর্বেও স্বর্গীয় প্রধান রঘুনাথন তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব “মুক্ত বেণী” প্রয়াগের স্থান নির্দেশ কালেও ইহাকে প্রহ্মন্ননগর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

“প্রহ্ম্য নগরাদ্ যাম্যে সরস্বত্যা স্তথোত্তরে ।

তদ্বিধা প্রয়াগস্থ পদ্মাতো যমুনা গতা ॥”

* এই লাইব্রেরীটি ইং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ৮শ্রীল চন্দ্র বোস ও কতিপয় উদ্যমশীল যুবক কর্তৃক ট্রুডেন্ট লাইব্রেরী নামে স্থাপিত হইলে পরে ইংরাজী ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইহা রক্ষাশীল নন্দিক বংশের অন্ততম বংশধর বাবু কালীকুমারের সম্মান তথা ৮মহেন্দ্রকুমার নন্দিকের পুত্র স্বত্তিতে ইং ১৯০৮ সালের Act XXI আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্টে রেজিষ্টারী হইয়া পাবলিক লাইব্রেরী নাম প্রাপ্ত হয়, এবং "সরেন্দ্র স্মৃতি গৃহে" স্থায়ীরূপে স্থাপিত হয়।

এই বচন অনুসারে সরস্বতী নদীর উত্তরে দক্ষিণ প্রয়াগ এবং তাহারও উত্তরে প্রহ্মম্ননগরএর স্থান নির্দিষ্ট হয়, তাহা হইলেই “চাকলহ মণ্ডল”ই প্রহ্মম্ননগর বলিয়া খ্যাত ছিল অনুমিত হয়।

ব্রহ্মম্নন বখন ইহাকে প্রহ্মম্ননগর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন সেই সময়ে বিভিন্ন ঘটকগণের কারিকার এই স্থানের “আচারিতা” নামও দেখা যায়। “আচারিতা” দেবীঘর ঘটকের ৩৬ মেলের এক মেল। ঈমিদারি কাগজাদিতেও ইহার আচারিতা নাম পাওয়া যায়। এই প্রহ্মম্ননগর পূর্বে বহু দেব মন্দির ও মঠাদি দ্বারা সুশোভিত ছিল জানা যায়। এখনও হুই একটী প্রাচীন দেবতাহীন মন্দির এখানে বিদ্যমান আছে।*

বহু পূর্বের সঠিক বিবরণ জানা না যাইলেও দেড়শত বৎসর পূর্ব হইতে ইহার যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে এই স্থানটী তদানীন্তন কালের সমৃদ্ধ স্থানের অত্যন্তম শ্রীসম্পন্ন গ্রাম ছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও ইহা মহারাজের চারি সমাজের এক সমাজ বলিয়া পরিচিত ছিল। এখানে ও ইহার নিকটবর্তী পালপাড়, মনসাপোতা, জশোড়া প্রভৃতি স্থান সকলে বহু টোলধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল। “কুলাবধ” প্রভেতা ভায় ও ভস্কের

* There is an old temple at Chagdaha which at present lies in a neglected and dilapidated state. The owners Babu Kalikumar Chaudhuri and others of Palpara having taken no care about its preservation. The owners are willing to give up their right to the temple if it is kept in repair by Government, and if they are allowed to use it as a place of worship in the customary way. There has been no idol in the temple nor is it used as a place of regular worship now.

The temple is of ordinary size and has ornamental cut brick-work. Its age may, as it appears and as has been reported by persons who had the inscription read, be 500 years. There is no idol there now. People say there was a lingam in it. Mr. J. S. M. Beglar, when Archaeological Surveyor of Bengal took measurement of it and also a photograph. There were two inscriptions on stone, which were taken off by Roy Ramsankar Sen, Subdivisional Officer of Ranaghat, and although afterwards returned, are not forthcoming.

Vide the List of Ancient Monuments in the Presidency Division, Published by the Government.

পরম পণ্ডিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাঁহার কালে এ স্থানের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। পালপাড়ার তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে লর্ডবিশপ্ হেবার সাহেব তাঁহার রোজ নামচায় এই পণ্ডিতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীশঙ্কর মিশিনারি মিঃ কেরি এই সময়ে এই সকল স্থানে অত্যন্ত ব্যাঘ্রের উপদ্রব ছিল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আর এক জন সাহেব ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দেও এখানে ব্যাঘ্রের উপদ্রবের বর্ণনা করিয়াছেন। এখানকার নিবিড় জঙ্গলে ব্যাঘ্রাদির ন্যায় বহু নবাকায় পশুও আশ্রয় লইয়া চুরি ডাকাতি প্রভৃতি কার্যে লিপ্ত ছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে হানিক নামে এক বিখ্যাত দস্যু ও তদীয় ৮ জন সহচরের এই স্থানের বাজারে নৃশংস ভাবে খুন ও ডাকাতি করা অপরাধে প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।*

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এখানে কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক একটা ব্রাহ্ম সভা ও স্কুল স্থাপিত হয় এবং এই বৎসরে এক জন নৌলকর সাহেব কর্তৃক আর একটা ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। ইহার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪০ জন। এখানে তখন ২টা স্মৃতির টোল ছিল। তাহার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩২ জন। ইহা তখন রাণাঘাটের পাল চৌধুরী বাবুদিগের জমিদারী ভুক্ত ছিল, এবং গঙ্গাতীরে তাঁহাদের গদী বাটীও ছিল। তখন চাকদহের বাজার খুব সমৃদ্ধ ছিল, অন্যান্য দুইশত বৃহৎ আড়ত ছিল। গঙ্গাবক্ষ যাত্রীবাহী ও ভারবাহী নৌকায় সর্বদা সমাচ্ছন্ন থাকিত। এক্ষণে গঙ্গা চাকদহ হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ায় ও রেল পথের বিস্তার হওয়ায় বাজার, গঙ্গা সমস্তই লোপ পাইয়াছে, এবং গঙ্গাতীরস্থ পুরাতন চাকদহের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া রেলওয়ে স্টেশন চাপিয়া নতুন চাকদহ গ্রাম গঠিত হইয়াছে। এই স্থান পূর্বে হিন্দুগণের অস্তিম তীর্থ করিবার জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার শ্মশান মহা শ্মশান বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান হইতেও শব লইয়া সর্বদা এখানে লোক আসিত। কালী প্রসাদ পোন্ধার নামে যশোহরের এক জন সদাশয় ধনী সুবর্ণবর্ষিক যশোহর হইতে চাকদহ পর্য্যন্ত, যশোহর বাসীর গঙ্গানানের সুবিধার জন্য এক প্রশস্ত বস্ত্র নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা এখনও বিদ্যমান থাকিয়া তাহার স্মৃতি আগন্তুক রাখিয়াছে।

পূর্বে প্রতি বৎসর বারুণীর সময়ে এখানে গজানানার্থ বহু জন সমাগম হইত। এখানকার বাৎসরিক ব্যয়োগ্যি পূজা পূর্বে খুবই জাঁক জমকে হইত। এখনও প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমাষ উহা সমাহিত হইয়া থাকে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মে এখানে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইয়াছে। ইং ১৯০৯ সালে এখানে একটা এনট্রান্স স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। উপস্থিত ছাত্র সংখ্যা প্রায় দুই শত।

চাকদহ মণ্ডলের অধিবাসীগণের মধ্যে নিম্নলিখিত বংশ ও ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

চাকদহ কাজীপাড়ার কাজী বংশ, চাকদহের দত্তবংশ, এই বংশীয় শ্রীযুত বাবু কালীচরণ দত্ত মহাশয় চাকদহের বর্তমান স্কুলের প্রাণ স্বরূপ। জশোড়ার গোস্বামী বংশ; মিত্রবংশ, এই বংশের বর্তমান বংশীয়দের মধ্যে শ্রীঅক্ষয়কুমার মিত্র ও শ্রীবসন্ত কুমার মিত্র উল্লেখযোগ্য; মজুমদার (গুহ) বংশ, বটিক বংশ; গোড়পাড়ার মিত্র বংশ, বহু বংশ, সিংহ বংশ, মুখোপাধ্যায় বংশ; পালপাড়ার বারেন্দ্রগণের মধ্যে সান্যাল চৌধুরী বংশ, ঢোল বংশ, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে চট্টোপাধ্যায় বংশ, চৌধুরী বংশ; মনসাপোতার বন্দোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় বংশ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এই সকল বংশাবলীর মধ্যে আবার কাজীপাড়ার কাজীগণই সর্বিশেষ প্রাচীন বংশ। এই কাজীপাড়ার প্রাচীন নাম পাজনোর, এখনও এতদঞ্চল পরগণা পাজনোরের অধীন। পূর্বে এই কাজীপাড়া কাজী মহল্যা, মুনসী মহল্যা, মুকতী মহল্যা প্রভৃতি বহু পন্নীতে বিভক্ত ছিল। প্রাচীন কাজীপাড়ার স্থান পরিবর্তন হইয়াছে এক্ষণে যাহা। কাজীপাড়া নামে খ্যাত উহা পূর্বে আচাষিতা সহরের অন্তর্গত ছিল। কাজীদিগের বর্তমান আবাস ব.টা যে স্থানে উহাও ঐ স্থানে ছিল না। কথিত আছে এই কাজীগণের পূর্ব পুরুষগণ পাণ্ডুরার যুদ্ধ কালে এ দেশে আগমন করেন। এই বংশে বহু বিদ্বান ক্রিয়াবান দানশীল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, উন্মধ্যে হজরত আবদুল স্তুর মরছুম নামে একজন সিদ্ধ পুরুষ জন্মলাভ করিয়াছিলেন। ইহার নিম্নতম ৭ম পুরুষে মুনসী এতে হামদীন মহম্মদ মরছুম ওরফে বেলাত মুনসী জন্মলাভ করেন, তিনি মহা বিদ্বান ছিলেন, দিল্লী তখতের শেষ বাদশাহ সাহ আলমের সময় তিনি বাদশাহের

প্রয়োজনে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ বিলাত গমন করেন, এই কালে তিনি লর্ড ক্রাইবের মীর মুনসী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ।

কাজী পাড়ার মুন্সী বংশেও বহু মহাত্মা জন্মলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মুনসী ছলিমুল মরচুম এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন । কথিত আছে নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁহার প্রতি কোনও কারণে বিরক্ত হইয়া সেকেন্দ্রা নামক যন্ত্রে তাঁহার প্রাণবধের আজ্ঞা দেন, কিন্তু কাজীবংশীয় প্রাক্তন বেলাত মুনসী লর্ড ক্রাইবের দ্বারা নবাবকে অনুরোধ করিয়া সে যাত্রা তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ।

কাঁচড়াপাড়া ।

কাকনপল্লী বা বর্তমান কাঁচড়াপাড়া নদীয়ার একটা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম । বহু পূর্বকালে ইহার নাম ছিল নবহট্টগ্রাম । এখান হইতেই বৈদ্যদিগের নব হট্টীয় সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে । তৎপরে এই স্থানে কুমারহট্টের* অন্তর্গত ছিল এবং পরস্পর সংযুক্ত ছিল । অধুনা বাগের খাল নামে যে খালটি কাকন পল্লী ও কুমারহট্টের মধ্যে বিদ্যমান আছে সেটা মাল্লিক সাহেব নামক কোনও এক ধনী কর্তৃক খাত হয় । এখনও কাকনপল্লী হাবলী সহর পরগণার অধীন ও

* কুমারহট্ট বা হাবলী সহর বা বর্তমান হালিসহর পূর্বে নদীয়ার মধ্যে একটা পণ্ডিত প্রধান বিশিষ্ট গ্রাম ছিল । ঐতিহ্যমহাশয় এই স্থানের যুক্তিকা গ্রীষ্ম ঈশ্বরপুরীর জন্মভূমি বলিয়া ভুলভ জ্ঞানে, যত্নে ধারণ করিয়াছিলেন । মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও এ স্থানে বিদ্যার চর্চা বিশিষ্টরূপে ছিল । সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন এই মহাতীর্থে বসিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এখনও তাঁহার পঞ্চমুণ্ডির আসন বিদ্যমান রহিয়াছে । গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র প্রসাদের অমৃত্যবধিক সম্মুখ কবো ও গীতে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কবিরঞ্জন উপাধী প্রদান করিয়াছিলেন । রাম প্রসাদের সময়ে এখানে আজু গোঁসামী নামে একজন মেধাবী কবি প্রসাদের যোগ্য প্রতিদ্বন্দী হইয়াছিলেন । বর্তমান সময়ে এখানকার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে বঙ্গের ভূতপূর্ব স্তানিটরী কমিশনার সার্জেন্ট কর্নেল কে, পি, গুপ্ত মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়, শিশুশিক্ষার ইত্যাদি তাঁহার কীর্ত্তি যোগ্য করিতেছে ।

কুমারহট্ট সমাজভুক্ত। বর্তমান কাঞ্চনপল্লী গ্রামটী গঙ্গাযমুনার সঙ্গম স্থানের চরভূমির উপর স্থাপিত। পূর্ব খ্যাত কাঞ্চনপল্লী কালের কুটীল গতিতে এখন গঙ্গাবক্ষে বিরাজ করিতেছে। বৈষ্ণবদিগের প্রসিদ্ধ পাঠশালা এখানে দেখা যায় যে কাঞ্চনপল্লী গ্রামটী সেন শিবানন্দের পাঠ বলিয়া উক্ত আছে। শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই শিবানন্দের বাটীতে আগমন করিয়াছিলেন ও এখান হইতে শান্তিপুর অর্ধদ্রত মন্দিরে, পরে তথা হইতে নবদ্বীপে জননী দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। সেন শিবানন্দ নিজ গুরু শ্রীনাথ আচার্য্যের নামে যে কৃষ্ণ রায় বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন, ঐ বিগ্রহ প্রথমে শ্রীনাথ আচার্য্যের দৌহিত্র শ্রীমহেশের নিজ বাটীতে থাকিতেন; ঐ বিগ্রহের পদ্মাসনে এই শ্লোকটী খোদিত আছে—

“স্বস্তি শ্রীকৃষ্ণদেবায়ঃ প্রোক্তরামীং স্বয়ং কর্ণে।

অনুগ্রহায় দ্বিজঃ কিকিং শ্রীযঃ শ্রীনাথ সঙ্গকঃ॥”

কথিত আছে বঙ্গের শেষ বীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লাতাত পুত্র যশোহরজী২ কচুরায় প্রতাপের বিরুদ্ধে নাশিক করিতে দিল্লীদরবারে যাইবার কালীন কাঞ্চনপল্লী হইয়া গমন করেন; তখনও কাঞ্চনপল্লী, জগদল প্রভৃতি স্থান যশোহর রাজ সংসার ভুক্ত ছিল। তিনি যাত্রাকালে কৃষ্ণরায় বিগ্রহ দর্শন করিয়া এইরূপ মানসিক করেন “যদি এ যাত্রায় আমি দরবারে ফতে হই, তাহা হইলে ঠাকুরের একটী শ্রীমন্দির নির্মাণ করিয়া দিব।” সেবার তিনি দরবারে সকল মনোরথ হওয়ার, প্রত্যাগমন কালে পুনরায় কৃষ্ণরায়কে দর্শন করিতে আসেন এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার শ্রীমন্দির, ভোগমন্দির, দোলমঞ্চ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া দেন; এবং ঠাকুরের নিত্য সেবা নির্বাহার্থ কৃষ্ণবাটী নামে একখানি নিষ্কর তালুক জায়গীর দেন। এখনও উক্ত তালুক তাঁহার সেবার্থ নিয়োজিত আছে। লড’ কর্ণওয়ালিশ দশশালা বন্দোবস্তের সময় ইহার বার্ষিক ২৮৮০০ কর ধার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পুরাতন কাঞ্চনপল্লী যখন গঙ্গায় ভাস্কনে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তখন যশোহরজিভের নির্মিত শ্রীমন্দিরও গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত হয়। বর্তমান শ্রীমন্দির বাহাভারতীয় শিল্প চাতুর্ধ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে তাহা ১৭০৭ শকে কলিকাতার প্রসিদ্ধ নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক মহাশয় দ্বয়ের ব্যয়ে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। একরূপ হৃদয় গঠন, সুঠাম মন্দির সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। শিবানন্দ সেনের পুত্র চৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রভৃতি প্রহপ্রণেতা পুরী গোদামী



ব'জা কৃষ্ণচন্দ্র স্থাপিত উদ্যার দিদি।



বাগেৰ মসজীদেৰ ভগ্নাবশেষ।

নদীয়া কাহিনী।

—যিনি মহাপ্রভুর পদসুষ্ঠ লেহন মাতেই, শৈশবে শাক্ত পাঠ ব্যতিরেকে অসাধারণ কবি হইয়া কবিকর্ণপুর নামে খ্যাত হইলেন, সেই ভক্তিময় পুরুষটী এই কাঞ্চনপদ্মীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । বঙ্গবিখ্যাত ক্রতিধর নিমট্টদ শিরো-মণি, যিনি ভাষ্যশাস্ত্রে প্রথিতনামা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ভুল্যানুভূত্যা বলিয়া খ্যাত, তাঁহারও জন্মভূমি এই কাঞ্চনপদ্মী । এতদ্ব্যতীত বঙ্গভাষাবিৎ বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এই স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করেন । প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত, অদ্বৈত রামায়ণ ও ভুলসৌদাসী রামায়ণের অনুবাদক হরিমোহন সেন গুপ্ত, জ্ঞানানব গ্রন্থ প্রণেতা প্রেমচাঁদ কবিরত্ন প্রভৃতি অনেক যশস্বী পণ্ডিত এই স্থানে প্রাহুর্ভূত হইয়া নানারূপ অমূল্য গ্রন্থাবলী রচনা দ্বারা ইহার যশস্বী সমুজ্জল করিয়া গিয়াছেন ।

কাঁচড়াপাড়া বলিলে সাধারণে কাঁচড়াপাড়া রেলস্টেশন যেখানে স্থাপিত সেই স্থানটীকে মনে করেন, কিন্তু কাঁচড়াপাড়া স্টেশনটি অধুনানদীয়ার সীমা বহির্ভূত । এই কাঁচড়াপাড়া বিজ্ঞপুরে ই, বি, রেলের গাড়ী প্রস্তুতের কলকারখানা স্থাপিত । ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে মাননীয় ডিউক অব্ কনট্ ও বহু সম্মানপদ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্, প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টর মহোদয় পক্ষী শীকার উদ্দেশে এখানে শুভাগমন করিয়াছিলেন ।

বাগের গ্রাম ।

পাঠানগণ যখন পশ্চিম ভারতে আসিয়া প্রথম রাজ্য সংস্থাপন করেন তখন, তাঁহারা নিয় বঙ্গকে, বাদা ও হুন্দরবনের অস্থাস্থকর জল বায়ুর নিমিত্ত “দোজাকু” বা নরক বলিয়া অভিহিত করিতেন । তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল এই দেশে বাস করিলে মৃত্যু অনিবার্য ; এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাঁহারা কোনও আমীর বা বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে চূড়ান্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইলে, তাঁহার বংশধোরব অনুরূপ রাখিতে, দণ্ডিত ব্যক্তির শিরঃচ্ছেদ না করিয়া, মৃত্যু নিশ্চয় জ্ঞানে এই প্রদেশে নির্বাসিত করিতেন । মালেক কাসিম নামে ঐরূপ এক আমীর হুগলীর অব্যবহিত পশ্চিমে আসিয়া বাস করেন । এখনও তথায় তাঁহার নামে একটী হাট চলিয়া আসিতেছে । মালেক মীর আমেদ বেগ নামে ঐরূপ আর এক

মন্ত্রাস্ত ব্যক্তি আসিয়া বংশবটীর অপর পারে স্রবহং বাসস্থান নির্মাণ করেন ও বিস্তারিত সৌখ্যশ্রেণী বাজার প্রভৃতি স্থাপনা করেন এবং গঙ্গা হইতে যমুনা পর্য্যন্ত একটা খাল কাটিয়া দেন ; উহাই বর্তমান কাল পর্য্যন্ত বেগের খাল অপভ্রংশে বাগের খাল নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে । গঙ্গার উপরে হুগলীর বিপরীত তটেও মীর বেগের আর একটা গড় বোষ্টত বসতবাটা ছিল, উহা এখনও মীর বেগের গড় নামে খ্যাত । অনেকে আবার বলিয়া থাকেন যে তিনশত বৎসর পূর্বে মুরসিদাবাদ নিজামৎ বংশের মালেক বারখোদাদার নামক জনৈক আমীর কোন দুর্ভাগ্যের শাস্তিস্বরূপে এখানে নির্বাসিত হইয়েন, তাহারই বাগ বাগিচা হইতে এই স্থানটা মল্লিক-বাগ নামে ও খালটা বাগের খাল নামে খ্যাত হয় ।

এই গ্রামটা হাজারই স্থাপিত হউক উহা যে এককালে শোভা সমৃদ্ধ পূর্ণ স্থান ছিল তাহা ইহার ধ্বংসাবশিষ্ট বালাখানা, রংমহল পিলখানা, গোরস্থান প্রভৃতি দর্শনে বিশেষরূপ উপলব্ধি হয় । একটা স্রবহং অর্দ্ধতর মসজিদ এখনও এই স্থানের পূর্ব সমৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ; এরূপ স্রবহং মসজিদ নিকটবর্তী কোনও জেলায় নাই । ইহা বর্তমান কালে মুন্সী বারী আবদুল আলি ও মুন্সী মহম্মদ জুল ফকর হায়দার সাহেব দ্বয়ের তত্ত্বাবধানে আছে । এই স্থানের বর্তমান অবস্থা বনাকীর্ণ জনহীন ও অত্যন্ত শোচনীয় হইলেও ৬০।৭০ বৎসর পূর্বেও গ্রামটা সমৃদ্ধিশালী ছিল । তখন এখানে সপ্তাহে ২ দিন দেশী সূতা ও দোস্তা ডামাকের হাট হইত । প্রতি হাটে প্রায় ৭০০০।৮০০০ হাজার লোক সমাগম হইত ; এই হাট একদে হরিংবাটা (স্রবহংপুরে) উঠিয়া গিয়াছে ।

* “ The island opposite Tribeny has a conspicuous place on De Barro's Map of Bengal and on that by Blaeu (Vide Pt. IV). The maps also agree with Abul Fazel's statement in the Ain, that at Tribeny there are 3 branches, one of the Saraswati on which Satgaon lies, the other the Ganga now called the Hugli and the third the Jan or Jabuna (Jamuna). De Barro's and Blaeu's map show the three branches of almost equal thickness, the Saraswati passing Satgaon and Chowna (Chaumnha in Hugli District north) and the Jabuna flowing westward to Borhan in the 24 Perganas.

Vide Journal of the Asiatic Society
Bengal, Vol XLII, 1873. Pp. 214.

বাগের খালটী এক্ষণে পূর্বকার যমুনা নদীর ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র জাগরুক রাখিয়াছে । সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী টলেমীর বর্ণনায় ইহার উল্লেখ দেখা যায় । ডি, ব্যারো ও ব্র্যাভের ম্যাপে ত্রিবেণী দ্বীপের যে মানচিত্র আছে তাহাতে কাকনপন্নী, বাগের গ্রাম প্রভৃতি স্থানগুলি দ্বীপ আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে । এই ত্রিকোণাকার ভূখণ্ডের দক্ষিণে বাগেরখাল, পশ্চিমে গঙ্গা এখনও বহত । উত্তরদিকে সুপ্রশস্ত যমুনা বহত ছিল উহার চিহ্ন এখনও কাঁচড়াপাড়া ও মদনপুরের মধ্যবর্তী বোম্বপাড়া গ্রামের উত্তর পার্শ্বে এবং মদনপুর ষ্টেশানের প্র্যাটিকরম হইতে ৫০।৬০ হাত দক্ষিণে আসিয়া পূর্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট দেখা যাইবে । ইষ্টারণ বেল্লল রেল লাইনের উচ্চ মৃত্তিকায় ইহার গতিরোধ হইয়া মূল স্রোতবেগ ব্যত হওয়ায় দিনে দিনে ইহা ক্ষীণ কায় হইয়া মূল খাত ত্যাগ করিয়া ক্ষীণ রক্তত রেখায় ভ্রায় এক্ষণে কুলীয়া গ্রামের নিকট হইতে বাগের খালের সহিত যুক্ত হইয়া বাগের খাল দিয়া প্রবাহিত হইতেছে । ডি, ব্যারো ও ব্র্যাভের ম্যাপে ত্রিবেণীতে গঙ্গা যমুনা ও স্বরস্বতী এই তিন নদীই একরূপ প্রশস্ত দেখান হইয়াছে । স্মার্ত রঘুনন্দন গঙ্গা, যমুনা ও স্বরস্বতী এই ত্রিধারাকেই মুক্ত ত্রিবেণী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন এবং এই স্থানকেই দক্ষিণ প্রয়াগ নির্দেশে ইহার উচ্চ মহিমা কীৰ্ত্তন করিয়াছেন ।* ১৮১০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট সার্ভেতে এই যমুনা ও বাগের খাল, স্পন্দর বনের উত্তর সীমা রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল । ইহা পূর্ব বাহিনী হইয়া ইচ্ছামতী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে । পূর্ব কালের অধিবাসীগণ, স্রোতের বেগে গঙ্গাগর্ভে পতিত হইবে জ্ঞানে, এই যমুনাতে মৃতদেহ ভাসাইয়া দিত । এক্ষণে এই বাগের খাল নদীয়া জেলার দক্ষিণ সীমা নির্দেশ করিতেছে ।

* “দক্ষিণ প্রয়াগ উম্মুক্তবেণী সপ্ত গ্রামাখ্যা

দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণীতি খ্যাতঃ ।।”

এই দক্ষিণ প্রয়াগ উম্মুক্ত বেণী দক্ষিণ দেশে সপ্ত গ্রামের নিকট ত্রিবেণী বলিয়া খ্যাত । প্রয়াগে যমুনা ও স্বরস্বতী আসিয়া জাহ্নবীর পুত সলিলে মিলিত হওয়ায় উহার নাম যুক্তবেণী, এই স্থান হইতে এই সম্মিলিত স্রোত জাহ্নবী খাতে প্রবাহিত হইয়া ত্রিবেণীতে মুক্ত অর্থাৎ পুনর্ব্বার বহির্গমন পূর্ব্বক পৃথক ভাবে প্রবাহিত হইয়াছেন বলিয়া এই স্থানের নাম মুক্তবেণী হইয়াছে ।

স্থল সাগর ।

এই গ্রাম খামির বর্তমান অস্তিত্ব না থাকিলেও, ইংরাজ আমলেও প্রথমে এই স্থানটী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। কালচক্রের আবর্তনে বর্তমান সময়ে স্থল সাগরের পূর্বে চিহ্ন মাত্রও বিদ্যমান নাই। পুণ্ড্রোয়া ভাগিরথীর বিষম তরঙ্গাঘাতে স্থলসাগরের স্থলস্থিতি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখনও অশীতিপর বৃদ্ধগণ স্থলসাগরের পূর্বে স্থলৈশ্বৰ্য্যের বর্ণনা করিয়া থাকেন। তৎকালে স্থলসাগর প্রকৃতই “স্থল সাগর” ছিল। রেনেলের মানচিত্রে স্থল সাগর গঙ্গা হইতে কিছু দূরে প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু কালে গঙ্গা, ক্রমে সরিয়া আসিয়া, ইংরাজের মুরসাদাবাদ হইতে অপসৃত রেভিনিউ বোর্ডের প্রাসাদোপম অটালিকাদি, যাহা দেড়লক্ষ মূদ্রা ব্যয়ে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, এবং তদানীন্তন হুবিধ্যাত ধনী, নীল কুঠিয়াল ব্যারেটো সাহেবের সৌধ শ্রেণী ও তাঁহার ১৭৮৯ খ্রষ্টাব্দে, ১,০০০ মূদ্রা ব্যয়ে নিৰ্ম্মিত রোমান ক্যাথলিক গির্জাঘর প্রভৃতি গ্রাস করতঃ ধরণী বক্ষ হইতে স্থল সাগরের চিহ্ন মাত্রও মুছিয়া লইয়াছে।

১৭৭২ খ্রষ্টাব্দে মুরসাদাবাদ হইতে খালসা দপ্তর এখানে উঠিয়া আসিবার কিছু পরেই এই স্থানটী ইংরাজদিগের আমোদ আফ্লাদের উপযোগী মনে হওয়ায়, ইংরাজবর্ষমেণ্টের পক্ষী আবাস এখানেই নিৰ্ম্মিত হয়, পরে উহা উঠিয়া বারাকপুরে যায়। সপরিবদ মাঝকুইস কর্ণওয়ালীশ সাহেব গ্রীষ্মকালে প্রায়শঃ এখানেই আগমন করিতেন। ফরাসী চন্দনদপ্তর, হুগলী, চুঁচড়া প্রভৃতি হইতে সাহেবরাও এখানে সর্বদা আমোদ করিবার জন্য আগমন করিতেন।

স্থল সাগরের সমৃদ্ধির কারণ কুঠিয়াল ব্যারেটো সাহেব। তিনি এখানে বহু বস্ত্র নিৰ্ম্মাণ ও তাহার উত্তর পার্শ্বে নিম্ন বক্ষ শ্রেণী রোপণ করিয়াছিলেন। এগুলির হুই চারিটা অদ্যাপি স্থানে স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৭৯২ খ্রষ্টাব্দে তিনি এখানে একটী মন্দের ভাটী স্থাপনা করেন। এই কালে লোকে এই স্থানকে “ছোট কলিকাতা” বলিত। ব্যারেটে এই স্থানে মদ ও নীলের কুঠী চালাইয়া এতই ধনী হইয়াছিলেন যে তিনি বলিতেন, “স্থল সাগরের গঙ্গা আমি টাকা দিয়া ভরাট করিতে পারি।” সাধারণ লোকে, তাঁহার এই অসম্ভব ধনাগম দেখিয়া তাঁহাকে পৈশাতিসম্পন্ন ও যে কোন ধাতুকে টাকায় পরিণত করিতে শক্তিশালী

মনে করিত। ইহার কুঠী বেশ সুরক্ষিত ছিল ও কুঠীর গজার দিকের অংশে কামান সাজান থাকিত। লড' ক্লাইব যখন সুখ সাগরের ওলা দিয়া পলায়ী অভিযুখে গমন করিতেছিলেন তখন ব্যারেটো তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ কামানধ্বনি করিলে ক্লাইব উহাকে শত্রুর শিবির মনে করিয়া ধ্বংস করিতে অনুমতি দেন।

পূর্বকালে সুখ সাগরের নিকটবর্তী বিষ্ণুপুর, শ্রীনগর, ভাগড়া, ও অদূরস্থিত জাগুলী প্রভৃতিতে বড়ই ডাকাতির উপদ্রব ছিল। একবার জাগুলীতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর খাজনা দখ্য কর্তৃক অপহৃত হয়। সেই সময় হইতে ইহার নাম হয় হুগুয়ারা জাগুলি। পূর্বে যখন রেল পথের বিস্তার হয় নাই এবং স্থলপথে সৈন্যাদি যাতায়াত করিত, তখন মুরসিদাবাদ হইতে কলিকাতায় বাইতে এই জাগুলীতেই সৈনিকদের পথপ্রাপ্তি নিবারণ কল্পে ছাউনি পড়িত। সুখসাগরের জমিদারী স্বত্ব রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ছিল। তিনি এখানে একটা বাজার স্থাপন করেন এবং এক মন্দির নির্মাণ পূর্বক তাহাতে উগ্রচণ্ডী দেবীর মূর্তি স্থাপনা করেন। কেহ কেহ দেবীকে সিদ্ধেশ্বরীও বলিয়া থাকেন। কালের ক্রীড়ায় এই মন্দির এখন গঙ্গাগর্ভে, সুতরাং দেবী, কৃষ্ণচন্দ্রের বংশাবলী কতক স্থানান্তরিত হইয়া হরধামে চিগ্নায়ী দেবীর মন্দিরাভ্যন্তরে রক্ষিত হইয়াছেন।

সুখসাগরের অবনতির ২টা কারণ নির্দেশ করা যায়। ১ম কারণ, গজার ভাঙ্গনে কুঠিয়াল সাহেবদিগের কুঠী ও ইমারতাদি জলমগ্ন হওয়া। ২য়, রাণা-বাটের উদীয়মান পাল-চৌধুরীগণ কর্তৃক জোর স্বত্বে সুখসাগরের বাজার ভাঙ্গিয়া চাকদহের বাজার পত্তন। সুখ সাগরের এইরূপ অধঃপতনের পরেও এখানে বহুদিন ধরিয়া একটা উচ্চ শ্রেণীর দেওয়ানী আদালত ছিল।

বিশপ হেবার তাঁহার পত্রিকায় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এই স্থান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ লিখিয়া গিয়াছেন। “আমি সুখসাগরের নিকট একটা সুসভ্য নগরীর চিহ্ন সকল দেখিয়াছিলাম। একটা কীসী কাটে ২টা ককালসার মৃতদেহ শৃঙ্খলিত অবস্থায় লম্বস্থান দেখিয়াছিলাম। তাহার নিকটবর্তী স্থানে ডাকাতি ও খুন করা অপরাধে ২ বৎসর পূর্বে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। এই স্থানটির নাম ডাকাতদি নামা কারণে কলঙ্কিত।” ফষ্টার নামে এক সাহেব ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে এই স্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, “সুখ সাগরের ফ্রাণ্ট ও ল্যানকনকস সাহেবের

কুঠী ও চাষ আবাদাদি, বিশিষ্ট মূল্যবান ও উন্নতিশীল। ইহাদের এই স্থানে স্থাপিত সাদা সূক্ষ্ম মসলীনের কুঠীতে কোম্পানী বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা দানন করিয়া থাকেন, তাঁহারা এখানে রেশমের ওটীর চাষও আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার ক্রমে প্রসার ও উন্নতি দেখিয়া স্থাপয়িতাদের চেষ্টা ও পরিশ্রমের বিলক্ষণ পুরস্কারের আশা করা যায়।” ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এখানে গভর্নেন্ট কর্তৃক একটা পাঠশালা স্থাপিত হয়। একজন জমিদার পূর্বে ব্যারেটো সাহেবের নিশ্চিত একখানি “চৌরীষর” পাঠশালার জন্ম দান করিয়াছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে এক মুনসেফ কর্তৃক এখানে একটা কেরানী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষায় ১৫০ জন সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরীক্ষা প্রদান করেন।”

বর্তমান কালে হুথসাগরের নাম ব্যতীত আর কিছুই বিদ্যমান নাই। গঙ্গা বন্ধ হইতে লোকে অঙ্গুলি নির্দেশে গঙ্গার ভাঙ্গন ও হুই চারিটা প্রাচীন বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া দেখাইয়া থাকে—“ঐ স্থানে হুথসাগর ছিল”।

চুয়াডাঙ্গা।

চুয়াডাঙ্গা মহকুমার পরিমাণ ৪৩৭ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ২৫৪৫৮৯। ইহা বর্ড লাকারে উত্তর দক্ষিণ লম্বা। পূর্ব বঙ্গ রেল পথ ইহার মধ্য দিয়া উত্তর দক্ষিণ দিকে চলিয়াছে। আলমডাঙ্গা, মুনসীগঞ্জ, নীলমণিগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, জয়রামপুর ও দর্শনা ষ্টেশন এই মহকুমার সীমার মধ্যে পড়ে। মেহেরপুর ও ক্রিনাইদহ (যশোহর) মহকুমায় যাইতে হইলে চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে নামিতে হয়। মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা হইতে ১৮ মাইল পশ্চিমে, ক্রিনাইদহ ২২ মাইল পূর্বে; হুইটী পাকারাস্তা দ্বারা মিলিত। মাধাভাঙ্গা বা হাউলিয়া নদী উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে চুয়াডাঙ্গার মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। হুবেলপুর নামক স্থানে মেহেরপুর হইতে তৈরব আসিয়া হাউলিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে। চুয়াডাঙ্গার নিকটবর্তী হাজরাহাটী নামক গ্রামে নবগঙ্গা নামক আর একটা নদী হাউলিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে; কিন্তু এই নদীর প্রথম ৩৪ মাইল এখন শুষ্ক। এই নদী ক্রিনাইদহ অভিমুখে চলিয়াছে। পূর্ব বঙ্গ রেল রাস্তার জঙ্গ ইহার মধ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই কয়টা বড় নদী ভিন্ন মধ্যে মধ্যে কয়েকটা মরা নদী

আছে ; কিন্তু সেগুলিতে প্রায়ই জল থাকে না স্থানে স্থানে অনেকগুলি ছোট বড় বিল আছে তাহার মধ্যে রায়গা, দলকা প্রধান ।

চুয়াডাঙ্গার চারিটা থানা,—চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা, দামুরহা ও জীবননগর । এই চারি থানার গ্রামগুলি ৩০টা চৌকীদারি ইউনিয়নে বিভক্ত । কুড়ুলগাছী কাপানডাঙ্গা, দামুরহা, জয়রামপুর, দৌলতগঞ্জ (জীবননগর), ডুমুরদিয়া আলোকদিয়া, কুমারী, বেলাগাছী, নাটুদহ এই কর্ণী গ্রাম খুব বড় । আলম-ডাঙ্গা, বেহালা (মুনসীগঞ্জ), হাটবোয়ালিয়া, দামুরহা, রামনগর (দর্শনা) এই কর্ণী প্রধান বাণিজ্য স্থান । রামনগরে একটা সব রেজিষ্টারি আফিসও আছে । এই মহকুমা হইতে পাট, ছোলা, তিসি, লুকা, মুগ, কলাই, অড়হর, গম প্রাধানতঃ রপ্তানি হয় । আমদানী দ্রব্যের মধ্যে ধান ও চাউল প্রধান । পূর্বে অনেকগুলি গুড়ের কারখানার চিনি প্রস্তুত হইয়া রপ্তানি হইত । কিন্তু দুই তিন বৎসরের মধ্যে বিদেশীয় চিনির মূল্য কম হওয়ার সেই সকল চিনির কারখানা লোকসান পড়িয়া প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে । কুমারি, বেলাগাছী, মমিনপুর প্রভৃতি গ্রামের জোলা ও তাঁতিগণ কাপড় প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে । কিন্তু তাহার পরিমাণ খুব কম ।

চুয়াডাঙ্গা মহকুমা ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় । ইহার পূর্বে দৌলতগঞ্জ (জীবননগর) একটা মুনসেফী চৌকী ছিল, আর দামুরহাদায় ২০ বৎসর পূর্বে একজন জজেন্ট মাজিস্ট্রেট ও কয়েকজন ডেপুটী কলেক্টরের কাছারি স্থাপিত হইয়াছিল । নীলকরদিগের ও প্রজাদিগের মোকদ্দমার বিচারের জন্য দামুরহাদায় এই সকল কোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল । ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ রেল পথ খুলিলে সেই মুনসেফী কাছারি ও দামুরহাদার কাছারি উঠিয়া আসিয়া বর্তমান চুয়াডাঙ্গা মহকুমা স্থাপিত হয় । পরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস ইলিয়ট লাট সাহেবের আমলে চুয়াডাঙ্গা মহকুমা উঠিয়া গিয়া মেহেরপুরের সামিল হয় ; চুয়াডাঙ্গাতে তখন মাত্র একটা মুনসেফের কাছারি থাকে । ইহাতে সর্বসাধারণের বিশেষ অসুবিধা হওয়ার, গবর্ণমেন্টের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করা হয় । পরে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আবার চুয়াডাঙ্গা মহকুমা স্থাপিত হইয়াছে । মহকুমা উঠিয়া যাইবার সময় কালুপেলে থানা উঠিয়া

গিয়াছিল, আর জীবননগর থানা সদরের এলাকা ভুক্ত হইয়াছিল। মহকুমা পুনঃ স্থাপিত হইলে, জীবননগর আবার চুয়াডাঙ্গায় ফিরিয়া আসিল, কিন্তু কালুপেলে আর আসিল না।

এই মহকুমার মধ্যে কোন প্রাচীন কীর্তি নাই। চুয়াডাঙ্গা হইতে ২ মাইল পশ্চিমে উজিরপুর নামক গ্রামে একটি পুরাতন দীঘি আছে, ও পাকা কোঠার ভগ্নাবশেষ আছে। শুনা যায় নবাবী আমলে উজিরপুর একটি কাছারি ছিল।

এক সময়ে চুয়াডাঙ্গার অধিকাংশ স্থান নাটোরের জমিদার প্রাভঃস্বরগীয়া ৮রানীভবানীর এলাকাভুক্ত ছিল। এখন মাত্র ৭৮ খানা গ্রাম সেই ষ্টেটের মধ্যে আছে। পরে নীলকর সাহেবগণ অনেক দিন পর্যন্ত এই মহকুমার মধ্যে আধিপত্য করিয়াছিলেন তাঁহার। এই মহকুমাকে ছয়টি কুঠির এলাকায় বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন যথা—নিশ্চিন্দীপুর, কাঁচিকাটা, লোকনাথপুর, সিন্দুরিয়া, খাড়াগোদা, পোড়াদহ। ইহার মধ্যে নিশ্চিন্দীপুর ও কাঁচিকাটা লোকনাথপুর ও সিন্দুরিয়া কুঠির সাহেবগণ খুব প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। দাদ্রাহাদ্রামাকালে জয়রামপুর ও আলোকদিয়া দুইটি প্রদান কেন্দ্র ছিল। ১৮৬০ অব্দের পর হইতে নীলের চাষ ক্রমশঃ কম হইতে লাগিল। আট বৎসর পূর্ব পর্যন্তও এই মহকুমার অল্প পরিমাণে নীলের চাষ হইতাইছিল। পরে জর্জাণির ক্রাভম নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় নীলের চাষ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। বর্তমান সময়ে মাত্র নিশ্চিন্দীপুর কনসার্নের মিঃ বার্কার ও মিঃ হ্যামিলটন সাহেবদিগের জমিদারী আছে। কানাই নগরে তাঁহাদের সবে একটি কুঠি আছে। সিন্দুরিয়া কনসার্নের মালিক মিঃ সেরিফ্ সাহেব কয়েক বৎসর মারা গিয়াছেন। এই কুঠি এখন ঝিনাইদহের অন্তর্গত পোড়াদহ কুঠির অন্তর্গত হইয়া মিঃ ম্যাকভোলেন সাহেবের অধীনে আছে। এই সকল সাহেবগণ এখন কেবল জমিদারী করিতেছেন; নীলের সহিত ইঁহাদের কোন সঞ্চয় নাই।

বর্তমান সময়ে নিশ্চিন্দীপুর কনসার্নের জমিদারীই সর্কোপেক্ষা বড়; তাঁহাদের আয় বার্ষিক প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। ইতাল পরে শ্রীবুদ্ধ বাবু নফর ৫৪ খাগ

চৌধুরী । এই মহকুমার তাঁহার জমিদারীর আয় প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা তাহার পরে আমেলা সদরপুরের মহা বাবুদের জমিদারী ; তাহার আয় এই মহকুমার পনের হাজার টাকা । এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ছোট ছোট জমিদার ও তালুকদার আছেন ।

এই মহকুমার শতকরা প্রায় ৭৫ জন প্রজা কৃষিজীবী ; ১২ জন মজুর ; ৮ জন ব্যবসায়ী ও কর্মচারী ; ৫ জন শিল্পী । কৃষিজীবী প্রজার মধ্যে প্রায় শতকরা ৮০ জন মুসলমান ।

কৃষকদিগের অবস্থা প্রায়ই শোচনীয় । জমির উর্বরতা শক্তি বড় কম । পূর্ববঙ্গের জায় এ জেলায় বস্তার জল দ্বারা মাঠে পলিমাটি পড়ে না ; আবার পশ্চিম বঙ্গের জায় জমিতে সার দেওয়ার রীতিও নাই । পূর্বে জমির উর্বরতা-শক্তির বৃদ্ধির জন্য একই জমি বছরে বছরে চাষ করা হইত না, ফেলিয়া রাখা হইত । এখন লোকসংখ্যা বেশী, জমির পরিমাণ কম ; সেই জন্য জমি প্রায়ই ফেলিয়া রাখা হয় না । এই সব কারণে জমির উর্বরতা শক্তি ক্রমেই হ্রাস হইতেছে । পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ১ বিঘা মধ্যম রকমের জমিতে ৩০০ মণ আউস ধান, ২৫০ মণ ছোলা, ১৫০ তিসি, ৩ মণ পাট উৎপন্ন হয় । এই মহকুমার অধিকাংশ জমিতে বৎসরে দুইটী ফসল উৎপন্ন—আউস ধান বা পাট, পরে সারসা, বা মটর, বা কলাই; বা মুগ বা ছোলা বা তিসি, বা গম বা যব । আবাদী জমির প্রায় দশ আনিতে আউস ধান হয়, প্রায় অর্ধেককে রবি ফসল হয়, প্রায় $\frac{১}{৩}$ অংশে আমন ধান হয়, প্রায় $\frac{১}{৩}$ অংশে পাট হয় । পাটের আবাদ ক্রমেই বাড়িতেছে । আলমডাঙ্গা থানার মধ্যে ইক্ষুর চাষও ক্রমে বাড়িতেছে । রেলের রাস্তার পূর্ব দিকে খেজুর গাছের আবাদ খুব বেশী ।

জমির উর্বরতা শক্তি কম বলিয়া জমির মূল্য খুব কম । এক বিঘা রায়তি জমির মূল্য ৫৭ টাকার বেশী নহে ; কিন্তু পূর্ব বঙ্গে ইহার মূল্য ২৫,০০ টাকা হইবে । জমির খাজানা বিঘা প্রতি ৮০ আনা হইতে ১৫০ পর্যন্ত দেখা যায় । গুঠবন্দী জমির পরিমাণই বেশী ; রায়তী জমাইজমি অপেক্ষাকৃত কম ।

কৃষকদিগের মধ্যে প্রায় দশ আনি লোক মহাজনগণের নিকট ঋণ ও টাকার ঋণে আবদ্ধ । প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছোট বড় মহাজনদিগের অনেক দোলা দেখিতে পাওয়া যায় । একবার যে কৃষক মহাজনের কাছে ঋণে আবদ্ধ হয়,

তাহার আর সহজে নিষ্কৃতি নাই। তবে ছুৰ্ভিক্ষের সময়ে মহাজনগণ ধান ও টাকা কর্জ দিয়া প্রজাদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকে। শ্রমীকে “আসামী” বলে। প্রত্যেক মহাজনই যে কোন উপায়ে হউক ধান কিনা টাকা কর্জ দিয়া তাহার আসামীর জীবন রক্ষা করিতে বাধ্য। জুখের বিষয় পাটের চাষ দ্বারা কৃষকগণ ক্রমশঃ মহাজনদিগের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতেছে।*

ধান্য চাউল প্রভৃতি জন্মের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে লোকের খোরাকী খরচও ক্রমে বাড়িতেছে। বর্তমান সময়ে কৃষক শ্রেণীর একটী লোকের গড়ে মাসিক ৪৮/০ র কম খোরাকী নির্বাহ হয় না। তাহার হিসাব দেওয়া যাইতেছে—

খোরাকী খরচ।			মাসিক।
চাউল মাসে ২৫সের, ৫ মণ দরে	২৬০ †
ডাইল তরকারী মাছ গড়ে রোজ			০
৫ হিসাবে	৪০
হলুদ লঙ্কা ইত্যাদি মশলা	৪০
লবণ	৮০
তেল	১০০
(কাঠ প্রায়ই কেহ কেনে না)			৪৮০
এক বৎসরে	৫৪৮০
বস্ত্র।			
ধুতি ১ বৎসরে ৪ খানা	৩০
পামছা ২ খানা	৪০
জীভের চাদর ১টা	২০
জ্বালানি তেল, ঘরমেরামত ও অন্যান্য খরচ			৫০
			৬৪০

* জমা, জমি, চাষ, আবাদ, প্রজার অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে এখানে যাহা লিখিত হইল তাহা নদীয়ার সকল মহকুমা সম্বন্ধেই প্রযুক্ত।

† চাউলের মূল্য কম বেশী হইলে সেই অনুপাতে খরচেরও কিছু হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

গড়ে একটি পরিবারের লোক সংখ্যা ৫টী ; সুতরাং একটি কৃষক পরিবারের বার্ষিক ব্যয় ৩২০ টাকা অর্থাৎ মোটের উপর ৩০০ টাকার কম নহে ।

এইরূপ এক জন কৃষকের দুই খানা লাঙ্গল ; ৪টী গরু ও ৩২ বিঘা জমি থাকার দরকার । তাহাতে কি আয় দেখা যাউক ।

৩২ বিঘা জমির মধ্যে ধরা যাক ২৪ বিঘায় ধান ও রবিধন্দ্র জন্মে আর ৮ বিঘায় পাট চাষ করা হয় ।

২৪ বিঘা জমিতে গড়ে ৭৮ মণ ধান জন্মে, মূল্য	...	২০০
৮ বিঘা জমিতে গড়ে ২৪ মণ পাট, তাহার মূল্য	...	২০০
রবিধন্দ্রের মূল্য	...	১০০
মোট উৎপন্ন ফসলের মূল্য	...	৫০০

বাদ আবাদের পরচ ।

বিঘা প্রতি ৭ টাকা হিসাবে চাষের

ব্যয় ও খাজনা ৫০

$$৭৫০ \times ৩২ \text{ বিঘা} = ২৪৮০$$

অর্থাৎ মোটামুটি বাদ	...	২৪৮০
---------------------	-----	------

সুতরাং কৃষকের লাভ	...	২৫০
-------------------	-----	-----

যদি কেহ নিজে ক্ষেতের কাজ না করিয়া মজুর নিযুক্ত করিয়া চাষ আবাদ করে, তাহার এইরূপই লাভ দাঁড়াইবে ; কিন্তু কৃষকগণ নিজেরাই ক্ষেতের কাজ করে ও গাঁত দ্বারা পরস্পরের সাহায্য করে । সেজন্য আবাদের বিঘা প্রতি ৭ টাকা না পড়িয়া ৩০ পড়িবে । এই জন্যই তাহারা কোন ক্রমে বাঁচিয়া থাকে ।

কিন্তু ৩২ বিঘা জমি চাষ করে, এরূপ কৃষকের সংখ্যা বেশী নহে ; আবার জমি থাকিলেও সব বছর ভাল ফলে না । ধোঁরাকী ধরত বাদে বিবাহ প্রাঙ্গণ প্রভৃতি কাজের জন্য ও গরু কিনিবার জন্য এক সময়ে অনেক টাকার প্রয়োজন হয় । এই সব কারণে তাহাদিগকে মহাজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে হয় । পাটের চাষ বৃদ্ধি হইলেও পাটের দাম ক্রমে বাড়িলে কৃষকগণের সুবিধা হওয়ার সম্ভাব । কোন কোন কৃষক জমি চাষের সঙ্গে অন্ত্রের মজুরি করে । ইহা একটি শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই । মজুরি খাটি সম্বন্ধে অনেক চাষীরই অভ্যাস কুসংস্কার

আছে ; তাহাদের ধারণা মজুরি খাটিলে তাহাদের মান যায় । কেহ কেহ দেশে মজুরি খাটিতে লজ্জা বোধ করে, কিন্তু বিদেশে গিয়া মজুরী খাটা অপমানের কাজ মনে করে না । এইরূপে অনেক চাষী দক্ষিণ ও পূর্ব জেলায় ধান কাটিতে ও মাটী কাটিতে যায় এবং বেশ দশ টাকা রোজগার করিয়া আনে । এই কুসংস্কার দূর হইলে কৃষকদিগের উন্নতি হওয়া সম্ভব ।

মজুরদিগের আয় পূর্বাপেক্ষা কিছু বাড়িয়াছে । ধাত্তোর কর বৃদ্ধি হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ । কিন্তু যে পরিমাণে খাদ্য জিনিষের মূল্য বাড়িয়াছে, মজুরির আয় সে পরিমাণে বাড়ে নাই । সাধারণ মজুরের পূর্বের দৈনিক আয় ছিল ৮০ হইতে ৮১০ ; এখন হইয়াছে ১০ হইতে ১১০ ; তবে ধান ও পাট কাটার সময়ে মজুরগণ খুব বেশী উপার্জন করে । ধান কাটার মজুরি দৈনিক ১৮০ ও হুই বেলার খোরাফী । পাটকাটার মজুরির কোন নির্দিষ্ট হার নাই ; কারণ চুক্তি করিয়া প্রায় কাজ করা হয় । ইহাতে কোন কোন মজুর দৈনিক ২৮ টাকা হইতে ৩৮ টাকাও রোজগার করিতে পারে । এই জন্য অনেক মজুরের অবস্থা চাষী অপেক্ষা ভাল ।

জিনিষ হুমূল্য হওয়াতে সর্বাপেক্ষা মধ্যবৃ্ত্তি শ্রেণীর লোকেরই বেশী কষ্ট হইয়াছে । যে গরিব ভদ্রলোকের পরিবারে পাঁচটা লোক ও মাসিক আয় ২৫ টাকা কিম্বা ৩০ টাকা তাহার বর্তমান সময়ে ৬৮ টাকার দরে চাউল কিনিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করা বড়ই কঠিন । এই জন্য মধ্যবৃ্ত্তি ভদ্রলোক স্বচ্ছল অবস্থায় থাকিতে গেলে তাঁহার মাসে গড়ে ৮৮ টাকার কম কিছুতেই কুলায় না । কারণ কৃষক অপেক্ষা তাঁহার মাছ, ডাইল, দুধ, জ্বালানি কাঠ, কাপড়, ধরমেরামত, ধোপা, নাপিত, ছেলেদের লেখাপড়া শিখান ইত্যাদি অনেক বেশী খরচ পড়ে । একটা পরিবারের পাঁচটা লোক থাকিলে ৫৫৮—৫৬০ টাকার কম মাসে নির্বাহ হওয়া কঠিন । অর্থাৎ বৎসরে খরচ ৫৮০৮ টাকার আবশ্যক । তবে একান্নবর্ত্তি পরিবার বলিয়া অনেকের তিন চারিশত টাকার মধ্যেই চলিয়া যায় । বিবাহ শ্রাদ্ধাদি উপস্থিত হইলে ঋণ করিতে হয় ।

সৌভাগ্যের বিষয় এ মহাকুমায়ে তেমন খন খন ছুর্ভিক্ষ হয় নাই । সর্বাপেক্ষা বড় ছুর্ভিক্ষ হইয়াছিল ১৮৬৫—৬৬ সালে । তখনা যায় তখন কোন গৃহস্থ ঘরের বাহিরে বসিয়া ভাত খাইতে পারিত না ; পেটের জ্বালায় অন্য লোকে আসিয়া তাহা

কাড়িয়া থাইত । সে বৎসর উড়িয়ায়ও খুব ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল ; হুতরাং তাহা দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ । তাহার পর ১৮৮৯, ১৮৯৭ ও ১৯০৬ সালে অল্পপরিমাণে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল । অল্প পরিমাণে সাহায্য বিতরণেই লোকের কষ্ট নিবারণ হইয়াছিল ।

১২৭৮ সনে ইং ১৮৭১-৭২ সনে খুব ভয়ানক বন্যা হইয়াছিল । তাহাতে রেলের রাস্তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল । ইহার পরে আর তেমন বড় বন্যা হয় নাই । তবে ১৮৭৯, ১৮৮৯, ১৮৯২, ১৮৯৭ সনে ও নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া দেশ প্লাবিত হইয়াছিল ।

মেহেরপুর ।

নদীয়ার অশ্রাচ্ছ প্রাচীন স্থানগুলির মধ্যে মেহেরপুর অত্যন্ত প্রাচীন গ্রাম । কেহ কেহ মহারাজা বিক্রমাদিত্যের কালে ইহার উৎপত্তি কল্পনা করেন ; কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না । কেহ কেহ এই স্থানটীকে মিহির-খানার বাসস্থান বলিয়াও নির্দেশ করেন এবং মিহিরের নাম হইতে মিহিরপুর, অপভ্রংশে মেহেরপুর নামের উৎপত্তি কল্পনা করেন ।

গ্রামখানি উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৫ মাইল লম্বা । গ্রামের পশ্চিম দিকে 'ভৈরব নদ প্রবাহিত । পূর্বে এই ভৈরব প্রকৃতই ভৈরব নদ ছিল, এক্ষণে ইহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় । গ্রামখানি মুখোপাধ্যায় পল্লী, মল্লিক পল্লী প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি পল্লীতে বিভক্ত । অধুনা এখানে আনন্দবাজার, কালীবাজার, বড়বাজার ও বৌ বাজার নামে চারিটা বাজার বিদ্যমান ।

বহু পূর্বে মেহেরপুরে গোয়ালার্চৌধুরী উপাধি-ভূষিত সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিগণ বাস করিতেন ; ইহাদের প্রধান ছিলেন রাজা রাঘবেন্দ্র । এই রাঘবেন্দ্র রায় সাক্ষরিত সনন্দ, কোবালা, দানপত্র প্রভৃতি দলিলাদি অনেক গৃহস্থের ঘরে আছে । কথিত আছে বর্গীর হাজ্জামা কালে মহারাষ্ট্রগণের অশ্রুতম নেতা রঘুজী ভোঁসলার সহিত যুদ্ধে এই বংশীয়েরা সপরিবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেন । চৌধুরীদিগের নিধনের পর বহুদিন তাঁহাদের অধিকৃত মেহেরপুরের অন্তর্গত প্রাসাদোপম অটালি-

কাদি ক্রোশেকদূরস্থ সুবিস্তীর্ণ গড়ভূমি, দীর্ঘিকা ইত্যাদি বন্যাকীর্ণ হইয়া পড়িয়া ছিল। এবং প্রয়োজন হইলেও কেহ কখন ইহার ইষ্টকাদি ব্যবহার করিত না। সাধারণের মনে ইহাই দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, চৌধুরী বংশের ইষ্টকাদি লইলে কাহারও শুভ হয় না; কিন্তু ১৮৬৯ খ্রষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপালটী স্থাপিত হইলে এই আবাসভূমির মধ্যেই মিউনিসিপাল আপিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, পোষ্টাফিস, জমিদারী কাছারি এবং হুই এক বর গৃহস্থেরও বাটী নির্মিত হইয়াছে। দীর্ঘিকাটী মিউনিসিপালটী কর্তৃক পুনঃসংস্কৃত হইয়া পানায় জলের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতেছে। বর্তমান কালে এই আবাস বাটীর অনতিদূরে একটী সুগঠিত প্রাচীন শিবমন্দির এবং গোয়ালী চৌধুরীদিগের একটী কালীমন্দির আজিও বিদ্যমান আছে।

প্রাতঃস্মরণীয় রাণী ভবানী যখন রাজপুর পরগণার অধিকাধিনী হইলেন, তখন মেহেরপুরেরও তিনি অধিষ্ঠার হইলেন। সেই কালে তাঁহার দত্ত ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর, দেবোত্তর প্রভৃতি বহু সনন্দ আজিও লোকের গৃহে থাকিয়া তাঁহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

রাণী ভবানীর হস্ত হইতে মেহেরপুর কাশিম বাজারাদিপতি হরিনাথ কুমারের হস্তে আসে। পরে হরিনাথের পুত্র রাজা কৃষ্ণনাথ এই ডিহি মেহেরপুর James Hill নামে এক দোর্দণ্ড প্রতাপ নিলকুঠিয়ালকে পতন্য দেন। James Hill থাকিবিল করিয়া লইয়া প্রজাপীড়ন করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার সহিত অত্রস্থ জমিদার মুখোপাধ্যায় বাবুদিগের বিবাদ বাধিয়া উঠে।

মুখোপাধ্যায় বাবুদের বংশের গজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় আসিয়া মেহেরপুর বাস করেন। গজেন্দ্র বাবু একজন বিশিষ্ট ধনশালী ব্যক্তি মুখোপাধ্যায় বংশ। ছিলেন। ইহার বনশ্রাম, গোলক, আনন্দ, গোবিন্দ, অন্নপ, ও বীরেশ্বর নামে ছয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই কৃতবিদ্যা ও কার্যকর্ম ছিলেন। গজেন্দ্র বাবু পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্রগণ একযোগে বিষয় কার্যের বহু উন্নতি সাধন করেন। এই সময়ে নদীয়ার নীলের আবাদের বিলক্ষণ প্রসার বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা ১২০ টী নীল কুঠী স্থাপনা করেন। জ্যেষ্ঠ বনশ্রামের মৃত্যুর পর ইহাদের বিষয়ের আর ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এই বিভাগের পর গোলকের তিন পুত্র মথুরা

লাল, রামচন্দ্র ও নবকৃষ্ণ নীলকুঠী চালাইয়া স্ব স্ব বিষয়া-আরও বুদ্ধি করিয়াছিলেন। মথুরানাথ সাতিশয় বুদ্ধিমান বিধায়, মুখোপাধ্যায়গণের ষোল আনা রকম বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব করিয়া এতদকালে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার বাবুয়ানা সম্বন্ধে বহু কিসমতী প্রচলিত আছে। শুনা যায় একবার ইঁহার জনৈক ভৃত্য কলিকাতার বাজারে গিয়া প্রসিদ্ধ ছাতু বাবু লাটু বাবুর ভৃত্যের সহিত বাদাবাদি করিয়া ১০০ শত টাকা দিয়া একটা রোহিত মংস্ত্র ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। এই মস্ত্রে ছাতু লাটু বাবুর সহিত গরে তাঁহার সবিশেষ সম্ভাব হয়। বারয়ারি উপলক্ষে ইনি খুব সমৃদ্ধি সহকারে মহিষমর্দিনী পূজা করিতেন। একবার এতদুপলক্ষে আগত স্বনাম ধ্যাত কবি হরু ঠাকুর গাহিয়া ছিলেন :—

“সত্য যুগে সুরত রাজা, করেছিল দেবী পূজা

জ্যেতায়ুগে রাম।

কলিয়ুগে মথুর নাথে, সদয় হল ভবাণী,

এমনি পূজার স্বটা মেহেরপুরে মহিষমর্দিনী ॥”

১২৪৮ সালে জেমস হিল মেহেরপুর পত্তনী লইলে মথুর বাবুর সহিত তাঁহার বিবাদ বাড়িয়া উঠে। এই সময়ে মথুরবাবু কতকটা মালের জমি নিজ দখলে আনিবার জন্য এক রাত্রির মধ্যে প্রায় ৪০ চত্বর্গ বিঘা জমি রেল দিয়া ধরিয়া লইয়া তাহার পশ্চিম পাশে একটা পুষ্করিণী খনন ও কামরা ঘর প্রস্তুত করিয়া নানাবিধ বৃক্ষাদি রোপণ ও বাগিচা প্রস্তুত করেন। অদ্যাপি সে রেল বাগানটী মথুর বাবুর রেল বাগন নামে প্রসিদ্ধ। মথুর বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবকৃষ্ণ বাবু গ্রামস্থ রামমোহন মৈত্র, ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বুদ্ধিমান ও বলশালী লোকের সহায়তায় বহু শুল্কিত অস্ত্রধারী লাঠিয়াল ও বরকন্দাজ সৈন্য লইয়া দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত জেমস্ হিলকে মেহেরপুর বেদখলে রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে স্বনাম্ভূত মুখোপাধ্যায়ের পোষ্য পুত্রের মর্দনাদি লইয়া মুখোপাধ্যায় বংশের মধ্যে গৃহ বিবাদ বাড়িয়া উঠে। এই কালে মথুর বাবুর মৃত্যু হওয়ার নবকৃষ্ণ বাবু একাকী জেমস্ হিলের বিপক্ষে দণ্ডায়মান করেন। কোশলী হিল, মথুর বাবুর পুত্র চন্দ্রমোহন বাবুকে তোষামদে সজ্জষ্ট করিয়া এবং তাঁহার উপযুক্ত নজরানা দিয়া তাঁহাকে সপক্ষে আনয়ন করিলে নবকৃষ্ণ বাবুর সহিত তাঁহার

মনান্তর হয় এবং নবকৃষ্ণ বাবু স্বীয় ভ্রাতৃসম্প্রদায়ের ব্যবহারে মর্শ্বাচ্ছত হইয়া বহরমপুরে প্রস্থান করেন ও তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এক্ষণে নবকৃষ্ণ বাবুর একটী দৌহিত্র, মথুরা বাবুর একটী প্রপৌত্র, পদ্মবাবুর দুটী প্রপৌত্র ও অপর প্রপৌত্রের চারিজন পুত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন।

নবকৃষ্ণ বাবুর মৃত্যুর পর জেমস্ হিলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে এমন লোক মেহেরপুরে না থাকায় ১২৬০ সালে জেমস্ হিল সম্পূর্ণরূপে মেহেরপুর দখল করিয়া লইলেন এবং এখানে তখন রাজকীয় বিচারালয় না থাকায় নিশ্চিত পুরের কুঠীতে বসিয়া নিশ্চিত মনে মেহেরপুরে প্রজাপীড়ন করিতে থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ মহেশ মুখোপাধ্যায়, যিনি নীলদর্পণে ‘গুপে গুওডা’ নামে খ্যাত, জেমস্ হিলের মন্ত্রী ছিলেন।

মুখোপাধ্যায় বংশের যখন দৌর্দান্ত প্রভাপ, তখন এখানকার অগ্রতম জমিদার কৃষ্ণকান্ত মল্লিক আসিয়া মেহেরপুরে বাসস্থান মল্লিক বংশে। নিষ্কাণ করেন। কৃষ্ণকান্ত-পুত্র নন্দ কুমার অত্যন্ত লক্ষ্যধিক টাকা লাভের জমিদারি করিয়া ছিলেন। ইহার ছয় পুত্র। তন্মধ্যে পঞ্চম পুত্রের অকালে মৃত্যু হইলে, নন্দকুমার শোক সন্তপ্ত হইয়া পুত্রের নামে “নবগৌরাজ” বিগ্রহ স্থাপনা করেন। অদ্যাবধি তাঁহার সেবা চলিয়া আসিতেছে। নন্দকুমার পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পঞ্চম পুত্র তুল্যংশ বিষয় বটন করিয়া লইলেন, তিনি অতিথিসেবা এবং “আনন্দ বিহারী” নামে বিগ্রহ স্থাপনা করিয়া সেবার বন্দোবস্ত করিয়া যান এবং বাটীতে ধর্মধামের সহিত বার মাসে ভের পার্শ্বণের ব্যবস্থা করিয়া যান। নবকৃষ্ণের পুত্র পদ্মলোচন কাশিমবাজারের কৃষ্ণনাথ কুমারের এট্টেটের কিছুদিন ম্যানেজারি করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার অন্ত্যস্ত ভ্রাতারাও নানারূপ উচ্চপদস্থ কার্যে ব্রতী থাকিয়া বহু অর্থোপার্জন করেন। পদ্মলোচন এইরূপে কিছুদিন রাজ সরকারে কার্য করিয়া পরে নিজ এট্টেটের কার্য পরিদর্শনে মেহেরপুরে চলিয়া আসেন। সাধারণ লোক মাঝেই তাঁহাকে গ্রামের মণ্ডল বলিয়া অভিহিত করিত। তিনি তাঁহার পিতার জায় দয়াদান ও কীর্তিমান ছিলেন। এই সময়ে মুখোপাধ্যায় ও মল্লিক বংশের আশ্রয়ে উভয় পক্ষের দলভুক্ত আশ্রিত আর ১০০ বহু স্বেচ্ছাসিদ্ধ, শতাধিক বর কার্যস্থ, পঞ্চাশ বর বৈদ্য, অসংখ্য নবশাখ, ও অন্যান্য আতি মেহেরপুরে বাস

করিতেন। গ্রামে ১০।১২টি সংস্কৃত টোল, ৫০টি পারসী ও আরবী বিদ্যালয়, এবং লাঠী ও সড়কী খেলার অনেক গুলি আখড়া বিদ্যমান ছিল।

মুখোপাধ্যায় বংশের গ্রাম ইঁহাদের বংশেও পঞ্চলোচনের জাতা কেশব বাবুর অপুত্রক মৃত্যু হইলে, পোষ্য পুত্র গ্রহণ উপলক্ষে গৃহ বিবাদ বাধিয়া যায়। এই মর্কদ্দমার সময় পদ্ম বাবুকে জেমস্ হিল নানারূপে সাহায্য করায় পদ্মবাবুর ইচ্ছা থাকিলেও নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পক্ষ লইয়া হিলের বিপক্ষতাচরণ করিতে পারেন নাই।

মুখোপাধ্যায় ও মল্লিকবংশের প্রতিপত্তিকালে মেহেরপুরের যেমন জাঁকজমক ছিল, এখন আর তাহার কিছুই নাই। ১২৬৯ সালে জ্যৈষ্ঠ মাহার মহামারীতে অসম্ভব লোকক্ষয় হওয়ায় গ্রাম হতশ্রী হইয়া পড়ে; পরে, ১৮৫৮ সপ্তাহে এখানে মহকুমা স্থাপিত হইলে বিদেশী লোক লইয়া ইহার জনসংখ্যা কথকিত বৃদ্ধি পাইলেও পূর্বের সে শ্রী আর ফিরিয়া আসে নাই।

এখানকার অজ্ঞাত প্রাচীন বংশাবলীর মধ্যে কায়স্থ বংশের ঘোষ ও দত্ত, বৈদ্য বংশের সরকার ও মজুমদার এবং ব্রাহ্মণ বংশের চক্রবর্তী মহাশয়েরা উল্লেখ যোগ্য। এতমধ্যে মজুমদার বংশের সম্বন্ধে নানা অদ্বিত কিস্কদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে ইহাদের পূর্ব পুরুষ মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট হইতে ধাতু ফলকে খোদিত এক সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,* আরও কথিত আছে বহু পুরাকালে ইহাদের গৃহে একটী ডাকিনী আসিয়া ছদ্মবেশে কিছুদিন বাস করার পর আত্ম প্রকাশ হইলে ঐ ডাকিনী গৃহস্থামকে একখানি থড়গ প্রদান করিয়া ইহাদের গৃহ পরিত্যাগ করে। অদ্যাপি সেই থড়গ যথোচিত ভক্তি ও সম্মান সহকারে পূজিত হইয়া আসিতেছে। উপস্থিত দুইটী মাত্র বিধবা স্ত্রীত এ বংশের আর কেহই পরিচয় দিবার নাই।

এস্থানের উৎপন্ন ও উল্লেখযোগ্য সামগ্রী—খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে রসকদম্ব, ফিরের মিঠাই প্রভৃতি মিষ্টান্ন। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে বলরাম হাড়ীর আড্ডা, ভজন সম্প্রদায়ের আখড়া, গোয়াল চৌধুরীদিগের মন্দিরাদি, ঘোষ বংশের শিবমন্দির,

আমরা অনেক চেষ্টার উহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে অনেক গুলি প্রাচীন লোকের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে, তাহারা তাহা দেখিয়াছেন।

উক্ত ইংরাজী বিদ্যালয়, ও আদালত গৃহ উল্লেখযোগ্য। এখানে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা নাই, তবে ১৯১০ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্গের প্রজাপ্রিয় ছোটলট সার এডওয়ার্ড নর্থান বেকার মহোদয় নদীয়া পরিদর্শনে আসিয়া দরবারে বক্তৃতা কালে কৃষ্ণনগর হইতে লাইট রেলওয়ে খুলিবার আশা দিয়া গিয়াছেন। উক্ত রেল খুলিলে জন সাধারণের বিশেষ সুবিধা হইবে আশা করা যায়।

নবদ্বীপ।

নবদ্বীপ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বহু কথাই ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে। বর্তমান গ্রামখানি যাহা এক্ষণে নবদ্বীপ নামে পরিচিত, তাহাই প্রাচীন নবদ্বীপ কি না, এবং তাহা না হইলে ঐ প্রাচীন নবদ্বীপের স্থানই বা কোথায়, এবং স্থান সম্বন্ধে কোনও পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকিলে, তাহাই বা কবে হইয়াছে, অথবা আদৌ ঐরূপ কোন পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে বহু দিন হইতে বহু বাদানুবাদ হইলেও এ সম্বন্ধে যে অভ্রান্ত সত্য তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে স্মরণ্য: আদি নবদ্বীপের যে বহুবার স্থান পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং কিছু দিন পূর্বেও যে নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থান গুলি গঙ্গার পূর্বকূলে স্থাপিত ছিল, সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।* এমন কি পাশ্চাত্য জাতীয়গণের অঙ্কিত নানা ভাষায় লিখিত মানচিত্রেও ইহার নিদর্শন

* কিকিদ্দিক শত বর্ষ পূর্বেও নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্বকূলে স্থাপিত ছিল এবং উহার পূর্ব দিয়া জালাঙ্গী বা খড়ে প্রবাহিত ছিল। গোয়ালপাড়া গ্রামে তখন নবদ্বীপের পূর্ব সীমা বাহিনী জালাঙ্গী ও পশ্চিম সীমাবাহিনী গঙ্গার সম্মিলন ছিল। কথিত আছে ১২০৬ সালে প্রবল বন্যার গঙ্গাত্রোতে নবদ্বীপের পশ্চিমতলবাসিনী খাত পরিত্যাগ করিয়া পূর্বতল বাহিনী জালাঙ্গী খাতে প্রবাহিত হয় এবং নবদ্বীপ তদবধি গঙ্গার কূলে গিয়া পড়িয়াছে এবং বর্তমান নবদ্বীপের উত্তর পূর্ব কোলে গঙ্গা জালাঙ্গীর সঙ্গম পাড়াইয়াছে। এই পরিবর্তন কালে ঐচ্ছৈতন্ত দেবের নবদ্বীপের যে কিছু অবশিষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান ছিল, তাহা সম্বন্ধে আর কোনও অবশ্য স্থানত্রষ্ট হইয়া পড়ে। ঐচ্ছৈতন্ত দেবের সময় কোন্ কোন্ গ্রাম লইয়া নবদ্বীপ গঠিত হইয়াছিল, এবং কোন গ্রাম কোথায় স্থাপিত ছিল ইত্যাদি নবহরি দাসের (চক্রবর্তী) নবদ্বীপ পরিভ্রমণ সন্নিবেশে উল্লিখিত আছে। সম্ভ্রান্ত সাহিত্যপারিষদ হইতে ইহার একখানি স্মরণ সংকরণ প্রকাশিত হইয়াছে, সকলেরই উহা পাঠ করা উচিত।

পাওয়া যায়। এই নব্বীপেই মহম্মদ-ই-বখতিয়ার আনসারী লক্ষণসেন দেবকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গলার মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত করেন *

এই নব্বীপেই বাহুদেব সার্বভৌম, ঐচৈতন্য মহাপ্রভু, কানতট শিরোমণি, দ্বার্ত-প্রধান রঘুনন্দন, তত্ত্ববিৎ কৃকানন্দ আগমবাগীশ, শতর তর্কবাগীশ † আনন্দরাম তর্কবাগীশ (যিনি অধ্যয়নের সুবিধার জন্য কোশার সুখ বিস্তারিত করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য কোশার নাম আনন্দার্থ্য্য হয়) প্রভৃতি মহাত্মাগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহার বশ ও ধ্যান্তি জনংঘ্যাপী করিয়া গিয়াছেন। হুঃখের বিষয় ইহাদের কে কোথায়, কোন স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বা বাস করিতেন, সে সকলের সঠিক নিদর্শন পাইবার কোনও উপায় নাই, এমনকি ইহাদের অধিকাংশের বংশ পর্য্যন্ত লোপ পাইরাছে।‡ সম্প্রতি ঐচৈতন্য

* একবারও সম্প্রতি স্থানে স্থানে প্রতিবাদ আরম্ভ হইরাছে, এবং হুঃখের বিষয় যে এবিষয়ে নানারূপ তথ্যাসুসন্ধান হইতেছে। বীহারী এই চির প্রচলিত বহুজন দ্বারা সত্তের প্রতিবাদী, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, মহম্মদ ই-বখতিয়ার কর্তৃক নদীয়া বিজয় সত্য বটে, হয়তো বখতিয়ার এই পথে লক্ষণাবতী গমন করিয়াছিলেন। বখতিয়ারের বহুবিক্রয়ের দুই বর্ষ পরে নদীয়া সম্পূর্ণভাবে মুসলমান অধিকারে আইসে। † তাঁহারী অভ্যন্ত বৃত্তির মধ্যে Asiatic Society তে সংগৃহীত ও রক্ষিত, যজের মুসলমান নরপতি সুবাহদ্দিন জুজুবাকের সময়ে তদানীন্তন রাজধানী লক্ষণাবতী সহরে বৃত্তিত একটি হুজুর লিখিত কথাগুলির উল্লেখ করেন, এবং বলেন যে ইহাই নদীয়ার মুসলমান অধিকারের পর প্রথম হুজুর; কিন্তু কে বলিবে যে, একদিন ডুগুর্ভের অন্ধকারময় পর্ভ হইতে ইহার পূর্বকার আর কোনও হুজুর সহসা আবিষ্কৃত হইবে কি না? উহাতে লিখিত আছে :—

This was minted at Lakhnabati for (paying) the revenue of Karmandan (Burdankar-Burdangarh-Bardhanksta (skt) and Nudiah in the month of Ramzan in the year 653 Hijri (February 1255 A. D.)

H. Nelson Wright—Catalogue of Coins in the Indian Museum Vol. II Part I Pag 146.

† এই নামের দুইজন মহোপাধ্যায় পণ্ডিত নব্বীপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক জন নব্বীপের আদি পণ্ডিত অপর রাজা গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন।

‡ উপস্থিত ঐ সকল প্রাচীন বংশাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের বংশ অদ্যাপি নব্বীপে বিদ্যমান আছে—

১। গজাধর ভট্টাচার্য্য বংশে—অধিনাপত্র প্রচারক।

২। জগদীশ তর্কালঙ্কারের বংশে—দ্বারভাষা শিরোমণি, রামদাস দ্বারভাষার।

৩। রামচন্দ্র সিদ্ধান্তের বংশে—মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপালন।

মহাশত্রুর অগ্রভিটা আবিষ্কারের চেষ্টা কেহ কেহ করিতেছেন এবং কেহ কেহ বর্তমান নবদ্বীপের পরপারে মারাপুর নামক স্থানে তাঁহার অস্ত্রভূমি নির্দেশ করিয়া তথায় তাঁহার শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ।

নবদ্বীপের ভলবাহিনী তানিরবী ও জালালী বহু প্রাচীন কাল হইতে এত অবিকার্য স্থান পরিবর্তন করিয়াছে যে, নবদ্বীপ-মণ্ডলের চতুঃসীমান্তবর্তী ৮১০ মাইলের মধ্যে কোথায় গঙ্গা বা জালালী বা তাহাদের শাখা ছিল এবং কোথায় না ছিল তাহা বলা সুকঠিন । এই ৮১০ মাইলের মধ্যে অসংখ্য প্রোত ও জলহীন স্থান তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । মহাশত্রুর আবির্ভাবের পর হইতেই এই স্থানটী হিন্দু বৈষ্ণবগণের নিকট পরম সমাদরের স্থান হইয়া উঠিয়াছে । তাঁহাদের চক্ষে ইহার অহিমা শ্রীমদ্বাবনের ভুল্যানুভূল্য এবং সেই কারণে অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে এই স্থানে জীবনের অবশিষ্টকাল বাস করিতে দেখা যায় । হেষ্টিংসের স্মৃতিস্তম্ভ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শেষ জীবনে দ্বোপার্জিত অতুল বিত্ত বৈভব, নিজ পুত্র লালাবাবুকে অর্পণ করিয়া হুই তিন শত বৈয়াকী সঙ্গে এই নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন । তিনি নবদ্বীপ সন্নিহিত রামচন্দ্রপুরে একটি ৬০ ফুট উচ্চ শ্রীমন্দির নির্মাণ করাইয়া অতিথি অভ্যাগত বৈষ্ণবানির সেবার বন্দোবস্ত করিয়া ছিলেন । ১৮০০ খৃষ্টাব্দের প্রবল বস্তার উহা চিহ্ন-রহিত হইয়া ভগ্ন হইয়া নিগাহিল । ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্যালেনসিয়া এখানে একটি মুসলমান কলেজ দেখিয়াছিলেন । ১৮১১ খৃষ্টাব্দে এখানে একটি মন্দির কারুকার্য-বচিত শ্রীমন্দিরের উদ্বোধন বহু গ্রন্থে দেখা যায় । ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এইখানেই সর্ব প্রথম কলেরা রোগের দৃষ্টি হইয়া ক্রমে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে উহা ভারতব্যাপী এবং ১৮২০ খৃষ্টাব্দে চীনে, ১৮২১ খৃষ্টাব্দে আরব ও পারস্য, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রুসিয়া, প্রুসিয়া এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে বিস্তারিত হইয়া পড়ে ।*

- ০। দোপাল ভ্রমরভারের বংশে—হরিপদ দ্বিতীর্ষ, শশিভূষণ দ্বিতীর্ষ ।
- ০। সার্ব লক্ষীকান্ত ভ্রমরভূষণের বংশে—নিবারণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সুসিংহ ও সিতিকর্ক ।
- ০। নানব সিদ্ধান্তের বংশে—হরিনাস ভ্রমর সিদ্ধান্ত ।
- ০। আগমবাসিনের বংশে—অভিভাস্য ভ্রমর ।

*In May 1817, the Cholera began in Nadiya, in 1818 it spread through India, then in 1820 to China, 1821 to Arabia and Persia, 1823 to Russia, and in 1832 to London.

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে বৈক্য প্রভৃ সমুদয়ে নবদ্বীপের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে, তদানীন্তন নবদ্বীপকে অতি সমৃদ্ধিশালী নগরী বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু সেই পূর্ব সমৃদ্ধির সহস্রাংশের এক অংশও অধুনা বিদ্যমান নাই। নদীর গতি-পরিবর্তনের সহিত নগরের সর্ববিধ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং কালের ক্রীড়ার ইহা একরূপ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে।

১৮০২ খ্রষ্টাব্দে একজন সাহেব এখানে অত্যন্ত ব্যাঘ্রের উপভবের কথা লিখিয়াছেন। ১৮০১ খ্রষ্টাব্দে ডরাটর লেডন, যিনি কয়েক মাস নদীয়ার ম্যাজি-স্ট্রেট ছিলেন, সার এস ব্যাকোল সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি এখানে সর্বদাই ব্যাঘ্রাদি শীকারে নিযুক্ত রহিতেন।

নবদ্বীপের নিকটবর্তী জহ্নু নগরে পূর্বে প্রতি বৎসর তাজীৰ সংক্রান্তিতে একটা বৃহত্তী মেলা হইত, এখনও উহা গাছপূজা নামে প্রচলিত এবং প্রতি বৎসর ঐ দিনেই হইয়া থাকে।* কথিত আছে এই স্থানেই জহ্নু মুনি এক গুহে গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। এখানে এক গৃহস্থের বাটতে কামবেহু ছিল এবং বহু লোকে উহার পূজা করিত। ১৮৪৬ খ্রষ্টাব্দেও এখানে অনানু ৩০টা মন্দির শ্রীমন্দির ও একশত সংস্কৃত টোল বিদ্যমান ছিল। এক্ষণে মন্দিরের সংখ্যাও অতি অল্প এবং টোলের সংখ্যা মাত্র পঞ্চদশ। পণ্ডিতের সংখ্যাও পূর্বাংশের বহুল পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে।†

In the Bengal Medical Report it is distinctly stated, as an undeniable fact, that the epidemic (Cholera) first appeared in the Nuddeah and Mymensing Dists. in May 1817 that it raged extensively there in June and in July had reached the distant district of Dacca.

(Vide W. H. Carrey's Good old days of Honble John Company P. 273. Vol. I (1600—1858 A D.)

কেহ কেহ বলেন যে কলেরা সর্ব প্রথম বর্তমান বশোহর জেলায় গদখালি গ্রামে উপস্থিত হইয়া ক্রমে পৃথিবী ব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে এবং গদখালি গ্রাম তখন নদীরা জেলা অন্তর্গত থাকায় প্রাপ্ত পুস্তকগুলিতে সর্বপ্রথম নদীরাতে কলেরার উপস্থিতির বিবরণ লেখা আছে।

*কবিকর্ণধর চণ্ডীতে ইহাই ত্রাঙ্কনী পূজা বলিয়া উল্লিখিত আছে।

† বর্তমান পণ্ডিত বঙ্গলীর নাম—মহানহোপাধ্যায় শ্রীহরিকৃষ্ণ তর্ক পঞ্চানন এবং মহানহোপাধ্যায় শ্রীধরনাথ সার্কভৌষ প্রধাম বৈদ্যারিক। সার্ক-প্রধান শ্রীহরিকৃষ্ণ তর্করত্ন—(বহিঃ পূর্ব হস্তী নিবাসী মহানহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ভায় পঞ্চানন নদীয়ার প্রধান সার্ক বলিয়া গণ্য, তদানীন্তন

১৮৩২ খ্রষ্টাব্দে এখানে ব্রহ্মান পাদরী সাহেবগণ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনা করেন। তৎপূর্বে ১৮১৬ খ্রষ্টাব্দে রেভী, ডিয়ার সাহেব এখানে কোন কোন বালককে ইংরাজী শিক্ষা দিতেন। বর্তমান কালে এখানে একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে; ছাত্র সংখ্যা অনন্য হুইশত।

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে এখানে একজন প্রভাবক “গোপাল পাইয়াছে এবং ঐ গোপালের আদেশে মৃতব্যক্তিগণ পুনর্জীবিত হইয়া ১৬ আশ্বিন বমালয় হইতে প্রভাগমন করিবে” বলিয়া এক হজুক ভুলিয়াছিল। বহু অশিক্ষিত নরনারী তাহার এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেই দিনে মৃত আত্মীয়গণের আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় হইতে এখানে বহু কীর্তনীর সন্মাদায় গঠিত হইয়াছে। বর্তমান যুগের এখানকার বিখ্যাত কীর্তনীরগণের মধ্যে শ্রাম বাউলের নাম সুপ্রসিদ্ধ। শ্রাম মনোপাধিপতি গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক। প্রেমিক ভক্ত শ্রামের মধুর কর্ণে তদানীন্তন আবাল বৃদ্ধ বসিতা বৃদ্ধ ছিল, এখনও প্রাচীনাাদের নিকট শুনা যায়,—

“ বাজলো শ্রাম বাউলের ধোল,

বহু মানী চরকাভোল।”

এখানকার উল্লেখযোগ্য বংশাবলীর মধ্যে প্রাজ্ঞেশ্বরীর বরেন্দ্রা ষড়িকর পণ্ডিত মণ্ডলীর মহিমাধ্বত নামাবলী ও সংকীর্ণ বংশ পরিচয়াদি ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত এখানকার গোবামী মহোদয়গণ শান্তিপুর শ্রীমহেশ্বর বংশের শাখা, ভক্তশ্রেষ্ঠ বর্দীর ব্রজানন্দ গোবামী প্রভুর বংশ, মণিপুরের

উপস্থিত ৮কানীধান-বাসী হওয়ার উপস্থিত হরিশ্চন্দ্রই মনোপাধিপতির প্রেত মার্জ বসিয়া গয়া) শ্রীঅজিতনাথ ভায়রহ, শ্রীভারাগ্রসর চূড়ামণি, শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ভায়রহ, শ্রীআশুতোষ ভর্ক-ভূষণ, শ্রীসীতারাম ভর্কতীর্থ, শ্রীবসিঃহরসাব মৃত্তিকভূষণ, শ্রীমিরজম বিদ্যাকৃষণ, শ্রীশশীমোহন মৃত্তিরহ, শ্রীহর্গামোহন মৃত্তিতীর্থ, শ্রীবোসেন্দ্রনাথ মৃত্তিতীর্থ, শ্রীমধুরানাম ভর্কবাসী, শ্রীউমেশ চন্দ্র ভর্করহ, শ্রীশশিকৃষণ মৃত্তিতীর্থ, শ্রীসত্যিকর্ষ বাচস্পতি, শ্রীহারকানাম শিবোবাসি, শ্রীকলাশচন্দ্র কাব্যরহ, শ্রীবাধকন্দ কাব্য রহ, শ্রীপারিলাল ভাণ্ডারভূষণ, শ্রীচীতুষণ শাস্ত্রী, শ্রীমহিভূষণ কাব্যতীর্থ, শ্রীহরিশব কাব্য মৃত্তিতীর্থ, বাসী শ্রীশিবমোহিন ভায়রতী, শ্রীদামোদর গোবামী সাহিত্য বর্ণনাচর্চা ও শ্রীজয়রাম গোবামী ব্যাকরণ-রহ প্রভৃতি।

রাজবংশ, কাংক্রবনিক কুলোত্তম কীৰ্ত্তিমান গুরুদাস দাস মহাশয়ের বংশ, ব্রায় বাহাদুর দ্বারকানাথ তট্টাচার্য্যের বংশ, বাবু তারিণীচরণের বংশ, এসিদ্ধ বাজ্রাকার পণ্ডিত ৩মতিলাল রায় ও তৎপুত্র কৃতি বর্ষদাস রায় প্রভৃতির বংশ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

এখানকার উল্লেখযোগ্য বর্ষনীর হানগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য, যথা—অত্রহ পণ্ডিত মণ্ডলীর বিভিন্ন চতুষ্পাঠী সকল, ৩ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন স্থাপিত হরিসভা ও চতুষ্পাঠী, ৩পোড়ামা সিংহবর্ষী, ৩ভবভারত ও ভবভারতীর মন্দির, ৩বুদ্ধোদিশি, ৩আগমেশ্বরী মাতা, ৩মহাপ্রভুর মন্দির, শ্রীবাস আশ্রিন* প্রভৃতি ।

বিভিন্ন বৈষ্ণব পাঠাবলী, এবং গজার পর পারহিত মায়পুর ও তৎকার শ্রীমন্দিরাদি এবং চাঁদ কাজীর কবর । বদ্রাল দিবি ও সুবর্ণ বিহার ও তত্রহ প্রাচীন রাজবাটীর লুপ্তপ্রায় ধ্বংসাবশেষ ।

সভাসমিতির মধ্যে “বহুবিশুদ্ধ জননী সভা” ও গজাটীকুরী-বাসী বনাম-খ্যাত হাস্যরসিক শ্রীহুজ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থাপিত “নববীণ সন্মাজ” সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । বহুবিশুদ্ধ জননী সভার পূর্ব নাম সংস্কৃত বিদগ্ধ-জননী সভা । ইহা প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে মহেন্দ্রনাথ তট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ, ডি এল কর্তৃক স্থাপিত হয় । তখন ইহার সভাপতি ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, সম্পাদক সর্বেশ্বর সার্কভোম ছিলেন । পরে মহেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পর ঐ সভা বহু বিশুদ্ধ-জননী সভা নামে খ্যাত হয় এবং বর্তমান নদীয়াস্থিতি মহারাজ ক্রিষ্ণচন্দ্র ঐ সভার সভাপতি হইলেন । পরে সভাপণের সহিত মহারাজের কতকগুলি বিষয়ে মতভেদ হওয়ার তিনি ঐ পদ ত্যাগ করিলেন ১৮৫ বৎসর ইহা স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে রক্ষিত হয় তৎপরে বজের শ্রুতি সন্তান লুপ্তিত, হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীহুজ আন্তোয়, বুদ্ধোপাধ্যায়, সরস্বতী, এবং এ, ডি. এল, ঞ্জ. আর. এস, ই, মহোদয় ঐ সভার সভাপতি হইয়াছেন । ইহার উদ্দেশ্য, সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি ও বিজ্ঞান, উপাধি পরীক্ষার উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি । ইহার বর্তমান সম্পাদক শ্রীমুসিংহ প্রসাদ স্মৃতিভূষণ ।

* শ্রীবাস আশ্রিন পূর্বে পুণশঙ্করের দক্ষিণ ভাগে রাধী কলুর পৌতার ছিল, তথা হইতে গজার চত্বর বর্তমান বাজারের পূর্ব উত্তর, তৎপরে এখন বাজারের দক্ষিণ অংশে স্থাপিত আছে ।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থাপিত নবদ্বীপ সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য হিন্দুসমাজের সর্বস্বত্ব সৎকার সাধন ও ব্রাহ্মণ্যের আভির্ভাব আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন। ইহার বর্তমান মন্ত্রী শ্রীহরিদাস ভায় সিদ্ধান্ত।

নবদ্বীপের উপর শিল্প সামগ্রীর মধ্যে পিত্তল কাংস্যের সামগ্রী, মাটির বাসন, তুলসীর মালা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নদীয়ার নিকটবর্তী স্থান সমূহের মধ্যে মায়াপুর, স্বরূপগঞ্জ, মহেশগঞ্জ বিষ্ণুধরিত্রী প্রভৃতি গ্রামগুলি উল্লেখযোগ্য।

মায়াপুর—ইহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মভূমি, বৈষ্ণবমতে অষ্ট ক্রোশ পরিমিত নবদ্বীপ নগরের কেন্দ্রস্থলী শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অগ্রকটের পর, নদীর গতি পরিবর্তনাদি নানা কারণে ইহা কিছু কাল, পরিত্যক্ত পদীর ন্যায় লুপ্তভাবে ছিল, কয়েক বৎসর হইতে তৎপ্রেমী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তি-বিনোদ, ও অন্তর্ভাবারে স্বনামধন্য, পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ ও নদীয়ার স্বর্গীয় ছাত্রকা নাথ সরকার রায় বাহাদুর ও দেশহিতৈষী বৈষ্ণব জমিদার শ্রীযুক্ত নকরচন্দ্র পাল চৌধুরী প্রমুখ দৌরভক্তবৃন্দের বন্ধে ও পরিচয়ে, ও হৃদ্যার্থিক সাহিত্যোৎসাহী, বহুভাষ্য প্রবর ভগবতভক্ত স্বাধীন ত্রিপুরাবিশিষ্ট স্বর্গীয় মহারাজ গোবিন্দ বর্দমানিক্য বাহাদুরের আর্থিক আনুকূল্যে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং শ্রীশ্রীগৌর ও বিষ্ণুধরিত্রীর নিত্য সেবা এখানে স্থাপিত হইয়াছে। এখানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মভাড়া উপলক্ষে একটা মেলা হইয়া থাকে। এখানে বিখ্যাত চাঁদ কাজির সমাধির কংসাধর্ষেব হুঁই হইয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এখানে অদ্যাপীও অসংখ্য তুলসীবৃক্ষ হুঁই হয়। উহা বিনা আরাধনায়, আপনা হইতেই জ্বলিয়া থাকে।

মহেশগঞ্জ—বড়িয়া (জলদী) নদীর উপরেই স্থাপিত। উপস্থিত ইহা একটা ক্ষুদ্র পদী, জমিদার নকরচন্দ্র পাল চৌধুরী ও ইংলণ্ড প্রভাগ্যত কৃতবিদ্য ও স্বদেশহিতৈষী জমিদার বিপ্রদাস পাল চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের পিতা স্বর্গীয় মহেশ বাবুর নামে স্থাপিত, এখানে বিপ্রদাস বাবু মৃত্যু অবাস স্থান নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। এবং তিনি এখানে কল কারখানা স্থাপিত করিয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সম্রাট প্রচার বাসনের কারখানা ও নদীয়া টেনারী নামে জুতার কারখানা স্থাপিত করিয়াছেন। মেহেরপুর হইতে এই স্থান পর্যন্ত রেল লাইনের প্রস্তাব হইয়াছে; এই রেল লাইন পার হইয়া কাটোয়া রেলের সহিত সংযুক্ত হইবে।

বরুণগঞ্জ—জলদ্বার উপরে স্থাপিত, ইহা শিবনিবাসের অমিত্যর বর্গীয় বরুণ চন্দ্র সরকার চৌধুরীর নামে স্থাপিত। তৎকালে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহোদয় এখানে একটি আবাস ঘাটী নির্মাণ করিয়া সুরভি-কুঞ্জ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ও তথায় বৎসরের অধিকাংশ সময়ে অভিযাহিত করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুধরিনী—একটি ক্ষুদ্র পল্লী হইলেও এখানে পূর্বে বহু পণ্ডিতের আবাস-স্থান ছিল, এক্ষণে পণ্ডিতের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। এক্ষণে পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন স্মৃতিরত্ন ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ তর্ক-রত্ন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ভাজন ঘাট—নদীয়া জেলার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান; এখানে পূর্বে বহু বৈদ্যের বাস ছিল, এক্ষণেও বহু বৈদ্য এখানে বাস করিয়া থাকেন। রাই-উদ্দাদিনী প্রভেতা প্রেমিক কবি বর্গীয় কৃষ্ণকমল গোস্বামীর আবাস স্থল। এখানকার অধিবাসীগণের মধ্যে নিম্নলিখিত মহাত্মগণের নাম উল্লেখযোগ্য। শুলেধক ও হুচিকিৎসক ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, কবিগুরু শ্রীচন্দ্র রায়, শ্রীচাক্রচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ রায় এবং বনামধ্যাত শ্রীশ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য ইহার অল্প নদীয়া গৌরবান্বিত।

কুঠিয়া ।

কুঠিয়া জেলা নদীয়ার একটি অতি প্রাচীন ও বর্ধিত গ্রাম না হইলেও ইহা জন সংখ্যাধিক্য ও বিস্তৃতিতে নদীয়ার সর্বপ্রধান মহকুমা। এখানকার অধিবাসীগণের ১৫ আনা ভাগ মুসলমান এবং কৃষিকার্য্যই তাহাদের প্রধান অবলম্বন।

নবাব মুরশিদকুলির সময়ে যখন অগ্রহীণ নদীর পূর্বে গারে আসিতেছিল, এবং পাটিলির রাজাগণের এলেকাধীন ছিল এবং যখন এখানকার শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউর মেলায় প্রতি বৎসর অন্যান্য একলক লোকের সমাবেশ হইত, তখন এখানকার এই অসাধারণ জনতার পিষ্ট হইয়া কতকগুলি লোক প্রাণত্যাগ করে। এই সংবাদ নবাবের কর্ণপোচর হইলে, তিনি এইরূপ অকারণ নরহত্যার ক্রোধ হইয়া যখন ঐ স্থানের অমিত্যরকে শাস্তি দিবার জন্য, অগ্রহীণ কোন্ অমিত্যরকে

অমিদারী-ভূক. এই বিষয় অমিদারপণের পক্ষে মোক্তারদলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন, কি জানি প্রকৃত কি শাস্তি হইবে মনে করিয়া উক্ত অমিদারের মোক্তার অন্তান্ত মোক্তারপণের সহিত একযোগে তাঁহার মনিবের নহে এই কথা বলায় হুচতুর নবদীপাধিপতির মোক্তার এই অপ্রত্যাশিত সুযোগ, কাতরকণ্ঠে, উহা তাঁহার মনিবের এলেকাধীন স্বীকার করিয়া, বখাবিহিত উক্তর দানে নবাবের ক্রোধ শাস্তি করিয়া, চতুরভাবে অগ্রবীপ প্রাপ্ত হইয়া বীর প্রভুকে জ্ঞাপন করেন। তখন রাজা, শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউকে এইরূপ অপ্রত্যাশিতরূপে বীর তত্ত্বাবধানে প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করেন এবং তাঁহার সেবার নিমিত্ত বর্তমান কুঠিয়া ও তরিকটবর্তী কতিপয় গ্রাম দেবসেবার অর্পণ করেন ও ঐ সকল স্থানের নাম রাখেন গোপীনাথবাদ। এই গোপীনাথবাদই বর্তমান কালে কুঠিয়া। ইহা বর্তমান নদীরা জেলার উত্তর সীমার পদ্মা নদীর উপরে অবস্থিত, এবং জেলা করিমপুর* ও বগোয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট; সেই কারণে এখানকার কোনও কোনও স্থানের অধিবাসীগণের বাপুত্ব স্বীকৃত বহু অধিবাসী পণের ভায়।

ইহার এলেকাধীনে যে সমস্ত নদী আছে তাহাদের মধ্যে গড়ুই ও কালীগঙ্গা প্রধান।

পূর্ববক্ত রেলপথ সর্ব প্রথম এই কুঠিয়া পর্য্যন্তই স্থাপিত। এই রেলস্থাপিত হওয়ার পর হইতেই এবং মহকুমা স্থাপিত হইয়া ইহা বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। নবো এই কুঠিয়াকে সেন্টার (Centre) করিয়া, পার্শ্ববর্তী কয়েকটা জেলা হইতে হুএকটা করিয়া মহকুমা লইয়া, উহাকে কুঠিয়া জেলা নামে একটা স্বতন্ত্র জেলা করিবার প্রস্তাব হয়; কিন্তু পরিণেমে সে সম্বন্ধ পরিভ্রান্ত হয়।

সমগ্র কুঠিয়ার পাটের চাষের বিলক্ষণ প্রমাণ। নিজ কুঠিয়ার কাপড় ও ছিট একপে সর্বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের আন্তরিক বহু ও চেষ্টার বিগত ১৯০৭ সাল হইতে এক লক্ষ টাকা মূলধনে এখানে “মোহিনী মিল” নামে একটা

* বিগত ১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসের কুঠিয়া মহকুমা হইতে কতকগুলি গ্রাম বাহির করিয়া লইয়া পূর্ববর্তী কোর্সেট করিয়া করিমপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মোহিনী বাবুর তত্ত্বাবধানে ইহা দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে। এই কলের কাপড় অত্যন্ত কলের কাপড়ের সহিত যেমন প্রতিযোগিতায় প্রেৰ্ত্ত হইয়াছে, তেমনই মূল্যেও অসাধারণ হ্রাস হইয়াছে।

এখানকার মধ্যে জটিল—হাই স্কুল, কেমিস কনসার্ন বা বৈকীলাল নদীতট ইত্যাদি।

কুঠিরা মহকুমার অধীনে, উল্লেখযোগ্য প্রাচীন গ্রাম সংখ্যা অতি বিরল, জঙ্গল উহারই মধ্যে কুমারখালি, আমলাসদরপুর, ছেঁউরিয়া প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামের নাম উল্লেখযোগ্য।

কুমারখালি—এখানে নবাবী আমলে একটা কাছারি ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটা ফ্যাক্টরি ছিল শুনা যায়। বর্ত্তমান রেল ষ্টেশনের সংলগ্ন যে একটা অবসর-রক্ষিত গোরস্থান দৃষ্ট হয়, উহা সেই কোম্পানীর আমলে স্থাপিত। এখানকার অমিদার কলিকাতার ঠাকুর বাবুরা। হুশিঙ্গ কাকাল হরিনাথ এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালের লেখকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের নিবাস এই স্থানে এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লেখক রাজসাহির প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের জন্মস্থান ইহার সন্নিকটবর্ত্তী।

আমলাসদরপুর—ইহা স্থানীয় অমিদার সাহ বাবুদের জন্মই প্রসিদ্ধ।

ছেঁউরিয়া—এই গ্রামখানি ধর্ম্ম-সংস্কারক লালন ফকিরের জন্মই প্রসিদ্ধ হয়। তাঁহার চরিত্র নানা অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ। তাঁহার ধর্ম্মমত অতি সরল উদার ছিল। তিনি আভিভেদের নিন্দা করিতেন এবং নিজে বনিও আভিভে কায়ছ (কুঠিয়ার নিকটবর্ত্তী চাপড়ার জৈমিকধর্ম্মের আশ্রয়) ছিলেন, তথাপি কেহ তাঁহার আভি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বশেষত এই গানটী শুনাইতেন—

সব লোকে কয় লালন কি আত সংসারে ?

লালন ভাবে আভির কি রূপ দেখলাম না এ সময়ে।

কেউ মালা কেউ তছবী পলার,

তাইতে তো আত তিন্ন বলার,

বাওয়া কিনা আসার বেলায়

আভের চিহ্ন নয় কারয়ে ?

যদি হুত্ব দিলে হয় মুশমনান,
 নারীও তবে কি হয় বিধান ।
 আমন চিনি—গৈড়া প্রাণ,
 বামনী চিনি—কিসে রে ?
 অগ্নে বেড়ে বেড়ের কথা,
 লোকে নৌরব করে কথা তথা,
 লালস সে কেতের বাতা

হুচিয়েছে সাধ বাজারে ।

লালস নিরাকর ছিলেন । তাঁহার মূল্যবান পদাবলী তাঁহার হিন্দুস্তানের পরিচয়
 দিত । বৈকুণ্ঠদেবের বর্ষ মন্ডের প্রতি তাঁহার বাতাবিক অনুমান ছিল এবং
 ত্রিভুজকে কখন কখন অবতার স্বীকার করিতেন । সত্য ভাব, সরল ব্যবহার,
 তাঁহার প্রবর্তিত বর্ণের মূল-মন্ত্র ছিল । হেউরিয়া গ্রামে তাঁহার প্রধান আশ্রয়
 ছিল । প্রতি বৎসর শীতকালে তিনি তথায় একটি উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন ।
 ইহার দ্বিতীয় সংখ্যা তদা যার প্রায় দশ সহস্র—প্রায়ই নিরাকর কৃষক ।
 ইং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে ১১৬ বৎসর বয়সে
 লালসের মৃত্যু হয় ।

নদীয়া সম্বন্ধে জাতব্য বিবিধ বিষয় ।

জেলা নদীয়া, বর্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমা নির্দেশ করিতেছে, এবং $২৪^{\circ} ১১' ০''$ ও $২২^{\circ} ৫২' ৩০''$ উত্তর ল্যাটিটিউড্ এবং $৮৯^{\circ} ২৪' ৪১''$ ও $৮৮^{\circ} ১০' ৩০''$ পশ্চিম লঙ্গিটিউডের মধ্যে অবস্থিত। উত্তর সীমা উত্তর সীমা জেলা রাজসাহী, পূর্ব সীমা জেলা পাবনা ও বশোহর, দক্ষিণ সীমা ২৪ পরগণা এবং পশ্চিম সীমা জেলা বীরভূম, বর্তমান ও হুগলী এবং উত্তর-পশ্চিম সীমা জেলা মুরসিদাবাদ। ইহার বিস্তৃতি ১৮৭১ সালে ৩৪১৪ বর্গ মাইল ছিল, এক্ষণে উহা আরও কমিয়া দাঁড়াইয়া হইয়াছে ২,৭৯৩ বর্গ মাইল। ১৭৯৫-৯৬ এবং ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র জেলার গ্রাম সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০৪১। ১৮৭০ অব্দে ছিল প্রায় ৩২৫০, ১৮৭২ অব্দে আদমশুমারীতে সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩১১। বিগত ১৯০২ অব্দে সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩,৪২০।*

বিস্তৃত অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বৃদ্ধিপাত করিলে, নদীয়ার বে গ্রাম-সংখ্যার ক্রমশঃ হ্রাস হইতে দেখা যায়, উহার কারণ এই যে, বঙ্গদেশে ইংরাজ বিজয়ের পর সর্বপ্রথম নদীয়ার জেলা স্থাপিত হয়। তখন ইহার আধুনিক চতুঃপার্শ্ব সকল জেলার অনেক অংশ, বিশেষতঃ হুগলী, বশোহর ও মুরসিদাবাদের অনেক গ্রামই নদীয়ার অন্তর্গত ছিল; পরে সময়ে সময়ে ইহার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া লইয়া চতুঃসীমাহ জেলার সহিত যোগ করিয়া দেওয়ার, ইহার আরও ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর বশিরহাট ও তৎসংলগ্ন বহুস্থান নদীয়া হইতে বাহির করিয়া বশোহরে যুক্ত করা হয়। ঐ বৎসর ঐ তারিখে মোজে আনারপুর নদীয়া হইতে বাহির করিয়া ২৪ পরগণায় যোগ করা হয়, ঐ বৎসর ২৯শে আগষ্ট বরুগপুর ও পরানপুর লইয়া বশোহরে যোগ করা হয়। এইরূপ ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে ২রা অক্টোবর নদীয়ার বহুস্থান

* Bengal Mss Record" এর ২৩৩৭, ২৭৯০, ২৭৯৩, ৩০০৮, ৩০৭৫, ৩১৪৭, ৩২২৫-৩৩ এবং ৩৭৮৭, ৩৭৯৭, ৩৮৩৩-৩৪, ৩৯৭৪-৭৫, ৪০৮৩, ৪১০৭, ৪১৮৩, ৪২১৭, ৪৩০৭, ৪৪৭৭, ৪৫২৭, ৪৮৭০, ৪৯২০, ৪৯২৭, ৪৯৩৮, ৬১৭৮ প্রভৃতি সংখ্যক পত্রের হুল পত্রগুলি দৃষ্টি করিলে নদীয়ার পরিমাপের হ্রাস বৃদ্ধি উপলব্ধ হইবে।

বর্তমান ও হ্রস্বীকৃত করা হয়। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ১১শে জামশাদপুর নদীয়ার বহুস্থান মুর্শিদাবাদের সামিল করা হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইহা হইতে অনেকগুলি পরগণা বাহির করিয়া লইয়া বারাসত জেলা গঠন করা হয়; ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত বারাসত ঐক্যপূর্ণ অর্ধ জেলা ছিল ও তথায় একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকিতেন। ১৮৭২ অব্দে আদমপুরীয়ার রিপোর্টে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, সবডিভিজন বনগ্রাম তখনও পর্যন্ত নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। পরে ১৮৮২ অব্দের ১লা জুন তারিখে উহাকে জেলা যশোহরের অধীন করা হইয়াছে। উপরিত্ত ককনগর, মেহেরপুর, কুতিয়া, চুরাজঙ্গা এবং রাণাঘাট এই পাঁচটা সবডিভিজন লইয়া নদীয়া জেলা গঠিত। ইহার মধ্যে ককনগর, জেলার রাজধানী ও সদর। কথিত আছে এখানে ১৭৭২ অব্দে প্রথম জজ ও কালেক্টরী আদালত স্থাপিত হয়।

১৭৯০ অব্দে সমগ্র জেলার মোট একটা দাওয়ানী আদালত ও একজন মাত্র কন্টেনেন্ট অফিসর ছিলেন; ১৮০০ অব্দে ৩১টা আদালত ও ২টা ইংরাজ কন্টেনেন্ট অফিসর ছিলেন। ১৮৮০ অব্দে ২৬টা কোজদারী আদালত (জানাবারী বেক লইয়া) এবং ১৮টা দাওয়ানী (রাজস্ব সম্বন্ধীয়) আদালত এবং ৪ জন কন্টেনেন্ট অফিসর ছিলেন।

নদীয়ার নদী।

নদীয়া জেলার অনেকগুলি নদী বর্তমান আছে। ইহাদের সকল গুলিই পদ্মার শাখা। পদ্মা, যে স্থান হইতে জালাদী নদী বাহির হইয়াছে, সেই স্থান হইতে পূর্বমুখে কুতিয়া পর্যন্ত বাইরা নদীয়ার উত্তর সীমা গঠন করিয়াছে। জালাদী বা কুতিয়া পদ্মা হইতে বাহির হইয়া নানানরূপ বক্রপাতিতে নদীয়া জেলার উত্তর পশ্চিম সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া ককনগরের তলদেশ দিয়া নবদ্বীপের পাণচুখন করিয়া নবদ্বীপ তলদেশবাহিনী ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ভাগীরথী মুর্শিদাবাদ জেলার হুঁতী থানার অন্তর্গত ছাপকাটা গ্রামে মূল নদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিরদুয় আসিয়া বিধূপাড়ার নিকট মুর্শিদাবাদ জেলা ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপের নিম্নে জালাদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই ভাগীরথী জালাদীর সম্মুখ স্থান

হইতে ইংরাজগণ দক্ষিণবাহিনী তানীরবীর “হুগলী রিতার” নাম দিয়াছেন । পদ্মার যে স্থান হইতে জালাঙ্গী বাহির হইয়াছে, তাহার আর পাঁচ ক্রোশ নিম্ন দিয়া মাথাভাঙ্গা বা হানুই বহির্গত হইয়া প্রথমে দক্ষিণ পূর্ব মুখে পরে কিরদুর্ আসিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হইয়া কৃকগঞ্জের উলদেশে আসিয়া বিধা বিভক্ত হইয়াছে ও চুই মুখ চুই নামে চুইনিকে প্রবাহিত হইয়াছে । এই চুই স্রোতের একের নাম চূর্ণী, অপরের নাম ইছামতী । চূর্ণী কৃকগঞ্জ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে মামজোরান, রাণাঘাট হরখাম প্রভৃতির উলদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া শান্তিপুর ও চাকদেহের মধ্যবর্তী হুগলী রিতারে পতিত হইয়াছে । ইছামতী প্রধানতঃ যশোর ও ২৪ পরগণা দিয়া প্রবাহিত । তৈরব নদের উত্তরাংশ জালাঙ্গী হইতে বাহির হইয়া মেহেরপুর প্রভৃতির উলদেশ দিয়া, কাপাশভাঙ্গার নিকট মাথাভাঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে । মাথাভাঙ্গা হইতে চাঁদপুরের নিকট কপতঙ্গ (কপোতাক্ষ) ও সমানপুরের নিকট পান্ধারী বা কুমার নদী বহির্গত হইয়া জেলা যশোরের অতিমুখে আগ্রসর হইয়াছে ।

এই সকল নদীর মধ্যে ইংরাজগণের তানীরবী, জালাঙ্গী এবং মাথাভাঙ্গা প্রধানতঃ নদীয়ার নদী নামে খ্যাত । পূর্বকালে এই সকল নদীই দেশদেশান্তরে বাইবার একমাত্র উপায় ছিল এবং দেশের অন্তর ও বহির্কোনিজ্য বিস্তারের এক মাত্র উপায় ছিল । আদিনি্য তারতের কি পাপে আজ সেই সকল স্বতাবজাত স্রোতবতীর এই অভাবনীয় হ্রদনা । পূর্বে যে সকল নদী দিয়া হুগুহং জলযান ওঅর্ধবপোত সকল অবাধে গভয়াত করিত, যে শান্তিপুরের কুঠী হইতে সূতা, বস্ত্র এবং বহুল পরিমাণে মদ্য এবং মালমহ, মুকুন্দাবাদ প্রভৃতি স্থান সকল হইতে রেশমী শূন্য বস্ত্র, চিনি চাউল প্রভৃতি এবং নদীয়ার ইতস্ততঃ বিক্ৰিষ্ট শত সহস্র কুঠী হইতে নীল সংগ্রহ করিয়া হুগুহং অর্ধবপোত সকল সর্বদা গমনাগমন করিত, আজ সেই সকল নদী নানা কারণে কোথাও বহুসলিলা, কোথাও জীর্ণ-কলেবরা, কোথাও শূন্য রজত ধারার স্তার মুহু হইতে মুহুতর গতিতে বহমানা । এমনকি যে চুই একটী নদীতে সমস্ত বৎসর ধরিয়া কিছু জল থাকে, তাহাভেও গ্রীষ্মকালে জুজ জুজ তরলী চালসা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে । পৰ্ব্বমেষ্ঠে প্রতি বৎসর জালাঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা নদীতে ধরস্রোত প্রবাহিত করাইবার জন্ত বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন এবং করিতেছেন কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও

কল হয় নাই বা হইতেছে না। এই ব্যক্তি অৰ্ধ সংগ্রহের নিমিত্ত পৰ্য্যবেষ্ট নদীয়া জেলার হুই স্থানে “টোল” বা চলিত নৌকার উপর কর দাখ্য করিয়া উহা সংগ্রহের নিমিত্ত আচ্ছাদ্য স্থাপনা করিয়াছেন। ১ম মবরীশে গঙ্গা আলাদী নদ্বয়ে; ২য় কৃষ্ণগঙ্গে, বেখানে মাথাডাঙ্গা চূর্ণী ও ইছানডী নামে হুই মুখে প্রবাহিত হইয়াছে। ১৮৬১ অব্দ হইতে ১৮৭০ অব্দ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে নদীয়ার নদী সকল হইতে মোট ২৪৯,৬০২ টাকা চারি আনা আদায় হয়; উহা হইতে সৰ্ব্ব কারণে মোট ব্যয় হয় ১৪৫,০৯৪ টাকা চারি আনা এবং বাকী ১০৪,৫০৮ টাকা ষাটী রাজস্ব আর হইয়াছে।

এই সমস্ত নদীর উপর পূৰ্বে যখন রেলপথ নির্মিত হয় নাই, তখন বহু স্থানে গঙ্গা ও নৌকার আচ্ছাদ্য বর্তমান ছিল। সেই সুষ্ঠু প্রায় গঙ্গাগুলির মধ্যে মুখ-সাগরের গঙ্গাই বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখানে গঙ্গা অভিশয় বিস্তীর্ণ ছিল এবং অনেকগুলি নৌলুটী ইহার উপর ছিল; তন্মধ্যে প্রধান ছিল (জুজু ব্রাট) সাহেবের লুটী।* এখন যখন হুনসকী আদালতের বসি হয়, তখন এখানে উল্লার এবং মাকজোরানে রাণাঘাট সবডিভিজনের এখন হুনসকী আদালত স্থাপিত হয়। মুখ সাগরের আদালতে জজ হোসেন সান সাহেবের নাম পাওয়া যায়। আচ্ছাদ্য স্থানের গঙ্গাগুলি এখনও অতি হীন অবস্থায় বর্তমান আছে; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গঙ্গা কর্তী অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী। ভানীয়াবীর উপর কালীগঙ্গা ও মবরীশ, হুগলী রিভারের উপর শান্তিপুর ও চাকদহ। আলাদীর উপর করিমপুর, চাপড়া, গোরাডী-কৃষ্ণনগর, বরুণগঙ্গা। মাথাডাঙ্গার উপর মুলিগঙ্গা, দাকুরহা, কৃষ্ণগঙ্গা। চূর্ণীর উপর হাঁসখালী ও রাণাঘাট। পাঙ্গলী বা কুমারের উপর আলমডাঙ্গা। গঙ্গার উপর কুষ্টিয়া অবস্থিত। অবশ্যি এই সকল গঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে ধান, চাল, সরিষা, শুভ ও পাটের আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে।

* Mr. George Barreto অপব্যয়ে “জুজু ব্রাট” হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই লব্ধ ব্যয়েটীর হুনসাগরে একটি কুখ কোলা ছিল। Lord Clive যখন পলাশী বিজয়ে এই মুখ সাগরের তলবাসিনী গঙ্গা বিজা গিয়াছিলেন, তখন ব্যয়েটী তাঁহার সম্মানের জন্য কামান দাগিয়াছিল। কিন্তু কল্যাণীর কোলা ভাঙিয়া Clive পলাশীর যুদ্ধের পর প্রত্যাগমন কালে এই কুখ কোলাটি ধ্বংস করিয়াছিলেন।

এই সকল বহুত নদী যতীত নদীয়ার আর কতকগুলি নদী আছে, বাহারী পূর্বে বেগবতী স্রোতধিনী ছিল, এক্ষণে হয় বহু-সলীল, না হয় শুধু অবহার পরিণত। ইহার বর্ষাকালে বিস্তীর্ণ বিলের আকার ধারণ করে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১ম কুকনগরের অবতিস্থানে হিত অঙ্গনা। ইহা পূর্বে আলাদী নিঃসৃত ক্ষুদ্র বলেবরা বহুসলিল স্রোতধিনী ছিল। কথিত আছে, নদীয়া রাজবংশের পূর্বে পুরুষ, কুকনগর স্থাপয়িতা রাজা ক্রতের সময়ে ১০৮৭ খ্রিঃাব্দ বা ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি মুসলমান সৈনিক পুরুষ এই জলপথে অঙ্গনা দিয়া বাইবার সময় ক্রতের দৌবারিকপণের সহিত বিবাহ করে; তাহাতে উত্তর পক্ষের একটা ক্ষুদ্র সংঘর্ষ হয়; এই কারণে ক্রত হইয়া রাজা ক্রত পরবর্ষেই অঙ্গনার পতি ক্রত করিয়াছিলেন। ২য়—কাঁচিকাটা নদী ইহারই উত্তরে সুবিখ্যাত কাঁচিকাটা কনসারণ নামীয় নীলভূমি স্থাপিত ছিল। ৩য়—রাণাঘাটের উত্তর এবং দক্ষিণ পূর্বদিক বেটন করিয়া যে হুইটী জলহীন খাত বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং বাহারী বাচকা ও হাকরের খাল বলিয়া খ্যাত,—বাহারী বর্ষাকালে অদ্ব্যাপি নদীর আকার ধারণ করে, তাহা পূর্বে চূর্ণী নিঃসৃত হুইটী ক্ষুদ্র স্রোতধিনী ছিল। রাণাঘাটের এক মাইল উত্তর-পূর্বে বাচকোর উত্তর স্থানে হিত নৌকাড়ি বলিয়া একখানি বহু পুরাতন ক্ষুদ্র গ্রাম বিদ্যমান আছে। গ্রামখানির নাম হইতেই উপলব্ধি হইবে যে, ইহা পূর্বকালে নৌকার আড়ি বা নৌকার আড্ডা ছিল। এই গ্রাম খানি বহু পুরাতন, এমন কি ৫৬ শত বৎসর পূর্বেও যে ইহা বিদ্যমান ছিল তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। খ্রীষ্টচৈতন্য লীলার প্রধান নায়ক শান্তিপুত্র-বাসী খ্রীষ্টযোত্যাচার্য্য প্রভু (১৪০৪ খৃষ্টাব্দে) এই গ্রামে দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করেন। এ বৃত্তান্ত অবৈত মঙ্গল লেখক শ্রীমৎ ভানুদাস বিশদ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে কালেও এই বাচকোর খাল বহুত ছিল এবং ইহার উপরিস্থিত ক্ষুদ্র গ্রাম খানি তখনও নৌকাড়ি বা নৌকার আড্ডা ছিল। এই ক্ষুদ্র খাত যে মহারাজ কুকচন্দ্রের সময় পর্যন্ত যে প্রবাহ ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ মহারাজা কুকচন্দ্রের জীবনীতে আমরা দেখাইয়াছি যে তিনি এই গ্রাম দিয়া নৌকাযোগে গমন কালে এই নৌকাড়ি গ্রামের কোন ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ কতাকে জলক্রীড়া কালীন দর্শন করিয়া তাহার রূপে আকৃষ্ট

হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। হুতরাং দেখা বাইতেছে যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও অর্থাৎ ১৭১০ খৃষ্টাব্দেও এই নদীটা বহুতা ছিল।

এই সকল স্রোতোধিনী বা স্রোতোধীনা বা খাত মাঝে পর্য্যবসিতা নদী, গঙ্গা ও অন্যান্য নদীসকল বহু পূর্বকাল হইতে বহুদূরপে পতি পরিবর্তন করার নদীয়ার বহু স্থানে বহু খাত হুই হয়। বর্ষাকালে প্রায়শঃ এগুলি এক একটা নদীর আকার ধারণ করে। এতদ্ব্যতীত নদীয়া জেলার আরও অনেক সহিত তুলনা করিলে এখানে বহু স্বাভাবিক খাল, বিল ও জলাভূমি হুই হয়, নিম্ন বঙ্গের আর কোনও জেলায় এরূপ নহে। এই সকল বিল ও খালের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটা সর্বাধিক বিখ্যাত; এই সকল বিলে প্রতি বৎসর অনেক সাহেব ও বাবু পক্ষী শিকার করিয়া থাকেন।

১৪। কৃষ্ণনগর নগর সমভিতিজনের অন্তর্গত—হাড়খালি বিল, হাঁসাদাঙ্গা বিল, উৎপূর বিল, ডালগের বিল, দোপাটীয়ার বিল, নোয়ালদহের বিল, কলিঙ্গ বিল, জাইদ বিল, পলদার বিল।

২২। রাণাঘাট সমভিতিজনের এলেকার—বাগদেবী খাল, হরিপুর খাল, নিকোর খাল, তারাপুর বিল, আমবার বিল, শ্রিয়নগরের বাগড়, চামটার বিল, জাকড়ির বিল, পুন্নি বিল, চিনিয়ালী বিল, বহুনার খাল।

৩২। মেহেরপুর সমভিতিজনে—কলমার বিল, পদ্মার বিল, কামলা বিল, জিন্দপুর খাল, নাটোর বিল, ধামদার বিল, মাদিয়া বিল।

৪৪। চুরাডাঙ্গা সমভিতিসনের এলেকার—রায়সা বিল, দলকা বিল, সোনা-পাড়ী বিল, পুরাপাড়া বিল, এলাদী বিল, কমলদার বিল, ডালবেড়ের বিল, পরত রামপাড়ী বিল।

৫২। কুষ্টিয়া সমভিতিজনে—আমলার বিল, ডালবেড়ের বিল, কাঁকরার বিল, বোয়ালিয়ার বাঁওর, মহেশ কুপুর ডামোশ, কোচো ডাঙ্গার ডামোশ, খোলাধর ডামোশ।

এই সকল নদী, খাল, বিল প্রভৃতি অলঙ্কর হইতে বৎসর বরা একটা প্রধান ব্যবসার। কিন্তু বৎসরের লংঘ্য ক্রমশঃ স্থান হইয়া বাইতেছে, অধুনা 'পর্বৎসর' এ বিষয়ে কনোবোঙ্গী হইয়াছেন এক কিসে বৎসরের চার ডালদূরপে করা বাইতে পারে, তাহার বিষয়ে লালারূপ জললা কলনা করিতেছেন। নদীয়ার বিল ধামে ও

নদীতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত সংস্কৃতি পাওয়া যায়,—কুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস, খয়রা, জিওল, কৈ, ইটে, মাগুর, সোল, চিংড়ী, পাকাল, আড়, বোয়াল, গঁড়চা, পুঁচী, টেকড়া, ঢেলা, বেল, চিতল, চাঁদা, ট্যাগা, শঙ্কর, লাটী, বানু, কাকলে, তোড়া, ঝলসে, মেতিচিহ্নি, ইলিস প্রভৃতি ।

নদীয়ার রাজপথ ।

অজ্ঞাত জেলার আরতনের সহিত তুলনায় ক্ষুদ্র নদীয়া জেলার বড় নদী, রাজপথ, রেলওয়ে প্রভৃতি ব্যতীতের সুযোগ দৃষ্ট হয়, নিম্নবক্তের অল্প কোন জেলায় তদ্রূপ দেখা যায় না । যদিও পূর্বকালে নদীয়ার অন্তর ও বহির্বাণিজ্য প্রধানতঃ জলপথেই চলিত, তথাপি বাণিজ্য কার্য ও গমনাগমনের সুবিধার জন্য মুসলমানদিগের সময়ে এদেশে বৃহৎ বৃহৎ সুপ্রশস্ত রাজবন্দ বিদ্যমান ছিল । ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত একখানি মানচিত্রে বক্তের কয়টি প্রধান প্রধান রাস্তা লক্ষিত হয় ; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত রাস্তাটী নদীয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট দেখা যায় । যে স্থানে ভাগীরথী ও পদ্মা পৃথক হইয়াছে, পাটনা, মুন্সের ও রাজমহল দিয়া সেই স্থান পর্যন্ত একটা রাস্তা আসিয়া দুইটা শাখায় বিভক্ত হইয়াছে । একটা মুকুন্দাবাদ, পলাসী, অগ্রহীণ, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর দিয়া কটকাভিমুখে গিয়াছে, অপরটা পদ্মার দক্ষিণ ধার দিয়া কাত,বাদ (করিমপুর) পর্যন্ত বাইরা ঢাকার অভিমুখে গিয়াছে । জেমস্ রেনেলস্ কর্তৃক ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ডেসক্রিপশন অব্ রোড্‌স্ (Description of Roads) নামক গ্রন্থেও আমরা এই রাস্তাটির উল্লেখ দেখিতে পাই ; তাহাতে মেদিনীপুর হইতে বর্দ্ধমান দিয়া নদীয়া পর্যন্ত রাস্তাটির উল্লেখ আছে । পরবর্তী কালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজ কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পরবর্তীকালে রেনেলসের "ম্যাপ অব্ বেঙ্গলে" নদীয়ার মানচিত্রে আমরা নিম্নলিখিত স্থানগুলি উল্লেখযোগ্য ও বড় অক্ষরে মুদ্রিত দেখিতে পাই । ১ম। ককনগর—এখানে নদীয়ার রাজ্যপথের বাসস্থান বলিয়া একটা মন্দির চূড়ামালা চিহ্নিত করা আছে (২) পলাসী—আত্রহুণ দ্বারা চিহ্নিত । (৩) অগ্রহীণ—জলীরবীর পূর্বপারে অবস্থিত । (৪) ময়ূরীণ

(৫) শিবনিবাস—ইহাও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অন্ততম রাজধানী বিধায় বড় অক্ষরে মুদ্রিত। (৬) শান্তিপুর (৭) শ্রীনগর—ভদ্রানীতন নদীয়া ও রাজসাহির সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত।

এই সকল প্রধান প্রধান স্থানগুলিকে সম্বন্ধ করিয়া নিম্নলিখিত প্রধান রাজবন্দগুলি অঙ্কিত দেখা যায়।

১। কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর—ইহা নবরূপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নির্মিত। (২) কৃষ্ণনগর হইতে শিবনিবাস। (৩) কৃষ্ণনগর হইতে রাণাঘাট, শ্রীনগর, মল্লিকপুকুর, বরানগর হইয়া কলিকাতা। (৪) শিবনিবাস হইতে রাণাঘাট দিয়া বারাসাত। (৫) শিবনিবাস হইতে বনগ্রাম কিকড়গাছা এবং (৬) শ্রীনগর হইতে বনগ্রাম।

বর্তমানকালে ১১৬টী সাধারণের অর্থে চালিত রাস্তার মধ্যে নদীয়ার নিম্নলিখিত রাস্তাগুলি উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর	...	দৈর্ঘ্য	৯	মাইল।
কৃষ্ণনগর হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত	...	,,	১২½	"
কৃষ্ণনগর হইতে নদীয়া	...	,,	৬½	"
কৃষ্ণনগর হইতে মেহেরপুর	...	,,	২৫½	"
কৃষ্ণনগর হইতে রাণাঘাট দিয়া জাগুলি (পূর্বে এই				
রাস্তা দিয়া সৈন্ত চলিত)	...	,,	৩২	"
চাপড়া হইতে ডেহাতি (ডাকরাস্তা)	...	,,	১৪	"
মেহেরপুর হইতে রামনগর রেলস্টেশন	...	,,	২১	"
কৃষ্ণনগর হইতে বগুলা	...	,,	২½	"
কৃষ্ণনগর হইতে বরনগর	...	,,	২৮½	"
চাকদহ হইতে সুবাসান	...	,,	৬	"
রাণাঘাট হইতে বনগ্রাম	...	,,	২০	"
রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর	...	,,	৮½	"
চুরাডাঙ্গা রেল স্টেশন হইতে কিশোরদহ (বশোদহ)	...	,,	২২	"
চুরাডাঙ্গা রেল স্টেশন হইতে মেহেরপুর	...	,,	১৮	"

কুষ্টিয়া হইতে দাদপুর ...	৭	১
ককগঞ্জ হইতে কোট চাঁদপুর ...	২০	১
ককনগর হইতে শিবনিবাস ...	১৪	১
তেহাটা হইতে দেবগ্রাম দিরা কাটোয়া	২৫	১
তেড়ামারা হইতে শিকারপুর ...	১৬	১
কুষ্টিয়া হইতে কুমারখালি দিরা সিমলা	১৩	১
দর্শনা হইতে কাপাসডাঙ্গা দিরা কেদারগঞ্জ	১৭	১
পলাশী ষ্টেশন হইতে পলাশী মনুমেণ্ট	২	১
ককনগর হইতে পলাশী ...	২৮	১

আদম স্মারি ।

ইংরাজ-রাজ আমাদের দেশে কে সমস্ত কল্যাণকর বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ওষধো আদমস্মারী প্রথা অন্ততম । এতদ্বারা আমরা আমাদের দেশের লোক-সংখ্যা কত, গৃহের সংখ্যা কত, কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক কত, উদ্ভাদের মধ্যে শিক্ষিত কতজন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় অশেষবিধ সংবাদ জানিতে পারিয়াছি এবং প্রতি দশম বৎসরে ঐরূপ গণনার নিয়ম প্রবর্তিত হওয়ার ঐ সময়ের মধ্যে উক্ত সংখ্যাগুলির হ্রাস বৃদ্ধি কিরূপ হইতেছে, তাহা জানিয়া দেশের অবস্থা বিশেষরূপে অনুধাবন করিতে পারিতেছি । ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রথম বৎসর উক্ত নিয়ম প্রবর্তিত হয়, তখন জনসাধারণ ইহার উপকারিতা সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করে এবং অশিক্ষিত জনসাধারণ আবার বুঝি কোনও রাজকর ধার্য্য হইবে, তাই এইরূপ মাতুল গণনা হইতেছে মনে করিয়া বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করে । কলে সে বৎসর আদমস্মারী ঠিক সন্মোহিত হয় নাই । হাট্টার সাহেবের “ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল একাউন্ট অব্ নদীয়া” পার্চে জানা যায় যে সে বৎসর নদীয়ার জনসাধারণ বিশেষ উত্তেজিত হইয়া এই প্রকার বিপক্ষে যত্নমান হয়, তখন এখানকার কোনও মুশিক্ষিত মুচত্বর জমিদার মহাশয় লোককে নানারূপে উহার প্রকৃত অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করেন,

কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য না হইয়া শেষে এই বলিয়া সকলকে আশান্বিত করেন যে “মহারাজার দ্বিতীয় পুত্র এ দেশে শুভাগমন করায় মহারাজার আদেশে বাঙ্গলার সকলকে একদিন সম্মেলন প্রভৃতি নানা উপায়ের মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইবে, তাই যার ঘরে যে কয়জন লোক আছে, সরকারে লিখাইয়া দিলে তাহাকে সেই মত মিষ্টান্ন দেওয়া বাইবে।” এই মহা লোভনীয় আশ্বাস ব্যত্যয় না কি দলে দলে আসিয়া বিনা আপত্তিতে আপনাদের বথাবধ সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিল ; কিন্তু অনেকে তথাপি নানা কুসংস্কারের বশে আপনাদের সংখ্যা গোপন করিয়াছিল।

এই আদমশুমারীর রিপোর্টে প্রকাশিত সংখ্যাগুলি একেবারে বথাবধ না হইলেও, অনেকটা প্রকৃত এবং ইহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা বাইতে পারে। বিগত চারি বারের আদমশুমারীর লোক-সংখ্যার প্রতি বৃদ্ধিপাত করিলে দেখা যায় যে, ১৮৭২ অব্দ অপেক্ষা ১৮৮১ অব্দে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ১৮৭২ অব্দে প্রথম লোক গণনা হওয়ার সে বৎসরের গণনা ও তালিকার নতই বহু ত্রুটি ও ভ্রম সংঘটিত হইয়াছিল ; সুতরাং ১৮৮১ অব্দের সংখ্যাই বার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পরে ১৮৯১ অব্দের গণনার বেলা যায় যে, পূর্ব বারের গণনা অপেক্ষা এইবার ১৮,৬৬৭ জন লোক কমিয়া যায়। পরে বিগত ১৯০১ অব্দের গণনার ১৮৯১ অব্দের সংখ্যা অপেক্ষা ২০০৮০ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে ; অর্থাৎ ১৮৯১ অব্দের যে সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল তাহা পূর্ণ হইয়াও মোট ৪৬৯৬ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু অল্পনা রেল প্রভৃতি গমনাগমনের সুযোগ হওয়ার ২৩ সংখ্যক বিদেশী এসেছে আসিয়া পড়িয়াছে, বিশেষতঃ নদীয়ার অনশিত ইটখোলায়, রেলের বিভিন্ন কার্যে পোষ্ট আফিসের সহায় ব্যাপারে, নানা কল কারখানায়, সাধারণ ক্ষুদ্রোদ্য, বেহারায়, পাচকের ও বাগবানের এবং পুলিশের কার্যে, নৌকা-বাহী মার্কীর কার্যে, ৯৫৫ মিউনিসিপালিটির নত নত মেম্বর ও বাসকের কার্যে কনষ্ট্রাকটরের টিকাদারের কার্যে এবং নদীয়ার বাজারের নত নত বিপনীতে এবং কোথায় নহে, বেতগ উপজিলা, খোটা, বিহারী প্রভৃতি সহস্র সহস্র বিদেশী ব্যক্তির সমাগম হইয়াছে তাহাতে নদীয়ার আদিম জন সংখ্যা যে কিছু মাত্র বৃদ্ধি পায় নাই, পরক, দিন দিন হ্রাস হইতেছে, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। বর্ধমানের এ বিষয়ে বৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রার্থনীয়।

নদীয়ার বিস্তৃতি ২,৭২৩ বর্গ মাইল । ইহাতে ১টা মিউনিসিপাল মহর এবং ৩,৪১১ গ্রাম বিদ্যমান আছে । যেট অধ্যুষিত বাটীর সংখ্যা ৩৪৮, ৬২৮ উন্নয়ন সহরে ২৪,৮১১ এবং গ্রামে ৩২৩,৮১৭ বাটী আছে । যেট জনসংখ্যা ১৬৬৭৪১১ উন্নয়ন ১টা সহরে ১৫,০৫৫ এবং গ্রামে ১,৫৭২,১৩৬ । এই লোক সংখ্যার মধ্যে পুরুষ ৮২৭,৫০৯ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৮০৯,৯৮২ ।

সেনসাস্ রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৭২ স্বর্টাক হইতে ১৯০১ স্বর্টাক পর্যন্ত তুলনার সমগ্র জেলার লোকসংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধি হইবে । লোকসংখ্যা বৃদ্ধি কেত্রে প্লেনের (+) ও হ্রাস কেত্রে মিয়োরের চিহ্ন (-) প্রদর্শিত হইয়াছে ।

সমগ্র জেলার লোকসংখ্যার হিসাব ।*

স্বর্টাক ।	যেট জন সংখ্যা ।	তুলনার	হ্রাস বা বৃদ্ধি ।
১৯০১	১,৬৬৭,৪১১	১৮৯১ - ১৯০১	২০৫,৩০+
১৮৯১	১,৬৪৪,১০৮	১৮৮১ - ১৮৯১	১৮,৬৮৭ -
১৮৮১	১,৬০২,৭২৫	১৮৭২ - ১৮৮১	১৬২,৩২৮+
১৮৭২	১,৫০০,৩৯৭		

* Subdivision	Area in sq. Miles	Number of		Popola- tion.	Population per sq. Miles.	Number of persons able to read and write
		Town	Villages			
Krishnagar	701	2	740	361,333	515	29,784
Ranaghat	437	4	548	217,077	508	16,706
Kushtia	596	2	1,011	486,368	816	22,743
Meherpur	632	1	607	548,124	551	13,875
Chuadanga	437	7	485	254,589	583	10,267
Dist Total	2,793	9	3,411	1,667,491	597	93,375

স্থানের নাম	কোন সালে	জনসংখ্যা	ভুলনার	জাতি বা বৃদ্ধি
কৃষ্ণনগর—	১২০১	২৪,৫৪৭	১৮২১—১২০১	২৫৩—
	১৮২১	২৫,৫০০	১৮৮১—১৮২১	১,২৭৭—
	১৮৮১	২৭,৪৭৭	১৮৭২—১৮৮১	৭২৭+
	১৮৭২	২৬৭৫০		

১২০১ সালে হিন্দু ১৬২২০, ব্রাহ্মণ ৪, মুসলমান ৭৪৪২ ও খৃষ্টান ৮৬৪ ।

নদীয়া—	১২০১	১০,৮৮০	১৮২১—১২০১	২,৪৫৪—
	১৮২১	১৩,৩৩৪	১৮৮১—১৮২১	৭৭১—
	১৮৮১	১৪,১০৫	১৮৭২—১৮৮১	৫,২৪২+
	১৮৭২	৪,৪৬৩		

১২০১ সালে হিন্দু ১০,৪১৬, মুসলমান ৪৫৭ ও খৃষ্টান ৭ ।

কাজিপুর—	১২০১	২৬,৮২৮	১৮২১—১২০১	৩৫০২—
	১৮২১	৩০,৪৩৭	১৮৮১—১৮২১	৭৫০+
	১৮৮১	২২,৬৮৭	১৮৭২—১৮৮১	১,০৫২+
	১৮৭২	২৮,৬০৫		

১২০১ সালে হিন্দু ১৮,২১২ মুসলমান ৮,৬৭২ ও খৃষ্টান ৬ ।

রাণাঘাট—	১২০১	৮,৭৪৪	১৮২১—১২০১	২৩৮+
	১৮২১	৮,৫০৬	১৮৮১—১৮২১	১৭৭—
	১৮৮১	৮,৬৬৩	১৮৭২—১৮৮১	১৮৮—
	১৮৭২	৮,৮৭১		

১২০১ সালে হিন্দু ৭,৪০৫ মুসলমান ১২৬৮ খৃষ্টান ৭১ ।

হুগলী—	১২০১	৫,৩৩০	১৮২১—১২০১	৬৮৬—
	১৮২১	১১,১২২	১৮৮১—১৮২১	১,৪৮২+
	১৮৮১	২,৭১৭	১৮৭২—১৮৮১	৪৭২+
	১৮৭২	২,২৪৫		

১২০১ সালে হিন্দু—৩০৩৬, মুসলমান—২২৩৫, খৃষ্টান—২৩ ।

স্থানের নাম	কোন সালে	জনসংখ্যা	তুলনায়	হ্রাস বা বৃদ্ধি
কুমারখালি—	১২০১	৪৫৮৪	১৮২১—১২০১	১৫৮১—
	১৮২১	৩,১৬৫	১৮৮১—১৮২১	১২৪+
	১৮৮১	৬,০৪১	১৮৭২—১৮৮১	৭২০+
	১৮৭২	৫,২৫১		

১২০১ সালে হিন্দু—৩,২৪২, মুসলমান—১০৪২

মেহেরপুর—	১২০১	৫,৭৬৬	১৮২১—১২০১	৫৪—
	১৮২১	৫,৮২০	১৮৮১—১৮২১	১৮২+
	১৮৮১	৫,৭০১	১৮৭২—১৮৮১	১৬১+
	১৮৭২	৫,৫৬২		

১২০১ সালে হিন্দু—০,২৬৭, মুসলমান—১৭৮৭, খৃষ্টান—১১ ।

বীরনগর—	১২০১	৩,১২৪	১৮২১—১২০১	২২৭—
	১৮২১	৩,৪২১	১৮৮১—১৮২১	২০০—
	১৮৮১	৪,৩২১

১২০১ সালে হিন্দু—২,৩৮০, মুসলমান—৭০৫, খৃষ্টান—২ ।

স্থানের নাম	কোন সালে	জনসংখ্যা	তুলনায়	হ্রাস বা বৃদ্ধি
চাকদহ—	১২০১	৫,৫৮২	১৮২১—১২০১	৩,১০৬—
	১৮২১	৮,৬১৮	১৮৮১—১৮২১	৩৭১—
	১৮৮১	৮,২৮২	১৮৭২—১৮৮১	৭৭১+
	১৮৭২	৮,২১৮		

১২০১ সালে হিন্দু—৪,৩০০, মুসলমান—১,১৮১, খৃষ্টান—১ ।

নদীয়ার লোক সমষ্টি কত জন কোন ধর্মাবলম্বী।

নদীয়ার মোট লোক সমষ্টি ১,৬৬৭,৪১১ ; উন্মধ্যে পুরুষ ৮২৭,৫০১ ও স্ত্রীলোক ৮৩৯,৯১০ ।

		পুরুষ	স্ত্রীলোক
মোট হিন্দুধর্মাবলম্বী	৬৭৬,০১১	৩৩৩,৯৮৭	৩৪২,০২৪
” ব্রাহ্ম ”	১৬	১০	৬
” বৌদ্ধ ”	১	১	০
” পার্শী ”	১	১	০
” মুসলমান ”	৯৮২,৯৮৭	৪৮১,০৮১	৫০১,৯০৬
” খ্রীষ্টান ”	৮,০১১	৪,১২৭	৩,৮৮৪
” অন্যান্য ”	৪	২	২

নদীয়ার কত জন নরনারীর বর্ণ শিক্ষা আছে।*

সমগ্র ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যে বাহ্যিকের বর্ণ পরিচয় আছে বা শিক্ষিত এরূপ লোক সংখ্যা মোট ১০,৩৭৫ ; উন্মধ্যে পুরুষ ৮৬,১০৭ জন ও স্ত্রীলোক ৭,২৬৮ জন।

একেকবারে নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা মোট ১,৫৭৪,১১৬ ; উন্মধ্যে পুরুষ ৭৯১,০০২ ; স্ত্রীলোক ৮০২,১১৪ ।

* Nadia District in spite its proximity to Calcutta, is not especially remarkable for the diffusion of the rudiments of learning. In 1901 the proportion of the literate persons was 5.6 per cent. (10.4 males and 0.9 females). The total number of pupils under instruction increased from about 20,000 in 1883 to 29,364 in 1892-3 and 31,102 in 1900-1, while 31,513 boys and 4,442 girls were at School in 1903-4, being respectively 25.4 and 2.7 per cent of the number of School going age. The number of educational institutions, public and private in 1903-4 was 1,026, including an Arts College, 90 secondary, 887 primary, and 48 Special Schools.

বাঙ্গালা ভাষা জানে একর পুরুষ ৮৩১৮২ খ্রীলোক ৭, ১৭২। হিন্দি ভাষা জানে পুরুষ ১০৬৫ ; খ্রীলোক ৩২। অজান্ত ভাষা জানে পুরুষ ১৩১৩ ; খ্রীলোক ৮৭। বাহারা ইংরাজি ভাষা জানে, তাহাদের মোটসংখ্যা ১৩,১১৮, তন্মধ্যে পুরুষ ১৩,৮৩৬, খ্রীলোক ২৮১। পূর্বোক্ত সংখ্যার মধ্যে ভাষা-জ্ঞান আছে একর হিন্দুর মোট সংখ্যা ৭১,৮৭১ তন্মধ্যে পুরুষ ৬৬,২২৮ ও খ্রীলোক ৫০৬৩। অশিক্ষিতের মোটসংখ্যা ৬০৪৫২০ ; তন্মধ্যে ২৬৭,৭১২ পুরুষ, ৩৩৬,৮০১ খ্রীলোক বাঙ্গালা জানে লোকের সংখ্যা ২৭১ পুরুষ, ১৬ খ্রীলোক। অজান্ত ভাষা জানে ৬৪৬ পুরুষ, খ্রীলোক ৩। ইংরাজি জানে তাহার সংখ্যা মোট ১২,৬৭৫ জন তন্মধ্যে ১২,১৪০ পুরুষ, খ্রীলোক, ১৩৫। শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা ১২,৮০৮, তন্মধ্যে ১২০০১ পুরুষ ও খ্রীলোক ৮০৭। অশিক্ষিত বাক্তির মোটসংখ্যা ২৬৩,১১২ তন্মধ্যে ৪৭০,৩৮০ পুরুষ, ৪৯২,৭৯২ খ্রীলোক। বাঙ্গালা জানে তাহার সংখ্যা ১৮, ০৭১ পুরুষ ৭১২ খ্রীলোক। হিন্দি জানে তাহার সংখ্যা ২১ পুরুষ ২২ খ্রীলোক অজান্ত ভাষা জানে ১৩০ পুরুষ ২৬ খ্রীলোক। ইংরাজি জানে তাহার সংখ্যা মোট ১১১২ ; তন্মধ্যে ১০২১ পুরুষ ২১ খ্রীলোক।

নদীয়ার কৃষি।

নদীয়ার ভূমিসকল বিশেষ উর্বর। ইহার অধিকাংশ ভূমিই বাগ্‌কা-মিশ্রিত, বা বালুকাময়। বৈমজিক দাক্তের উপযোগী জল ইহাতে দীর্ঘকাল পাবে না, বালুকার উহা বিশেষণিত হয়। নদীয়ার কেবলমাত্র কালান্তরের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ও কুষ্টিয়া মহকুমার স্থানে স্থানে বৈমজিক দাক্ত প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। অজান্ত স্থানেও অল্পবিস্তর জন্মিয়া থাকে। এখানকার কৃষকেরা তাদৃশ কঠিন পরিশ্রমী নহে ইহারা কেবল দৈব ও পর্জন্ম দেবের অমুগ্ধতার উপর নির্ভর করিয়া থাকে ; অতিতে দিবার জন্য সার সংগ্রহণের প্রতি ইহাদের সেরূপ লক্ষ্য ও বৃত্ত নাই। বিনা আয়াসে বা স্বল্প পরিশ্রমে যে সার সংগ্রহ হয়, তাহাই

* Annual rainfall averages 57 inches of which 6.5 inches fall in May.

9.7 in June, 10.3 in August, 8.1 in September, and 4.1 in October.

Im. Gazetteer (New edition) vol XVIII page 273.

ব্যবহার করে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকার কারেবী বহু না থাকার হইয়া জমির উন্নতিকল্পে পরিশ্রম ও বহু করে না । তাহার উপর আবার যে বৎসর পর্য্যায়দেবের কৃপা না হয় সে বৎসর জলাভাবে যেমন কৃষীর ক্ষতি হয় তেমনই স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট পানীর জলের নিত্যই অভাব হইয়া পড়ে । † এ প্রদেশে জমির শুষ্কতা-প্রযুক্ত পালখনন (Irrigation) করিয়া ক্ষেত্রে জল লইয়া যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও চলে । তজ্জন্য এখনে পাল খনন কার্য্য (Irrigation) হয় না করাও হয় না । ১২০৩৪ সালে মোট ২০১ বর্গ মাইল আবাদ হইয়াছিল, আবাদ-যোগ্য পতিভূমি ৫৪৪ বর্গ মাইল ছিল । উৎপন্ন প্রবোধের মধ্যে চাউলই প্রধান । ৭৭৬ বর্গ মাইল ভূমিতে চাউলের আবাদ, তদ্ব্যতীত আশু ধান্যই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় । প্রায় ৬০৭ বর্গ মাইল ভূমিতে আশুধান্য উৎপন্ন হয় । এষ্ট আশুধান্য বৈশাখ মাসে বুনান হইয়া ভাদ্র মাসে কাটা হয় । আমন ধান্য অর্থাৎ চৈতন্যিক ধান্যের বীজ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করিয়া আষাঢ় মাসে ঐ চারা ক্ষেত্রান্তরে রোপণ করিয়া অগ্রহায়ণমাসে কাটা হয় । আশু দাণ্ড ভাদ্র মাসে কাটিয়া ঐ ভূমিতে চাষ দিয়া পুনরায় উগাতে* রবিপক্ষ বুনানি করা হয় । রবিপক্ষের মধ্যে মুগ, কলাই, মটর, ভোলা অরहर ধেনসারি বহুরি সরিষা ও মসিনা । গম ও নবের চাষ এখানে নাই বলিলেও হয় । বর্ষাকালে কোঠী কাটা হয় । পূর্বে কয়েকবৎসর কোঠীর চাষ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হইয়াছিল, কিন্তু আজকাল কোঠীর চাষ অনেক কমিয়া গিয়াছে । ইক্ষুর আবাদ কিছু কিছু হইয়া থাকে, বেশী নহে । পূর্বে এখানে অধিক পরিমাণে নীলের চাষ ছিল, এক্ষণে ভাগা লুপ্ত হইয়াছে । সমস্ত নীল কুঠীই বন্ধ হইয়াগিয়াছে । বর্ষাকালের শুষ্ক এ প্রদেশে উত্তমরূপে উৎপন্ন ও প্রস্তুত হইয়া থাকে । শান্তিপুর গড়ে চিনি প্রস্তুত, ও জেলায় দক্ষিণাংশে তামাকের চাষ হইয়া থাকে, এবং উত্তম

† সম্প্রতি মহানদীবিধিত রাজস্বায়েবর ৭ম এডওয়ার্ডের প্রতিশ্রুতী-করে নদীয়ার বর্ধমান জন-মির ম্যাজিষ্ট্রেট ইলাকহিল সাহায্যকে সুখপত্র করিয়া নদীয়ার জনসাধারণ লক্ষ টাকা টাঙ্গা ভুলিয়া নদীয়ার ভূদ্বন্দ্বণরীষ চলকট বিবরণের কল্পনা করিয়াছেন । আপা হত পক্ষই এ সকল কার্য্যে পরিণত হইবে ।



মহামহিমাদিত্য রাজ-বাজেশ্বর ভারত-সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড ।

(এই মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতি-বক্ষাক্ষে নদীয়াশাসী জনসাধারণ বহু অর্থ টান্না
তুলিয়া কোন স্থায়ী চিতকরী কীৰ্ত্তি স্থাপনের সঙ্কল্পনা করিয়াছেন ।

নদীয়া-কাছিনী ।

হিংলী তামাক জন্মে কিন্তু বেশী নহে। চাকদাহ ধানার এলাকায় পানের বরজ আছে। আত ধানের জমিতে এতোক বৎসর আবাদ হয় না; জমী উর্বর নাহে বলিয়া, একবৎসর আবাদের পর উপরূপরি ২।১ বৎসর তাহকে, উর্বরতা-শক্তি সঞ্চারের জন্য পতিতভাবে রাখিতে হয়। এপ্রদেশে তরিতরকারী উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে। গম্মার চর জুম্মাতে, এবং অন্যান্য নদীর চরে পটল, কুমড়া, কাঁহুড়, তরমুজ, প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আলুর চাষ এখানে নাই। জমি বালুকাময় হেতু ও স্যাঁতা নহে বলিয়া, এখানে নারিকেল বৃক্ষ তত অধিক নাই। সুপারি বৃক্ষ নাই বলিলেও চলে। গোচরণ জুম্মি এখানে নাই; একারণে গবাদির বিশেষ কষ্ট হয়। মোট কথা, এ প্রদেশে যে পরিমাণ চাউল জন্মে, তাহাতে এই জেলায় লোকের পক্ষে কোনরূপ চলিতে পারে। তবে অজন্মা হইলে, ও রপ্তানি হইলে সংকুলান হয় না, কাজেই মধ্যে মধ্যে হুতিজ উপস্থিত হয়। এখানে বৃষ্টি স্নোতিমত হইয়া থাকে। তবে দৈবশাপে, সময়ে হুতিজ অত্যধিক, ও অসময়ে অতি বৃষ্টি-প্রযুক্ত শস্যের বিশেষ হানি হইয়া থাকে।

নদীয়ার ব্যবসায়-বাণিজ্য।

নদীয়ার মধ্যে শান্তিপুরে, বাউ পাছিতে পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশমের কুঠি ছিল। শান্তিপুর হুস্ত বস্ত্র বয়ন-প্রধান-স্থান, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, শান্তিপুর হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতি বৎসর ১৫০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের হুস্ত বস্ত্র ক্রয় করিয়া বিদেশে চালান দিতেন। এক্ষণে শান্তিপুরে বহুতর উন্নয়ন আছে। কিন্তু সেরূপ পরিমাণে বস্ত্র আর প্রস্তুত হয় না। হুস্তরাং আজিও তথায় উৎকৃষ্ট হুস্ত বস্ত্র প্রস্তুত হইলেও, বেকর দেখা বাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে ঐ বয়ন-শিল্প অতি অল্প কাল মধ্যেই লুপ্ত হইবে। শান্তিপুর হুস্তরাং গড়ে এখনও অল্প বিস্তার চিনী প্রস্তুত হইয়া থাকে। মুনসীগঞ্জ আলমডাঙ্গা অঞ্চলেও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। নবদ্বীপ, রাণাঘাট, মেহেরপুর প্রদেশে পিতলের ত্রব্য উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ককনগরে মাটির পুতুল, মাটির কৃত্রিম ফল সুন্দররূপে নিৰ্ম্মিত হইয়া থাকে। কুষ্টিয়ার ইয়োরোপীয় তত্ত্বাবধানে, ইক্ষুর মাড়ার কারখানা আছে। শান্তি কুষ্টিয়ার অবসর-প্রাপ্ত

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু মোহিনীমোহন চক্রবর্তী বয়ঃ একটী কাপড়ের কল
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সাধারণে অর্থ সাহায্য করিলে, উহা বিশেষ সুকল প্রসব
করিবে। নদীয়ার নদীর সুবিধা থাকায় ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধা কর।
বিশেষতঃ ইহার বন্ধ দিয়া আর ১০০ মাইল ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেল ও তাহার মূর্নিদাবাধ
নাধা ৪০ মাইল ও শান্তিপুর লাইট রেল থাকায় নদীয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের আরও
সুবিধা হইয়াছে। ছোলা, সর্ষপ প্রকার ডাইল, কোটী, মসিনা, সন্নিসা ও লম্বা
এখান হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। এখান হইতে পূর্ব বঙ্গে চিনি রপ্তানি হয়।
বর্ডমান ও মানভূম প্রদেশ হইতে এ প্রদেশে জালানি করণা আমদানী হইয়া থাকে;
কলিকাতা হইতে এখানে লবণ, তৈল, বহু আমদানী হইয়া থাকে, কলিকাতা
হইতে কেরোসিন তৈল আমদানী হইয়া বশোহর মূর্নিদাবাধ প্রদেশে আবার রপ্তানি
হয়। কালনা হইতে বহু পরিমাণে অলু আমদানী হইয়া স্থানীয় বরচ বামে ভিন্ন
ভিন্ন প্রদেশে রপ্তানি হয়। বর্ডমান, দিনাজপুর, বগুড়া, বশোহর হইতে এখানে
চাউল আমদানী হয়। রেলওয়ের ধারে বাণিজ্য-কেন্দ্র বধা, চুরাডাঙ্গা, বগুসা,
কৃষ্ণপল্ল, রাণাঘাট, দাবুকদিয়া এবং পোড়ামহা। নদী সমূহের ধারে নৌকা-যোগে সবা
সভ্যে আমদানি-রপ্তানি-কেন্দ্র :—বধা শান্তিপুর, রাণাঘাট, করিমপুর, আঁহুলিয়া
কৃষ্ণনগর, বরুপল্ল, হাঁসখালী, কৃষ্ণপল্ল, বোয়ালিয়া, নোনাপল্ল, আলমডাঙ্গা,
পাংশা, কুড়িয়া, কুমারখালী, খোজা; এই সকল স্থানে বহুপরিমাণে দ্রব্য
আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানে প্রতি বৎসর আর ৩৮টী মেলা
হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে অধিকাংশই আর বর্ষ সম্বন্ধীয় মেলা; এই সব মেলার
মধ্যে শান্তিপুরের রাসমেলা, নবদ্বীপে পট পূর্বীয় মেলা, কুলিয়া অপরাজ-ভঙ্গনের
পাঠ মেলা, এবং বোয়ালিয়া ঘোলের মেলাই প্রধান ও এই গুলিতে অধিক লোক
সমাগম হইয়া থাকে। এই সকল মেলার নানা স্থান হইতে (স্থানীয় ও অন্ত
স্থানীয়) বহুতর দ্রব্যাদি আমদানী ও বহির্গ বিক্রয় হইয়া থাকে।

পরিশিষ্ট ।

নদীয়া-কাহিনী গ্রন্থিতে আরম্ভ করিবার সময় বরহরি দাসের “নবদীপ-পত্রিকা”র কোষ বিত্তস্ব সংকরণ না থাকায় পরিশিষ্টে উহা বিবরণ ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু, সম্ভ্রুতি নবদীপ পত্রিকার বহু স্মরণ বিত্তস্ব সংকরণ বাহির হইয়াছে । ঐতিহাসিকের চক্ষে নবদীপ পত্রিকার বিশেষ কোন দ্রব্য না থাকিলেও, প্রাচীন নবদীপের সংস্থানাদি স্মৃতিতে হইলে নবদীপ পত্রিকা ভৌগোলিকগণের বিশেষ সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই । ইহার নবদীপ-পত্রিকা পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবেন. উহাখণ্ডকে এই বিত্তস্ব সংকরণ পাঠ করিতে অনুরোধ করি ।

—:—

Names of Members of the Indian Civil Service who were connected with the administration of the District and who subsequently held higher positions, with short notices of their career.

1. SIR RIVERS THOMSON, K.C.S.I.—was District and Sessions Judge of Nadia from 1862 to 1865 ; while Lieutenant Governor of Bengal, visited Krishnagar in 1886 and Ranaghat when his visit was commemorated by the establishment of a public library which bore his name.
2. SIR WILLIAM HARSCHER,—was Magistrate of the District and as such, was very popular. Still remembered as a staunch friend of the Indigo *ryyat*. Rose to be a Member of the Board of Revenue.
3. SIR CHARLES CECIL STEVENS, K.C.S.I.—was the most popular Magistrate and Collector of the District. His amiable manners and unfailing courtesy and kindness won for him the heart of everybody who came in contact with him. His name is still remembered in the remotest corners of the District. Rose to be Acting Lieutenant Governor of Bengal.
4. SIR HENRY COTTON, K.C.S.I.,—was connected with the District as Subordinate officer of Chuadanga. Rose to be Chief Commissioner of Assam. His memory is still preserved there in a beautiful avenue bearing his name. A portrait is also preserved in the Local Criminal Court. His name is a household word for his love of India.

5. SIR JAMES WESTLAND, K.C.S.I.,—was associated with the administration of the District as Magistrate and Collector. Rose to be an ordinary Member of the Imperial Council.
6. SIR STUART COLVIN BAYLEY, K.C.S.I.—known as a very popular Magistrate and Collector for his amiable disposition. Rose to be a Member of the Board of Revenue and subsequently Lieutenant-Governor of Bengal.
7. SIR ALEXANDER MACKENZIE, K.C.S.I.,—was connected with the District as Sub-divisional officer of Kushtea. Became ultimately Lieutenant-Governor of Bengal.
8. LORD ULLICK BROWNE,—was for sometime the Magistrate and Collector and was known as a popular officer. Became a Member of the Board of Revenue.
9. HORACE A. COCKRALE, C.S.I.—was Magistrate and Collector. Rose to be a member of the Board of Revenue and subsequently acting Lieutenant-Governor of Bengal.
10. JAMES MONRO, C.B.—a popular Magistrate and Collector. His love of the District and specially its people was subsequently evinced, by his settling as a Missionary at Ranaghat. His knowledge of the District is sufficiently wide to enable him to speak with authority.
11. W. B. OLDHAM, C.S.I.—known as an able administrator. Was for a short time Magistrate and Collector. Rose to be a Member of the Board of Revenue.
12. W. C. MACPHERSON, C.S.I.—For a short time an acting Magistrate and Collector. Known as an able officer. Now a Member of the Board of Revenue.
13. A. EARLE, C.S.I.—Magistrate and Collector. Now a Secretary to the Government of India.
14. L. R. TOTTENHAM, C.I.E.—Magistrate and Collector. Became a Judge of the High Court.
15. K. G. GUPTA, C.S.I.—was for long the Magistrate and Collector and was very popular. Known as an intelligent and able officer. Now a colleague of the Right Hon'ble the Secretary of State.



÷। মহামহিমায়িত রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ । ÷—

নদীয়া কাহিনী ।

16. E. A. GAIT, C.I.E.,—One of the most popular Magistrates. His affability and unflinching courtesy endeared him to the people. His interest in furthering Sanskrit learning in the District, especially in *Navadvip* the seat of ancient Sanskrit literature is still remembered by the Educated Community. Now holds the position of Chief Census Commissioner for India.

EDUCATIONAL.

Of the foremost educationists who held charge of the Krishnagar College, the only College in the District, the following are worthy of notice :—

Captain D. L. Richardson ; Sir Roper Lethbridge, K.C.S.I. Norman Chevirs ; S. Lobb ; F. J. Rowe ; Prof Livingstone ; J. Mann ; and S. C. Hill. Some of them held high positions at present. The last named now holds the position of Director of Public Instruction, Central Provinces.



নিম্ন নদীয়াবাসী নদীয়ার জমিদারবর্গ ব্যতীত বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলার যে সমস্ত প্রধান প্রধান জমিদার বংশের জমিদারী নদীয়ায় আছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত সাহিত্যামুরাগী মহাহুস্তব নদীয়ার বাবুগণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

মহারাজা নগেন্দ্র চন্দ্র নন্দী (কাসিমবাজার), রাজা সার সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর (কলিকাতা), মহারাজা সার প্রমোদকুমার ঠাকুর (কলিকাতা), সিবিలిয়ান বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা) লুকাবি বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা), রাজা পার্শ্বমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া), রাজা প্রমথ ভূষণ দেবরায় (নলডাঙ্গা), রাজা হরিকেশ লাহা (কলিকাতা), বাবু অধিকাচরণ লাহা (কলিকাতা), বাবু গৌরচরণ লাহা (কলিকাতা), রাজা কৃষ্ণদাস লাহা (কলিকাতা), কুমার শরৎ কুমার রায় (দীঘপতিয়া), কুমার শরৎচন্দ্র সিংহ (পাকপাড়া), বাবু উপেন্দ্রনাথ নাথ ঘোষ (কলিকাতা), ওকালী প্রসন্ন ঘোষ (কলিকাতা) ।



নদীয়ার জমিদারগণের শীর্ষস্থানীয় নদীয়া-রাজ-শ্রী ভুবনবিখ্যাত অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী বংশের সুপণ্ডিত মহারাজা দ্বিতীয় চন্দ্র রায় বাহাদুর,—বাহার আন্তরিক বহু ও চেষ্টার উৎসাহিত হইয়া আমি নদীয়া-কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করি, আমার সেই প্রিয়-স্বপ্ন যে এত দীর্ঘ, নদীয়া-কাহিনী প্রকাশিত হইতে না হইতে আমারিগকে অকূল শোক-সাগরে ভাসাইয়া অকালে ইহ ধাম ত্যাগ করিয়া বাইবেন, তাহা কে ভাবিয়াছিল, (যুজ্য ২২২ ভাৱ) তাঁহার হস্তে আমি যে সম্পূর্ণ নদীয়া-কাহিনী তুলিয়া দিতে পারিলাম না, এ হ্রদে আমার বাইবার নহে । নারায়ণ তাঁহার আশ্রয় নীলগতি সাধন করণ ; পিতার উপযুক্ত পুত্র কুমার কোশিন্দ্র চন্দ্র পিতার ভায় বশঃ সমানে লাভ করল, এই দারুণ শোকে ইহাই আমাদের একমাত্র সাধনা ।

যে রাজার রাজত্বকাল মধ্যে কোনও পুস্তক রচনা সমাপ্ত হয় সেই পুস্তক ঐ রাজার রাজত্ব-
কালের যে বৎসরে সমাপ্ত হয়, পুস্তক সমাপ্তির তারিখে সেই বৎসরের উল্লেখ করা সমাভ্যন্তরীণ
এবং। নদীয়া কাহিনী লেখা, পূর্ণাঙ্গোল, শান্তিপুর, রাজরাজেশ্বর সমস্ত এডোয়ার্ডের রাজত্বকালের
৪৮ বর্ষে আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইচ্ছা ছিল তাঁহারই পুত্রানার লইয়া তাঁহারই রাজত্বকাল মধ্যে
উহা সমাপ্ত করিব, কিন্তু নিষত ইং ১৯১০ সালের ৩ মে, বঙ্গাব্দ সন ১৩১৭ সালের ২৩ বৈশাখ
তারিখে নিম্নলিখিত কাল তাঁহাকে ব্রাহ্মে টানিয়া লওয়ার এ সাথে বাদ পড়িয়াছে। এক্ষণে উপ-
স্থিত পিতার প্রতিজ্ঞা, মহাপ্রতিষথ করায় রাজরাজেশ্বর পক্ষ জর্জের মহামহিমায়িত নাম
গ্রহণ করিয়া তাঁহার রাজত্বের প্রথম বর্ষে ইং ১৯১০ সালের ৩০শে আগষ্ট তারিখে, সন ১৩১৭
সালের ১৪ ভাদ্র এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। ভগবান তাঁহার কর্মময় জীবন
শান্তিপূর্ণ ও সুখীর্ণ করুন; তাঁহার শান্তিবাণী কোবল আশ্রয়ে কমনীয় বলতাবা দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি
লাভ করুক, ভদ্রবতরণে ইহাই প্রার্থনা।

— :: —

শাকে পঞ্চ-ভূপেত-চন্দ্র-বিমিতে সিংহভূতে ভাষ্যে
বেঙ্গেলু-প্রমিতে মুদ্রে ২ শিত-তিথাবেকালীসংক্ষেপে ।
ত্রিংশকাবধঃ প্রবেশ সময়ে সম্পাদিতা শ্রীমতা
রাণাঘাট শিবাসিনা সুসুন্দর্যম্ প্রবক্তাবিঃ ।
নদীয়াকাহিনীমায় মলিকোপাধিধারিণা ।
পুস্তিকা সততাব্যস্ত ভগ্নানীপাতু বাবদঃ ।

সম্পূর্ণ।



